স্বাধীনতার অজানা কথা

বিক্রমাদিত্য

বেঙ্গল পাবলিশিং। কলিকাতা ৭০০০৭৩

স্বাধীনতার অজানা কথা

পরিচিতি

'স্বাধীনতার অজানা কাহিনী' 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামের', ইংরেজ শাসক বিরোধী 'আন্দোলন', 'বিদ্রোহের' এবং দেশনেতাদের স্বার্থের সংঘর্ষ, আত্মকলহের অপ্রকাশিত, অমুক্ত কাহিনী।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর অন্তে অতীত স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিচারণার আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব ইতিহাস এক কৌতুহলদ্দীপক সজীব কাহিনী হতে পারে সেই কথা স্মরণে রেখে আজ এই কাহিনী লেখা হল। এই কাহিনী প্রামাণিক তথ্য, বই, দলিলপত্রের উপর নির্ভর করে রচিত।

সদ্য প্রকাশিত বহু তথ্য, বই যার সাহায্য পেয়েছি তার পুরো তালিকা এই বই এর শেষাংশে প্রদত্ত হয়েছে। বহু লেখক ও ছাত্রদের গবেষণা আজ স্বাধীনতা সংগ্রাম কাহিনীর এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এবং বহু ঘটনার উপর নতুন আলোকপাত করেছে। এই ইতিহাস কিংবা পর্যবেক্ষণ অনেকের কাছে প্রিয় কিংবা শ্রুতিমধুর না হতে পারে এবং অনেকে হয়ত আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু বলা প্রয়োজন ইতিহাস কোন ব্যক্তির মন গড়া নিছক গল্প উপন্যাস নয়। 'এ হল অতিবাস্তব রূঢ় ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ যদি তারা এই কথা স্মরণ রেখে এই বই'র বিচার করেন তাহলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এই কাহিনী লেখবার আর একটি নেপথ্য কাহিনী আছে। ঘটনাটি আমার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ১৯১০ সালে ২৩শে জানুয়ারী আমার রেঙ্গুন প্রবাসকালে, প্রত্যুষে এক বৃদ্ধ ভারতীয় মুসলমান আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তার অভিযোগ ছিল যে নেতাজী সুভাষ বোসের জন্মদিন যথাযোগ্য সম্মান এবং মর্যাদা দিয়ে পালন করা হচ্ছে না। এই কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি আবার বললেন 'নেতাজী আমাকে স্বাধীনতার মন্ত্র শিখিয়েছেন…তিনি আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহস দিয়েছেন।' বৃদ্ধের এই কয়েকটি কথা আমার অন্ধচোখে এক নতুন আলোর ঝলক এনে দিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি ভারতীয় বিদেশ দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সচিব কে. পি. এস. মেননের Twilight in China বইটি পড়লাম। এই বইতে মেনন জওহরলাল নেহরুর কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন: আমি সুভাষ বোসের নীতির সঙ্গে একমত না হতে পারি তবে অনস্বীকার্য নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়া ভারতীয়দের মাটি দিয়ে তৈরি করে মানুষ করেছিলেন, (He has made men out of clay) মেননের এই উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছেন, বর্মা, সিঙ্গাপুর, মালেশিয়া এবং অন্যান্য ঐ সব এলাকায় তারা এই সব দেশে অনেক ভারতীয়দের বাড়িতে শুধু নেতাজীর ছবিই দেখতে পাবেন, অন্য কোন ভারতীয় দেশনেতার ছবি বড় বেশি দেখতে পাওয়া যাবে না। কারণ ঐ এলাকায ভারতীয়দের কাছে নেতাজী ছিলেন এক 'দেবতুল্য মানুষ'। নেতাজী দেশে ফিরে এলে কোন মানের কিংবা কোন পর্য্যায়ের নেতা হতেন সেই নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, বাদানুবাদ হতে পারে, তবে তিনি দেশে না ফিরে এসে এবং দেশের বাইরে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আন্দোলন করে কত বড় নেতা হযেছিলেন তার কিছু বিবরণী এই কাহিনীতে দেবার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সম্বন্ধে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উক্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকারের ডি-আই-বীর রিপোর্টে বলা হয়েছিল—

Bose's influence over the I. N A. is very considerable....It affects all races, castes, and communities, almost equally strongly. They regard him with deep admiration, respect and confidence as sincere patriot, as an able leader without peer among the overseas Indian community, as the organisers of India's first 'national army', as the protector of his contrymen, under Japanese occupation, as one who suecssfully dealt with the Japanese and who was accorded by them greater respect and power than most other leaders in the same position পরে নেতাজীর মৃত্যুর পর **South East Asia Command** এর মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের এক রিপোর্টে বলা হল (**Sept. 14, 1945)....one politician even declared that his legend will continue to inspire the people and steel them in their determination to free India and Asia from Imperialism.**

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তীকালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম এক রিপোর্টে বলেছিলেন যে, এই দেশে ইংরাজ সরকার আগামী পঁচিশ বছর নির্বিঘ্নে শাসন করতে পারবে। কিন্তু যেদিন কলকতায় এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে আই-এন-এর জয়ধ্বনি শোনা গেল তখন ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স দপ্তরের ডিরেক্টর, ক্যাকসেল, কম্যাণ্ডার ইন চীফ স্যর অকিনলেক এবং ভাইসরয়

ওয়েভেল স্বীকার করলেন যে, সুভাষ বোসের গঠিত 'আই-এন-এ ভারতীয় সেনা-বাহিনীর (ইংরেজ পরিচালিত) উপর এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং এই কারণবশত ব্রিটিশ সরকার এই সেনাবাহিনীর আনুগত্যের উপর আর নির্ভর করতে পারে না'। ক্লড অকিনলেক এই গুরুতর অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্যে অন্য দেশ থেকে গোপনে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আনবার প্রস্তাবও করে ছিলেন। এখানে বলা দরকার যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে শাসন করবার জন্যে মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় ইংরেজ আই-সি-এস, আই-পি, কর্মচারি এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করত। ক্র্যাকনেল তার গোপনীয় রিপোর্টে বলেছিলেন যে নেহরুও বলছে, I. N. A. men were soldiers of Independence. নর্থওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের গভর্নর স্যর জর্জ কানিংহাম ভাই-সরয়ের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, যে আই-এন-এ'র এই আন্দোলন ইংরেজ সরকারের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ভারতে ইংরেজ বন্ধুরা ক্রমেই ইংরেজ বিদ্বেষী হচ্ছে। এমন কী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্য আসফ আলিও স্বীকার করেছিলেন 'যে সুভাষ বোসের আই-এন-এ এই দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যা কংগ্রেস উপেক্ষা করতে পারে না'।

ওয়েভেল পরে সেক্রেটারী অব স্টেটসের কাছে বার বার চিঠি লিখে জানিয়ে ছিলেন যে, নেহরু, 'প্যাটেল দেশের নির্বাচনের কাজ-কারবারে আই-এন-এ আন্দোলনের পুরো সুযোগ নিচ্ছেন'।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আই-এন-এ'র এবং নেতাজী বোসের প্রভাবের কথা আমি এই বইতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি। এছাড়া ঐ সময়ে ব্রিটিশ সরকারের বিচলিত হবার আর একটি কারণ ছিল বোম্বাইতে 'ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ'।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কংগ্রেস ও অনান্য রাজনৈতিক দলগুলির এবং গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেলের ভারতের মুক্তি সংগ্রামে তাদের ভূমিকার বিচার করতে হবে। ইংরেজ কেন এই দেশ থেকে চলে গেল এবং কেন এত সহজে দেশের নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে রাজি হল তার একটি স্পষ্ট ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি'

এই কাহিনীর সূত্রপাত ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনকে ভিত্তি করে। অনেকে বলেন যে বিয়াল্লিশের এই আগষ্ট আন্দোলন হল' ইংরেজ সরকারের ভারত শাসন অবসানের প্রথম দিন। কারণ যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে এই দেশে ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের

ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল এবং এই জন্যে ইংরেজ সরকারও বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। এই কাহিনীর সমাপ্তি হয় ১৯৪৮ সালে মুহম্মদ আলি জিন্নার মৃত্যুর পর।

মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান দাবী', ইংরেজ শাসকের ভাষায় লীগের নেতাদের সম্মান এবং ক্ষমতা এবং কংগ্রেসের কাছে তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং নিজেদের (লীগের সদস্যদের) মূল্য বাড়াবার জন্যেই শুরু করা হয়েছিল এবং যে পাকিস্তানকে 'আল্লার স্বর্গভূমি' বলে প্রচার করা হয়েছিল, 'কবির সেই স্বপ্ন-কল্পনা' কী করে রাজনীতি-বিদদের আত্মকলহে, আত্মবিরোধে, আত্মম্ভরিতায় এবং কুচক্রী শাসকের চক্রান্তে, ষড়যন্ত্র ভয়াবহ জটাজাল বিস্তার করে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল সেই কাহিনীর রূপরেখা দেবার চেষ্টা করেছি। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে এই সর্বপ্রথম বাংলা কাহিনীতে মুসলিম লীগের নেতা মুহম্মদ আলি জিন্নার জীবন কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ এ পর্যন্ত যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখেছেন তারা শুধু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সংগ্রামের বিবরণী প্রকাশ করেছেন কিন্তু সেই বিবরণীতে জিন্নার কোন স্থান দেওয়া হয়নি? তারা জিন্নার জীবনী সম্বন্ধে মৌন ছিলেন। কী কারণে জিন্না একদা 'হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যর দূত' হয়ে কংগ্রেসের পতাকার নিচ থেকে সরে গিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্ত আজকের দেশ ভাগের ইতিহাসে এক অপরিহার্য অংশ। এছাড়া দেশ স্বাধীন হবার ঠিক আগে জিন্না দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুও দেশভাগের পরেই হল। প্রশ্ন হল কংগ্রেস নেতারা, গান্ধীজি, নেহরু কী জিন্নার এই ক্যান্সার রোগের কথা জানতেন কিংবা তারা জানবার চেষ্টা করেছিলেন? হয়ত তারা জানতেন না কিংবা জানবার চেষ্টাও করেননি। যদি এই খবর তাদের জানা থাকত এবং তারা কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকতেন তাহলে পাকিস্তান গঠন হত কিনা সন্দেহ? কারণ এই পাকিস্তান গঠনের পেছনে যে শক্তি বিদেশী শাসকের সাহায্যে পরিপুষ্ট হচ্ছিল সেই শক্তির অধিকর্তা ছিলেন কায়েদ-ই-আজম মুহম্মদ আলি জিন্না।

দেশভাগের মূল কারণ কী এবং কার ভুলে এই পাকিস্তান গঠন করা সম্ভব হয়েছিল তার কিছু বিবরণী দেবার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে একমাত্র মৌলানা আবুল কালাম আজাদই সর্বান্তঃকরণে দেশভাগ এবং পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন। গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতারাও পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রতি পদে পদে এত ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যে তাঁদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে শেষ অবধি এঁরা পাকিস্তান এবং

দেশভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

গান্ধীজি দেশভাগের বিরোধী ছিলেন কিন্তু তার এই বিরোধিতা ছিল অতি দুর্বল। প্রথমত চুয়াল্লিশ দশকের মধ্য ভাগে জেলখানা থেকে বেড়িয়ে এসে তিনি রাজগোপালচারীর প্রস্তাবঅনুযায়ী 'পাকিস্তান' গঠন নিয়ে আলোচনা করার জন্যে জিন্নার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জিন্নার ভাষায় এই দেখা করবার পর, গান্ধীজি পরোক্ষে পাকিস্তানের কাঠামো গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। পরে ছিয়াল্লিশ এবং সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ যখন এক বাস্তবরূপ নিল তখন তিনি বিহার থেকে কংগ্রেস নেতাদের কাছে চিঠি লিখে পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু জাতির কাছে পাকিস্তান গঠন এবং দেশভাগ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গান্ধীজির এই প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতারা কোন গুরুত্ব দেননি। জীবনে গান্ধীজি বহু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করে অনশন করেছিলেন কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের এই দেশভাগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কেন তিনি অনশন করেন নি, এর সঠিক কারণ জানা যায়নি। তাহলে কী গান্ধীজি শুধু সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা করে দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন এই সমালোচনা উঠেছে। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, গান্ধীজি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় প্রস্তাব করেছিলেন 'আপনি দেশের সরকার গঠনের দায়িত্ব জিন্নার হাতে তুলে দিন। উনি নিজের বাছাই করা লোকদের নিয়ে দেশের সরকার গঠন করুন'। কিন্তু লর্ড ওয়েভেলের মত মাউন্টব্যাটেনও গান্ধীজিকে এড়িয়ে চলতেন। পরে মাউন্টব্যাটেন ও কংগ্রেস নেতারা তাঁর এই প্রস্তাবকে 'পাগলের প্রস্তাব' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এছাড়া কংগ্রেস নেতারা, বিশেষ করে নেহরু এবং প্যাটেল, গান্ধীজির প্রস্তাবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কারণ ক্ষমতা গ্রহণ করাই ছিল তাদের সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য। কংগ্রেস নেতারা যখন দেশভাগের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন তখন ভাইসরয় গান্ধীজির বিহার পরিভ্রমণকে 'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে গণ্য করেছিলেন। গান্ধীজি নোয়াখালি চলে গেলেন [trekked off to Noakhali in Bengal to seek to calm communal passion there on the eve of partition and much to the Mountbatten's delight. (জিন্না : ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৩৬) মাউন্টব্যাটেন পরে আর একটি রিপোর্টে লিখেছিলেন : "Gandhi has announced his decision to spend the rest of his life in Pakistan looking after the minorities. This will infuriate jinnah, but will be a great relief to congress for as I have said before, his influence largely

negatlive or even destructive and is directed against the only man who has his feet firmly on the ground, Vallablhbnrai Patel. (Mountbatten, "Top Sccret" personal reports as Viceroy, no 16, page-228.) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে ট্রান্সফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড, এবং জিন্না, ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৩৬ দ্রষ্টব্য]।

দেশভাগের সময় গান্ধীজি পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। হয়ত এই সময়ে তিনি দিল্লীতে উপস্থিত থাকলে লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের প্রস্তাব নেহরু, প্যাটেলের কাছে বিক্রী করতে পারতেন না। সব ভাইসরয়ই এবং ইংরেজ সরকারি কর্মচারিরা গান্ধীজিকে দিল্লীর বাইরে এবং দেশভাগের আলাপ-আলোচনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। এই কারনেই পরবর্তীকালে গান্ধীজির নোয়াখালি এবং বিহার সফরকে one man peace misson বলে ব্রিটিশ কাগজে সুখ্যাতি করা হয়েছিল। আর একটি কথা। গান্ধীজ যখন নোয়াখালি এবং বিহারে দাঙ্গাবিধ্বস্ত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে গিয়েছিলেন তখন ঐ এলাকায় তার করবার মত কিছুই ছিল না। ক্ষতি যা হবার হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে তার দিল্লীতে থাকা নোয়াখালি, বিহারে থাকবার চাইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। অনেকে বলেন তিনি তার বার্ধক্যের দরুণ আর কোন নতুন আন্দোলন শুরু করতে চাননি কিংবা তিনি দেশের গুরুতর পরিস্থিতি এবং আই এন এ ও নৌবাহিনীর বিদ্রোহের এবং আই-এন-এ, নেতাজীর জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ রেখে কংগ্রেস নেতাদের এবং নেহরুর ক্ষমতা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে চাননি। কিংবা তিনিও ইংরেজ সরকার এবং কংগ্রেস নেতাদের মত আতঙ্কিত হয়েছিলেন যদি কংগ্রেস ঐ সময়ে ক্ষমতা গ্রহণ না করত তাহলে দেশের ক্ষমতা হয়ত বামপন্থী নেতাদের হাতে চলে যেত।

'এই সব যুক্তির মধ্যে কোন যুক্তি সত্যি আজ বলা কঠিন। এ ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বহু ভুলের এবং কল্পনার বালুচর পড়েছে যার মধ্যে সত্যি এবং মিথ্যেকে আবিষ্কার করা কঠিন কাজ হয়ে পড়েছে। আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমত দেশভাগ করা যখন স্থির হল তখন গান্ধীজি ভাইসরয়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন (৪ঠা জুন) এবং ভাইসরয় গান্ধীজিকে বললেন দেশভাগ করা ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। 'মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজিকে আরও বলেছিলেন যে' এই প্রস্তাব (দেশভাগের) করবার প্রেরণা ও উৎসাহ গান্ধীজিই তাকে দিয়েছেন। কারণ গান্ধীজি বলে-ছিলেন যে ভারতের লোকেরা তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে এবং এই দেশ-

ভাগের পরিকল্পনাকে গান্ধী প্ল্যান বলা উচিৎ, তার (মাউণ্টব্যাটেনের) প্ল্যান নয়। গান্ধীজি মাউণ্টব্যাটেনের এই যুক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা বোঝা যায় না। মাউণ্টব্যাটেনের জীবনী লেখক জিগলার তার বইতে বলেছেন It seems unlikely that Gandhi was convinced by this line of argument but intelligence and subtlety are not necessarily sure guards against flattery. He (Vicerory) puts his case........with a skill persuasiveness and flair for salesmanship........His efforts were sucessful [মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার, পৃষ্ঠা ৩৭৯]।

এই দেখা সাক্ষাতের পর গান্ধীজি ভাইসরয়কে দেশভাগের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেন। ঐ দিন তিনি তার প্রার্থনা সভায় তিনি বলেছিলেন 'এই দেশ ভাগে ভাইসরয়ের কোন হাত ছিল না। যদি হিন্দু মুসলমান অন্য কিছুতে রাজি না হতে পারে তাহলে ভাইসরয়ের দেশভাগ করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না।'

আর একটি প্রশ্ন পাঠকদের মনে হতে পারে। কংগ্রেস নেতারা কেন দেশ ভাগ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের মূল দাবী পূর্ণ-স্বাধীনতার পরিবর্তে নেতারা কেন ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস গ্রহণ করেছিলেন এবং কেন ঐ দিন জনগণকে বলা হয়নি যে এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার দরুণ (ইংরেজ সরকার শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছিল এবং 'স্বাধীনতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি) দেশকে শুধু ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস দেওয়া হচ্ছে··· ?

'এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত এবং স্বাধীনতা' শব্দটির মধ্যে যে পার্থক্য ছিল এই কথা দেশবাসীকে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ স্পষ্ট করে জানান হনি। ঘোষণা অনেকটা 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজের' মত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজি জানতেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরিতের দরুণ দেশ শুধু ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস পাচ্ছে কিন্তু তিনিও তার প্রার্থনা সভার বক্তৃতা এই পার্থক্যের কথা স্পষ্ট করে জনগণকে বলেন নি।

নেহরু এবং কংগ্রেস নেতারা দেশভাগের কী ভয়ংকর পরিণাম হবে কিংবা হতে পারে সেই নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করেন নি। ১৫ই জুন ১৯৪৭ সালে নেহরু এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : পাকিস্তান গঠন হলে কেন সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হবে তার কোন যুক্তিসঙ্গত 'কারণ' তিনি খুঁজে পাননি। প্যাটেল বলেছিলেন যে একবার দেহে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলে বাকী অংশটুকু বাদ দিলে দেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে পাকিস্তান এবং দেশভাগ করা হলে কী সুবিধে অসুবিধে হবে বা হতে পারে সেই নিয়ে কংগ্রেস নেতারা কোন চিন্তা-

ভাবনা কিংবা গবেষণা করেন নি। জিন্না কিছুটা করেছিলেন এবং শাহ নওয়াজ খান নামে তার এক বন্ধু পাকিস্তানের আর্থিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন। তবে শাহ নওয়াজ খানের গবেষণা খুব গভীর ছিল না। একমাত্র ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেটস-পেথিক লরেন্সের সেক্রেটারী টার্নবুল পাকিস্তান গঠন হলে ভারতের এবং নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কী জটিল সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সেই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। টার্নবুলের পাকিস্তানের উপর এই রিপোর্ট আজকের রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মচারিদের জন্যে বিশেষ উপযোগী এবং তাদের এই রিপোর্ট পাঠ করা আবশ্যক। বাংলা ভাগ হলে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ কী হবে এই নিয়ে বাংলার গভর্নর বারোজ কিছু মন্তব্য করেছিলেন। বারোজ তাঁর এই রিপোর্ট মাউন্টব্যাটেনের কাছে পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, বাংলাকে ভাগ করা হলে পূর্ব-বাংলা হবে এক 'গ্রামীন বস্তী' (a rural slum)। এই বইতে পাঠকদের সুবিধের জন্যে টার্নবুল এবং বারোজের রিপোর্টের কিছু অংশ তুলে দে'য়া হল।

দেশভাগের পরবর্তীকালে জনগণের ভবিষ্যৎ কী হবে এবং যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে দেশকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের নেতারা পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাদের সেই উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হল না। এ নিয়ে দেশের নেতাদের মধ্যে কোন চিন্তা-ভাবনার পরিচয় আমরা কোন কাগজপত্রে পাইনি। সর্দার প্যাটেল (বাংলা সরকারের ডি. আই. বী'র রিপোর্ট অনুযায়ী এবং এই রিপোর্ট গভর্নর বারোজকে দে'য়া হয়েছিল) বাংলার তিন কংগ্রেস সদস্যকে (৪ঠা জুন, ১৯৪৭) বলেছিলেন 'যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে কিছু নতি স্বীকার করেছেন বটে তবে এই প্রস্তাবের বিকল্প ছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস এই যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত নয়। এছাড়া দেশের এবং দেশবাসীর মঙ্গলের কথা চিন্তা করে কংগ্রেস তার নীতিকে কিছু হজম করেছে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস মীমাংসা করেছে। রাজনীতির খেলায় এই প্রকার অনেক আপস মীমাংসা করতে হয়' এই ছিল সর্দার প্যাটেলের বক্তব্য। এ ছাড়া সর্দার প্যাটেল বাংলার প্রতিনিধিদের কাছে আরও বলেছিলেন যে, অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবার জন্যে কংগ্রেসের প্রভাব এবং প্রতিপত্তির যা কমবার তা কমেছে এবং এর চাইতে বেশি হ্রাস পাবে না। অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দেওয়া কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য নয় কিন্তু এ-ক্ষমতা গ্রহণ হল দেশকে স্বাধীন করবার এক পদক্ষেপ। যদি দেখা যায় অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দিয়ে কংগ্রেস

তার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে পারছেনা তাহলে কংগ্রেস অন্তবর্তীকালীন সরকার থেকে বেড়িয়ে আসবে এবং সংগ্রাম শুরু করবে। কিন্তু শুধু মাত্র আসামের জন্যে সমস্ত ভারত গৃহযুদ্ধ করতে পারে না। কংগ্রেসের বক্তব্য হল যে ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমিকতার শক্তপাথরের দেয়ালে একটি ছিদ্র তারা আবিস্কার করেছে এবং এই ছিদ্র হল ১৬ই মে এর ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব। এই ছিদ্রের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকাকে এ দেশ থেকে তাড়াতে চায়।'

সর্দার প্যাটেলের এই বিবৃতি খুব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার ছিল। কিন্তু একবার অন্তবর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবার পর কংগ্রেস নেতারা তাদের ক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে সরকার থেকে বেড়িয়ে আসতেন কিনা সন্দেহ। কারণ ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর যখন পরে স্থির করা হল কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করবে তখন অনেক মন্ত্রীই পদত্যাগ করতে চাননি। এমন কী রাজগোপালচারি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর তার কংগ্রেস সহকর্মীদের পেছনে পুলিশ ইনফরমার লাগিয়েছিলেন। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে সর্দার প্যাটেল শুধু বাংলার প্রতিনিধিদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন, যেন বাংলা কংগ্রেসের নীতি বিরোধী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ না করে।

নেহরু কেন দেশভাগ গ্রহণ করেছিলেন তার বিভিন্ন বক্তৃতা বিশ্লেষণ করলে তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। প্রথমত তিনি এক গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করেছিলেন। দুই, তিনি ভেবেছিলেন যে লীগের দাবীকে স্বীকার করে নিলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন partition is better than murder of inocent citizen। তার এই বিচারে ভুল ছিল। কারণ দেশভাগের পর পাঞ্জাব এবং দিল্লীতে যে ভয়াবহ নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনা তার ভুল বিচারের সাক্ষ্য দেবে। পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পর প্যাটেল তার এক ইংরেজ বন্ধুর কাছে বলেছিলেন : We were promised peace if we accepted partition। এই সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের মধ্যে প্রতিদিন লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এক বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। নেহরু আরও বলেছিলেন যে দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরও তীব্র হচ্ছিল। এর দরুণ ঐ অবস্থায় 'অখণ্ড ভারত' গ্রহণ করলে ভারত আরও দুবল হত। কারণ অধিকাংশ ক্ষমতা প্রদেশগুলির হাতে ছিল। (নেহরু প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা রাখবার খুব পক্ষপাতি ছিলেন না)। 'আমরা (নেহরুর বক্তব্য) অন্য কোন উপায়ে স্বাধীনতা পাবার

পথ দেখছিলাম না। অতএব আমরা এক শক্ত, মজবুৎ ফেডারেল শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত গঠন করবার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম অন্য কেউ যদি এই ভারতে অংশ গ্রহণ করতে না চায় তাহলে আমরা কেন তাদের আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করব।'

এছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে (নেহরুর বক্তব্যানুযায়ী) নেহরু দেশ-ভাগকে এক আপস মীমাংসার প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন। নেহরু এবং কংগ্রেসের ও দেশবাসীর বদ্ধ ধারনা ছিল যে পাকিস্তান হবে ক্ষণস্থায়ী। কারণ নেহরু ও কংগ্রেস নেতারা ভেবেছিলেন রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামরিক দুর্বলতার কারণবশত পাকিস্তান জীবিত থাকতে পারবে না। এমন কী টার্নবুলের পাকিস্তানের উপর যে রিপোর্টটি রচনা করা হয়েছিল সেই রিপোর্টেও বলা হয়েছিল যে ভারতের কিংবা অন্য কোন দেশের সাহায্য ছাড়া পাকিস্তান বাঁচতে পারবে না। আমরা জানি আজ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন সদ্ভাব নেই। অতএব আর একটি তৃতীয় দেশ (এ ক্ষেত্রে আমেরিকা) পাকিস্তানকে পরিচালনা করছে। কারণ পাকিস্তানের সামরিক (টার্নবুলের রিপোর্টে বিস্তৃত করে এই সামরিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল) গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। (অপর দিকে রাশিয়া ও আর একদিকে আফগানিস্থান) এইখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে অনেকে ভেবেছিলেন যে পাকিস্তান ভারত অদূর ভবিষ্যৎ আবার বন্ধু হবে। এমন কী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এক প্রস্তাবে [কংগ্রেস বুলেটিন, চারনম্বর ১০ই জুলাই, পৃষ্ঠা-১১]। বলেছিল… When passions have cooled, a new and a stronger unity based on goodwill and cooperation will emerge"

আমার এই কাহিনীতে দেশনেতাদের চরিত্র এবং কার্যকলাপকে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করেছি।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রমে গান্ধীজির অনলস সংগ্রাম অনস্বীকার্য। তিনি দেশের জন্যে কারাগার বরণ করেছেন এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিচারে তার সমকক্ষ কোন নেতা কিংবা ব্রিটিশ ভাইসরয় ছিলেন না। আমরা জানি যদিও গান্ধীজি ১৯১৫ সালে দেশে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু তিনি ১৯১৯ সালে তার সংগ্রাম এবং রাজনীতি করেছিলেন। কেন?

একটা কথা বলা প্রয়োজন যখন গান্ধীজি তার রাজনীতির কাজ শুরু করে-ছিলেন তখন দেশের আশী ভাগ লোক ছিল নিরক্ষর এবং এদের আকৃষ্ট করবার জন্যে তিনি ধর্মকে তার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তার প্রতি প্রার্থনা

সভায় গীতা, বাইবেল এবং কোরান পাঠ করা হত। উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা এবং তার এই উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল। তিনি অশিক্ষিত জনগণকে ধর্মের বাণী শুনিয়ে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করবার আগে কংগ্রেস ছিল এক 'ইংরেজ রাজভক্ত প্রতিষ্ঠান' এবং গান্ধীজিই সর্ব প্রথমে কংগ্রেসকে এক জনপ্রতিষ্ঠানে দাঁড় করালেন। তিনি সামাজিক সেবা শুশ্রূষার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন তবে তিনি রামমোহনের, বিদ্যাসাগরের মত সমাজের কয়েকটি কুসংস্কারের (সতীদাহ, ইত্যাদি) সমাজের আমূল পরিবর্তন করবার ব্যাপার অত মনযোগ সহকারে কাজ করবার সময় পাননি। কিন্তু অন্য আরও কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয়ে জড়িত হবার দরুণ তিনি দেশের সর্বশ্রেণীর প্রিয়ভাজন হতে পারেন নি। এ ছাড়া তিনি তাঁর নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। কোন একটি বিষয় নিয়ে সুকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর তিনি কারু কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ, বিরোধিতা সহ্য করতে পারতেন না। উদাহরণ হিসাবে আমরা জিন্না, সুভাষ বোস ও নরীম্যানের নাম করতে পারি কারণ এদের বিরুদ্ধে তিনি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যে এরা সবাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এরা সবাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে খুব সাফল্য সহকারে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অনেকে বলেন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করা সম্বন্ধে তার (গান্ধীজির) দক্ষতার অভাব ছিল। তিনি দেশের নেতা ছিলেন বটে কিন্তু যখন সংগ্রাম, আন্দোলন শুরু করা হত তখন কিছুদিন পরে তিনি তার নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করতেন। এই ব্যর্থতাকে তিনি 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' বলতেন এবং তার আন্দোলনকে প্রত্যাহার করতেন। তার আন্দোলনের আহ্বানে অসংখ্য সহস্র জনগণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা পরে তাদের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়েছিল, চাকুরীজীবীরা তাদের চাকুরী থেকে ইস্তাফা দিয়েছিলেন। স্কুল কলেজের মাষ্টারেরা শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং ছাত্ররা স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এছাড়া সরকারের বিরোধী হরতাল ঘোষণা করে তিনি দেশের আইন শৃঙ্খলাকে শিথিল করে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ১৯৪২ বিপ্লবের কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি ৮-৯ই আগষ্ট সমস্ত দেশবাসীকে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে ডাক দিয়ে ছিলেন কিন্তু এই আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্যে তার কোন সুপরিকল্পিত প্ল্যান কিংবা নকশা ছিল না। অতএব দেশের কয়েকটি স্থানে আন্দোলন যখন তীব্র হল কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে

ইংরেজ সরকার অতি সহজেই এই 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন ব্যর্থ করল।

ইংরেজের আইনের তুলনামূলক বিচারে গান্ধীজির জুড়িদার কেউ ছিল না। প্রতি ভাইসরয়, ওয়েভেল, মাউন্টব্যাটেন তাকে এড়িয়ে চলতেন। অতএব যখন গান্ধীজি দিল্লী ছেড়ে নোয়াখালি কিংবা বিহারে যেতেন তখন তারা নিশ্চিন্ত বোধ করতেন। গান্ধীজির নেতৃত্বর একটি বিশেষ অপরিহার্য অংশ ছিল তার ইংরাজি ভাষার ব্যুৎপত্তি। তিনি বাইবেলের ভাষাকে খুব ভাল করে দখল করেছিলেন। লর্ড ওয়েভেল, যিনি গান্ধীকে সবচাইতে বেশি ভয় পেতেন, বলে ছিলেন: He never makes a pronouncement that is not qualified and so vaguely worded that it can not be used in whatever sense it best suits him at a later stage. পরে লর্ড ওয়েভেল স্বীকার করেছিলেন, তিনি (গান্ধীজি) যতই দুমুখো হন না কেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সরকারকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা এবং তার এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। অনেকে অভিযোগ করেছে যে গান্ধীজির পক্ষপাতিত্বের দোষ ছিল। নেহরু সম্বন্ধে তার একটি 'অন্ধবিশ্বাস' ছিল। গান্ধীজি পর পর দু'বার সর্দার প্যাটেলের পরিবর্তে নেহরুকে কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্যে মনোনীত করেছিলেন। প্রথমবার ১৯২৯ ১৯৩০ সালে, যখন তিনি নেহরুকে কংগ্রেসের সভাপতি করলেন তখন তিনি (গান্ধীজি) নেহরুর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন He is a knight, sans peur, sans reproche. তিনি পরে ১৯৪৬ সালে আবার সর্দার প্যাটেলের পরিবর্তে নেহরুকে কংগ্রেসের সভাপতি করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে নেহরুই হবেন আগামী বছরের ভারতের প্রধান মন্ত্রী। এই বইতে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে গান্ধীজি জিন্নাকে ভুল আন্দাজ, অনুমান করেছিলেন এবং ঠিক ভাবে তার মূল্য যাচাই করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন জিন্না কী সাম্প্রদায়িক ছিলেন? প্রথমে ছিলেন না, কিন্তু পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এবং বলা যায় কিছুটা গান্ধীজি নেহরু এবং কংগ্রেস তার বিরোধিতা করবার জন্যেই তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে তার প্রধান বাহক করে নিয়েছিলেন। জিন্না চালচলনে, আদাবকায়দায় ছিলেন পাকা সাহেব। তিনি ধর্মে বিশ্বাস করতেন না কিন্তু তিনিও ধর্মের দোহাই দিয়ে সহস্র মুসলমান জনতাকে বশ করেছিলেন। নেহরু ভেবেছিলেন যে মুসলমানদের পেটের খিদেই অর্থাৎ অর্থনীতি সমস্যা হয়ত প্রবল কিন্তু জিন্নার মত নেহরু বুঝতে পরেননি যে পেটের খিদের চাইতে ধর্মের আকর্ষণ সবার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। আমার এই কাহিনীতে জিন্নার সাহেবী আদবকায়দার কিছু ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

এই কাহিনীতে চারটি দলের সংগ্রামের কার্যকলাপকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এই চারটি দল হল কংগ্রেস (গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেল) মুসলিম লীগ (জিন্না) আই-এন-এ (নেতাজী বোস) এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ সরকার অর্থাৎ তার তিন ভাইসরয়, লর্ড লিনলিথগো, ওয়েভেল এবং মাউণ্টব্যাটেন।

এই পরিচিতি শেষ করবার আগে নেহরু এবং ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষে ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। নেহরু ছিলেন ঐতিহাসিকদের ভাষায় 'এক দুর্বল প্রকৃতির ভাবপ্রবণ, সুবিধাবাদী এবং অহংকারী নেতা'।

নেহরুর জীবনের দুর্বলতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তার জীবনীর লেখক এস. গোপালও বলেছেন যে, তার ভুল, অহমিকার এবং অহংকারের জন্যেই দেশকে পরবর্তীকালে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। সাধারণত তিনি তাঁর রাজনীতির মতামত সম্বন্ধে অন্যের উপর নির্ভর করতেন। প্রথম জীবনে তার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তাঁর পিতা, মতিলাল নেহরু এবং পরে গান্ধীজির উপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। গান্ধীজির নির্দেশ ছাড়া তিনি একপাও এগোতে পারতেন না। গান্ধীজির মৃত্যুর পর তিনি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং পরে রাজাজীর পরামর্শের উপর নির্ভর করতেন। (কিছুটা কৃষ্ণ মেননের তার উপর প্রভাব ছিল) নেহরুর নিজস্ব কোন স্বাধীন মত ছিল কিনা সন্দেহের ব্যাপার।

লেডী মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর উপর এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তার উপরে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন এবং লেডী মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাবের দরুণই হয়ত "দেশভাগ" এত ত্বরান্বিত হয়েছিল। কী করে এই কাজ হয়েছিল তার বিবরণী এই বইতে দিয়েছি। এছাড়া লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ওয়েভেলেরই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করলেন বটে তবে তার পদক্ষেপের নীতি একটু স্বতন্ত্র ছিল এবং আলাদা ছিল। কারণ আমরা দেখতে পাব যে তিনি দেশ-নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে তার স্ত্রী এডউইনা মাউণ্টব্যাটেন এবং কন্যাকে জনসংযোগের কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এবং দেশের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে এই সর্বপ্রথম এক ইংরেজ ভাইসরয় তার রাজনীতি দাবার চালকে সফল করবার জন্যে এক ইংরেজ মহিলাকে ব্যবহার করলেন। এমন কী এডউইনার এই ধরনের কাজ করবার জন্যে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জও প্রস্তাব করেছিলেন। এডউইনার সাহায্য নিয়ে (His wife was an invaluable ally....she has made herself the queen and through the rapport she had established

with Indian leaders and still more their wives....Mountbatten by Ziegler pp. 365.) পরে এডউইনার সঙ্গে নেহরুর বন্ধুত্ব, অনুরাগ, ভালবাসা হল এবং এডউইনা গান্ধীজির'ও বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার এক সন্ধিক্ষণে এই 'মাতাহরি' লেডী মাউন্টব্যাটেনের চরিত্রের এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার আগমন এবং তার কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং নেহরুর সঙ্গে ভালবাসা, প্রেম, অনুরাগ দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

নেহরু, মাউন্টব্যাটেনের ভাষায়, প্রথমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে থাকবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। (Nehru said he did not see how India could remain within it....there was room for manouever....the Viceroy felt.) আমরা দেখতে পাব যে মাউন্টব্যাটেন তাঁর স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে নেহরুকে একেবারে হাতের মুঠোয় করেছিলেন এবং ভাইসরয় যা বলতেন সেই কথা স্বীকার করে নিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১৫ই আগষ্টের পর ভাইসরয় ব্রিটিশ রাজার (ষষ্ঠ জর্জ) কাছে এক চিঠি লেখে ছিলেন। পরে তিনি নেহরুর সঙ্গে এই চিঠি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন (He told me that I was quite right in offering to stop it. Mountbatten then asked whether he had any objcetion to my writing a regular letter to the King in view that he was still the king in India, and I was his representative, Nehru said he saw no objection to this, I asked if I might make those letters personal and not show them to Nehru, he said he trusted implicitely in this matter and I could do as I wished........Transfer of Power. Vol. XII. PPS-451)

এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে মাউন্টব্যাটেন দম্পতি নেহরুর উপর কতদূর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক বিদেশী গভর্নর জেনারেলকে তার ইচ্ছে মত চিঠি লিখবার এবং কাজ করবার সম্মতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঐ সব চিঠি তাকে না দেখালেও চলবে। দুই, আর একটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয় হল মাউন্টব্যাটেনের ক্ষমতা হস্তান্তরিতের পর উক্তি He was still the King in India and I was his representative.

এরপর আমরা দেখতে পাব নেহরু যখন তার ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিসভায় গঠন করবেন তখন মাউন্টব্যাটেন তাঁকে পরামর্শ দিতেন কাকে কাকে মন্ত্রীসভায়

গ্রহণ করতে হবে।

অনেক পাঠকই হয়ত জানেন না যে নেহরু ১৯৪২ সালে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পরে গান্ধীজির কাছ থেকে ধমক খাবার পর তিনি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া ১৯৪২ সালে তিনি প্রকাশ্যে নেতাজী সুভাষ বোসের এবং তার আই-এন-এ'র বিরোধিতা করেছিলেন এবং পরে ১৯৪৫ সালে তিনি গাউন চাপিয়ে আই-এন-এ'র সমর্থনে জন্যে লালকিল্লার বিচারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর এই নীতি ছিল সুবিধাবাদের নীতি। এত সব মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্বেও নেহরু বিভিন্ন কারণে জনপ্রিয় নেতা হয়েছিলেন। ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল এবং গান্ধীজি তাকে সাহায্য এবং সমর্থন করেছিলেন। অন্য কোন কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজির প্রিয়ভাজন ছিলেন না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এত অল্প পাতায় লেখা এক দুরুহ কাজ। তবু এই চেষ্টা করেছি। বই-এর সার্থকতা নির্ভর করবে পাঠকের বিচারের উপর।

এই বইতে Chief Minister. শব্দকে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়েছে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের, কারণ ১৯৪৮ সালে প্রদেশের এই পদকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত।

এই বই রচনায় আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন ডাঃ শিশির বসু, নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর। তাঁর সাহায্যে আমি নেতাজীর ইম্ফলের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের প্রতি নেতাজীর বাণী নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো থেকে সংগ্রহ করেছি। আর এই বই ছাপার সময়ে সুবীর ভট্টাচার্যের সাহায্য পেয়েছি। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। তার পরামর্শমত অনেক স্থানে কিছু অ বদল করেছি। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রীব্রজেশ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বহু বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সর্বশেষে বন্ধুবর সুধাংশুশেখর দে'র সাহায্যর জন্য কৃতজ্ঞ।

বিনীত

বিক্রমাদিত্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে সব বই'র সাহায্য পেয়েছি :

ট্রান্সফার অব পাওয়ার, প্রথম থেকে দ্বাদশ খণ্ড (হার ম্যাজেষ্টিস ষ্টেশনারী সার্ভিস) মাউন্টব্যাটেন (ফিলিপ জিগলার), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, (ভি. পি. মেনন), মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন (এ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন) পাকিস্তান, ইয়ান ষ্টিভেন্স, (পেলিকান বুক), 'এসকেপ ফ্রম এম্পায়ার (অক্সফোর্ড), পার্টিশন এ্যাণ্ড ইন্ডিপেনডেন্স অব ইণ্ডিয়া (মন্মথ নাথ দাশ) ভাইসরয়ের জার্নাল, সম্পাদনা (পেনাডেরেল মুন), দি লাইফ অব মহাত্মা গান্ধী (লুই ফিশার), দি ইণ্ডিয়া ষ্ট্রাগলস (সুভাষ চন্দ্র বোস), হাফওয়ে টু ফ্রীডম (মার্গারেট ব্রুক হোয়াইট), দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ (লিওনার্ড মোসলে), নেহরু, এ পলিটিক্যাল বায়গ্রাফি (মাইকেল ব্রেসার), নেহরু (মাইকেল এডওয়ার্ডস), নেহরু, (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, এস. গোপাল), মহাত্মা গান্ধী (লেখক টেণ্ডুলকার), ক্রীপস মিশন (আর কোপল্যাণ্ড), ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম (মৌলানা আবুল কালাম আজাদ), ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (মাদ্রাজ), এন. ইণ্ডিয়ান ডায়েরী (এডউইন এস মন্টেগু), দি মেকিং অব পাকিস্তান (কে কে আজিজ), ইণ্ডিয়া ফাইটস ফর ফ্রীডম (কানজী দ্বারকা দাস), টেন ইয়ার্স টু ফ্রীডম (কানজী দ্বারকাদাস), দি গ্রেট ডিভাইড (এইচ. ভি হডসন), জিন্না, দি ক্রিয়েটর অব পাকিস্তান (হেক্টর বলিথো), জিন্না অব পাকিস্তান (ষ্টানলী ওলপোর্ট), রোজেজ ইন ডিসেম্বর (এম সি চাগলা), অল পার্টিস কনফারেন্স, ১৯২৮ (অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ১৯২৮), বিভিন্ন কংগ্রেস বুলেটিন (অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি), কলেক্টড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী (নবজীবন ট্রাষ্ট, ১৩ খণ্ড থেকে ৫৪ খণ্ড অবধি] সাম স্পীচেস এ্যাণ্ড রাইটিংগস অব মিঃ জিন্না (জমিলুদ্দিন আহমেদ, দ্বিতীয় খণ্ড), মোমোয়ারস অব আগা খান (আগা খান), দি ওয়ে অউট (সি রাজাগোপাচারী), ট্রান্সফার অব পাওয়ার অব ইণ্ডিয়া ১৯৪৫-১৯৪৭ (ই ডব্লিউ আর লামাব), আন টু হিম, উইটনেস টু দি ষ্টোরী অব নেতাজী সুভাষ বোস ইন ইষ্ট এশিয়া (এস এ আয়ার), জাঙ্গাল এলায়েন্স (জয়েস লেব্রা), ইণ্ডিয়া ষ্ট্রাগলস ফর ফ্রীডম (মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জী), আই-এন-এ ডিফেন্স (ভুলাবাই দেশাই), নেতাজী এনকোয়ারী রিপোর্ট (ভারত সরকার), এ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান ফ্রীডম মুভমেণ্ট (রমেশ মজুমদার), ফেমাস এ্যাণ্ড হিস্টোরিক ট্রায়ালস (কে এল গৌবা), সুভাষ বোস দি স্প্রিঙ্গিং টাইগার (হিউ টয়), দি ষ্টোরি অব দি আই-এন-এ (কুসুম নায়ার), মুসলিম লীগ, ইয়াষ্টারডে এ্যাণ্ড টু ডে (এ বি রাজপুত), দি ষ্ট্রাগল ফর পাকিস্তান (আই-এইচ কুরেশী), পাকিস্তান, পাষ্ট এ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট (ডেভিড পেজ) এ নিউ হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া (ষ্টানলি ওলপোর্ট), হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, প্রথম খণ্ড (পট্টভি সীতারামাইয়া), এ বাঞ্চ অব লেটারস (জওহরলাল নেহরু)। অটোবায়োগ্রাফী অব নেহরু এবং ষ্টেটসম্যান, ন্যাশনাল হেরাল্ড, হিন্দুস্থান টাইমস বিভিন্ন বছরের সংখ্যা।

এক

বোম্বাই, ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ সাল। মুখর বোম্বাই আজ নীরব, নিস্তব্ধ। আকাশে বাতাসে, শহরের রাস্তায় থমথমে ভাব। জনকোলাহল মুখরিত মেরিন ড্রাইভ, ফ্লোরা ফাউন্টেন নীরব। বোম্বাই নগরী ঝিমিয়ে পড়েছে। শহরে লোকজন নেই বললেই চলে। শুধু সরকারের কিছু সেপাই-পাইক শহরের চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কারণ শাসক ইংরেজ আজ সতর্ক, সজাগ। সবাই শহরে গোলমালের আশঙ্কা করছে। কী হবে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, তবে সবাই আশঙ্কা করছে একটা কিছু হবেই। কারণ আজ 'গউলি · ·ঙ্ক' কাছে কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী তার ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেবেন। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের বলবেন: ইংরেজ ভারত ছাড়।

এই বক্তৃতার পর হয়ত দেশব্যাপী গোলমাল শুরু হতে পারে কিংবা পুলিশ গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করবে। তাই সরকারের পলটন বাহিনী শহরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। আজ থেকে শুরু হল ভারতে ইংরেজ শাসন অবসানের প্রথম অধ্যায়।

শহরের সবাই ছুটে চলেছে কংগ্রেসের মণ্ডপের দিকে। আজকের সভায় বড় বড় কংগ্রেস নেতারা, নেহরু, প্যাটেল, আজাদ বক্তৃতা দেবেন। অবশেষে গান্ধীজি তাঁর বক্তৃতা দেবেন।

সরকারকে শেষবারের মত সাবধান করে বলবেন: কুইট ইণ্ডিয়া।

ভারত থেকে ইংরেজ শাসকদের চলে যাবার এই দাবী শুধু গান্ধীজির নয়, এ হল ভারতের জনগণের ডাক। তাই অগণিত দর্শক, শ্রোতা, আগ্রহ নিয়ে বসে আছে গান্ধীজি কখন তাঁর বক্তৃতা দেবেন।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলছে। সবাই ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিটি প্রহর এক-এক যুগ

মণ্ডপের একপাশে বসে আছে সাংবাদিকের দল। অসংখ্য, দিশি-বিদেশি, সব মিলিয়ে একশো, দেড়শ হবে। গান্ধীজির বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে

তারা বিদেশে তার পাঠাবেন, "গান্ধীজি ইংরেজ সরকার বিরোধী তার ঐতিহাসিক 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেছেন।"

সাংবাদিকদের মত আর একদল গান্ধীজির বক্তৃতা শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত, উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিল। এরা হল পুলিশের লোক। এরা শুনতে চায় গান্ধীজি কী বলেন? বক্তৃতা শেষ হবার পর তারা বোম্বাই সরকারের কাছে বক্তৃতার সারাংশ পাঠাবেন। আর ঐ খবর বোম্বাই'র গভর্নর রজার লামলী ভাইসরয়ের কাছে পাঠাবেন। কংগ্রেস মণ্ডপের শ্রোতাদের মত ভাইসরয়ও গান্ধীজির বক্তৃতার সারাংশ শুনবার জন্যে বসে আছেন। কারণ ঐ বক্তৃতা শেষ হবার পর ভারতে রাজার প্রতিনিধি ভাইসরয় লিনলিথগো তার পুলিশ বাহিনীকে আদেশ দেবেন 'এ্যারেস্ট গান্ধী' --কংগ্রেস সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হবে। হয়ত এই গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জনতা বিদ্রোহ করবে। শুরু হবে দেশব্যাপী এক গণ-আন্দোলন।

ব্রিটিশ সরকার এবং ভাইসরয় অনেক আগেই স্থির করে রেখেছিলেন যে সর্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করে তারা এই আন্দোলনকে দমন করবেন। গান্ধীজির অনুসরণকারীদের অর্থাৎ যারা গান্ধীজির নির্দেশানুযায়ী এই আন্দোলনে যোগ দেবেন তাদেরও জেলখানায় আটক করা হবে। ব্রিটিশ সরকার কোন প্রকারেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা ভাঙতে দেবেন না। এ হল যুদ্ধের সময়, ইংরেজ সরকারের জীবন-মরণ সমস্যা.... ভারত সীমান্তের ওপারে শত্রুবাহিনী ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। যে কোন মুহূর্তে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে এই দেশ আক্রমণ করতে পারে।

আজ প্রতিটি দিন তুপক্ষের জন্যে বিশেষ মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়।

কিন্তু গান্ধীজি এই আন্দোলন শুরু করতে চাননি। ভারতের স্বাধীনতা সমস্যার প্রশ্নটির সমাধান করবার জন্যে তিনি শান্তির এবং মীমাংসার পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজির ইচ্ছা পূরণ হল কৈ? কারণ ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী। তিনি মীমাংসার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি সেক্রেটারী অব স্টেট্‌স, আমেরীকে এক চিঠি লিখে বলেছিলেন, 'আমরা শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে জয় করেছি এবং শক্তি দিয়েই আমরা এদেশ শাসন করব' ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার': প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১]।

ভাইসরয়ের এই রুক্ষ, কর্কশ ভাষায় লেখা চিঠি ব্রিটিশ ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং শ্রমিক দলের নেতা ক্লেমেন্ট এটলীকে দুঃখিত করল। এই ধরনের রূঢ় ভাষায় লেখা চিঠি তিনি ভাইসরয়ের কাছ থেকে আশা করেননি।

আমেরী ছিলেন ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের একজন পাণ্ডা এবং ভাইসরয়ের বন্ধু।

এটলী এবার আমেরীর কাছে এক কড়া লম্বা নোট লিখে প্রতিবাদ জানালেন : 'লিনলিথগো ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করবার চেষ্টা করছেন। এই গোঁড়া-পন্থী ভাইসরয়কে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটির সমাধান করা যাবে না। অন্য কাউকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কোন মন্ত্রীকে ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে পাঠান হ'ক ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার' : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫]।

আমেরী এটলীর প্রস্তাবে বাধা দিলেন। কারণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ছিলেন ঘোর ভারত-বিদ্বেষী। ভারতের নাম কিংবা ভারতের স্বাধীনতার কথা শুনলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। এই চার্চিল আমেরী ছিলেন ভাইসরয়ের প্রামোফোন। ভাইসরয় যা বলেন, শুধু সেই কথানুযায়ী কাজ করেন। এটলীর কাছ থেকে এই চিঠি পাবার পর আমেরী এটলীকে বললেন : ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটি বড় জটিল সমস্যা। এই সমস্যার একদিকে রয়েছে হিন্দু এবং অপর দিকে রয়েছে মুসলমান। দু'দলের মধ্যে এতটুকু কোন মিলমিশ নেই। এ ছাড়া তফসিলী এবং রাজামহারাজাদের সমস্যা তো রয়েছে। এইসব দলকে খুশি করে ভারতের কঠিন সমস্যা সমাধান করা সহজ কাজ নয়। তবে কেউ যদি ভারতে গিয়ে এই সমস্যার জটগাঁথন খুলতে চায় আপত্তি করব না। তবে উনি 'ওখানে গিয়ে নেতাদের কাছে কী প্রস্তাব করবেন সেই প্রস্তাব আমরা লিখে দেব'।

এটলী বড় কঠিন সমস্যায় পড়লেন। কী করবেন তিনি ? ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে কারুর বেশি জ্ঞান ছিল না। তাই সবাই ভাইসরয়ের কথানুযায়ী ভারত শাসনের নীতি ঠিক করে দিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সমস্যা সমাধানের একটি পথ খুঁজে পাওয়া গেল। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে যোগ দিলেন সমাজতন্ত্রী নেতা স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী, বুদ্ধিতে দীপ্ত এবং আলাপ-আলোচনায় ক্ষুরধার। তর্ক-বিতর্কে তার জুড়িদার বড় কেউ ছিল না। যুদ্ধ শুরু হবার পর তাকে রাশিয়াতে স্ট্যালিনের দরবারে পাঠান হয়েছিল। ওখানে তিনি খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং রাশিয়াকে তিনি মিত্রশক্তির দলে টেনেছিলেন। পরে রাশিয়া জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করবার পর ক্রীপস দেশে ফিরে এলেন এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে যোগ দিলেন।

এটলী জানতেন সমাজতন্ত্রী ক্রীপস ছিলেন কৃষ্ণমেনন, নেহরু বন্ধু। তাদের এই বন্ধুত্ব শুধু জিন্নার গাত্রদাহ সৃষ্টি করত, ব্রিটিশ রক্ষণশীল সভাসদের মনে হিংসা-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলত। এটলী এবার ক্রীপসের শরণাপন্ন হলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার কঠিন প্রশ্নটি নিয়ে ক্রীপসের সঙ্গে আলোচনা

করলেন। তার ইচ্ছা যে, এই জটিল প্রশ্নটি নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে এদেশ থেকে কাউকে পাঠান দরকার। কে যা'বেন? কারণ ভারতের সীমান্তে শত্রু জাপানীর সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। সামরিক পরিস্থিতি গুরুতর। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং চীনের নেতারা তাদের এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। কী করা যায়? ভারতবর্ষ হল ইংরেজ সরকারের এক বড জমিদারী, 'দি ক্রাউন জুয়েল'। সহজে এই 'ক্রাউন জুয়েল'কে শত্রুর হাতে কিংবা ভারতীয়দের হাতে তুলে দে'য়া যায় না।

এটলী যখন ভারতের সমস্যার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন চার্চিল ছিলেন আমেরিকাতে। রুজভেল্ট চার্চিলকে বললেন ভারতের স্বাধীনতার সমস্যার একটি সুরাহা করুন। এই যুদ্ধে আমরা ভারতীয়দের সাহায্য চাই।

রুজভেল্টের এই দুশ্চিন্তা উদ্বেগ প্রকাশ করবার একটি গৌণ কারণ ছিল। তিনি খবর পেয়েছিলেন জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় নাগরিকদের এবং বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করেছে। হয়ত এই সৈন্যবাহিনী জাপানী সৈন্যবাহিনীকে ভারত আক্রমণের কাজ-কারবারে সাহায্য করবে। চার্চিল রুজভেল্টের অনুযোগ মন দিয়ে শুনলেন বটে, কিন্তু কোন স্পষ্ট জবাব দিলেন না।

এটলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ক্রীপসও স্বীকার করলেন যে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান করবার জন্যে এদেশ থেকে কাউকে পাঠান হ'ক। কারণ এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিপজ্জনক। তিনি নিজেই এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে দিল্লীতে যেতে চান। জটিল প্রশ্নের সমাধান করবার দক্ষতা তার ছিল। স্টালিনের দরবারে তিনি খুব কুশলতার সঙ্গে কূটনীতি করেছেন⋯ ⋯এ ছাড়া কংগ্রেস মহলে তার কিছু বন্ধু আছে।

এটলী ক্রীপসকে বললেন, কিছুদিন আগে ভারতের উদারপন্থী দলের নেতা স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু এবং আরও কিছু ভারতীয় নেতা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে এক চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন যে, দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করুন। কিন্তু চার্চিল এই চিঠির কোন জবাব দেননি। কারণ মনে মনে ভেবেছিলেন যে ভারতের প্রশ্নটি নিয়ে তিনি তার নিজস্ব এবং তার সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করে বি. বি. সিতে এক বক্তৃতা দেবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি রেডিওতে কোন বক্তৃতা দিলেন না। কারণ ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ঠিক করল যে তারা ভারতের রাজনৈতিক প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তাদের এক প্রতিনিধিকে দিল্লীতে পাঠাবে। আর এই

প্রতিনিধি হলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস।

সমস্যা সমাধান করবার জন্যে এক প্রস্তাব তৈরি করা হল। ক্রীপসকে নির্দেশ দে'য়া হল এই প্রস্তাবের কাঠামোর ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং রাজা মহারাজাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কাঠামোর কোন অদল-বদল করা চলবে না।

ক্রীপস এই দেশে আসবার কিছুদিন আগে চিয়াং কাইশেক ভারতে এসে গান্ধীজি এবং নেহরুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তার ভারতে এই আগমন ভাইসরয়ের খুব মনঃপুত হয়নি। তিনি চিয়াং কাইশেকের ভারত সফরে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া চার্চিলের চিয়াং কাইশেক কিংবা রুজভেল্টের কথায় কান দেবার কোন ইচ্ছেই ছিল না। অতএব চিয়াং কাইশেকের ভারতে আসবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল।

ক্রীপস ভারতে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে দিল্লীতে আসছেন ঐ কথা শুনে ভাইসরয় ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁকে ডিঙিয়ে ক্রীপসকে রাজনৈতিক আলোচনার জন্যে এদেশে পাঠান হচ্ছে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আমেরীর কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন, অবিলম্বে ক্রীপস এদেশে এসে কোন রাজনৈতিক আলোচনা করলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

লিনলিথগোর এই পদত্যাগের হুমকি চার্চিল এবং আমেরীকে হতবাক, বিস্মিত করল। [illegible] হবে তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি! কী করা যায়? চার্চিল ভাইসরয়কে আশ্বাস দিলেন, ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা আছি। ক্রীপসকে যে প্রস্তাবের কাঠামো দেয়া হয়েছে তার বাইরে সে কোন আলোচনা করতে পারবে না।

তবু যদি পদত্যাগ করবেন না। তা হলে ভারতের শাসনতন্ত্র ভেঙে পড়বে এবং আপনি পদত্যাগ করলে এদেশে [illegible] প্রতিক্রিয়া হবে। আমাদের সামনে বিপদ। এই দুর্যোগের সময় আমরা আর কোন বিপদ [illegible] সৃষ্টি করতে চাইনে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার': প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠ ৩।৯]।

এই টেলিগ্রাম পাবার পর ভাইসরয় আশ্বস্ত হলেন। তবে দুশ্চিন্তা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। এর পর থেকে ভাইসরয়ের প্রধান কাজ হল, ক্রীপসের মিশনকে বানচাল করে দেয়া।

* * *

দিল্লী, ২২শে মার্চ ১৯৪২।

রাজধানীর চারদিকে আগুনের হল্কা বইছে। কিন্তু ঐদিন রাজধানীর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার চাইতে রাজনৈতিক আবহাওয়া আরও বেশি উত্তপ্ত

ছিল। কারণ ঐদিন দিল্লীতে ক্রীপস এসে পৌচেছেন। দেশের রাজনৈতিক এবং সাংবাদিক মহল উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত, দেশবাসীরা উদ্বিগ্ন। ক্রীপস এই দেশকে কী দেবেন?

কংগ্রেস মহল ক্রীপসের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছেন। কারণ ক্রীপস হলেন নেহরু, কৃষ্ণমেননের বন্ধু।

এদিকে মুসলিম লীগ মহলে বিষাদের কালো ছায়া পরেছে। জিন্না ক্রীপসকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তার সন্দেহেরও কারণ ছিল। ১৯৩৯ সালে ক্রীপস নাকি একবার দিল্লীতে এসেছিলেন এবং কিছুদিনের জন্যে নেহরুর বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন। তাই জিন্না বললেন, 'ক্রীপস যদি মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধী কোন প্রস্তাব করেন, তাহলে আমরা তার প্রতিবাদ করব।'

ক্রীপস দিল্লীতে কী করেন সেই খবর জানবার জন্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিলেন। তার চিন্তা করবার কারণ ছিল। এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে প্রচুর আমেরিকান সৈন্য বাহিনী ছিল। এরা জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অতএব রুজভেল্ট এই যুদ্ধের কাজ-কারবারে ভারতীয়দের সাহায্য চান। রুজভেল্ট ক্রীপসের আলোচনার উপর নজর রাখবার জন্যে তার এক বিশেষ প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠালেন। এই বিশেষ প্রতিনিধির নাম হল: লুই জনসন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে বলা হল যে লুই জনসনের ভারতে যাবার মুখ্য উদ্দেশ্য হল—ভারতে আমেরিকান মিলিটারি সাপ্লাইয়ের কাজকর্ম তদ্বির তদারক করা। কিন্তু রুজভেল্ট জানতেন যে লুই জনসনের ভারতে আগমনের গৌণ উদ্দেশ্য ছিল: ক্রীপসের আলোচনার খবর নেয়া এবং প্রয়োজন হলে ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা

আলোচনা শুরু হল

দিল্লীর গরম আবহাওয়াকে তুচ্ছ করে দেশের রাজনীতিবিদরা ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ক্রীপস খুব সহজে তার প্রস্তাবের রূপরেখা নেতাদের দিলেন। তার এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল: যুদ্ধের পর এক সংবিধান সভা ডাকা হবে। সদ্য নির্বাচিত প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বর ভিত্তিতে এই বিধানসভা নির্বাচন করবে। এছাড়া পাকিস্তানকে স্মরণ রেখে বলা হয়েছিল, যদি কোন প্রদেশ ডোমিনিয়ন সংবিধান গ্রহণ না করে তাহলে সেই প্রদেশ বর্তমান কার্যকরী সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারবে এবং যুদ্ধের সময় ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। ডিফেন্সের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকবে।

মৌলানা আজাদের পর জিন্না ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিন্তু

প্রস্তাবের খসড়া পড়ে তার মনের সংশয় দ্বিধা দূর হয়ে গেল। তিনি কখনও কল্পনা করেননি যে, ব্রিটিশ সরকার এত সহজে তার পাকিস্তান দাবীকে স্বীকার করে নেবে। তবে ঐদিন জিন্না তার মনের প্রসন্নতা ভাষায় প্রকাশ করলেন না। তিনি বললেন যে এই প্রস্তাবের জবাব তিনি মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে দেবেন।

জিন্নার পর সেবাগ্রাম থেকে গান্ধীজি এলেন। তিনি ক্রীপসকে জিজ্ঞেস করলেন: বলুন, আপনি আমাদের জন্যে কী এনেছেন?

ক্রীপস তার প্রস্তাবের খসড়া পড়বার পর গান্ধীজি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, আপনারা পাকিস্তান গঠন করবার ষড়যন্ত্র করেছেন। এ প্রস্তাব নিয়ে আপনার এ-দেশে আসা উচিত হয়নি। আপনি পরের প্লেনেই দেশে ফিরে যান…

কৌতূহলী, বিস্মিত হয়ে ক্রীপস জিজ্ঞেস করলেন: কেন?

আপনার এই প্রস্তাব হল: A post dated cheque এ প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না।

ক্রীপস এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, ধরুন মুসলিম লীগ যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস অস্বীকার করে, তাহলে আমাকে কী করতে হবে বলুন?

তাহলে আপনি জিন্নাকে বলুন, উনি যেন কংগ্রেসের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। যদি জিন্না বুঝতে পারেন যে আপনারা দেশের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ওঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন, তাহলে উনি নিশ্চয়ই সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন….গান্ধীজি জবাব দিলেন।

ইচ্ছে করেই গান্ধীজি জিন্নার কাঁধের উপর দেশের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব চাপাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নেহরু, প্যাটেল, গান্ধীজির প্রস্তাবকে অকার্যকরী বলে মনে করলেন।

২৭শে মার্চ, রাত ডুটোর সময় গান্ধীজি এক ডেনটিস্টের বিলের পেছনে জওহরলালকে এক চিঠি লিখলেন, 'আশা করি তোমরা ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। কারণ এই প্রস্তাব দেশের সর্বনাশ করবে। যদি তুমি আমার নীতির সঙ্গে একমত হও, তাহলে এই নিয়ে রাজাজীর সঙ্গে আলোচনা কর। যদি তোমরা দুজনে এই নীতি গ্রহণ কর, তাহলে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে' ['নেহরু': এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৯]। কিন্তু রাজাজী ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। রাজাজী ক্রীপসকে বললেন: আপনি নেহরুর সঙ্গে দেখা করুন। প্রস্তাব গ্রহণ কিংবা অগ্রাহ্য করার পুরো দায়িত্ব হল নেহরুর উপর। কারণ জাপানীদের আক্রমণ থেকে ভারত রক্ষার কাজে

নেহরু আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান। নেহরু যদি আপনার প্রস্তাবকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে গান্ধীজির আপত্তি হবে অর্থহীন এবং সহজেই তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে।

ক্রীপসও নেহরুর কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তার 'পুরাতন বন্ধু' হয়ত এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন। যদি ক্রীপসের 'ভারত-সমস্যা'র সমাধান সফল হ'ত তাহলে হয়ত তিনি চার্চিলের পরিবর্তে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন·· এই ছিল তার মনের আশা

আর একদিন এক আলোচনার বৈঠকে আজাদ জিজ্ঞেস করলেন:

যুদ্ধকালীন সময় ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলে এই ডিফেন্স দপ্তরটির পরিচালনার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে?

ক্রীপস আজাদের এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে চাইলেন না। এই 'ডিফেন্স' দপ্তরের কর্তৃত্ব নিয়ে কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। চার্চিল, আমেরীর প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো আপত্তির সুর তুললেন। ভাইসরয় আমেরীর কাছে এক চিঠি লিখলেন। লণ্ডন থেকে কম্যাণ্ডার ইন চীফ, লর্ড ওয়েভেলের কাছে নির্দেশ এল, 'ডিফেন্স দপ্তর কোন প্রকারেই ভারতীয়দের হাতে তুলে দেব না।'

ক্রীপসের অনুরোধে আজাদ এবং নেহরু কম্যাণ্ডার ইন চীফ [১৯৪২ সালে ওয়েভেল ভারতবর্ষে কম্যাণ্ডার ইন চীফ ছিলেন] ওয়েভেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। চা খাবার পর এই ডিফেন্স দপ্তর নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে আলোচনা হল। কংগ্রেসের তরফ থেকে জওহরলাল নেহরু বললেন যে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলের ডিফেন্স সদস্য হবেন ভারতীয়। কম্যাণ্ডার ইন চীফ হবেন শুধু তার পরামর্শদাতা। তারপর দু-পক্ষের মধ্যে কিছু আলোচনা হল, ওয়েভেল কিছু দিতে রাজি হলেন, নেহরু কিছু ছেড়ে দিতে স্বীকার করলেন। কিন্তু মীমাংসা হল না। কারণ একটু বাদে ওয়েভেল বললেন, এই যদি আপনাদের দাবী হয় তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। এরপর আলোচনা ভেঙে গেল ['নেহরু' : এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৮১-৮২]।

এবার আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি লুই জনসন। লুই জনসন এবং ক্রীপস খুব গোপনে এই ডিফেন্স দপ্তরের সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করলেন। তারা দুজনেই বুঝতে পারলেন যে কংগ্রেস ডিফেন্স দপ্তরটি তাদের নিজের হাতে নিতে চাইছে। এর মধ্যে 'আজাদ' দাবী করলেন যে নতুন সরকার হবে এক 'জাতীয় সরকার'। এই দাবীকে স্মরণ রেখে ক্রীপস নতুন জাতীয় সরকার গঠনের জন্যে এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলের

সদস্যদের নামের তালিকা তৈরি করলেন। এ ছাড়া ঠিক হল যুদ্ধের কাজকর্ম এবং নীতি ইত্যাদি পরিচালনা করবেন 'কম্যাণ্ডার ইন চীফ'। তার নতুন পদবী হবে 'মিনিস্টার অব ওয়ার'। ডিফেন্স দপ্তরের বাকী কাজ কৌন্সিলের ডিফেন্স সদস্য একজন ভারতীয় করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ভাইসরয় লিনলিথগো, জনসন এবং ক্রীপসের মীমাংসার নতুন ফর্মুলার খবর পেলেন। এই খবর পেয়ে তিনি রাগে ক্ষিপ্ত হলেন। ভাইসরয় আগেই জনসনের ভারতে আগমনে একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। যদি জনসন এবং রুজভেল্ট ভারতের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তাকে বেকায়দায় পড়তে হবে। তিনি আবার আমেরী এবং চার্চিল কোম্পানীর শরণাপন্ন হলেন। চার্চিল রুজভেল্টকে জিজ্ঞেস করলেন যে কর্ণেল জনসনের ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য কি? তিনি ক্রীপস এবং ভারতীয়দের আলোচনার মধ্যে নাক গলাচ্ছেন কেন? চার্চিল রুজভেল্টকে অনুরোধ করলেন জনসন যেন ক্রীপসের কাজ-কর্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন। (এই সময়ে দিল্লীতে আমেরিকান সৈন্য এবং ডিপ্লোম্যাটিক মহলে SEAC-র সাউথ ইষ্ট এশিয়া কমাণ্ডের নাম ছিল SAVE England's Asiatic Colonies)

রুজভেল্ট চার্চিলের এই দাবীকে স্বীকার করে নিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্রীপসের মিশন ব্যর্থ হল। ইতিমধ্যে আজাদ এক চিঠি লিখে ক্রীপসকে জানিয়েছিলেন যে নতুন ফর্মুলা অনুযায়ী কংগ্রেস এক 'জাতীয় সরকার' গঠন করতে প্রস্তুত। এই নতুন সরকারকে পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে। অন্যদিকে জিন্না এক বিবৃতিতে বললেন, কংগ্রেসের এই দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। কংগ্রেস, মুসলমান এবং তামিলী জাতির প্রতিনিধি নয়—এই ছিল জিন্নার বক্তব্য।

ক্রীপস দেশে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে তার রিপোর্টে বলেছিলেন: "তার আলোচনা মিশন ব্যর্থ হবার পেছনে গান্ধীজির হাত ছিল। কারণ গান্ধীজি আশঙ্কা করেছিলেন যে ক্রীপস মিশন সফল হলে দেশের নেতৃত্ব জওহরলালের হাতে চলে যাবে। গান্ধীজি ৯ই এপ্রিল ওয়ার্ধা থেকে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে জওহরলালের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলেছিলেন এবং আলোচনাকালীন তিনি নেহরুকে 'আদেশ' দিয়েছিলেন যেন তারা ক্রীপসের প্রস্তাবকে গ্রহণ না করেন। এই কারণবশত আজাদ শেষ মুহূর্তে পূর্ণ দায়িত্বসহ এক "জাতীয় সরকার" গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। এই "জাতীয় সরকার" গঠন করবার প্রস্তাবের পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, যেন ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হয়। ক্রীপস আরও বলেছিলেন, কংগ্রেস হল 'এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'। কোন

সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি নয় এবং সংখ্যালঘুরা এদের অধীনে থাকতে চায় না"
['নেহরু' : এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৭]।

ক্রীপস শূন্য হাতে দেশে ফিরে আসছেন শুনে রুজভেল্ট বিশেষ বিচলিত হলেন। তিনি চার্চিলকে এক জরুরী বার্তা পাঠালেন। বললেন, দোহাই ক্রীপসকে শূন্য হাতে ফিরতে দেবেন না। তাকে আর একবার মীমাংসার চেষ্টা করে দেখতে বলুন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার' : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৩]। কিন্তু চার্চিল রুজভেল্টের এই টেলিগ্রাম পকেটে পুরে রাখলেন এবং সহকর্মীদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করলেন না। কারণ চার্চিলের অভিমত ছিল 'সম্রাটের রাজত্ব বিলিয়ে দেবার জন্যে আমি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইনি'।

ক্রীপ সর প্রস্তাব কংগ্রেস দলকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিল। গান্ধীজি, প্যাটেল প্রমুখ ক্রীপসের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। নেহরু, আজাদ, সৈয়দ মামুদ এরা ক্রীপসের প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন। আর একদল নিরপেক্ষ ছিলেন। পরে ডাঃ সৈয়দ মামুদ অবিভক্ত বাংলার গভর্নর কেসীকে বলেছিলেন : ক্রীপস যদি আর দুই সপ্তাহ দিল্লীতে বেশি থাকতেন, তাহলে তার মিশন সফল হত। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার' : ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯০৮]।

এতদিন জিন্না এবং মুসলিম লীগের নেতারা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ার জন্যে দেরী করছিলেন। ক্রীপস দেশ থেকে চলে যাবার আগে মুসলিম লীগ ক্রীপসের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করল।

*   *   *

ক্রীপসের আগমনে দেশে যে আশা উদ্দীপনার দীপশিখা জ্বলে উঠেছিল সেই আশার আলো নিভে গেল। দেশের চারদিকে নিরাশার ছায়া পড়ল। সব নেতার প্রশ্ন হল এবার কী হবে? ক্রীপস চলে যাবার পর মাদ্রাজের কংগ্রেস দলের রাজাগোপালচারীর নেতৃত্বে মাদ্রাজ কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। একটি প্রস্তাবে বলা হল, শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনার সামনে দেশের জনসাধারণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। অতএব এক 'জাতীয় সরকার' গঠন করা হ'ক এবং জাতীয় সরকার গঠন করবার জন্যে লীগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হ'ক। আর একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের কাছে অনুরোধ করা হল যে, মাদ্রাজে মুসলিম লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করে মাদ্রাজ কংগ্রেস প্রদেশে এক জনপ্রিয় সরকার গঠন করতে চায় এবং এই সরকার গঠনে মাদ্রাজের কংগ্রেসকে অনুমতি দেওয়া হ'ক। দুইটি প্রস্তাবই বিপুল ভোটে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই সর্বপ্রথম কংগ্রেস দলের মধ্যে ভাঙন ধরল। বলা যায়, পরোক্ষে এই হল মুসলিম লীগের নেতা জিন্নার প্রথম জয়। কারণ পরবর্তী-

কালে রাজাজী জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাবের একজন বড সমর্থক হয়েছিলেন।

অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি রাজাজী এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের এই দুইটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করল এবং রাজাজীর এই কার্যের তীব্র নিন্দা করা হল। রাজাজী এর প্রতিবাদে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি থেকে ইস্তফা দিলেন। [এখানে বলা প্রয়োজন যে ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেস প্রশাসনের সময় রাজাজী অনেক কংগ্রেস নীতির বিরোধী কাজ করেছিলেন। প্রথমত রাজাজী তার সহকর্মী এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিকে বিশেষ অবজ্ঞা, অনুকম্পার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতেন। এই সময়ে তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন মাদ্রাজের অতি রক্ষণশীল গভর্নর এরসকিন। রাজাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি কংগ্রেস সদস্যদের পেছনে পুলিশের ফেউ লাগিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার দাবী' শপথ গ্রহণের বিরুদ্ধে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, এবং এক সমাজতন্ত্রী পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তিনি 'ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেন্ট' আইন ব্যবহার করে হিন্দী বিরোধী ভাষা আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করেছিলেন। রাজাজী মাদ্রাজের গভর্নরকে বলেছিলেন যে, কঠিন শক্ত আইন প্রয়োগ না করলে এই দেশ শাসন করা সম্ভব নয়। তিনি তার কিছু প্রিয় সমর্থকদের ব্রিটিশ সরকারের খেতাবের জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। এর পরে যখন ইংল্যাণ্ডের রাজার করোনেশন উপলক্ষে কংগ্রেস দেশে দরবার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করল, তখন রাজাজী দরবার অনুষ্ঠানকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মাদ্রাজে দরবারকে বয়কট করা হবে না। গভর্নর এরসকিন এক চিঠিতে তার বন্ধুকে লিখেছিলেন: রাজাজী আমার চাইতে বেশি রক্ষণশীল। আমি যদি কুড়ি বছরের আগের কথা বলি, উনি (রাজাজী) দু হাজার বছরের আগে সম্রাট অশোকের কথা বলেন। রাজাজীর এই ব্যবহারে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেছিল এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে রাজাজীর এই নীতির সমালোচনা করা হয়। রাজাজী এই সভায় যোগ দেননি এবং গান্ধীজির সাহায্য নিয়ে রাজাজীর এই কার্য সমালোচনার প্রস্তাবটিকে পরাজিত করা হয় ('নেহরু': এস. গোপাল' প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৩০-২৩১)। আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। দেশ স্বাধীন হবার পরে রাজাজীকে প্রথমে পশ্চিম বাংলার গভর্নর এবং তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। রাজাজী ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু।]

ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজি ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় তার মত ব্যক্ত করে লিখলেন যে, ভারত

নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। আমি এই তিন পন্থী নেতাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিনে।

এ ছাড়া তিনি রাজাজীর নতুন প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন: 'আমি রাজাজীর প্রস্তাবকে সমর্থন করিনে।... দেশকে ভাগ করা আমি পাপ বলে মনে করি।' পরে আর একটি বিবৃতিতে তিনি বললেন: ক্রীপসের মিশনে আমি দুঃখিত হয়েছি... আমার মতানুযায়ী তারা (ব্রিটিশ) তাদের দেশের ক্ষতি করেছেন। এবার তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন: যদি ব্রিটিশ সরকার এ দেশ থেকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলে যায় তাহলে এদেশে শান্তি বজায় রাখবার জন্য কোন খরচ করতে হবে না।

ক্রমে ক্রমে গান্ধীজির চিন্তাধারা আরও সুস্পষ্ট হল। তিনি আবার ব্রিটিশ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনারা এ দেশ থেকে চলে যান...হয় এ দেশকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিন...নতুবা অরাজকতার হাতে ছেড়ে দিন.... (Leave India to God. If that is too much, leave her to anarchy) ....আমি এ দেশে এক রক্তপাতহীন বিপ্লব দেখতে চাই...আমি চাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান।

গান্ধীজির এই বিবৃতি সবাইকে বিস্মিত করল। কী বলতে চাইছেন গান্ধীজি? সাংবাদিক, ব্রিটিশ সরকার, এমনকি নেহরুও প্রথমে গান্ধীজির এই বিবৃতি শুনে অবাক হলেন। পরে সাংবাদিকদের কাছে গান্ধীজি তার বিবৃতিকে ব্যাখ্যা করে বললেন: ইংরেজ সরকারের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা এশিয়া থেকে, সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে চলে যান। তাই আমি দাবী করছি 'ইংরেজ ভারত ছাড়'।

গান্ধীজি কী করতে চান, কী বলতে চান? তার মনের কথা জানবার জন্যে এক ঝাঁক বিদেশী সাংবাদিক সেবাগ্রামে এল। প্রথমে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে এলেন আমেরিকান সাংবাদিক লুই ফিশার। তাঁর দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা প্রচুর...দীর্ঘকাল স্টালিনের রাজত্বে দিন কাটিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার জানবার আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম...

ফিশার এসে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন, তার "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" প্রস্তাবটি সম্বন্ধে জানবার আকাঙ্ক্ষা অপারসীম, তিনি আরও কিছু জানতে চান। গান্ধীজি তাকে বললেন: বেশ রোজ ভোরে আমার সঙ্গে বেড়াবার সময় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কারণ ঐ সময়ে লোকজনের ভিড় কম থাকে, নিশ্চিন্ত মনে কথাবার্তা বলা যায়। গান্ধীজি প্রথমে ক্রীপসের প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করলেন। ফিশার তাকে বললেন....আপনি এই দেশ থেকে ইংরেজদের চলে

যাবার জন্যে অনুরোধ করছেন কেন? এই দুর্যোগ মুহূর্তে ইংরেজ চলে গেলে আপনার দেশের ক্ষতি হবে····আপনার কি ক্রীপসের প্রস্তাব একেবারেই পছন্দ হয়নি?

গান্ধীজি ফিশারের প্রশ্ন শুনে হাসলেন। বললেন, অতি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। 'না, ক্রীপসের প্রস্তাব আমার একবারে পছন্দ হয়নি। কারণ ক্রীপস আমাদের কাছে শুধু ভবিষ্যৎ-এর কথা বলেছেন অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে কী পাব? কিন্তু আমি দূরের স্বপ্ন দেখতে চাইনে· আমি জানতে চাই আজ কী পাব? ভবিষ্যৎ-এর প্রতিশ্রুতির উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। তবে ইংরেজকে আমি নাজেহাল করতে চাইনে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমি দাবী করছি: ইংরেজ এই দেশ থেকে চলে যাক। 'কুইট ইণ্ডিয়া।'

তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে গান্ধীজি বললেন: আমি ইংরেজকে বলেছি··· আপনারা এই দেশ ঈশ্বরের হাতে নতুবা অরাজকতার হাতে ছেড়ে দিন। হয়ত এর পরে আমরা সবাই মিলে কুকুরের মত ঝগড়া বিবাদ করব·। তারপর যখন আমাদের হাতে দায়িত্ব চলে আসবে তখনই আমরা মীমাংসার টেবিলে ব··সব।

: কিন্তু ধরুন যদি ইংরেজ এই দেশ থেকে না চলে যায়·তাহলে আপনি কী করবেন? লুই ফিশার জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

: তাহলে তাদের এই দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য করব····গান্ধীজির এই জবাবে বেশ দৃঢ়তার স্বর ছিল। তাহলে আমি শিগ্‌গিরই এদেশে এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করব·

: আপনি এই আন্দোলন নিয়ে অন্য কারো সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করেছেন? লুই ফিশার জিজ্ঞেস করলেন।

: না, এই আন্দোলন নিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কোন কথা বলিনি। তবে আমার হরিজন পত্রিকায় এই আন্দোলন নিয়ে লিখেছি

তারপর গান্ধীজি তার গলার স্বর নিচু করে বললেন: ইংরেজের প্রশাসনে কিছু ফাসিস্ত মনোভাবসম্পন্ন লোক আছেন···তারা চায় না আমাদের দেশ কোন প্রকার উন্নতি করুক। এরা এই দেশকে কোন স্বাধীনতা দিতে চায় না।

গান্ধীজি-ফিশারের আলাপ আলোচনা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সরকার এবার গোপনে খবর নিতে শুরু করল: গান্ধীজি কী করছেন· কিংবা কী করবেন? কংগ্রেসের ঘরের খবর নেবার জন্যে তারা এক শক্তিশালী বিভীষণ বাহিনী গঠন করল। গান্ধীজির এবং কংগ্রেসের সব কাজের খবর

ব্রিটিশ সরকার পেত। তবে গান্ধীজি লুকিয়ে কিছু করতেন না। সবই তিনি প্রকাশ্যে করতেন। সরকারের এই বিভীষণ বাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু বড় বড় কংগ্রেসের নেতারাও ছিলেন।

একদিন 'ইংরেজ ভারত ছাড়' প্রস্তাবের খসড়া গান্ধীজি তার শিষ্যা মীরা বেনের মারফৎ এলাহাবাদে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির দপ্তরে পাঠালেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তার এই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস সদস্যরা আলাপ-আলোচনা করুক, তারা প্রস্তাবের ভাল-মন্দ বিচার করে দেখুক।

ক্রীপসের আলোচনা ভেঙে পড়বার পর নেহরুও কিছুটা মুষড়ে পড়েছিলেন। ক্রীপসের সঙ্গে তার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ক্রীপস তার আলোচনা ব্যর্থ হবার আগে নেহরুর কাছে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন: আপনার কাছে আমি শেষবারের মত অনুরোধ করছি, কারণ আপনার এই সিদ্ধান্তের উপর দুই জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ভর করবে··· আমরা আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা দৃঢ় করতে চাই····আজকের এই সুযোগ ভবিষ্যতে আবার নাও ফিরে আসতে পারে··· অন্য কিছু হয়ত হতে পারে, তবে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করবার মত এমন সুযোগ আর হবে না··। নেতৃত্ব, হ্যাঁ আপনার নেতা হবার ক্ষমতা আছে—এই কাজ সম্পন্ন আপনি করতে পারেন। নেতাকে এই মুহূর্তে অসম সাহস দেখিয়ে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করতে হবে, ·আমি জানি আপনার ঐ সাহস আছে····['নেহরু' : এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪]। কিন্তু জওহরলালের কিছু করবার ছিল না। তিনি ক্রীপসকে বলেছিলেন যে সীমার লঙ্ঘন ছাড়িয়ে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে তার হাত-পা বাঁধা ছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ব্রিটিশ সরকারকে বেকায়দায় ফেলবার কোন ইচ্ছেই নেহরুর ছিল না। তিনি লড়াই-র অস্ত্র তৈরি করবার এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে কোন বাধা দিতে চাননি। তার এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে এক বক্তৃতা দেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মৌলানা আজাদ তাকে এই কাজ থেকে বিরত করেন। নেহরু লুই জনসনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কলকাতায় গিয়ে তিনি শ্রমিক ধর্মঘট মেটাবেন। জনসন 'স্টেট ডিপার্টমেন্টে' এক চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ প্রচেষ্টার কাজে নেহরুর কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পাবেন।

'আমি নেহরুকে পুরো বিশ্বাস করি।' কারণ নেহরু তাকে বলেছিলেন, যদি জাপানীরা ভারত আক্রমণ করে তাহলে আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলন করব না, গরিলা যুদ্ধ করব এবং "পোড়ামাটি" নীতি

অবলম্বন করব ['নেহরু' : এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৮]।

নেহরু জানতেন, গান্ধীজি তার 'যুদ্ধের কাজে সহযোগিতার নীতির বিরোধী। কিন্তু নেহরু চুপ করে বসে থাকবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দিল্লীতে এক প্রেস কনফারেন্সে [১২ই এপ্রিল ১৯৪২, সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৩ই এপ্রিল ১৯৪২] বলেন যে, তিনি সুভাষ বোসের "সাক্ষীগোপাল" সৈন্যবাহিনীর বিরোধিতা করবেন···এই সৈন্যবাহিনী শুধু জাপানীদের অধীনে এক 'পুতুল' সৈন্যবাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

নেহরুর এই নীতি এবং বক্তৃতা গান্ধীজিকে বিচলিত করল। তিনি নেহরুকে বললেন যে তার এই নীতি কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। তিনি বললেন, যদি নেহরুর নীতি অনুযায়ী কাজ করা হত তাহলে কংগ্রেস এত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হতে পারত না। পরে গান্ধীজি নেহরুকে তার 'গরিলা যুদ্ধ' করবার বিবৃতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিলেন ['নেহরু' : এস গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯]।

এপ্রিলের শেষে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক সভা হল। এই সভায় গান্ধীজি [illegible] পারেন নি, তবে তিনি একটি প্রস্তাবের খসড়া কার্যকরী সমিতির কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কার্যকরী সমিতিকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন, যদি আমার প্রস্তাবকে গ্রহণ না করা হয় তাহলে আমার অনুচরদের কংগ্রেস থেকে [illegible] করে নেব। 'আজ যার যার নিজেদের পথ বেছে নেবার সময় এসেছে।'

ক্রীপসের মিশন ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজির প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেছিলেন যে, এদেশ থেকে ইংরেজের চলে যাওয়াই হবে বিবেচকের কাজ। ইংরেজের সঙ্গে আলাদা আলোচনা করে [illegible] ফল হবে না—কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল, এ দেশকে ভাগ করা। গান্ধীজি তার প্রস্তাবে বলেছিলেন যে জাপানের ভারতের সঙ্গে কোন কলহ নেই, তার কলহ হল ব্রিটিশের সঙ্গে। ব্রিটেন ভারতকে রক্ষা করতে অক্ষম—এবং এখান থেকে তার প্রস্থান করা উচিত। তাহলে ভারত নিজেকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রথম কাজ হবে জাপানের সঙ্গে আপোষ মীমাংসা নিয়ে আলোচনা সুরু করা। জাপানকে বলা দরকার, ভারতের জাপানের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন জাতির বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই। তবে জাপান যদি ভারতকে আক্রমণ করে এবং ইংরেজরা যদি প্রস্থান না করে তাহলে ভারত জাপানের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে। তবে 'পোড়ামাটির' নীতি শুধু যুদ্ধের সামগ্রীর উপর করা হবে

['ট্রান্সফার অব পাওয়ার' : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৬-৬°]।

জওহরলাল গান্ধীজির প্রস্তাবের খসড়াকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। তিনি আপত্তি করলেন। তার বক্তব্য ছিল যে গান্ধীজি তার প্রস্তাবে পরাজয়ের মনোভাব এবং জাপানের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি বললেন, গান্ধীজি বিশ্বাস করেন যে চক্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করবে। যদি আমরা 'বাপুর' পথ অনুসরণ করি তাহলে আমরা চক্রশক্তি, জর্মানী-জাপান-ইতালি শক্তির নীরব সমর্থক এবং অংশীদার হব....এছাড়া প্রস্তাবের এই খসড়া আমাদের নিজেদের শক্তিকে দুর্বল করবে। মিত্রশক্তি ভারতকে শত্রু বলে গণ্য করবে..এবং আমাদের ধ্বংস করবে..রেঙ্গুনে তারা যা করেছিল। পরে নেহরু গান্ধীজির প্রস্তাবকে কিছু পরিবর্তন করলেন কিন্তু কার্যকরী সমিতি এ সংশোধিত প্রস্তাবকে ১১-৬ ভোটে প্রত্যাখ্যান করল এবং গান্ধীজির আসল প্রস্তাবকে গ্রহণ করল। নেহরু তার প্রস্তাবে বলেছিলেন যে, ভারতের অন্য দেশের সঙ্গে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই.. ভারত নাৎসীবাদ ফাসিস্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধী. যদি ভারত স্বাধীন হ'ত তাহলে তার লড়াই থেকে দূরে থাকা সম্ভব হত....ব্রিটেন ভারতের শাসন অবসান করুক...কংগ্রেস বিশ্বাস করে না যে, দেশের স্বাধীনতা অন্য কোন শক্তির সাহায্যে কিংবা আক্রমণের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। ভারতের উপর আক্রমণ করা হলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করে তার মোকাবিলা করতে হবে।

যদিও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে নেহরুর পরাজয় হল, তবু কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধে সদস্যরা নেহরুর প্রস্তাবকে গ্রহণ করলেন।

সম্ভবত জওহরলাল তাঁর সহকর্মীদের কাছে মিত্রশক্তির সপক্ষে তার নীতিকে কার্যকরী করবার আর এক সুযোগ দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কারণ এই সময়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিখ্যাত লেখক এডগার স্নো'র মাধ্যমে নেহরুর কাছে এক খবর পাঠিয়েছিলেন। 'নেহরুকে বল উনি যেন আমার কাছে চিঠি লেখেন এবং আমাকে ভারতের জন্যে কী করতে হবে তার ইঙ্গিত দেন। দরকার হলে এই চিঠি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ মারফত পাঠাতে পার' ['এডগার স্নো-জার্নি টু দি বিগিনিং' : পৃষ্ঠা ২৫৭]।

জনসন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করেছিলেন, যদি আমেরিকা এবং চীন ভারতের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত শাসনের সপক্ষে এক বিবৃতি দেয় তাহলে নেহরুর হাত আরও শক্ত হবে। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে নেহরুর জয়লাভের পর জনসন আবার রুজভেল্টের কাছে আবেদন করে বললেন, ভারতের জন্যে কিছু করুন। কিন্তু রুজভেল্ট পরে এই ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতে রাজি হননি।

কারণ তিনি বললেন আমেরিকার জনগণের বিশ্বাস যে ইংল্যাণ্ড এই যুদ্ধে ভারতের কাছ থেকে সমর্থন পাবার জন্যে এবং ভারতের সমস্যা সমাধান করবার সব চেষ্টাই করেছে ·কিন্তু ভারতের রাজনীতিবিদরা সর্বপ্রকার আপোষ মীমাংসার বিরোধী। এই কারণে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসকে আর কোন প্রকার সাহায্য করলেন না। [যদিও 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে দেখতে পাওয়া যায় যে, রুজভেল্ট ভারতের সমস্যা সমাধান করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু চার্চিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কোন আবেদনে কান দেননি। একবার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চার্চিলকে হুমকি দিয়েছিলেন আপনি ভারতের সমস্যা সমাধান করুন। যদি না করেন তাহলে আমাকেই কিছু করতে হবে। এর জবাবে চার্চিল বলেছিলেন যে যুদ্ধের এই দুর্যোগের সময়ে আপনি আমাদের বিপদে ফেলবেন না এই ধরনের কথার আভাস প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং চার্চিলের টেলিগ্রামের মধ্যে পাওয়া যাবে।]

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কিছু করবেন না, এই মনোভাবের আভাস পেয়ে ব্রিটিশ সরকার আরও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিল। ইংরেজের এই 'ভারত বিদ্বেষী' নীতি নিয়ে প্রায়ই গান্ধীজি এবং জওহরলালের মধ্যে বচসা-বিবাদ হত। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে 'ইংরেজ ভারত শাসনের জন্যে অনুপযুক্ত। অতএব গান্ধীজি 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এই দাবী করেছিলেন কিন্তু নেহরুর এই যুক্তিকে স্বীকার করে নিতে মনে দ্বিধা ছিল।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ভারতের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবার পর এবং ভারত সরকার যখন কংগ্রেস সদস্যদের বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেপ্তার এবং অত্যাচার করতে শুরু করেছিল, তখন নেহরুর মিত্রশক্তির সপক্ষে কিছু বলবার আর কোন ভাষা ছিল না।

মে মাসের শেষে নেহরু সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। এবার গান্ধীজির চাপে পড়ে নেহরু স্বীকার করে নিলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজ শাসনের অবসান হওয়া একান্ত আবশ্যক। এছাড়া এই মুহূর্তে যদি ইংরেজ সরকার-বিরোধী কোন আন্দোলন শুরু না করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের ইংরেজ সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু করবার আর কোন ক্ষমতা এবং সুযোগ থাকবে না। কী করে ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করা যায় সেই সম্বন্ধে গান্ধীজির কোন সুস্পষ্ট চিন্তাধারা কিংবা নীতি ছিল না। জওহরলাল গণ-আন্দোলন কিংবা সত্যাগ্রহ করবার সপক্ষে ছিলেন না। অথচ গান্ধীজি জনগণকে 'ডিরেক্ট এ্যাকশন' করবার জন্যে তৈরি হতে বলেছিলেন। তবে তিনি ঠিক করেছিলেন যে এই আন্দোলন শুরু করবার আগে একবার এই বিষয় নিয়ে

ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন। জাপানীদের কোন প্রকারে সাহায্য করবার ইচ্ছেও গান্ধীজির ছিল না।

এই আন্দোলন কোন নীতির ভিত্তিতে করা হবে এ নিয়ে গান্ধীজি এবং নেহরুর সঙ্গে বেশ মতবিরোধ দেখা দিল। নেহরু যখন 'ডিরেক্ট এ্যাকশন' করবার বিরোধিতা করলেন তখন গান্ধীজি নেহরুকে ভৎর্সনার সুরে বললেন: তুমি যদি আমার সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ না দাও, তাহলে আমি তোমাকে বাদ দিয়েই এই আন্দোলন শুরু করব ['নেহরু': প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২৯২]।

গান্ধীজি এবার চিয়াং কাইশেকের কাছে চিঠি লিখে এই আন্দোলন শুরু করবার কারণ বর্ণনা করলেন। তিনি এই চিঠিতে লিখেছিলেন যে এই সংগ্রাম করে ভারত তার নিজের ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবে। চিয়াং কাইশেকও চিঠির জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার চিয়াং কাইশেকের চিঠি প্রকাশ করতে দেয়নি।

'কিছুদিন পরে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হল। এই বৈঠকে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি সরকারকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার জন্যে অনুরোধ করল। এই প্রস্তাবে বলা হল ভারতের স্বাধীনতা শুধু ভারতের জন্যে নয়। সমস্ত পৃথিবীর শান্তি এবং সুরক্ষার জন্যে এই স্বাধীনতার প্রয়োজন। কংগ্রেসের এই মুহূর্তে মিত্রশক্তিকে বেকায়দায় কিংবা বিপর্যস্ত করবার কোন ইচ্ছে নেই কিন্তু কংগ্রেসের আবেদনে যদি ইংরেজ সরকার কান না দেয়, তাহলে কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে এক অহিংস আন্দোলন শুরু করবে। ব্রিটিশ সরকারকে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবার জন্যে কিছু সময় দেওয়া হল। আরও ঠিক হল কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির আগামী অধিবেশন ৭ই আগষ্ট ১৯৪২-বোম্বাইতে করা হবে এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কিছুদিন পরে গান্ধীজি এবং নেহরু এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বললেন যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আর আলোচনা করবার কোন প্রয়োজন নেই। ক্রীপসের প্রস্তাব 'অকার্যকরী'। অতএব ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করুক। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা করেছিল। আজাদ রুজভেল্টকে মধ্যস্থ রেখে যুদ্ধকালীন সময়ের জন্যে এক মীমাংসার প্রস্তাবও করেছিলেন। অবশ্যি তার এই প্রস্তাবের একটি সর্ত ছিল যে ভারতের স্বাধীনতাকে ইংরেজ সরকার স্বীকার করে নেবে। আজাদের এই প্রস্তাবে গান্ধীজি তার উপর বিশেষ বিরক্ত হয়েছিলেন।

কংগ্রেস শিগ্‌গিরই কিছু একটা করবে তার আভাস ভারত সরকার এবং ভাইসরয় আগে থেকে পেয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের এই আন্দোলনের পরিকল্পনার সুস্পষ্ট একটি ছবি তারা সংগ্রহ করলেন। কারণ পুলিশ কংগ্রেসের এলাহাবাদের দপ্তরে হানা দিয়ে এবং কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে সরকারের ইনটেলিজেন্স দপ্তর আসন্ন 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনের অনেক প্রয়োজনীয় কাগজ এবং খবর সংগ্রহ করেছিল। ঐ সময়ে কংগ্রেস মহলে পুলিশের চর ছিল। তারপর উত্তরপ্রদেশের গভর্ণর হ্যালেট লিনলিথগোর কাছে খবর পাঠালেন: খুব সম্ভবত বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনের পর এই আন্দোলন শুরু করা হবে।

ভাইসরয় লিনলিথগো এবার তার কর্তা আমেরীকে জিজ্ঞেস করলেন: এবার কী করি বলুন? আমেরী গান্ধীজিকে জুলাই মাসে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে ঠিক করা হল যে আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পরই গান্ধীজি এবং অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হবে। এ ছাড়া এই আন্দোলন দমন করবার জন্যে ভাইসরয়কে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল। আমেরী ভাইসরয়কে জানালেন গান্ধীজিকে গ্রেপ্তারের পর এডেনে এবং কংগ্রেস সদস্যদের আফ্রিকার নিয়াসাল্যান্ডে আটক করে রাখা হবে। কিন্তু ভারতের জনমত তীব্র হতে পারে এই চিন্তা করে পরে ঠিক করা হল গান্ধীজিকে পুনার আগা খাঁন প্যালেস এবং কংগ্রেস সদস্যদের আহমদনগর ফোর্টে আটক করে রাখা হবে।

আগস্টের প্রথম দিকে ভারতের ইনটেলিজেন্স দপ্তর আর একটি প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করেছিল। খবরটি হল 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এই আন্দোলন কী ধরনের হবে এবং এই আন্দোলনের সময় কী করা হবে।

২৮শে জুলাই মাদ্রাজে কংগ্রেস নেতা পট্টভি সীতারামিয়ার বাড়িতে কংগ্রেস সদস্যদের এক গোপন বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকে প্রায় উনত্রিশজন কংগ্রেস সদস্য উপস্থিত ছিলেন। (এর মধ্যে একজন ছিলেন বিভীষণ অর্থাৎ ভারত সরকারের ইনফরমার। কারণ তিনিই এই বৈঠকের আলোচনার খবর সরকারকে দিয়েছিলেন) সেদিন ঐ বৈঠকে আলোচনার বিষয় ছিল 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এই আন্দোলন শুরু হলে কংগ্রেস সদস্যরা কী ধরনের কাজ করবে। সভায় এক প্রস্তাবে ঠিক করা হল যে আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র এক ইস্তাহার বিলি করতে হবে (পরে এই ইস্তাহার 'অন্ধ্রপ্রদেশ সার্কুলার' নামে পরিচিত হয়েছিল)। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে এই আন্দোলনের মূলত হবে এক অহিংস আন্দোলন। এই আন্দোলন অনুযায়ী

দেশের সবাইকে আইন ভঙ্গ করতে বলা হবে। আইনজীবীরা তাদের পেশা ত্যাগ করবেন… কলকারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করবে, মদ-গাঁজার দোকানের সামনে পিকেটিং করা হবে, সরকারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং জেলখানার কয়েদীরা এক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে ইত্যাদি।

এই রকমের বিভিন্ন খবর পাবার পর লর্ড লিনলিথগো ঠিক করলেন যে কংগ্রেস সদস্যদের আন্দোলন করবার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। তিনি স্থির করলেন যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবেন এবং কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করবেন।

যুদ্ধের পর পট্টভি সীতারামিয়া প্রথমে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে গান্ধীজি অন্ধ্রপ্রদেশের কমিটির সার্কুলার রচনা করেছিলেন কিন্তু গান্ধীজি তীব্র প্রতিবাদ করবার পর পট্টভি সীতারামিয়া তার ভুল স্বীকার করেন। [লর্ড ওয়েভেলের পেথিক লরেন্সের কাছে লেখা চিঠি, ৫ই আগষ্ট ১৯৪৫, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার': প্রথম খণ্ড]

* * *

তারপর মাস ঘুরে এল ঐতিহাসিক ৮ই আগষ্ট। ঐদিন গান্ধীজি তার আন্দোলনের নীতি ব্যাখ্যা করবেন—এবং ভাইসরয়ও গান্ধীজি এবং কংগ্রেস সদস্যদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। দু'পক্ষই এক চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হল।

প্রথমে বক্তৃতা দিতে উঠলেন কংগ্রেসের সভাপতি আবুল কালাম। তিনি ক্রীপসের পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই আসন্ন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করলেন এবং ব্যাখ্যা করলেন, কেন কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেনি। তারপর বক্তৃতা দিলেন নেহরু এবং প্যাটেল।

ঠিক রাত বারোটার পর গান্ধীজি তার ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিতে উঠলেন। নির্ভীক অবিচলিত কণ্ঠস্বর, তার চোখেমুখে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না। গান্ধীজি বলতে শুরু করলেন: এই দেশ, এই ভারত হল হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি….আজ আমরা যে আন্দোলন শুরু করব, এই সংগ্রাম হল হিন্দু-মুসলমানের সর্বজাতির, দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করবার জন্যে এক সংগ্রাম। কংগ্রেস কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, এ হ'ল সর্বজাতির সংস্থা।

গান্ধীজি বলতে লাগলেন: আমরা কী চাই? আমরা চাই স্বাধীনতা এছাড়া আমরা কিছুই চাইনে।….

: আজ আমি আপনাদের স্বাধীনতার এক মন্ত্রে দীক্ষিত করব। আপনারা হৃদয়ে গেঁথে রাখুন….। আপনারা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করবেন, তখন

যেন এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়…এই মন্ত্র হল "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-'ডু অর ডাই।' হয় আমরা দেশকে স্বাধীন করব, নতুবা দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে প্রাণ দেব। আজ আমি প্রতি ভারতীয় নাগরিকের কাছে এই আবেদন করছি, যেন এই মুহূর্ত থেকে তারা মনে করেন যে দেশকে স্বাধীন করবার জন্যেই তারা বেঁচে আছেন এবং প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্যে তারা প্রাণ দেবেন।

'আজ ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করুন যে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কেউ নীরব নির্বাক হয়ে বসে থাকবেন না।' 'আজ যিনি এই স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দেবেন তিনিই স্বাধীনতার সুখের আস্বাদ পাবেন, যিনি প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবেন তিনি স্বাধীনতার সুখ থেকে বঞ্চিত হবেন। স্বাধীনতা কোন ভীরু কাপুরুষদের জন্যে নয়।'

এরপর গান্ধীজি বললেন যে তিনি পুলিশের ধমকে কিংবা হুমকিতে ভয় পাবেন না।

শ্রোতারা সবাই নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গান্ধীজির বক্তৃতা শুনল। গান্ধীজির বক্তৃতা যখন শেষ হল, তখন রাত প্রায় একটা।

"গান্ধীজি 'ইংরেজ ভারত ছাড়' সংগ্রামের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হতে বলেছেন"— এই কথা ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক নবজাগরণ শুরু হল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। পরে ব্রিটিশ সরকারও স্বীকার করল যে, ৯ই আগষ্ট ১৯৪২ 'ইংরেজ ভারত ছাড়' সংগ্রাম হল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের প্রথম দিন

বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই'র গভর্ণর রজার লামলী ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে খবর দিলেন: গান্ধীজি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছেন এর পর ·

এর পরে শুরু হল শাসকগোষ্ঠির কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান। দিল্লী থেকে প্রতি প্রদেশের গভর্ণরকে নির্দেশ দেওয়া হল, কংগ্রেসকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করুন। যারা গান্ধীজির 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দেবেন তাদের গ্রেপ্তার করুন·। শুরু হল সরকার এবং জনগণের মধ্যে লড়াই।

* * * *

৯ই আগষ্ট, ১৯৪২ সাল।

গতানুগতিক নিয়মানুসারে ভোর চারটের সময় গান্ধীজির ঘুম ভাঙল।

আগের দিন বোম্বাই'র বাজারে এক গুজব রটেছিল যে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হবে। এই গুজবের খবর গান্ধীজির কানেও এসেছিল। কিন্তু গান্ধীজি এই গুজবে বিশ্বাস করেননি। তিনি হেসে তার সেক্রেটারী-বন্ধু মহাদেব দেশাইকে

বলেছিলেন, অসম্ভব আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে না।

কিন্তু গান্ধীজি ভুল আন্দাজ অনুমান করেছিলেন।

ভোর চারটে, নির্জন, নীরব বোম্বাই শহর। শহর তখনও ঘুমিয়ে আছে। এমনি সময় পুলিশ এসে বোম্বাই'র বিড়লার বাড়িতে হাজির হল। এত ভোরে পুলিশ কী চায়? সবাই পুলিশকে দেখে বিস্মিত হলেন।

পুলিশ গান্ধীজিকে বলল, আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি…

আজ এই পুলিশ বাহিনীর নেতা ছিলেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার।

গান্ধীজি কোন প্রতিবাদ করলেন না। তিনি কারাগারে যেতে প্রস্তুত।

পুলিশের গাড়িতে উঠবার আগে গান্ধীজি সবাইকে বললেন আমি গতরাত্রে দেশবাসীর কাছে বলেছি দেশের এই সংকট মুহূর্তে তাদের কী কর্তব্য। আমি তাদের বলব তারা যেন একটি কাগজে লিখে রাখে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। পরে সেই কাগজটি যেন তাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখে। তাহলে দেশের সবাই জানতে পারবে দেশের আসল সেবক কে?

পুলিশ গান্ধীজিকে গাড়ি করে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশনে নিয়ে গেল। তারপর একটি বিশেষ ট্রেনে করে তাকে পুনায় নিয়ে যাওয়া হল।

(অনেকে বলেন যে গান্ধীজি নেতাজী সুভাষের জাপান কিংবা জার্মান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে ভারতে আগমনের আশঙ্কা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে লেখক মাইকেল এডওয়ার্ডসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ['নেহরু: এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি', পৃষ্ঠা-১৪৬]।

এডওয়ার্স বলেছেন: জার্মানী থেকে সুভাষের বক্তৃতা প্রতিদিন ভারতবাসীরা শুনতে পাচ্ছিল। এ ছাড়া জাপানীদের ইংরেজ বিরোধী প্রচার বুদ্ধিজীবীদের মনকে আকৃষ্ট করছিল। দেশের সর্বত্র এক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এবং দেশবাসীদের মনে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষাও বাড়ছিল। গান্ধীজির পক্ষে সুভাষ জাপানী সেনাবাহিনীর নেতা হয়ে ফিরে আসবেন এ ছিল চিন্তাশক্তির বাইরে। সুভাষের আগমনের আগেই গান্ধীজি দাবী করলেন, দেশকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দিন 'কুইট ইণ্ডিয়া'। গান্ধীজি এক বড় মহান নেতা হলেও নিজের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন। তার চারপাশে কোন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এই কারণে জিন্না, সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।)

ভোর পাঁচটার সময় পুলিশ এগার জন কংগ্রেস নেতাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। তারপর ট্রেনে করে সবাইকে পুনায় নিয়ে যাওয়া হল।

এখান থেকে কংগ্রেস সদস্যদের দেশের বিভিন্ন জেলখানায় নেওয়া হল।

নেতারা কেউ তরুণ যুবক ছিলেন না, বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত। জেলখানায় থাকাকালীন কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হত। তাদের এই আলোচনা এত তীব্র হত যে, চার বছর পরে তারা যখন জেলখানা থেকে মুক্তি পেলেন তখন একে অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আহমদনগর জেলখানায় থাকাকালীন আজাদ, আসফ আলি, সৈয়দ মামুদ এবং নরেন্দ্র দেব নেহরুর সঙ্গে ছিলেন এবং এদের মধ্যে কিছুদিনের জন্য বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু পরে বন্ধুত্বের মধ্যে কিছুটা চিড় ধরল। নেহরু এবং সৈয়দ মামুদ বেশ কিছুদিন এক কারাগারের একই সেলে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন সৈয়দ মামুদকে মুক্তি দেওয়া হল। জওহরলাল খবর পেলেন যে সৈয়দ মামুদ 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভাইসরয়কে এক চিঠি লিখেছিলেন এবং নিজের মুক্তি আদায় করেছেন। নেহরু এই খবর শুনে অবাক হলেন।
['নেহরু' : এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৮]

* * * *

৯ই আগষ্ট, ১৯৪২।

সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে গান্ধীজির বার্তা রটে গেল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' · ইংরেজ ভারত ছাড়। দেশব্যাপী শুরু হল বিপ্লব, ধর্মঘট।

ভারতের কিছু কিছু ইংরেজ মহলেও লিনলিথগোর নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। কলকাতার ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্র "ষ্টেট্‌সম্যানের" সম্পাদক আর্থার মুর লিখলেন :

'এই নীতি কী ভাইসরয় একা নিয়েছেন না তিনি মিত্রশক্তির হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে এই নীতি গ্রহণ করেছেন। যদি মিত্রশক্তির সঙ্গে পরামর্শ না করে ভাইসরয় কংগ্রেস দমননীতি গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে এই নীতির পরিবর্তন করা দরকার।' ষ্টেট্‌সম্যানের এই সম্পাদকীয় ভাইসরয় লিনলিথগোকে বিচলিত করল। তিনি তদানীন্তন ষ্টেট্‌সম্যানের মালিক লর্ড কাটোর শরণাপন্ন হলেন। তিনি নালিশ করলেন আর্থার মুর সরকারের নীতির সমালোচনা করছেন। তাকে ঐ পদ থেকে বরখাস্ত করা হ'ক। লর্ড কাটো কোন আপত্তি করলেন না। আর্থার মুরের চাকুরী গেল।

আগষ্টের বিপ্লব সব চাইতে তীব্র হয়েছিল বিহারে। অতীতে পাটনা—পাটলিপুত্র—ছিল সম্রাট অশোকের রাজধানী। এখান থেকে সম্রাট তার শান্তির দূত পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর চারদিকে। কিন্তু আগষ্টের বিপ্লবে ঐ পাটনা হল হিংসার অগ্নিকুণ্ড। পাটনা শহরের দেয়ালে দেয়ালে লেখা হল 'ইংরেজ ভারত ছাড়'।

১১ই আগষ্ট, ১৯৪২...

সকাল প্রায় এগারটা হবে....

পাটনার গর্দানিবাগ সরকারি সেক্রেটারিয়েটের চারদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘোরাফেরা করছিল। প্রদেশের গভর্ণর স্টুয়ার্ট, তার চীফ সেক্রেটারী ওয়ালটার লেসী এবং আই-জি রবার্ট রাসেল সেক্রেটারিয়েটের বারান্দায় দাড়িয়ে আছেন। কারণ তারা খবর পেয়েছেন যে কংগ্রেস সদস্যরা এক বড় মিছিল করে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সেক্রেটারিয়েটের দিকে এগিয়ে আসছে। উদ্দেশ্য, তারা সেক্রেটারিয়েটের ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে তাদের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়াবে।

একদিকে সশস্ত্র পুলিশ টহল দিচ্ছে, অপর দিকে রয়েছে মিছিলের সদস্যরা। এদের হাতে কোন অস্ত্র নেই। এত বড় মিটিংয়ে সবাই যোগ দিয়েছে, ছেলে বুড়ো। সবাই চিৎকার করছে বন্দে মাতরম, 'ইংরেজ ভারত ছাড়'। মিছিল সেক্রেটারিয়েটের কাছে এসে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মিছিলের নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর গুলি চালাল। কিন্তু জনতা পুলিশের এই গুলিতে ভয় পেল না। তারা আবার বিকেলে সেক্রেটারিয়েট আক্রমণ করল। রাত্রের মধ্যে পাটনা হল এক রণক্ষেত্র। একদিকে সরকারের সেপাই, অপরদিকে কংগ্রেসের সমর্থকেরা। অবস্থার অবনতি দেখে গভর্ণর ঢালা হুকুম দিলেন প্লেন ঠিক রাখ। প্রয়োজন হলে আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করব।

এদিকে বিহারের বিভিন্ন শহর থেকে আরও ভয়াবহ খবর এসে গভর্ণরের কানে পৌছুল। ছাপরা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মুজাঃফরপুর সবই হল ছোট ছোট রণক্ষেত্র।

শুধু বিহারে নয়, দেশের অন্য প্রদেশেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করবার জন্যে সরকার বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় এবং খবরের উপর সেন্সরশিপ জারী করল। পাটনার "সার্চলাইট" পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল। "ইণ্ডিয়ান নেশনস্" পত্রিকার উপর সেন্সরশিপ জারী করা হল। কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান নেশনস্' এই আদেশ মানতে রাজি হল না। অতএব এই পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল। এক সপ্তাহের মধ্যে বিহার হল এক বিভীষিকার প্রদেশ। আগষ্টের বিপ্লবের ঢেউর তরঙ্গ অন্য সব প্রদেশেরই গায়ে এসে লাগল। বাংলা, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ-- সব প্রদেশ থেকে জনতার বিক্ষোভ মিছিল, সরকারী দপ্তরে হানা, আক্রমণের এবং জনতার উপর পুলিশের গুলি চালনার খবর পাওয়া গেল।

জেলখানা থেকে গান্ধীজি সরকারের এই হিংস্র নীতির প্রতিবাদ করে ভাইসরয়কে চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন, আগষ্টের আন্দোলন শুরু করবার

আগে আমি আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলাম। আপনি কোন কথাবার্তা বলবার সুযোগ আমাকে দেননি।...অথচ আপনি কংগ্রেস নেতাদের বন্দী করে দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন... এবং দেশবাসীর কাছে কংগ্রেস ও আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করেছেন...

লর্ড লিনলিথগো এই চিঠি পাবার পর মাত্র দু-লাইন জবাব দিলেন। তিনি বললেন, দুঃখিত এ ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই

কিছুদিন পরে আগা খান প্যালেসে গান্ধীজির বন্ধু সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই মারা গেলেন। মহাদেব দেশাই-এর মৃত্যুতে গান্ধীজি বিশেষ বিচলিত হলেন। কারণ মহাদেব ছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহচর... মহাদেব ছিল আমার এই সংগ্রামের এক বীর সৈনিক... সে আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

গান্ধীজির গ্রেপ্তারের খবর রুজভেল্টকে চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি আন্তরিকভাবে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তার বহু চিঠির অনুরোধ আবেদন কিছুতেই চার্চিল কোন কান দেননি। তার সব চিঠির জবাবে চার্চিল শুধু বলেছিলেন, ভারতের ঘটনা আমাদের নিজস্ব ঘরোয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

এই সময়ে আমেরিকাতে অবস্থিত ব্রিটিশ এম্বাসাডার লর্ড হ্যালিফ্যাক্স চার্চিলের কাছে এক বিশেষ গোপনীয় চিঠিতে লিখলেন : দিল্লীর আমেরিকান কনস্যাল জেনারেল, জর্জ মেরিল (এই সময়ে ভারতে আমেরিকার কোন 'দূতাবাস' ছিল না) স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে এক বিশেষ গোপনীয় চিঠিতে জানিয়েছেন যে, ভারতের বহু বিশেষ করে কলকাতার ব্যবসায়ীরা, হিন্দু মুসলমান এবং য়ুরোপীয়ান সম্প্রদায় প্রচুর অর্থ দিয়ে যে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে এবং ভারতের সমস্যা যেন কোন সমাধান না হয় তার চেষ্টা করছে।

ভাইসরয় লিনলিথগো কিছুদিন পরে তার প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের শরণাপন্ন হলেন। তিনি খবর পেয়েছেন ভারতের জটিল সমস্যা সমাধান করবার জন্যে আমেরিকার দুইজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ উইণ্ডেল উইল্‌কি এবং শেরউড এডি দিল্লীতে আসছেন। এরা এদেশের রাজনীতি এবং আমাদের সমস্যার কিছু বোঝেন না, ভাইসরয় লিখলেন। এরা এখানে এলে গোলমাল হতে পারে। এর জবাবে আমেরী তার ভাইসরয়কে নির্দেশ দিলেন : দেখবেন এরা যেন কংগ্রেস বন্দীর সঙ্গে দেখা না করতে পারেন ? চার্চিল লিখলেন : এদের হাত করতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। কারণ উইল্‌কি এবং শেরউড এডি দুজনেই

স্যাম্পাইন পান করতে ভালবাসেন। কিন্তু ভাইসরয় কোন বিদেশী রাজনীতিবিদ এ দেশে আসছেন শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন। ভারতের প্রকৃত অবস্থা কেউ জানুক তিনি চান না।

সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে বিহার ছাড়া অন্য সব প্রদেশে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন করতে গিয়ে মোট ৩৪০ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। আহতদের সংখ্যা ৬৩২ জনের কিছু বেশি হবে। প্রায় ষাটি শহরে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীকে গুলি চালাতে হয়েছিল। এর দরুন প্রায় ৫৭টি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে 'আমেরিকার জনমত'কে উল্লেখ করে আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড হ্যালিফ্যাক্স আবার বিদেশমন্ত্রী ইডেনকে লিখলেন: 'প্রেসিডেন্টের উপর বিভিন্ন মহল থেকে চাপ দে'য়া হচ্ছে যেন অনতিবিলম্বে ভারতের সমস্যার দূর করা হয়। এই প্রচার যেমনি করেই হ'ক বন্ধ করতে হবে। সমস্যা সমাধানের কিছু একটা করুন।'

একদিন চার্চিল এক গার্ডেন পার্টিতে আমেরীকে বললেন, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে লজ্জা পাবার কারণ নেই। দীর্ঘ আশি বছর ধরে আমরা এই দেশের রক্ষণাবেক্ষণ করছি এবং ভারতীয়দের শান্তি দিয়েছি··· । কিন্তু চার্চিল এবং তার সহকর্মীদের ভারত নিয়ে চিন্তা করবার অন্য একটি কারণ ছিল। সেই কারণটি হল 'ষ্টার্লিং ব্যালান্স'····যুদ্ধের আগে ভারতে বিভিন্ন ধরনের কাজ রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি করবার জন্তে ভারত ইংল্যাণ্ডের কাছে ঋণী ছিল। কিন্তু লড়াই শুরু হবার পর ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীকে ভারতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ইংল্যাণ্ডেরই ভারতের কাছে উল্টো ঋণ হয়েছিল। এই ঋণের পরিমাণ ছিল তখন প্রায় চারশো মিলিয়ন পাউণ্ড। অতএব কী করে এই ষ্টার্লিং ব্যালান্স সমস্যা সমাধান করা যায় এ নিয়ে আমেরী এবং লিনলিথগো ভাবতে শুরু করলেন। কিছুদিন পরে তারা বুঝতে পারলেন যে, সমস্যা গুরুতর এবং বর্তমানে কিছু করলে ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। অতএব চুপ করে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের পরিচয়। ['জিন্না অব পাকিস্তান' ষ্টানলী ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-২১২]।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে দেশের অচল সমস্যা সমাধান করবার জন্যে রাজাগোপালাচারী এক প্রস্তাব করলেন। তার প্রস্তাবানুযায়ী এই সন্ধিক্ষণে "ভাইসরয় হবেন রাজার মত"। তিনি দেশের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এক জাতীয় সরকার গঠন করবেন। এই সরকারে প্রথমে পাঁচজন কংগ্রেস সদস্যকে নে'য়া হবে এবং পরে জিন্নাকে তার ইচ্ছানুযায়ী সদস্য নিয়ে এই

সরকারে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হবে। এ ছাড়া সংখ্যালঘু কিছু প্রতিনিধিদের এই সদস্যসভায় নে'য়া হবে। রাজাগোপালাচারী মত প্রকাশ করলেন যে, তার এই প্রস্তাব কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কিন্তু জিন্না রাজাজীর এই প্রস্তাবকে 'ঘুড়ি উড়ান' প্রস্তাব বলে বর্ণনা করলেন ['জিন্না অব পাকিস্তান' : ষ্টানলি ওলপো' পৃষ্ঠা-২২১]।

দুই

'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে আর এক বীরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তার সেই পৌরুষ কণ্ঠস্বর ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকে পাগল করে তুলল।

ভারতের সব গ্রামে গ্রামে, শহরে, পথে-ঘাটে, সেই মহাপুরুষের আবেদন শোনা গেল।

'তুমি আমাকে এক বিন্দু রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব! ব্লাড ফর ফ্রীডম...।'

এই বীরের নাম হল সুভাষচন্দ্র বোস। পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় নাগরিকেরা তার নাম দিয়েছিল 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস' এবং জনগণের কাছে তিনি 'নেতাজী' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে বুদ্ধিতে পরাজিত করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। তিনি সম্রাটের ফাঁদ থেকে পালিয়ে গিয়ে দিল্লীর আলমগীরকে নাজেহাল করেছিলেন। তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন।

দেশ থেকে পালাবার আগে সুভাষচন্দ্র কলকাতার ব্ল্যাকহোল-হলওয়েল মনুমেন্ট—নিয়ে এক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তার এই আন্দোলনের দরুন ব্রিটিশ সরকার তাকে তার এলগিন রোডের বাড়িতে 'নজরবন্দী' করে রেখেছিল। নেতাজী এই সময় থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করলেন। কারণ দেশ থেকে অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার পরিকল্পনা তিনি আগেই করেছিলেন।

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১ সাল। খুব সকালে সুভাষচন্দ্রের গাড়ির সামনে এক গাড়ি এসে দাঁড়াল। এই গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসলেন এক মুসলমান শিক্ষক এবং নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির বোস। ঐ মুসলমান শিক্ষক ছিলেন সুভাষচন্দ্র নিজে। তিনি বাইরে মোতায়েন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঐ ভোরে

কলকাতা থেকে পালিয়ে গেলেন। তারপর কলকাতা থেকে দুশো মাইল দূরে গিয়ে তিনি পেশোয়ার যাবার জন্যে এক ট্রেন ধরলেন। পেশোয়ার থেকে তিনি কাবুলে গেলেন। প্রথমে গাড়ি করে গেলেন, কিন্তু গাড়ির যন্ত্র বিকল হয়ে যাবার পর সুভাষচন্দ্র দুই আফগান বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে খাইবার পাশ এবং সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছুলেন। কাবুলে উত্তমচাঁদ নামে এক ভারতীয়র সাহায্য নিলেন। ইতালির এম্বাসাডার সুভাষচন্দ্রকে এক ইতালিয়ান পাসপোর্ট দিলেন। এই পাসপোর্ট নিয়ে সুভাষচন্দ্র প্রথমে মস্কো গেলেন। পরে সেখান থেকে তিনি বার্লিনে গিয়ে হাজির হলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিনে গিয়ে পৌঁছুলেন তখন বার্লিনে একদল ভারতীয় নাগরিক তাদের ভবিষ্যৎ এবং ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এরা য়ুরোপের এই যুদ্ধের সময় কী নীতি গ্রহণ করবেন ভাবছিলেন। সুভাষচন্দ্র এইসব ভারতীয়দের নিয়ে এক নতুন সংস্থা গঠন করলেন। এই সংস্থার নাম হল 'আজাদ হিন্দ'।

এই নতুন আজাদ হিন্দ সংস্থাকে সংগঠন করবার জন্যে তার অনেক সাহায্যের দরকার ছিল। চাই অর্থবল, চাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সুভাষচন্দ্র তার ভারতীয় বন্ধুদের বললেন, আমরা ভারতীয় আমাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য হল দেশকে স্বাধীন করা। বর্তমানে জার্মানদের সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কিছু বলব না। য়ুরোপের লড়াইর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই (নেতাজীর তিন অনুরাগী নাম্বিয়ার, গিরিজা মুখার্জি এবং আবিদ হাসান এই কথা লেখককে বলেছিলেন)। বার্লিনে পৌঁছুবার পর ১৯৪১ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র রোমে গিয়ে ইতালির বিদেশমন্ত্রী চিয়ানোর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলেন।

চিয়ানো ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখালেন না। বরং সুভাষচন্দ্রকে রোমের এক হোটেলে নজরবন্দী করে রাখা হল ['চিয়ানো ডায়েরী' পৃষ্ঠা-৩৫৫]। বার্লিনে নাৎসী সরকারও ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখালেন না। হিটলারও ভারতের স্বাধীনতার দাবীর খুব সমর্থক ছিলেন না। নেতাজী হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু তাকে দেখে বিশেষ আকৃষ্ট হননি। কিছুদিন পরে নাৎসী সরকার নেতাজীকে তাদের রেডিও 'আজাদ হিন্দের' প্রচার কাজের জন্যে ব্যবহার করবার সুযোগ দিল। নেতাজী 'আজাদ হিন্দ রেডিও' গঠন করলেন। পরে সুভাষচন্দ্রের কাজকর্ম দেখে নাৎসী প্রচার সচিব গোয়েবলস বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে মুসোলিনী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বিদেশে এক "সাময়িককালের সরকার গঠন" করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু হিটলার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন না।

ইতিমধ্যে জাপান সরকার বিদেশে ভারতীয়দের নিয়ে এক সাময়িককালের সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিল।

বার্লিনে সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কিন্তু এইসব ছোট ছোট কাজ করে তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরে তিনি ঠিক করলেন, জর্মানীতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক সৈন্য-বাহিনী গঠন করবেন।

নাৎসী সরকার বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করবার অনুমতি দিলেন। গঠন করা হল 'ইণ্ডিয়ান লিজন'। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান লিজনের' সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। বার্লিনের তিয়ারগার্তেন এলাকায় সুভাষচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান লিজনের' এক দপ্তর খুললেন। সুভাষচন্দ্র এই ইণ্ডিয়ান লিজনের গঠনের কাজ নিয়ে য়ুরোপের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় সেনাদের একত্র করবার চেষ্টা করলেন। সুভাষচন্দ্র এইসব সৈন্যদের কাছে ভারতের স্বাধীনতার কথা বললেন 'আমার দেশ পরাধীন। ঐ পরাধীন দেশে স্বাধীনতার পতাকা তুলতে হবে।' ক'দিনের মধ্যে ভারতীয় সেনারা সুভাষচন্দ্রের আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হল। ক্রমে ক্রমে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সংস্থা শক্তিশালী হতে লাগল। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন বার্লিনে বসে থেকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হলে তাকে দেশের আরও কাছে এগিয়ে যেতে হবে। কিছুদিন পরে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে আহ্বান পেলেন: আপনি আমাদের এখানে আসুন। আমাদের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির পরিচালনা গ্রহণ করুন। তারপর এল জাপান সরকারের আমন্ত্রণ।

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এবং ইণ্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট লীগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

*　　*　　*　　*

পয়লা অক্টোবর, ১৯৪১ সাল।

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক।

দিনটা ছিল গুমোট গরম।

বিকেলের কিছু আগে এক ডাকোটা প্লেন থেকে এক জাপানী মেজর নামলেন, তার নাম ছিল ইমাসিতা হিরকাজু এ ছিল তার ছদ্মনাম। তার আসল নাম ছিল মেজর ফুজিয়ারা ইয়াইচি...। তাকে এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ গুপ্তচরের কাজ দিয়ে থাইল্যাণ্ড, মালেশিয়া এবং বর্মার স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে, বিশেষ করে ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কারণ এই

পঁয়ত্রিশ বছরের জাপানী যুবক জানতেন যে কিছুদিনের মধ্যে জাপানী সৈন্য-বাহিনী এইসব এলাকা আক্রমণ করবে। এই আক্রমণের সময় জাপানীদের স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন কাজের জন্যে দরকার হবে। যদি ফুজিয়ারা তার কাজ ভাল না করে করতে পারেন তাহলে জাপানীদের আক্রমণ এবং এইসব দেশগুলি দখল করে নে'য়া খুব সহজ কাজ হবে না। ফুজিয়ারাকে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একত্র এবং সংগঠন করে ইংরেজ বিরোধী এক বাহিনী গঠন করতে হবে।

১৯৪১ সালে ফুজিয়ারা হংকং'র ব্রিটিশ জেলখানা থেকে তিনজন ভারতীয়কে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন এবং তাদের পরে এক জাপানী জাহাজে করে থাইল্যাণ্ড পাঠিয়েছিলেন। এই তিনজন ভারতীয় ব্যাংককের জাপানী এম্বাসীর মিলিটারী এটাচীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। পরে ফুজিয়ারার সঙ্গে তাদের আবার দেখা হয়েছিল।

জাপানী সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষের কাছে থাইল্যাণ্ড ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ব্যাংককে পৌঁছুবার পরের দিন মেজর ফুজিয়ারা এম্বাসীতে গিয়ে জাপানী মিলিটারী এটাচী কর্নেল তামুরা'র সঙ্গে দেখা করলেন। কর্নেল তামুরা ফুজিয়ারাকে তিনটি বিশেষ কাজের নির্দেশ দিলেন। প্রথম কাজ হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেইগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং ঐ সংস্থাগুলোকে একত্র করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করা। দুই, বিদেশী চীনা এবং মালেশিয়াদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং তার তৃতীয় কাজ হল মালেশিয়াকে হরিমাওর (এটা ছদ্মনাম, এর পুরো নাম হল এ-টাইগার প্রজেক্ট) সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। মিলিটারী এটাচী তামুরা ফুজিয়ারাকে সতর্ক করে বললেন যে তাকে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। কারণ থাই সরকার এই ধরনের স্পাই'র কাজ একেবারেই পছন্দ করেন না। এছাড়া তিনি ফুজিয়ারাকে সাবধান করে বললেন, থাইল্যাণ্ডের কোন জাপানী বাসিন্দার সঙ্গে তিনি যেন কোন সংশ্রব না রাখেন।

বারোই অক্টোবর, দুপুর বেলা ফুজিয়ারা আবার মিলিটারী এটাচী তামুরা'র বাড়িতে গেলেন। ঐখানে মাথায় পাগড়ী বাধা এক শিখের সঙ্গে তার আলাপ হল। এই শিখের নাম হল প্রীতম সিং। আলাপ-আলোচনাকালে ফুজিয়ারা জানতে পারলেন তিনি যে তিনজন ভারতীয়কে হংকংএর জেলখানা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রীতম সিং'এর বন্ধু।

প্রীতম সিং নিজেও ১৯৩৯ সালে দেশ থেকে পালিয়ে ব্যাংককে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন।

প্রীতম সিং'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফুজিয়ারা জানতে পারলেন যে থাইল্যাণ্ডে দুইটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান আছে। একটি প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'ইণ্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট লীগ' এবং এর অধিকাংশ সদস্যই ছিল শিখ। আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'ইন্দোথাই কালচারাল এসোসিয়েশন'। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রকার বন্ধুত্ব কিংবা সদ্ভাব ছিল না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ফুজিয়ারা ঠিক করলেন যে, তিনি প্রীতম সিং এবং 'ইণ্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট লীগের' সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করবেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে আর একটি গৌণ কারণও ছিল। 'ইণ্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট লীগের' সদস্য থাইল্যাণ্ডের চার কোণে ছড়িয়ে ছিল।

'ইন্দোথাই কালচারাল এসোসিয়েশন' সাধারণত ভারতীয় সাংস্কৃতিক কাজ-কর্ম নিয়ে প্রচার করত। এই প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় ভারতীয়দের উপর খুব বেশি প্রভাব ছিল না।

ফুজিয়ারা প্রীতম সিংএর কাছ থেকে আরও জানতে পারলেন যে মালেশিয়াতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ ভারতীয় সেনারা হল 'ইংরেজ বিদ্বেষী' ফুজিয়ারা ঠিক করলেন যে প্রীতম সিং'এর সাহায্য নিয়ে তিনি এইসব ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ সরকার বিরোধী প্রচার কাজ করবেন।

১৯৪১ সালে জাপানে কনো মন্ত্রীসভার পতন হল। দেশের নতুন সরকার গঠন করলেন জেনারেল টজো। টজোর মন্ত্রীসভা যুদ্ধ শুরু করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ঠিক হল জাপান প্রথমে পার্ল হারবার আক্রমণ করবে। তারপর থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর দখল করা হবে। ফুজিয়ারা এই আক্রমণের খবর আগেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রীতম সিং কিংবা তার কোন সহকর্মীর কাছে এই আক্রমণ পরিকল্পনার কোন আভাস দেননি। অবশ্যি যুদ্ধ শুরু হলে কী করা সম্ভব হবে সেই নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। দুজনে মিলে ঠিক করলেন, লড়াই শুরু হলে তারা বিভিন্ন উপায়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীর লড়াইতে বাধা সৃষ্টি করবেন। পরে ফুজিয়ারা তার ভারতীয় বন্ধুদের সহযোগিতা নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করবে। এই দলের নাম হবে ফুজিয়ারা 'কিকান' (কিকান মানে 'এজেন্সী')। অবশ্যি ফুজিয়ারা দলের নামকরণ করলেন ফুজিয়ারা, এফ এফ মানে 'ফ্রেণ্ডশীপ' এবং 'ফ্রীডম'। এছাড়া আরও ঠিক করা হল প্রীতম সিং এবং তার সহকর্মীরা জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের সঙ্গে এগিয়ে যাবে।

এ ছাড়া ঠিক হল প্রীতম সিং এবং ফুজিয়ারা জাপানী অধিকৃত এলাকায় ভারতীয় নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করবেন। এক চুক্তিপত্রে এইসব শর্ত লেখা হল এবং পরে চুক্তিপত্রটি টোকিও'র সামরিক বাহিনীর

হেডকোয়াটার্সে পাঠিয়ে দে'য়া হল।

৪ঠা ডিসেম্বর ফুজিয়ারা খবর পেলেন যে, ৮ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করবে। তারপরে থাইল্যাণ্ড এবং সিঙ্গাপুর আক্রমণ করা হবে। জাপানী সেনাবাহিনী ঠিক করেছিল যে তারা থাইল্যাণ্ড অতিক্রম করে মালেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে যাবে। জাপানীরা তাদের এই আক্রমণের কিছু আভাস দিয়ে থাই সরকারের কাছে এক কূটনৈতিক নোট পাঠাল।

থাই সরকার এই ধরনের নোট পেয়ে বেশ আতঙ্কিত হল। কী ব্যাপার? তারা এই ধরনের নোট জাপান সরকারের কাছ থেকে আশা করেনি।

এই গুরুতর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে থাই সরকারের ক্যাবিনেটের এক বিশেষ জরুরী মিটিং করা হল। কিন্তু আলোচনাকালীন দেখা গেল যে, প্রধানমন্ত্রী পিবুন সোংগ্রাম ক্যাবিনেটের এই বৈঠকে অনুপস্থিত। গুজব শোনা গেল তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। এ খবর শুনে সবাই হতভম্ব হল। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কী করা যায়? পালিয়ে যাবার আগে প্রধানমন্ত্রী এক চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সেই চিঠি জাপান সরকারকে দে'য়া হল। এবার জাপানী সেনাবাহিনী ঠিক করল যে তারা আগের নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী থাইল্যাণ্ড অতিক্রম করে মালেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে যাবে।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর প্রীতম সিং এবং তার এক বন্ধু অমর সিং গিয়ে জাপানী জেনারেল ইডা সোজিরার সঙ্গে দেখা করলেন। ইডা সোজিরা তাদের দুজনকে কথা দিলেন যে তিনি মালেশিয়ার ভারতীয়দের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এবার প্রীতম সিং, অমর সিং এবং ফুজিয়ারা প্লেনে করে 'সিঙ্গোরা' শহরের পানে রওনা দিলেন। সিঙ্গোরাতে এসে প্রীতমসিং এবং ফুজিরারা সিঙ্গোরার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। পরে তারা অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করলেন। ইতিমধ্যে ঐ এলাকায় যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। প্রীতম সিং ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করলেন। সবাইকে আশা দে'য়া হল যে ভারতকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করা হবে। প্রীতম সিং এবার কোটাবারুতে গিয়ে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করলেন। সেই দিন রাত্রেই জাপানী সেনাবাহিনী 'এলোরষ্টার' শহর দখল করে নিল।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী জাপানীদের এই আক্রমণের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

তারা বুঝতে পারল যে তাদের সৈন্যবাহিনী জাপানী সৈন্যবাহিনীর চাইতে অনেক দুর্বল। অতএব পশ্চাৎপসরণ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

এই এলোরষ্টারের যুদ্ধের পর প্রীতম সিং এবং অমর সিং'র আর এক

ভারতীয়র সঙ্গে পরিচয় হল। ইনিই ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির' প্রতিষ্ঠাতা মোহন সিং।

*　　　*　　　*

এই যুদ্ধে মোহন সিং এক পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের 'সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ড' ছিলেন। লড়াই শুরু হবার ঠিক কিছু আগে ছুটি নিয়ে দেশে বেড়াতে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু লড়াই'এর সম্ভাবনার আশঙ্কা করে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ তার ছুটি নাকচ করে দিয়েছিল। মোহন সিং যখন ফিরে এসে তার রেজিমেণ্টে যোগ দিলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, এই প্রান্তে যে-কোন দিন লড়াই শুরু হতে পারে। এই সময়ে মোহন সিং পদমর্যাদায় ছিল ক্যাপ্টেন।

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল, লড়াই শুরু হবার ঠিক কিছুদিন আগে মোহন সিং তার বন্ধুদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, এই লড়াইতে তার মৃত্যু হবে না। 'বরং এই যুদ্ধে আমিই আপনাদের জীবন রক্ষা করব।'

মোহন সিং'এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সবাইকে অবাক করেছিল। কারণ মোহন সিং ছিলেন স্বল্পভাষী।

৮ই ডিসেম্বর জাপানী বোমারু বিমানবাহিনী এলোরস্টার শহরের বিমানবন্দর আক্রমণ করল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই আক্রমণে চকচকিয়ে গেল। মোহন সিং'এর কম্যাণ্ডিং অফিসারের নাম ছিল কর্নেল ফিৎজপাট্রিক। তাদের বলা হল, থাই সীমান্তে গিয়ে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কোন ট্যাঙ্ক ছিল না। তাদের বলা হয়েছিল এই এলাকায় কোন ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এদিকে জাপানী ট্যাঙ্কবাহিনী তীব্রগতিতে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। মোহন সিং'এর রেজিমেণ্ট থাই সীমান্ত অতিক্রম করবার কোন সুযোগ পেল না। পরে ১১ই ডিসেম্বর, মোহন সিং'এর রেজিমেণ্টের সঙ্গে জাপানীদের এক লড়াই হল। জাপানীরা ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী ব্যবহার করল। এই যুদ্ধে মোহন সিং'এর রেজিমেণ্টের শোচনীয় পরাজয় হল। মোহন সিং'এর রেজিমেণ্টের সেনারা জঙ্গল দিয়ে পালাতে শুরু করল। মোহন সিং'এর কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ফিৎজপাট্রিক মোহন সিং'এর হাতে সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ড তুলে দিলেন।

যুদ্ধের এই বিপর্যয়ের পরে মোহন সিং একা তিনদিন জঙ্গলে কাটিয়ে ছিলেন। এই সময়ে তার প্রধান চিন্তা হল, তিনি এবার কী করবেন? মোহন সিং বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী হল বৃটিশ সরকারের ভারত-শাসন করবার প্রধান অস্ত্র এবং তাদের মেরুদণ্ড। এই সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া ইংরেজ কোনদিনই ভারতবর্ষ শাসন করতে পারবে না। যুদ্ধের পরে ভারতীয়

সৈনাবাহিনীর কর্তারা, বিশেষ করে ওয়েভেল এবং আকিনলেক এই সত্যি কথা উপলব্ধি করেছিলেন। মোহন সিং আরও বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজ শাসকদের ভারতবর্ষ থেকে জোর করে না তাড়িয়ে দিলে, তারা এ দেশ থেকে যাবে না····। এই ধরনের বহু চিন্তা এসে তার মনে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তিনি তার মনের জটিল প্রশ্নের এবং সংশয়ের কোন সমাধান করতে পারলেন না।

* * *

এলোরস্টার, ১২ই ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটা।

জাপানীদের শিবিরে প্রীতম সিং বক্তৃতা দেবেন। তার এই বক্তৃতা শুনবার জন্যে স্থানীয় ভারতীয়রা এসে জড়ো হয়েছেন। পরাজিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কিছু ভারতীয় সেনারাও আছেন। প্রথমে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করা হল। পরে প্রীতম সিং বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন যে, জাপানীদের সাহায্য নিয়ে শিগ্‌গিরই তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে এক সংগ্রাম শুরু করবেন। এই বক্তৃতার পর ফুজিয়ারা কিছু ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ নীতি নিয়ে আলোচনা করলেন।

ঐ এলাকার অনেক ভারতীয়রা বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা, সহজে জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন না। পরে প্রীতম সিং, ফুজিয়ারা, মোহন সিং, কর্নেল ফিৎজপাট্রিকের সঙ্গে দেখা করলেন। কর্নেল ফিৎজপাট্রিকের নির্দেশে মোহন সিং এবং অন্যান্য ভারতীয় সেনারা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এক মুহূর্তে ভারতীয় সেনারা তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করলেন। এই আনুগত্য পাল্টাবার নির্দেশ দিতে কর্নেল ফিৎজপাট্রিকের মনে কোন দ্বিধা কিংবা সংকোচ হল না।

ইতিমধ্যে এলোরস্টার শহরের আইন-শৃঙ্খলা সব কিছুই ভেঙে পড়েছিল। ফুজিয়ারা শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব মোহন সিং এবং তার ভারতীয় সেনাদের হাতে তুলে দিলেন। মোহন সিং শহরের চারদিকে তার সেনাবাহিনী মোতায়েন করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এল।

মোহন সিং'এর হাবভাবে, চালচলনে ফুজিয়ারা বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এবার মোহন সিং'এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনা অন্তে ফুজিয়ারা মোহন সিং'কে জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

মোহন সিং'এর সঙ্গে ফুজিয়ারার এই আলোচনা সার্থক হল। এরপর থেকে

ফুজিয়ারা দুপুরে প্রীতম সিং'এর সঙ্গে এবং রাত্রে মোহন সিং'এর সঙ্গে এক নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করা নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু মোহন সিং'এর মনে কিছু দ্বিধা-সংশয় রয়ে গিয়েছিল। তিনি যেন সহজে ফুজিয়ারার জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। পরে মোহন সিং'এর মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে ফুজিয়ারা জাপানী সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহিনীর কর্তা জেনারেল ইমাসিতারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন করলেন। ইমাসিতা মোহন সিং'কে বললেন: আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনাদের সাহায্য করব।

মোহন সিং ফুজিয়ারার কাছ থেকে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি চাইলেন। প্রথমে আশ্বাস চাওয়া হল, জাপান তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। দুই, জাপান কংগ্রেসকে সাহায্য করবে। ফুজিয়ারার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাবার পরেও মোহন সিং'এর মনে খটকা রয়ে গেল। এরপর মোহন সিং ফুজিয়ারার প্রস্তাব নিয়ে তিনি তার অতি বিশ্বস্ত সহকর্মী মুহম্মদ আক্রমের সঙ্গে আলোচনা করলেন। এই আলোচনার পর মোহন সিং জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

* * *

এবার শুরু হল আই. এন. এ. গঠন।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল।

মোহন সিং এলোরস্টার থেকে পেরেক স্টেট এলেন। এখানে এসে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আরোগ্য লাভ করে মোহন সিং ফুজিয়ারার কাছে ছয়টি প্রস্তাব পেশ করলেন। এই ছয়টি প্রস্তাব হল—ভারতীয়রা তাদের সৈন্যবাহিনী গঠন করবে। দুই, জাপানীরা এই সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করবে। তিন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স ল সাময়িকভাবে জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। চার, জাপানীরা মোহন সিং'কে 'বন্দী ভারতীয়দের' নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। পাঁচ, যে-সব ভারতীয়রা বন্দী হয়ে আছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে এবং বন্দীদের মধ্যে যদি কেউ আই-এন-এতে যোগ দিতে চায় তাহলে তাদের সেই যোগ দেবার সুযোগ দিতে হবে। ছয়, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে 'বন্ধু-মিত্র' বাহিনী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ফুজিয়ারা মোহন সিং'এর এই শর্তগুলি স্বীকার করে নিলেন। ফুজিয়ারা এবং মোহন সিং নতুন ভারতীয় সেনাবাহিনীর নামকরণ করলেন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি—সংক্ষেপে আই-এন-এ।

পরে দুদিন ধরে ফুজিয়ারা এবং মোহন সিং 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' এবং

. ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের ভবিষ্যৎ এবং কী করে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একক হয়ে কাজ করতে পারে এই নিয়ে আলোচনা করলেন। মোহন সিং অভিযোগ করলেন যে, রাজনৈতিক কাজকর্ম দেখাশোনা এবং তত্ত্বাবধান করবার কাজে প্রীতম সিং অনুপযুক্ত এবং তার চাইতে একজন কঠোর, কর্মঠ লোকের প্রয়োজন এই পদের জন্য।

যদিও মোহন সিং প্রীতম সিংকে সাময়িকভাবে তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন, তবু তিনি ফুজিয়ারাকে অনুরোধ করলেন যে, সুভাষ বোস জার্মানীতে আছেন। আপনারা ওকে এই এলাকায় নিয়ে আসুন……

মোহন সিং ফুজিয়ারাকে বললেন যে, আই-এন-এ শুধু ইন্দোবর্মা এলাকায় লড়াই করবে, এশিয়ার অন্য কোন রণাঙ্গনে নয়।

ফুজিয়ারা মোহন সিং'এর শর্তগুলি স্বীকার করে নিলেন। তিনি বললেন যে, আই-এন-এ'কে 'মিত্র-বাহিনী' হিসাবে গ্রহণ করে নেবার কিছু অসুবিধে আছে।

এবার ফুজিয়ারা মোহন সিং'এর শর্তগুলি জেনারেল ইমাসিতারের কাছে পেশ করলেন। ইমাসিতাও মোহন সিং'এর শর্তগুলি স্বীকার করে নিলেন। শুধু 'মিত্রশক্তি' শর্তটি গ্রহণ করা হল না।

যুদ্ধের শেষ অবধি এই প্রশ্নের কোন সমাধান করা হয়নি।

মোহন সিং ফুজিয়ারাকে বললেন, আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমাদের পরিবার ভারতবর্ষে আছে। হয়ত ব্রিটিশ সরকার ওদের উপর অনেক অত্যাচার করবে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করব।

ফুজিয়ারা মোহন সিং'কে ধন্যবাদ জানালেন।

জাপানী সৈন্যবাহিনী এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও পেছু হটতে শুরু করল। ফুজিয়ারা, মোহন সিং এবং প্রীতম সিং ইপোতে চলে গেলেন। মোহন সিং ইপোতে সাময়িককালের জন্যে তার হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করলেন।

এই সময়ে টোকিও'র হেড-কোয়ার্টার থেকে মেজর ওজিকি ফুজিয়ারার কাজকর্ম দেখবার জন্যে এই এলাকায় এলেন। ফুজিয়ারা মেজর ওজিকিকে বললেন, জাপানের প্রধান নীতি হওয়া উচিত ব্রিটিশ সরকারকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই ক'জ করতে হলে জাপানী সৈন্যবাহিনী এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। দুই, এ-ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে জাপান সরকারের নীতিকে আরও স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে,

ব্যাখ্যা করতে হবে। তিন, জাপান সরকার এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীকে ভারতের নীতি সম্বন্ধে একমত হতে হবে। চার, জাপান সরকার সুভাষ বোসকে এই এলাকায় নিয়ে আসবার আয়োজন করবেন। পাঁচ, জাপান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরো সাহায্য করবেন।

মেজর ওজিকি ফুজিয়ারাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি এই বিষয়গুলি নিয়ে জাপান সরকার এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

কুয়ালালামপুরের যুদ্ধের পর মোহন সিং আই-এন-এ নতুন করে গঠন করলেন। তিনি আই-এন-এ বাড়িয়ে পাঁচ ব্যাটালিয়নে করলেন।

আই-এন-এ সৈন্যবাহিনীকে কুচকাওয়াজ এবং অন্যান্য সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হল। কিছু ভারতীয় সেনাকে সায়গন রেডিও থেকে প্রচার কাজ করবার জন্যে পাঠান হল।

২৪শে জানুয়ারীর মধ্যে জাপানী সৈন্যবাহিনী ফিলিপিন, সেলিবিস এবং নিউ ব্রিটেন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়েছিল। ফুজিয়ারাও আই-এন এ'এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে টোকিওতে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তার যাত্রায় বাধা পড়ল। একদিন তার কুয়াং আর্মি শিবিরে ডাক পড়ল। জেনারেল তেরুচি এবং জেনারেল ইমাসিতা তার সঙ্গে আই-এন-এ এবং মোহন সিং'কে নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চান। এদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী টজোর, ব্যক্তিগত প্রতিনিধি টনাকাও ওখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে ফুজিয়ারা জাপানী জেনারেলদের সঙ্গে 'ভারত নীতি' নিয়ে আলোচনা করলেন। জেনারেল টনাকা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিদের গঠন করা এবং ঐ সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা উচিত হবে কিনা? তিনি ফুজিয়ারার মত জানতে চাইলেন। কিন্তু জেনারেল টনাকার অন্য দুইজন সহকর্মী এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন না।

ফুজিয়ারা জেনারেলদের সিদ্ধান্তে অবাক হলেন। এরা কী বলছেন? এতদূর থেকে তারা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির গঠন নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে কুয়ালালামপুরে এসেছেন, এখন তারা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাইছেন না। কী ব্যাপার? ফুজিয়ারা এবার মোহন সিং এবং প্রীতম সিং'এর কাছে তার জাপানী জেনারেলদের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার বিবরণ দিলেন। পরে জাপানী আর্মির স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল ওকামুরা, মোহন সিং এবং প্রীতম সিং'এর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করে বেশ স্পষ্ট ভাষায় বললেন, দেখুন আপনাদের একটা অপ্রিয় সত্য কথা

বলব। জাপানী জেনারেলদের মধ্যে অনেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করা কিংবা এক নতুন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাজ করা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন যে, ভারতীয়রা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এ-ছাড়া জাত-বিচার তো লেগেই আছে। এবার আপনারাই বলুন এই ধরনের কোন সৈন্যবাহিনী গঠন করা কী সম্ভব?

মোহন সিং ওকামুরার কথায় একটুও ভয় পেলেন না। তিনিও বেশ সহজ গলায় স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন, দেশপ্রেম জাতিভেদ বর্ণ-বৈষম্যের উর্ধ্বে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে কোনদিনই জাতিবিচার নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। আমাদের এ সৈন্যবাহিনী জাত-বিচার, ধর্ম, বর্ণ-বৈষম্য, ভাষাভেদ এবং সাংস্কৃতিক বাছ-বিচারের বাইরে।

এরপর জেনারেল টনাকা ফুজিয়ারা'কে ডেকে বললেন, আমাদের স্টাফ অফিসার মোহন সিং'এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একেবারেই খুশি হননি। তার ধারণা মোহন সিং অতি সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তি। তার নেতৃত্ব করবার কিংবা নেতা হবার কোন যোগ্যতা নেই।

জেনারেল টনাকার এই প্রশ্ন ফুজিয়ারাকে একটুও বিচলিত করল না। ফুজিয়ারা বুঝতে পারলেন যে, জেনারেল টনাকা তাকে বাজিয়ে দেখছেন। এবার ফুজিয়ারা জেনারেল টনাকাকে বললেন, স্টাফ অফিসার যদি এই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন তাহলে আমি একবার তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

এর জবাবে জেনারেল টনাকা ধমকের স্বরে বললেন, তুমি স্টাফ অফিসারের রিপোর্টে অবিশ্বাস কর? কিন্তু ফুজিয়ারা জেনারেল টনাকার কর্কশকণ্ঠ শুনে কোন ভয় পেলেন না।

আমি গত পঞ্চাশদিন যাবৎ মোহন সিং'এর সঙ্গে মেলামেশা করেছি এবং তাকে ভাল করে জানবার সুযোগ পেয়েছি। অতএব আমাকে বলতে হবে যে, আমি স্টাফ অফিসারের রিপোর্টে বিশ্বাস করতে পারিনে

মোহন সিং বিপ্লবী কিংবা কূটনীতিবিদ নন—জেনারেল টনাকা বললেন।

ফুজিয়ারা এর জবাবে বললেন, সব বিপ্লবীই প্রথম জীবনে অতি সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কেউ যদি নিঃস্বার্থভাবে তার দেশকে ভালবাসতে পারেন দেশের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, তাহলে জীবনে একদিন তিনি বড় হবেনই·······

ফুজিয়ারা এরপর জেনারেল টনাকাকে অনুরোধ করলেন, আপনারা জার্মানী থেকে সুভাষ বোসকে নিয়ে আসুন।

জেনারেল টনাকা একটি ছোট জবাব দিলেন, তোমার এই অনুরোধের কথা

মনে রাখব........

ফুজিয়ারা জেনারেল টনাকা এবং জেনারেল টমিনুগোর কাছ থেকে আরও স্পষ্ট জবাব আশা করেছিলেন। কিন্তু জেনারেল টনাকা কিংবা জেনারেল টমিনুগোর ফুজিয়ারার আবেদনে কান দেবার মতো সময় ছিল না।

এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভে জাপানী সৈন্যবাহিনী বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। এবার তারা সিঙ্গাপুর, বর্মা দখল করবার পরিকল্পনা করলেন ....

সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশ সরকারের এক বড গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি। এখানে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল।

১৯৩৭ সালে চীন জাপান যুদ্ধ শুরু হবার পর ব্রিটিশ সরকার সিঙ্গাপুরকে এক বড নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। সাধারণত ব্রিটেনের বড বড় নৌ-যুদ্ধ জাহাজগুলিকে এই বন্দরে রাখা হত।

ব্রিটিশ সরকারের বড় গর্ব ছিল যে, সমুদ্র দিয়ে কোন যুদ্ধ-জাহাজই সিঙ্গাপুরকে আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু এই দুর্গের একটি দুর্বলতা ছিল যে, সিঙ্গাপুরের একপাশে ছিল এক বড জঙ্গল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বড কর্তারা কল্পনা করেননি যে, জাপানী সেনাবাহিনী থাইল্যাণ্ড থেকে এই জলা-জঙ্গল ভেদ করে সিঙ্গাপুরে ঢুকবে। এদিকে টোকিওতে জাপানী লড়াই-পরিকল্পনার কর্তারা সিঙ্গাপুরের এই দুর্বল স্থানগুলিকে বেশ ভাল করে নজর করেছিলেন। যখন সিঙ্গাপুরের এই দুর্বল স্থানগুলি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নজরে পড়ল তখন তিনি কমাণ্ডার ইন চীফ লর্ড ওয়েভেলের কাছে এক বিশেষ তার পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন, যেন সিঙ্গাপুরের এই দুর্বল স্থানকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা হয়।

এছাড়া চীনের সামরিক বাহিনীর কাছে অস্ত্র পাঠাবার জন্য বর্মা-চীন রোডকে শত্রুর কব্জার হাত থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন ছিল।

জাপানী জেনারেল ইমাসিতা সিঙ্গাপুর আক্রমণ করবার জন্যে তিন ডিভিশন সেনাবাহিনী নিয়োগ করলেন। এ-ছাড়া জাহাজ প্লেন এবং পদাতিকবাহিনীও নিয়োগ করা হল। কিছু কিছু জাপানী সৈন্য মোটরবোট করে সিঙ্গাপুরের ডাঙায় অবতরণ করল।

৮ই ফেব্রুয়ারী জাপানী সৈন্যবাহিনী সিঙ্গাপুর আক্রমণ করতে শুরু করল। এই আক্রমণে ফুজিয়ারার নেতৃত্বে কুড়িজন আই-এন-এ সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল। আই-এন-এ'র এই আক্রমণে অংশ নেবারপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সেনাদের বিভ্রান্ত করা।

তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। জাপানী বোমারু বিমান, সেলেটর নৌ-

বন্দরকে আক্রমণ করল এবং কিছু বড় বড় নৌ-জাহাজকে ধ্বংস করল। এই বিমান-যুদ্ধে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর পরাজয় হল। এই আক্রমণের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাপানী পদাতিকবাহিনী সিঙ্গাপুরের জেলাগুলিকে ভেদ করে সিঙ্গাপুর শহরকে ঘিরে ফেলল। ঐদিন শহরের ইংরেজ সাহেব-মেমসাহেবরা তাদের ক্লাবে আনন্দ-উৎসব এবং নৃত্য করছিলেন। জাপানী সেনাবাহিনী সিঙ্গাপুর শহর আক্রমণ করবে, এ তারা কল্পনা করেননি। তাই জাপানী সেনাদের আক্রমণে স্থানীয় বাসিন্দারা হকচকিয়ে গেল। অল্পযুদ্ধের পরেই সিঙ্গাপুর শহরের পতন হল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভারতীয় সেনা।

যুদ্ধের পরে ফুজিয়ারা ঠিক করলেন যে, তিনি বন্দী ভারতীয় সেনাদের একত্র করে এক বক্তৃতা দেবেন। তার এই বক্তৃতার সারাংশ ছিল :

জাপান ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে এশিয়ান নাগরিকদের মুক্ত করবে। দুই, জাপান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয়দের সাহায্য করবে। তিন, সিঙ্গাপুর পতনের পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও তীব্র জোরদার করা সহজ কাজ হবে। চার, জাপান ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্ট লীগ এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করবে। পাঁচ, জাপানী সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবাইকে সমান এক নজরে দেখবে এবং তাদের বন্ধু হিসাবে গণ্য করবে।

আরও ঠিক হল, সিঙ্গাপুরে যে-সব ভারতীয় সেনারা আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে যারা আই-এন-এতে যোগ দেবেন, তারা সবাই মোহন সিং'এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সেনা সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে এসে জড়ো হল। দুপুর দুটোর পর কর্নেল হান্ট মাইক্রোফোনে জাপানীদের কাছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ করবার কথা ঘোষণা করলেন। কর্নেল সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজ থেকে আপনারা সবাই জাপানী সেনাপতিদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করবেন। এই এক লাইনের ছোট ঘোষণার মধ্যে দিয়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার ভারতীয় সেনার জীবনযাত্রার এবং আনুগত্যের পরিবর্তন হল। ইংরেজ কর্তা ভারতীয়দের জাপানীদের হাতে তুলে দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করলেন না। এবং এরপর ফুজিয়ারা জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করলেন।

এই আত্মসমর্পণ করার পর প্রীতম সিং এবং মোহন সিং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ও ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্ট

-লীগের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করলেন। পরে বন্দী ভারতীয় সেনাদের তত্ত্বাবধানের ভার এন-এস-গিলকে দে'য়া হল।

অনেক ভারতীয় সেনা আই-এন-এতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবার কেউ কেউ এই বাহিনীতে যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ক্যাপ্টেন শাহ্‌নওয়াজ খান লাহোরের খুব উচ্চপদস্থ পরিবারের ছেলে ছিলেন। দীর্ঘকাল তার পরিবার ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি মোহন সিং'কে খুব অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতেন।

প্রথমে শাহ নওয়াজ খান আই-এন-এতে যোগ দিতে চাননি। পরে দিয়েছিলেন।

যারা আই-এন-এতে যোগ দিলেন না তাদের সাধারণ বন্দী সেনা হিসাবে গণ্য করা হল।

কিছু দিনের মধ্যে সিঙ্গাপুরে অসুখ-রোগ বৃদ্ধি পেল। শহরে রুগীদের চিকিৎসা করবার ভার দে'য়া হল মেজর জেনারেল এ. সি চ্যাটার্জি এবং কর্নেল ডি. এস. রাজুকে। পরে সিঙ্গাপুরের আরও দুইজন খ্যাতনামা আইনজীবী সি. গহো এবং কে. পি. কে. মেননের সঙ্গে ফুজিয়ারা'র পরিচয় হল। তারা ফুজিযারাকে আশ্বাস দিলেন যে, ভারতীয়দের দেখাশো'না তারা করবেন। সিঙ্গাপুরে আরও কযেকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল।

এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব মালেশিয়া, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কর্মা'স, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদ। প্রীতম সিং'এর পরামর্শে সিঙ্গাপুরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডপেনডেন্ট লীগের একটি শাখা খোলা হল এবং এই শাখার সভাপতি হলেন এ. সি. গহো।

সিঙ্গাপুর প তনের পর ফুজিয়ারাকে বলা হল যে, ১'ই মার্চ শিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয নাগরিকদের নিয়ে টোকিওতে এক সভা করা হবে। এই সভায় নেতৃত্ব করবেন রাসবিহারী বোস।

ঠিক হল মালেশিয়া এবং থাইল্যাণ্ড থেকে ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল র্মির দশজন সদস্যকে নিয়ে ফুজিয়ারা টোকিওতে যাবেন। ফুজিয়ারা এই আসন্ন সভা নিয়ে প্রীতম সিং'এর এবং মোহন সিং'এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারা ঠিক করলেন যে, ছয়জন ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং তিনজন আই-এন-এ সদস্যকে তারা নির্বাচিত করবেন। এ-ছাড়া ফুজিয়ারার অনুরোধে ব্যাংককের আরও দুইটি সংস্থা, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ (ব্যাংকক) এবং থাই-ভারত কালচারাল শাখার দুইজন প্রতিনিধিকে এই দলের মধ্যে নে'য়া হল।

টোকিওর এই আসন্ন সভা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে সিঙ্গাপুরে একটি সভার আয়োজন করা হল। ওরা মার্চ কুড়িজন ভারতীয়কে নিয়ে এই সভা হল। পেনাংগের সমৃদ্ধশালী এড্‌ভোকেট এন. রাঘবন এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন।

সভার একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের নেতৃত্ব করবার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে এই অঞ্চলে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হবে।

টোকিওর সভায় যোগ দেবার জন্যে দুইটি ভারতীয় সদস্য দল এল। এক দলের মধ্যে ছিলেন ফুজিয়ারা, লেঃ কর্নেল এন. এস. গীল, এন. রাঘবন, গহো, মোহন সিং এবং কে. পি. কে. মেনন। দ্বিতীয় দলে ছিলেন প্রীতম সিং, স্বামী সত্যানন্দ পুরী 'বং ক্যাপ্টেন আক্রাম খান।

ফুজিয়ারার প্লেনটি ১১ই মার্চ টোকিওর পানে রওনা দিল। হায়নান দ্বীপে দুদিন কাটাবার পর প্লেনটি নিরাপদে টোকিওতে গিয়ে পৌছুল। অন্য প্লেনটি অর্থাৎ যে প্লেনে প্রীতম সিং'এর যাবার কথা ছিল, সেই প্লেনটির ১৯শে মার্চ টোকিওতে পৌছুবার কথা ছিল। কিন্তু 'হনসু' দ্বীপের কাছে এসে দেখা গেল আকাশের অবস্থা গুরুতর। অনেকে আশা করেছিল এই ঝড়ে প্লেন আর এগোবে না। কিন্তু পরে জানা গেল, প্লেন সাংঘাই থেকে রওনা দিয়েছে। অনুসন্ধানে শোনা গেল যে, ঐ প্লেনে এক জাপানী জেনারেল ছি'লন এবং তিনি আকাশের এই ঝড়ের পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কে'থাও একমূহূর্ত দেরী করতে চাননি। এই ঝড়ে প্রীতম সিং'এর প্লেন ভেংে দু'টুকরো হল। প্রীতম সিং এবং আক্রাম খান মারা গেলেন।

আক্রাম খানের কাছে আই-এন-এর জন্মের কিছু প্রয়োজনীয় কাগজ ছিল। আগুনে সেইসব কাগজ পুড়ে গেল।

যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে কোন সদ্ভাব কিংবা হৃদ্যতা ছিল না। একের অন্যের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই আসন্ন সভার সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের সভাপতি রাসবিহারী বোসকে খুব সুনজরে দেখতে পারতেন না। তাদের বক্তব্য ছিল, রাসবিহারী বোস ছিলেন জাপানীদের হাতের 'কলের পুতুল' এবং তিনি টোকিওর কর্তাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করে' থাকেন। অতএব কিছু কিছু সদস্য দাবী করলেন যে, টোকিওর এই সভায় কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নে'য়া উচিত হবে না। রেঙ্গুনের পরবর্তী সভায় সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

জাপানের অধিকাংশ ভারতীয়রা ছিলেন হয় ছাত্র কিংবা সওদাগর। এদের

বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইণ্ডিয়ান ক্লাব, ইণ্ডিয়া সোস্তাল এসোসিয়েশন, কোবেতে ভারতমন্দির এবং ইয়োকাহামা শহরে একটি ইণ্ডিয়া ক্লাব ছিল। এ-ছাড়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্যে 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স'ও ছিল।

জাপানে যে-সব ভারতীয়রা থাকতেন তাদের মধ্যে রাসবিহারী বোস, এ. এম. নায়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া দেবনাথ দাস ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে টোকিওতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

টোকিও'র 'সানো হোটেলের' এই সম্মেলনে জাপানের কিছু কিছু ভারতীয় অংশগ্রহণ করেনি। এর মধ্যে এম. সহায়ের নাম করা যেতে পারে।

সহায় ১৯২৩ সালে ডাক্তারী পড়বার জন্যে আমেরিকা অভিমুখে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পাশপোর্টের কিছু গোলযোগ থাকার দরুন তাকে জাপানেই থাকতে হয়েছিল। ১৯২৯ সালে তিনি জাপানে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা স্থাপন করেছিলেন। এখান থেকে তিনি 'ভয়েস অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে একটি হোস্টেলও খুলেছিলেন।

১৯৪১ সাল অবধি সহায়'এর আশা ছিল, জাপান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী কিছু কাজ করবেন। কিন্তু পরে তিনি নিরাশ হলেন, কারণ জাপান সরকার এই বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখালেন না।

পরে তিনি রাসবিহারী বোস এবং জাপানী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তিনি বহুবার রাসবিহারী বোসকে জাপান সরকারের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রাসবিহারী বোস সহায়ের অনুরোধে কান দেননি।

টোকিও'র এই সভায় আর একজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও অনুপস্থিত ছিলেন।

বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত থেকে পালিয়ে যান। ১৯১৮ সালে তিনি কাবুলে সময়কালীন এক ভারত সরকার গঠন করেন। পরে ১৯৩৪ সালে তিনি জাপানে এসে পৌছন। ১৯৩৪ সালে তিনি জাপান 'ওয়ার্ল্ড' ফেডারেশন সেন্টার' স্থাপন করেন। জাপানে থাকাকালীন তিনি রাসবিহারী বোসের সঙ্গে প্রায়ই দেশের রাজনীতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু লড়াই শুরু হবার পর তিনি এক স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেন। এ কারণে তাকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়নি।'

এবার রাসবিহারী বোস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ তিনি ছিলেন সানো হোটেলের সম্মেলনের সভাপতি।

দেশে থাকাকালীন রাসবিহারী বোস গান্ধীজির 'অহিংস নীতি' এবং নেহরুর কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধী ছিলেন। ১৯১২ সালে ভাইসরয় লর্ড হারডিন্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং রাসবিহারী বোসকে এই বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তিনি দেশে কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি পি. এস. ঠাকুর ছদ্মনাম ব্যবহার করে দেশ থেকে পালিয়ে জাপান চলে যান। ১৯০৫ সালে টোকিও ছিল বিপ্লবীদের মক্কা। রাসবিহারী বোস এখানে এসে চীনের সুন ইয়াৎ সেন এবং লাজপৎ রায়ের দেখা পেলেন। জাপানে ব্রিটিশ সরকার তাকে জাপানী পুলিশের সাহায্য নিয়ে গ্রেপ্তার করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। এই সময়ে সুন ইয়াৎ সেনের সাহায্যে তাঁর জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির কর্তা তয়োমা মিতসুরুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। তয়োমা মিতসুরু রাসবিহারী বোসকে আশ্রয় দিলেন। তাঁর জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তর এবং পুলিশের উপর বিশেষ প্রভাব ছিল। জাপানী পুলিশ রাসবিহারী বোসের গতিবিধির খবরাখবর রাখত বটে কিন্তু তয়োমা মিতসুরুর নির্দেশে তাকে গ্রেপ্তার করেনি।

এবার টোকিও'র একটি বড় রেস্তোরাঁর মালিক সোমা আইজো রাসবিহারী বোসকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। সোমা আইজো দৈনিক সংবাদপত্রে রাসবিহারী বোসের টোকিওতে উপস্থিতির কথা জানতে পারেন এবং নিজে যেচে তয়োমা মিতসুরুকে গিয়ে বললেন যে, তিনি রাসবিহারী বোসকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেবেন। তয়োমা সোমা আইজোর প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন। তয়োমা এবং সোমা রাসবিহারী বোসকে জাপানে স্থায়ী বাসিন্দা করবার জন্যে ঠিক করলেন, সোমার মেয়ে তসিকোর সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। এই সময়ে কোন জাপানী মেয়ের সঙ্গে বিদেশীর বিয়ের প্রথা একেবারে বিরল ছিল। অতএব রাসবিহারী বোসের সঙ্গে তসিকোর বিয়ের ব্যাপারটিতে এক বিশেষ নতুনত্ব ছিল। বিয়ের পর রাসবিহারী বোসের দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করল। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে রাসবিহারী বোস জাপানী নাগরিক বলে গণ্য হলেন।

১৯২৬ সালে রাসবিহারী বোস বিভিন্ন ভারতীয় এবং এশিয়ার বিপ্লবীদের একত্র করবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ বছর তিনি নাগাসাকিতে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে এক সম্মেলন করেন। পরে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল পরিচালনা করতে শুরু করলেন। তিনি 'ভয়েস অব এশিয়া' নামে

একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের' জাপান শাখার পুনর্গঠন করা হল এবং জাপানে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের জাপান সরকার এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯৪১ সালে লড়াই শুরু হবার পর রাসবিহারী বোস বুঝতে পারলেন, জাপান সরকার এবং সামরিক বাহিনীর সাহায্য ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। তিনি আবার তয়োমার সাহায্য নিয়ে জাপান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। রাসবিহারী বোস সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। এরপর ১৯৪১ সালে চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ, জেনারেল ওকামোটো এবং লেঃ কর্নেল কোদমাতসুকে ভারত সম্বন্ধে একটি নকশা তৈরি করতে বলা হল। এই সময়ে জাপানের সামরিক মহলে ভারত সম্বন্ধে কারুর বিশেষ গভীর জ্ঞান ছিল না। সামরিক বাহিনী এই ব্যাপারে রাসবিহারী বোসের সাহায্য চাইল। পরে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ ফুজিয়ারাকে থাইল্যাণ্ড পাঠাল। ফুজিয়ারার যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ঐ এলাকার ভারতীয়দের একজোট করা এবং তাদের নিয়ে এক সংগ্রাম বাহিনী গঠন করা।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে মেজর ওজিাককে ফুজিয়ারার বাহিনী পরিদর্শন এবং ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি তদন্ত করবার জন্যে পাঠান হল। মেজর ওজিাক ব্যাংককে কর্নেল তামুরা এবং পরে ফুজিয়ারার সঙ্গে দেখা করে 'ইণ্ডিয়া প্রজেক্ট' পরিকল্পনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। ওজিকি টোকিওতে ফিরে এসে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে শুরু করলেন।

রাসবিহারী বোস জাপানী সামরিক বাহিনীকে অনুরোধ করেছিলেন যে, বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে এক স্বাধীন সেনাবাহিনী গঠন করা হ'ক। জাপানী সামরিক বাহিনী রাসবিহারী বোসের এই প্রস্তাবকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করল। রাসবিহারী বোস আর এক প্রস্তাবে বলেছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে টোকিওতে এক সম্মেলন করা হ'ক। টোকিও'র 'সানোর' হোটেলে ভারতীয়দের সম্মেলনের এই হল পটভূমিকা।

* * *

সানোর হোটেলের এই সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এক প্রস্তাবে স্বীকার করে নেওয়া হল যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। রাসবিহারী বোস হবেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ঠিক হল

ছ'মাস পরে ব্যাংককে লীগের আর এক সভা হবে। ব্যাংককের সভায় ভারতের স্বাধীনতার উপর নীতি গ্রহণ করা হবে। আরও ঠিক করা হল, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এক সঠিক নীতি গ্রহণ করবে। এই আর্মির কম্যাণ্ডের দায়িত্ব এক ভারতীয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। আই-এন-এ'র স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে জাপানের সামরিক বাহিনী সাহায্য করবেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর দেশের সংবিধান রচনা করবে ভারতীয় জনগণ। এই সম্মেলনের পর কিছু ভারতীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টজোর সঙ্গে দেখা করলেন। টজো ভারতীয় প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান সাহায্য করবে।

১৫ই জুন ব্যাংককে প্রায় একশো ভারতীয়দের নিয়ে আর একটি সম্মেলন করা হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে মালেশিয়া, বর্মা, থাইল্যাণ্ড, জাভা, সুমাত্রা, বোরনিও, ফিলিপিন, জাপান এবং নানকিং থেকে বহু সংখ্যক ভারতীয় এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন।

ব্যাংককের সম্মেলনে দুটি মত বেশ স্পষ্ট হল। রাসবিহারী বোস এবং তাঁর দল জাপান সরকারের পক্ষে ছিলেন; আর একদল জাপান সরকারের বিরোধী ছিলেন।

এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে জার্মানী থেকে সুভাষ বোস এক বাণী পাঠিয়েছিলেন।

ব্যাংকক সম্মেলনে চৌত্রিশটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। এইসব প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য ছিল, কী করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাস্তব এবং জোরদার করা যায়। এই সম্মেলনে ঠিক্ করা হল যে, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেণ্ট লীগের সৈন্য-বাহিনী হবে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'। এই সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ হবেন মোহন সিং। যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্যে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেণ্ট লীগের একটি কাউন্সিল গঠন করা হল। এই কাউন্সিলের সভাপতি হলেন রাসবিহারী বোস। বাকী চারজন সদস্য হলেন মোহন সিং, কমাণ্ডার ইন চীফ, কে. পি. কে. মেনন-পাব্লিসিটি এবং প্রোপাগাণ্ডা, এন. রাঘবন, অর্গানিজেশন, এবং লেঃ কর্নেল জি. কে. জিলানী, মিলিটারী ট্রেনিং। এরপর জাপানী সামরিক বাহিনী তাদের এই অঞ্চলের ইনটেলীজেন্স এজেন্সী অর্থাৎ কিকানকে আরও কর্মঠ এবং উন্নত করবার চেষ্টা করল। এবার ফুজিয়ারা কিকানের (এজেন্সী, এরা আসলে ছিলেন ইন্‌টেলীজেন্স স্পাই প্রতিষ্ঠান) পরিবর্তে আরও একটি বড় কিকানকে এই এলাকায় নিয়োগ করা হল। এই নতুন কিকানের (এজেন্সী) নাম হল 'ইয়াকুয়ো কিকান'। এই কিকানের প্রধানের নাম ছিল: কর্নেল ইয়াকুয়ো।

কর্নেল ইয়াকুরো শুধু সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে নয়, রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়েও বিচার করতেন এবং জাপানী সামরিক বাহিনীর কী ধরনের নীতি গ্রহণ করা উচিত তার পরামর্শ দিতেন। ২১শে মে ইয়াকুরো সিঙ্গাপুরে ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগকে বলল, জাপান সরকার তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

অবিশ্যি ইয়াকুরো রাসবিহারী বোসের নেতৃত্ব নিয়ে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল সেই ঝগড়া-বিবাদ তিনি মেটাতে পারলেন না।

এরপর ইয়াকুরো ব্যাংককের গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে টোকিও'তে সামরিক কর্তাদের কাছে পাঠালেন। এই প্রস্তাবগুলি টোকিও'র সামরিক বাহিনীর কর্তাদের বিশেষ বেকায়দায় ফেলল। প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টজো যদিও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেশ সহানুভূতির চোখে দেখতেন, তবু প্রস্তাবগুলিকে স্বীকার করে নে'য়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইয়াকুরো তার টেলিগ্রামে টোকিও'র কর্তাদের বলেছিলেন, আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সহানুভূতির চোখে দেখতে পারি এবং ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারি বটে, তবে ছোট ছোট প্রস্তাব নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করবার কোন প্রয়োজন নেই। এ-ছাড়া জেনারেল টজোর সঙ্গে ইয়াকুরোর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তিনি ইয়াকুরোর প্রস্তাবে বেশি কান দিলেন না। টজোরও ভারত সম্বন্ধে খুবই সীমিত জ্ঞান ছিল, যদিও পরবর্তীকালে টজো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টায় বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

এবার ইয়াকুরো কিকান ভারতীয় সেনাবাহিনীদের কী ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলা দরকার।

এই কিকানের শিক্ষকেরা ভারতীয় স্বরাজ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। পেনাঙ্গে এই স্বরাজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন এন. রাঘবন, পেনাঙ্গ শহরের এক সমৃদ্ধশালী এড্‌ভোকেট। এই ইনস্টিটিউটে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ দে'য়া হত। এছাড়া এসপিওনেজ, প্রোপাগাণ্ডা, কাউন্টার ইন্‌টেলিজেন্স ইত্যাদি কাজও শেখান হত। কী করে চিঠি খুলতে হয়, টেলিফোনের লাইন ট্যাপ করতে হয়, অদৃশ্য কালীর ব্যবহার, ডকুমেন্ট জাল করা, কোড-ডিকোডের কাজ, গরিলা যুদ্ধের কাজ, বোমা-বিস্ফোরণ তৈরী করবার কাজ ছাত্রদের শেখান হত। প্রোপাগাণ্ডার কাজের মধ্যে ছিল, রেডিও ব্রডকাস্টিং, ছাপাখানা এবং ফিল্ম ডেভেলপ করা ইত্যাদি। ফিল্ড ট্রেনিং-এর কাজ ছিল, কী করে শত্রুর ব্যূহে ঢুকে খবর সংগ্রহ করা যায়।

ইয়াকুরো কিকান পেনাঙ্গ শহরের আর একটি দলের সঙ্গে যোগাযোগ

স্থাপন করেছিল। এই দলের নাম ছিল : ওসমান গ্রুপ। দলের নেতা ওসমান নিজে মেক্সিকোর বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরে পেনাঙে এসে শিখদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন।

পেনাঙ শহরে লেঃ কর্নেল জিলানীর নেতৃত্বে আর একটি দল বিশেষ তৎপর ছিল। জিলানীর দলের অধিকাংশ সদস্যই ছিল মুসলমান। অনেকে সন্দেহ করতেন, জিলানী আসলে ছিলেন ইংরেজদের গুপ্তচর। পরে জানা গিয়েছিল যে, জিলানী স্পাই-এর কাজের নাম করে তার দলের সদস্যদের ভারতে পাঠাতেন এবং ভারতে পৌছে জিলানীর সদস্যরা ইংরেজ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করত। এই অভিযোগ প্রমাণ হবার পর ওসমান গ্রুপের জাপানী শিক্ষক আত্মহত্যা করেছিল।

স্পাই-এর কাজ করবার জন্যে ইয়াকুরো কিকান কিছু গুর্খা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিন্তু গুর্খারা ছিল ইংরেজ-ভক্ত। অতএব গুর্খা বাহিনীর কাছ থেকে খুব বেশী সাড়া পাওয়া যায়নি। আর একদল ভারতীয়কে সাবমেরিনে করে শ্রীলঙ্কায় পাঠান হয়েছিল। ভারতীয়দের ওয়্যারলেসের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। প্যারাসুট ব্যবহার করে কী করে শত্রুর ব্যূহের পেছনে নামতে হয় এবং খবর সংগ্রহ করতে হয় তার পদ্ধতি কিছু ছাত্রদের শেখান হয়েছিল। ছাত্ররা এই কাজে ট্রেনিং নেবার পর বিহার এবং উড়িষ্যায় এসে সংবাদ সংগ্রহ করে ইয়াকুরো কিকানের কাছে পাঠিয়েছিল।

কিছুদিন পরে ইয়াকুরো কিকানের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর রাঘবনের মনোমালিন্য হয়। কারণ, যে-সব ছাত্রদের স্পাই-এর কাজ করতে বিহার-উড়িষ্যায় পাঠান হয়েছিল তাদের রাঘবনের বিনা অনুমতিতেই পাঠান হয়েছিল। এই খবর পাবার পর রাঘবন স্বরাজ ইনস্টিটিউট থেকে ইস্তফা দেন।

পরে ১৯৪৪-৪৫ সালে ইয়াকুরো কিকান কিছু ভারতীয়কে এই দেশে গুপ্তচরের কাজ করতে পাঠিয়েছিল, কিন্তু তারা এই কাজে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। এইসব স্পাইরা ভারতে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

টোকিও'র কর্তারা ব্যাংকক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। না দেবার একটি কিছু কারণ ছিল। কারণ, ইতিমধ্যে দূর-প্রাচ্যের কয়েকটি যুদ্ধে জাপানী সামরিক বাহিনীর পরাজয় হয়েছিল। অবশ্যি জাপান এই পরাজয়কে 'সাময়িক' বলে মনে করল। তবে এই সময়ে জাপানী সামরিক বাহিনীর ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির কোন দাবীর প্রতি নজর দেবার সময় ছিল না।

টোকিও'র কাছ থেকে কোন জবাব না পাবার পর লীগের কাউন্সিল ইয়াকুরোর শরণাপন্ন হল। ইয়াকুরো লীগের সদস্যদের বললেন, টোকিও তাদের প্রস্তাবগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে এবং শিগ্‌গিরই হয়ত জবাব পাওয়া যাবে। লীগ এই সংক্ষিপ্ত জবাবে খুশি হল না। এবার ইয়াকুরো নিজে এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে জাপানে গেলেন। ইয়াকুরোর জাপান যাত্রা খুব ফলপ্রসূ হল না। টজো এক সাধারণ মামুলি জবাব দিলেন।

ইতিমধ্যে খবর এল যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে এবং দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর রচিত 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এই প্রস্তাবটির খবরও লীগের সদস্যদের কানে এসে পৌছুল। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এবং ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের সদস্যরা এবার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান করবার জন্যে ব্যস্ত হল। এই সময়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সালে আই-এন-এর তিনটি নতুন ব্রিগেড গঠন করা হল। এই তিনটি ব্রিগেডের নাম হল গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড এবং আজাদ ব্রিগেড। এ ছাড়া ইনটেলিজেন্স বাহিনীর মধ্যে স্যাবোটাজ, প্রোপাগাণ্ডা এবং মেডিক্যাল বাহিনী গঠন করা হল।

বহু ভারতীয় সেনা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগ দেয়নি। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার। এই সময়ে এরা ছিলেন সাধারণ বন্দী।

ফুজিয়ারা যখন 'কিকানের' (এজেন্সীর) কর্তা ছিলেন তখন তিনি মোহন সিং-এর সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ রাখতেন। কিন্তু ইয়াকুরো রাসবিহারী বোসের মাধ্যমে মোহন সিং-এর সঙ্গে এই যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন এবং রাসবিহারী বোসের সঙ্গেই রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে জাপানের প্রচার কার্যের জন্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

বিভিন্ন কারণবশত এবং নিজেদের দলের মধ্যে অন্তর্কলহের জন্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বর্মা প্রান্তে এগিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু একদিন লীগের কাউন্সিলের সদস্যরা খবর পেলেন যে, মোহন সিং কাউন্সিলের বিনানুমতিতে আই-এন-এর কিছু সেনা বর্মা প্রান্তে পাঠিয়েছে। এই সময়ে রেঙ্গুনে ভারতীয় সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে জাপানী সামরিক বাহিনী 'মিনামি কিকান' নামে আর একটি 'এজেন্সী' গঠন করেছিল। রেঙ্গুনে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের একটি শাখা অফিস ছিল। এই শাখা বর্মার বিভিন্ন এলাকায় লীগের প্রচার কাজ করছিল। মোহন সিং তার বাহিনীর পঞ্চাশ জন

সৈন্যকে রামস্বরূপ নামে এক সদস্যর নেতৃত্বে রেঙ্গুনে অবস্থিত ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে যোগাযোগ করতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রামস্বরূপ এই কাজ করবার অজুহাতে বর্মা সীমান্ত পার হয়ে ভারত সীমান্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। রামস্বরূপ ভারত থেকে আর ফিরে এলেন না। মোহন সিং রামস্বরূপকে কাউন্সিলের বিনানুমতিতে ভারতে পাঠিয়েছিলেন।

এ. সি. গহো এবং এন. রাঘবন মোহন সিং-এর বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ করলেন। অভিযোগ করা হল যে, মোহন সিং কাউন্সিলের বিনানুমতিতে চারজন সদস্যকে বর্মাতে কিছু নির্মাণ কাজের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। গহো-রাঘবন আপত্তি করলেন এবং বললেন, তারা এই কাজের জন্যে অনুপযুক্ত। কারণ এরা হলেন ইনটেলিজেন্সের লোক, কোনপ্রকার ঘর-বাড়ি তৈরী করা এদের কাজ নয়। সন্দেহ করা হল, নিশ্চয় এদের অন্য কোন কাজের জন্যে পাঠান হয়েছে। আর একটি ঘটনা রাঘবনকে বিশেষ বিরক্ত করল। মোহন সিং কৌন্সিলের বিনানুমতিতে প্রায় আটশো আই-এন-এ সৈন্যকে বর্মায় পাঠিয়েছিলেন। রাঘবন কারণ জানতে চাইলেন। এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আই-এন-এ এবং ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেনডেন্ট লীগের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। এন. এস. গীল ছিলেন স্যাণ্ডহার্স্টের শিক্ষিত একজন ইনটেলিজেন্স অফিসার। গীলকে বলা হয়েছিল, কিছু আই-এন-এ সৈন্যকে উপযুক্ত স্পাইর কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারতে পাঠাতে হবে। অদূর ভবিষ্যৎ-এ জাপান ভারত আক্রমণ করবার পর এইসব গুপ্তচরদের খবর সংগ্রহ করবার কাজে ব্যবহার করা হবে। গীল এই কাজের জন্যে তার বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। একটি দলকে মেজর মহাবীর সিং ধীলনের নেতৃত্বে ভারতে পাঠান হল। মহাবীর সিংকে বলা হল ভারতে পৌঁছে তার প্রধান কাজ হবে, আই-এন-এ সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের এবং ভারতীয় জনগণের মতামত যাচাই করতে হবে। সেই খবর আই-এন-এর কাছে পাঠাতে হবে। ধীলন তার দলবল নিয়ে ট্রেনে করে উত্তর বর্মার পানে রওয়ানা দিলেন। কিছুদিন পরে গীল সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে এক রিপোর্টে বললেন যে, তিনি নিজের চোখে ধীলনকে ভারত-বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখেছেন। কিন্তু গীল সন্দেহ করেছিলেন এবং তার সেই অনুমান ভুল ছিল না যে, ধীলন দেশে পৌঁছে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

গীল আর একটি দলকে জাহাজে করে আকিয়াবে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু জাহাজ আকিয়াবে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সেই বাহিনীকে গ্রেপ্তার করল। কারণ পরে জানা গেল, মহাবীর সিং ধীলন এই দ্বিতীয় বাহিনীর যাত্রার

খবর ব্রিটিশ পুলিশকে দিয়েছিল। এই দুইটি ঘটনার পর জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ গীলকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেন। ইয়াকুরো গীলকে টোকিওতে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু গীল এর কারণ জানবার চেষ্টা করলেন। কিছুদিন পরে জাপানী সামরিক বাহিনী গীলকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তারের সময় গীলের কাছে ভারতে অবস্থিত কিছু লোকের কাছে লেখা চিঠি পাওয়া গেল। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করল যে, গীল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে এইসব চিঠি লিখেছেন। গীল এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, এ-সব তার আত্মীয়স্বজনের কাছে লেখা চিঠি।

* * * *

আই-এন-এ এবং ইয়াকুরো কিকানের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ প্রতিদিনই তীব্র হতে লাগল। তাদের এই ঝগড়া-বিবাদের কাহিনী ফুজিয়ারার কানে এসে পৌঁছুল। যদিও এই কলহের খবর ফুজিয়ারাকে বিশেষ দুঃখিত করেছিল তবু তার এই ব্যাপারে করবার কিছুই ছিল না।

এদিকে ঘটনার পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, মোহন সিং সন্দেহ করতে শুরু করলেন যে, জাপানীদের আই-এন-এ'কে বড় এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী হিসাবে গঠন করবার কোন ইচ্ছে নেই। আসলে জাপানীরা এই সৈন্যবাহিনীকে শুধু তাদের কাজের জন্যে ব্যবহার করছেন এবং আই-এন-এ হল তাদের কাছে এক 'পুতুল' সৈন্যবাহিনী। কিছুদিন পরে বর্মাতে যে-সব ভারতীয়রা তাদের সম্পত্তি ফেলে গিয়েছিল, এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে লীগের কৌন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে এবং ইয়াকুরো কিকানের ঝগড়া লাগল। 'কিকানের' এক প্রতিনিধি কিছু ভারতীয় সম্পত্তি লীগের কৌন্সিলের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কৌন্সিলের সদস্যরা এই সম্পত্তি গ্রহণ করবার আগে সম্পত্তি গ্রহণের চুক্তিপত্রে কিছু সংশোধনের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু 'কিকানের' কর্তারা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। একদিন জাপানী সামরিক বাহিনীর এক বড়কর্তা ইন্ডিপেনডেন্ট লীগের সদস্যদের বেশ পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে, "ব্যাংকক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা বা না করা জাপান সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।....জাপান সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার এবং সফল করবার কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত... তবে সদস্যদের মনে রাখা উচিত, জাপান সরকার কোনদিনই ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্ট লীগকে স্বাধীন সরকার হিসাবে গ্রহণ করবে না। অতএব কৌন্সিলের দাবী মেনে নে'য়া যায় না এবং এই দাবীকে স্বীকার করে নে'য়া আমাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়।" লীগের এক সদস্য এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করবার চেষ্টা

করলেন। তিনি 'কিকান' এবং জাপান সরকারের মনোভাবকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। নতুবা জাপান সরকারের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সবার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু কিতাবে বললেন যে, ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই-এন-এর উচিত কাজ হবে জাপান সরকারের অধীনে কাজ করা।

লীগের অনেক সদস্য মনে করলেন যে, কিতাবের এই উক্তি অপমানজনক। এর পর 'কিকানের' আর এক সদস্য ইটানি মন্তব্য করলেন যে, বর্মার যে-সব সম্পত্তির মালিক অনুপস্থিত সেই সম্পত্তি হল শত্রুর সম্পত্তি, এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এই সম্পত্তির মালিক হল জাপান সরকার....।

এই দুইটি ঘটনার পর মোহন সিং এবং লীগের সদস্যরা উপলব্ধি করলেন যে, 'কিকান' ক্রমে ক্রমে ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই-এন-একে তাদের হাতের মুঠোয় আনবার চেষ্টা করছে এবং তাদের স্বাধীন অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। কিছুদিন পরে লীগের সচিব কে. পি. কে. মেনন সিঙ্গাপুর থেকে অভিযোগ করলেন যে, জাপানী সেন্সর কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিটি খবর সেন্সর করছে এবং তাদের প্রচার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রচারের কাজকর্মে সিঙ্গাপুরের ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের কোন স্বাধীনতা নেই। সব কাজই 'কিকানের' নির্দেশ মেনে করতে হয়। 'কিকানের' কর্মচারীরা হয় সংবাদ নতুন করে লেখে, নতুবা রেডিওতে প্রচার করতে দেয় না। মোহন সিং আরও খবর পেলেন যে, 'কিকান' লীগের লেখা প্রচারপত্রগুলি নতুন করে লিখে বিলি করবার চেষ্টা করছে। মোহন সিং জাপানীদের আসল উদ্দেশ্য জানবার চেষ্টা করলেন। এর পর তার কাছে খবর এল, 'কিকান' লীগের এক্তিয়ারের বাইরে কিছু সদস্যদের স্পাই-এর কাজে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং পরে গুপ্তচর হিসাবে ভারতে পাঠাবার চেষ্টা করছে। মোহন সিং এই নীতির বিরোধিতা করলেন। মোহন সিং প্রস্তাব করলেন, তিনি হংকং সাংঘাই থেকে কিছু ভারতীয়কে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসতে চান এবং তাদের গুপ্তচরের কাজে প্রশিক্ষণ দিতে চান। কিন্তু ইয়াকুরো এই ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখালেন না। এইরকম ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে প্রতিদিনই 'কিকান' এবং ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই-এন-এর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হত।

এবার ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের কার্যকরী সমিতি ইয়াকুরোর কাছে এক চিঠি লিখল এবং চিঠির এক নকল টোকিওতে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করল। প্রথমত, কার্যকরী সমিতি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করল যে ব্যাংকক সম্মেলনের প্রস্তাব সম্বন্ধে টোকিও-র কী নীতি? দ্বিতীয়ত, তারা দাবী করল যে

লীগের কার্যকরী সমিতিকে এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ভারতের স্বাধীনতার সার্বভৌমতাকেও স্বীকার করে নিতে হবে।

কিন্তু রাসবিহারী বোস লীগের কার্যকরী সমিতির এই প্রস্তাবগুলিকে ইয়াকুরোর কাছে পাঠাতে অস্বীকার করলেন। এবার কৌন্সিলের সদস্যদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হল যে, রাসবিহারী বোস জাপান সরকারের হাতে কলের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩০শে নভেম্বর ইয়াকুরো এবং কৌন্সিলের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে এক বৈঠক হল। ইয়াকুরোর সঙ্গে তার 'কিকান এজেন্সীর' আরও কিছু লোক ছিল। কার্যকরী সমিতির এক কথার জবাবে ইয়াকুরো জানালেন যে, তিনি লীগের চিঠি টোকিওতে পাঠাবেন না। তিনি সদস্যদের বললেন, কিকানের সঙ্গে কার্যকরী সমিতির যে মতভেদ আছে, সেই সমস্যার সমাধান মীমাংসা তিনি ঘটনাস্থলেই করবেন। কিন্তু কার্যকরী সমিতি ইয়াকুরোর এই জবাবে সন্তুষ্ট হল না। এই বৈঠকের পর ইয়াকুরো তার এক বিশেষ প্রতিনিধিকে লীগের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের কাছে মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে পাঠালেন। কিন্তু কোন মীমাংসা হল না। বরং কিকানের সঙ্গে ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সম্পর্ক প্রতিদিনই অবনতি হতে লাগল এবং পরে সম্পর্ক বিশেষ তিক্ত হল। এবার ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এক বৈঠকে ঠিক করল যে, যতদিন টোকিওর কর্তারা লীগের ব্যাংককের প্রস্তাবগুলির উপর তাদের মনোভাব স্পষ্ট করে ব্যক্ত না করে ততোদিন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোন কাজ করবে না।

ইতিমধ্যে 'ইয়াকুরো কিকানের' এক কর্মচারী মেজর ওগোয়া[?] ...গর কার্যকরী সমিতিকে বললেন যে, আই-এন-এ সৈন্যবাহিনীর বর্মার যুদ্ধ রণাঙ্গনে যাত্রার জন্যে সব আয়োজন করা হয়েছে। অতএব আই-এন-এ'র সৈন্যরা এবার বর্মার জন্যে যাত্রা শুরু করতে পারে। মোহন সিং-এর জবাবে বললেন যে, টোকিওর নীতি সুস্পষ্ট না হলে তারা যাত্রা শুরু করবে না। মেজর ওগোয়া এর জবাবে বললেন, যদি আই-এন-এ বর্মার রণাঙ্গনে না যায় তাহলে তারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবার কোন সুযোগ পাবে না।

মোহন সিং তার মত পরিবর্তন করতে চাইলেন না। দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে জাপান সরকারের অভিমত সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিংবা তার সহকর্মীরা আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না।

ইয়াকুরো মোহন সিংকে বললেন: যদি মোহন সিং কিংবা তার সহকর্মীরা 'কিকানের' নির্দেশানুযায়ী কাজ না করেন তাহলে তাদের আবার সাধারণ বন্দী

হিসাবে গণ্য করা হবে। এছাড়া তিনি বললেন, টোকিও'র কর্তাদের কাছ থেকে ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের গৃহীত প্রস্তাবগুলির উপর তাদের অভিমত জানবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, টোকিও সরকার কিছু কিছু প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কয়েকটি প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার কিছু সাংবিধানিক অসুবিধে আছে। এছাড়া ইয়াকুরো নিজেও টোকিও'র কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল জাপান ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করবে এবং জাপান ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। জাপান ভারতের সার্বভৌমতা এবং দেশের অখণ্ডতা স্বীকার করে নেবে। জাপান ভারতের কাছে কোন নতুন দাবী করবে না। ভারতীয়দের সম্পত্তি যুদ্ধের পর নতুন ভারত সরকারের হাতে তুলে দে'য়া হবে। ইয়াকুরো আরও কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলেন এবং প্রস্তাবগুলির মধ্যে বলা হয়েছিল যে, ভারতের জনগণের দাবী এবং চাহিদা অনুযায়ী জাপান সব ধরনের প্রয়োগিক বিদ্যা এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবে এবং সাহায্য করবে। জাপান ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না এবং জাপান ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে যে-সব এলাকা ছিনিয়ে নেবে, সেই অংশগুলি কংগ্রেস কিংবা ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের হাতে তুলে দেবে। জাপান বাইরের কোন শত্রুর আক্রমণে ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবে।

মোহন সিং এর জবাবে জাপানের অধিকৃত মালেশিয়া এবং বর্মা'র প্রশাসনের সমালোচনা করলেন; তিনি বললেন, জাপানের এই ধরনের প্রশাসন নীতি এবং রীতি ভারতীয়রা সহ্য করবে না। এ ছাড়া ইয়াকুরোর প্রস্তাবগুলির এবং ব্যাংককের গৃহিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

ইয়াকুরো এবং মোহন সিং-এর আলোচনা খুব ফলপ্রসূ হল না।

৩রা ডিসেম্বর ফুজিয়ারাকে এই ঝগড়া-বিবাদের জন্যে সালিশী মানা হল। ফুজিয়ারা বললেন, মোহন সিং যদি আই-এন-এর সৈন্যদের বর্মা যুদ্ধ প্রান্তে পাঠাতে অস্বীকার করেন তাহলে তার 'হারাকারি' করা ছাড়া আর কোন পথ নেই ['হারাকারি' হল জাপানী আত্মহত্যার প্রথা]।...

কারণ ফুজিয়ারাকে আই-এন-এ সৈন্যবাহিনীকে বর্মায় পাঠাবার দায়িত্ব দে'য়া হয়েছিল। কিন্তু মোহন সিং নতি স্বীকার করার পাত্র ছিলেন না। তিনি ফুজিয়ারার অনুরোধকে স্বীকার করে নিলেন না।

পরে রাঘবন রাসবিহারী বোসকে এক চিঠিতে আই-এন-এ সৈন্যবাহিনী

গঠন করবার পর যে-সব ভুল করা হয়েছে সেই ভুলের কথা উল্লেখ করলেন। রাঘবন তার চিঠিতে মোহন সিং সম্বন্ধে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

৪ঠা ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেণ্ট লীগের কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হল। এই বৈঠকে মোহন সিং এবং জিলানী কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করলেন। একটি প্রস্তাব ছিল ইয়কুরোকে বলা হবে যে, অবিলম্বে ব্যাংকক সম্মেলনের প্রস্তাব টোকিওর কাছে ব্যাখ্যার জন্য পাঠান হ'ক। টোকিওর জবাব পয়লা জানুয়ারীর মধ্যে চাই এবং যতদিন না জবাব পাওয়া যায় ততোদিন আই-এন-এর সৈন্যবাহিনীকে অন্য কোথাও পাঠান হবে না।

রাসবিহারী বোস, মোহন সিং এবং জিলানীর এই প্রস্তাবে বিচলিত হলেন। তিনি ইয়াকুরোর অভিমতকে বাজিয়ে দেখবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইয়াকুরো এই ব্যাপার নিয়ে কী করতে চান?

৫ই ডিসেম্বর আবার কৌন্সিলের কার্যকরী সমিতির এক জরুরী বৈঠক হল। বৈঠকের আগে রাসবিহারী বোস ইয়াকুরোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু কোন মীমাংসার পথ খুঁজে পাননি। রাঘবন দেরী করে সভায় এলেন এবং বললেন যে, তিনি কৌন্সিল থেকে পদত্যাগ করেছেন কারণ ব্যাংকক প্রস্তাবের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

পরে সমিতির অন্য সদস্যরা পদত্যাগ করলেন। জাপানী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ইণ্ডিয়া ইনডিপেনডেণ্ট লীগের ঝগড়া স্পষ্ট হল।

৮ই ডিসেম্বর জাপানী সামরিক বাহিনী কর্নেল গীলকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে মোহন সিং-এর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। এই সময়ে গীল মোহন সিং-এর বাড়িতে থাকতেন। গীলের গ্রেপ্তারের পর মোহন সিং বিশেষ বিচলিত হলেন। এবার রাসবিহারী বোস বুঝতে পারলেন যে, 'কিকান' এবং কৌন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সহজে মেটান যাবে না। মোহন সিং ইয়াকুরো 'কিকানে'র কাছে গীলের গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলেন। কেন গীলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এর জবাবে ফুজিয়ারা বললেন যে, জাপানী ইনটেলিজেন্স বিভাগ বেশ কিছুদিন যাবৎ গীলের গতিবিধি এবং কার্যকলাপের উপর নজর রাখছিল। ইনটেলিজেন্স অফিসারদের বক্তব্য হল, গীল আই-এন-এর ভেতরের খবর জানবার জন্যে এর অভ্যন্তরে এক 'স্পাইচক্র' পরিচালনা করছিলেন। ব্যাংককে থাকাকালীন গীল জাপানী এবং আই-এন-এ'র অনেক ক্ষতি করেছিলেন এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর বক্তব্য হল গীল হলেন ব্রিটিশদের চর। এবার ফুজিয়ারা গীলের কার্যকলাপের এবং তার গতিবিধির পুরো খবর মোহন সিংকে দিলেন। ফুজিয়ারা আর একটি গুরুতর অভিযোগ করলেন যে, কিছুদিন আগে

পেগুতে ছয়জন ব্রিটিশ সৈন্য প্যারাসুট করে নেমেছে। জাপানী ইনটেলিজেন্স বিভাগের 'প্রশ্নে' সৈন্যরা স্বীকার করেছে যে, তাদের পেগুতে আগমনের প্রধান কারণ ছিল গীলের এবং ধীলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

মোহন সিং এই প্যারাসুট বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ফুজিয়ারা বললেন, এই প্যারাসুট বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। এবার লীগ কার্যকরী সমিতির সদস্যদের কাছে রাসবিহারী বোস বললেন, টোকিও'র কাছ থেকে জবাব আদায় করবার জন্যে তিনি নিজেই টোকিওতে যাবেন। তিনি অবশিষ্ট সদস্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন। মোহন সিং লীগের কার্যকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কিন্তু আই-এন-এ সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি ইস্তফা দেননি। পরে রাসবিহারী বোস এক সার্কুলার জারী করে লীগের সদস্যদের জানালেন যে, তাদের কার্যকরী সমিতির কিছু সদস্য পদত্যাগ করেছেন। রাসবিহারী বোস মোহন সিং-এর কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি কয়েকজন আই-এন-এর অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চান। মোহন সিং এই সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলেন। রাসবিহারী বোস এর জবাবে বললেন, যদি অফিসারেরা তার সামনে এসে না উপস্থিত হয় তাহলে তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।

আপনি কোন অধিকারে আই-এন-এর অফিসারদের শাস্তি দেবেন ? মোহন সিং রাসবিহারী বোসকে জিজ্ঞেস করলেন। কারণ কার্যকরী সমিতির এখন কোন অস্তিত্ব নেই।

অন্য সদস্যরা পদত্যাগ করলেও আমি পদত্যাগ করিনি। অতএব কার্যকরী সমিতি এখনও বলবৎ আছে এবং ঐ সমিতির একমাত্র সদস্য হলাম আমি··· রাসবিহারী বোস জবাব দিলেন। এখন থেকে কার্যকরী সমিতির সব অধিকার এবং ক্ষমতা আমার হাতে। কিন্তু মোহন সিং রাসবিহারী বোসের এই জবাবকে স্বীকার করে নিলেন না। তিনি কার্যকরী সমিতির ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন এবং বললেন যে, ব্যাপারটি নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে আলোচনা বিতর্ক করতে চান [মোহন সিং-এর রাসবিহারী বোসের কাছে লেখা চিঠি, ন্যাশনাল আর্কাইভস, নিউ দিল্লী]।

পরে ২৯শে ডিসেম্বর রাসবিহারী বোস ইয়াকুরোর সমর্থন নিয়ে মোহন সিংকে তার অবাধ্যতার জন্যে আই-এন-এর প্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করলেন [রাসবিহারী বোসের মোহন সিং-এর কাছে লেখা চিঠি, ২৯শে ডিসেম্বর ন্যাশনাল আর্কাইভস, নিউ দিল্লী]।

সেই দিনই ইয়াকুরো মোহন সিংকে তার বাড়িতে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন

যে, তিনি জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে রাজি আছেন কিনা? মোহন সিং এই কাজ করতে অস্বীকার করলেন। এই জবাব পাবার পর ইয়াকুরো রাসবিহারী বোসের সম্মতি নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করলেন। পরে ইয়াকুরো বলেছিলেন যে, তিনি মোহন সিং এবং গীলকে রাসবিহারী বোসের নির্দেশানুযায়ী গ্রেপ্তার করেছিলেন [জাঙ্গল এলায়েন্স, জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-৯৭]।

মোহন সিং জেলে যাবার আগে ফুজিয়ারা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। মোহন সিং ফুজিয়ারাকে বললেন, "যদি জাপানীরা জার্মানী থেকে সুভাষ বোসকে এই এলাকায় নিয়ে আসেন তাহলে তিনি জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন ⋯ ⋯।"

ফুজিয়ারা মোহন সিংকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন অন্যান্য আই-এন-এ সৈন্যদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। ফুজিয়ারা মোহন সিংকে আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মোহন সিং-এর মুক্তির জন্যে তিনি চেষ্টা করবেন [জাঙ্গল এলায়েন্স, জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-৯৭]।

*　　　　*　　　　*

মোহন সিং গ্রেপ্তারের আশঙ্কা করেছিলেন। গ্রেপ্তার হবার আগে তিনি আই-এন-এ সেনাবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং ইয়াকুরো 'কিকানের' ব্যবহারের বিরোধিতা করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আই-এন-এর জরুরী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মোহন সিং গ্রেপ্তার হবার পর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা গিয়ে 'কিকানের' কর্তাদের বললেন যে, তারা সাধারণ বন্দী হিসাবে থাকতে চান। কিন্তু 'কিকানের' কর্তারা জবাব দিলেন যে, জাপানের সঙ্গে ভারতের কোন লড়াই কিংবা ঝগড়া-বিবাদ নেই। অতএ আই-এন-এর সদস্যদের সাধারণ বন্দী হিসাবে গণ্য করা যায় না [জাঙ্গল এলায়েন্স, জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-৯৭]।

রাসবিহারী বোস ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগকে পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা করলেন। লীগের সঙ্গে রাঘবন তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং তিনি পেনাঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। কে. পি. কে. মেনন বললেন যে, তিনি জাপানীদের অধীনে কাজ করবেন না এবং লীগের কোন কাজ তিনি করবেন না। মালেশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে রাঘবন এবং মেননের খুব প্রভাব ছিল [রোড টু দিল্লী, এম. শিবরাম, টৌকিওর প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৯০]।

এবার রাসবিহারী বোস আই-এন-এর সেন্যবাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি আই-এন-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রাখতে চান।

যদি না চান, তাহলে কী কারণে তারা এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান ?

রাসবিহারী বোস অফিসারদের কাছ থেকে অসংখ্য জবাব পেলেন। সবাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চান। আবার অনেকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে সংগ্রাম করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রাসবিহারী বোস এইসব অফিসারদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন যে, জাপানীদের সাহায্য ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

'আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতীয়' রাসবিহারী বোস বলেছিলেন। ঐ সময়ে তার ছেলে জাপানী সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন, এবং তার ইচ্ছা ছিল, তিনি একদিন এই ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগ দেবেন [মাই এ্যাডভেনচার্স উইথ আই-এন-এ'কে, আর. পলতা, পৃষ্ঠা-৫৯-৬১]।

১৫ই ফেব্রুয়ারী আই-এন-একে নতুন করে গঠন করা হল। এবার ডিরেক্টর অব মিলিটারী ব্যুরো হলেন লেঃ কর্নেল ভোঁসলে। ঠিক হল, তিনি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের অধীনে কাজ করবেন। লেঃ কর্নেল শাহ্ নওয়াজ খান হলেন চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ। মেজর হবিবুর রহমান হলেন কমাণ্ডাণ্ট অব ট্রেনিং স্কুল। মেজর পি. কে. সায়গল হলেন মিলিটারী সেক্রেটারী এবং লেঃ কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি কালচারাল বিভাগের কর্তা। পরে সুভাষ বোস যখন সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছুলেন, তখন এই ছিল ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের গঠন।

এদিকে পেনাঙ্গ শহরে ফিরে এসে রাঘবন মালেশিয়া ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের শাখার এক সভা ডাকলেন। উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক করলেন যে, সংগ্রাম বন্ধ করা হবে কিন্তু তার আগে টোকিওর মনোভাব ভাল করে জানা এবং যাচাই করা দরকার। পেনাঙ্গের ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এক তেরো পয়েন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যার একটি প্রধান দাবী ছিল যে, জাপান ভারত সম্বন্ধে তার নীতি ব্যাখ্যা করে বলবে সামরিক এবং বেসামরিক সম্পর্কে তারা কী নীতি গ্রহণ করবে ?

রাসবিহারী অভিযোগ করলেন যে, রাঘবন ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই-এন-এ'র বিশেষ ক্ষতি করছেন। এবার রাসবিহারী বোস ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের ক্ষমতা ব্যবহার করে রাঘবনকে লীগ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন।

ইতিমধ্যে রাসবিহারী বোস ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের অনেক অদলবদল করলেন। পরে ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের এক সম্মেলন হল।

এই সম্মেলনের সদস্যরা দাবী করলেন যে, অবিলম্বে বার্লিন থেকে সুভাষ বোসকে এই এলাকায় নিয়ে আসা হ'ক। রাসবিহারী বোস সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে, জাপান সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন এবং সুভাষ বোসকে এই এলাকায় নিয়ে আসবার আয়োজন করছেন। ঠিক হল, সুভাষচন্দ্র বোস হবেন ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের প্রধান এবং আই-এন-এর কম্যাণ্ডার ইন চীফ।

১৬ই মে ১৯৪৩ সালে সুভাষ বোস টোকিওতে এসে পৌছুলেন।

*　　　*　　　*　　　*

কী করে সুভাষচন্দ্র বোস সাবমেরিনে করে সাতসমুদ্র অতিক্রম করে টোকিওতে এসে পৌছুলেন এবার তার পটভূমিকা দেওয়া দরকার।

বার্লিনে কিছুদিন কাটাবার পর সুভাষচন্দ্রও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সক্রিয় কাজ করবার প্রয়াসী। হিটলার গোয়েবল্‌স-এর সঙ্গে দেখা করে তিনি সন্তুষ্ট হননি। কী করবেন তিনি? তারপর এল একদিন ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস।

এই সময়ে বার্লিনে জাপানী এম্বাসীর মিলিটারী এটাচী কর্নেল ইয়ামামটো বিন টোকিওর সামরিক বাহিনীর শিবির থেকে এক জরুরী তার পেলেন: তারা জানতে চান এই সুভাষচন্দ্র বোস লোকটি কে? আমরা তার সম্বন্ধে আরও কিছু খবর জানতে চাই। কিন্তু বার্লিনে বিভিন্ন কারণবশত সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ, জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর সুভাষচন্দ্রের দেখাশোনা এবং তার অন্যান্য কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করত। বিদেশীদের সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে হলে পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমতির প্রয়োজন হত। ইয়ামামটো প্রথমে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাইলেন। তিনি নিরাশ হলেন এবং তার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হল। পরে ইয়ামামটো জাপানী এম্বাসডার জেনারেল ওসিমা হিরোসির নাম ব্যবহার করে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চাইলেন। এবার অনুমতি মিলল। এদিকে সুভাষচন্দ্রও জাপানী এম্বাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। অক্টোবরের শেষ ভাগে ওসিমা এবং ইয়ামামটো সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন। একঘণ্টা ধরে তাদের আলাপ আলোচনা হল। আলোচনার বিষয় ছিল, ভারতের স্বাধীনতা এবং এই কাজে জাপান সরকারের কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্য পাওয়া যাবে। প্রথম আলাপ-আলোচনার পর ওসিমা এবং ইয়ামামটো সুভাষচন্দ্রকে দেখে আকৃষ্ট হলেন [জাঙ্গল এলায়েন্স, জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১১০]। এরপর আরও বেশ কয়েকবার সুভাষচন্দ্র বোস বার্লিনের জাপানী এম্বাসীতে গিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের গতি দেখে জাপানী এম্বাসডারের কাছে

ঐ এলাকায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ওসিমা কী তাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেতে সাহায্য করবেন?

ওসিমা কী করবেন? টোকিও'র কর্তারা সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কী করতে হবে তার কোন আভাস ওসিমাকে দেননি। ওসিমা ভাবলেন যে, টোকিও'র কর্তাদের হয়ত ভারত-সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার স্পষ্ট নীতি নেই। এ ছাড়া ওসিমার মনে সন্দেহ ছিল, জার্মান সরকার ঐ মুহূর্তে সুভাষচন্দ্রকে জার্মানীর বাইরে যেতে দেবেন না। সুভাষচন্দ্রকে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রচার কাজে ব্যবহার করছিলেন। সুভাষচন্দ্র রেডিওতে ইংরেজ সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ঐ সব বক্তৃতা ভারতের সবাইকে অভিভূত করেছিল। এছাড়া জার্মানীর খুব বেশি ইচ্ছে ছিল না, জাপান সুভাষচন্দ্রকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে ব্যবহার করে।

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কী করা হবে সেই নির্দেশ চেয়ে ওসিমা তিনখানা টেলিগ্রাম টোকিও'র কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতি টেলিগ্রামের জবাব ছিল: এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। সঠিক নীতি গ্রহণ করে আপনাকে জানাব। এদিকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে সুভাষচন্দ্র ওসিমাকে জিজ্ঞেস করতেন: টোকিওর কাছ থেকে কোন জবাব পেলেন? ওসিমা জবাব দিতেন: পাইনি, আরও একটু ধৈর্য ধরুন।

কিছুদিন পরে জাপান পররাষ্ট্র দপ্তর ওসিমাকে জানালেন, সুভাষচন্দ্র যদি টোকিওতে আসেন তবে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করা হবে। তবে এই ব্যাপারে ওসিমা যেন তাকে কোন প্রতিশ্রুতি না দেন।

কিন্তু এবার সমস্যা হল, সুভাষচন্দ্রকে জার্মানি থেকে টোকিওতে কোন পথ দিয়ে এবং কী করে পাঠান হবে। সুভাষচন্দ্র নিজে মেরুপথ দিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু টোকিওর কর্তারা এই ব্যাপারে ইতস্তত: বোধ করলেন। কারণ, মেরুপথ দিয়ে যেতে হলে মস্কোর অনুমতি দরকার হবে এবং এই ব্যাপারে মস্কোর কী নীতি হবে জানা দরকার। প্রধানমন্ত্রী টোজো সুভাষচন্দ্রের মেরুপথ দিয়ে যাবার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না।

কিন্তু তারপর আবার বেশ কিছুদিন জাপান সরকার চুপচাপ রইল। ইতিমধ্যে মিলিটারী এটাচী ইয়ামামটো বদলি হয়ে বার্লিন থেকে চলে গেলেন।

কী কারণে জাপান প্রথমে সুভাষচন্দ্রকে টোকিওতে আনবার প্রস্তাবে কোন উৎসাহ দেখাননি? একটা গৌণ কারণ ছিল। এই সময়ে জাপানে আর একজন ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন....তারও নাম ছিল বোস, রাসবিহারী বোস....। জাপানের নেতাদের মনে একটা ধারণা ছিল, সুভাষচন্দ্রকে এই অঞ্চলে আনলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সংগ্রামের মধ্যে আরও বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে।

এ ছাড়া বার্লিন থেকে টোকিও, এতটা পথ গোপনে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আসবার অনেক বিপদ ছিল বৈকি।

একদিন জাপানী সামরিক বাহিনী রাসবিহারী বোসকে জিজ্ঞেস করলেন: সুভাষচন্দ্র এই এলাকায় এলে আপনি কি করবেন? এর জবাব দিতে রাসবিহারী বোস দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচ বোধ করেননি। তিনি বিনা দ্বিধায় বললেন: আমি সুভাষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেব। তারপর ১৯৪২ সালে আই-এন-এর মধ্যে যখন গোলমাল বিভেদ সৃষ্টি হল তখন জাপান সরকার উপলব্ধি করল যে, এই এলাকায় রাসবিহারীর চাইতে আরও একজন শক্তিশালী ভারতীয় নেতার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করার জন্যে প্রয়োজন। এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দেরও দাবী ছিল: সুভাষকে বার্লিন থেকে নিয়ে এখানে আমুন। এবার জাপানী সামরিক বাহিনী স্থির করল, সুভাষচন্দ্রকে টোকিওতে নিয়ে আসা দরকার।

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আসবার প্রস্তাব নিয়ে জাপানী ক্যাবিনেটের এক সভা হল। এই সভায় জাপানের সামরিক এয়ার ফোর্স এবং নৌবাহিনীর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। জাপানী ক্যাবিনেট সুভাষচন্দ্রকে কী কাজের জন্যে ব্যবহার করবে সেই নিয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই সিদ্ধান্তর দুইটি অংশ ছিল। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪২ সালে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। প্রথম সিদ্ধান্তে বলা হল, আমরা সুভাষচন্দ্রকে ১০ই জানুয়ারীর সিদ্ধান্ত এবং বর্তমান ঘটনার পরিস্থিতির নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করব। জাপানী সরকার ১০ই জানুয়ারী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, সেই সিদ্ধান্ত ছিল: এক, ব্রিটেনের সামুদ্রিক যানবাহন বন্ধ করতে হবে। দুই, ভারতে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে এবং এই মনোভাবকে তীব্র করার জন্যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন প্রচার কাজকে আরও জোরদার শক্তিশালী করতে হবে।

'এই কাজের জন্যে আমরা তাঁকে টোকিওতে আমন্ত্রণ করব এবং তাঁর এই কাজের উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা যাচাই করব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্যের ইচ্ছার কথাও আমরা তাঁকে জানাব। সামরিক বাহিনী তাঁর দেখাশোনার তত্ত্বাবধান করবেন [আনকল এলায়েন্স, জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-২২৭]।

এবার ঠিক হল, ভারত মহাসাগরে সত্তর ডিগ্রী পূর্ব লঙ্গিচুটে এক জার্মান সাবমেরিন সুভাষচন্দ্রকে জাপানী সাবমেরিনে তুলে দেবে। প্রথমে জার্মান সরকার সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে ~~দিতে একটু~~ আপত্তি করেছিল, কিন্তু পরে যখন জাপানের এ্যাম্বাসডার ওসিমা হিটলারের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করলেন তখন হিটলার

সুভাষচন্দ্রকে জাপানে যাবার সম্মতি দিলেন।

জার্মানী থেকে চলে আসবার আগে সুভাষচন্দ্র ফ্রয়লাইন শ্লেনকেল্‌কে বিয়ে করেছিলেন। ফ্রয়লাইন শ্লেনকেল্‌ ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারী। তিনি এই বিয়ের কথা দীর্ঘকাল গোপন রেখেছিলেন। তাঁর জার্মানীর সহকর্মীরাও এই বিয়ের কথা জানতে পারেননি। কেন সুভাষচন্দ্র এদের কাছে তার বিয়ের কথা বলেননি? হয়ত সুভাষচন্দ্র ইচ্ছে করেই এই বিয়ের কথা গোপন করেছিলেন। কেউ এই খবর জেনে থাকলেও প্রকাশ্যে সুভাষচন্দ্রের বিয়ে নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। কারণ, আচার ব্যবহারে নীতি এবং আদর্শে সুভাষচন্দ্র পণ্ডিত নেহরুর চাইতে অনেক বেশি ভারতীয় ছিলেন। এই কারণে তিনি ভেবেছিলেন যে, তার বিয়ের কথা বাজারে ছড়িয়ে পড়লে শিষ্য-অনুচরদের মধ্যে ভুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি সুভাষচন্দ্রের পরিবারও এই বিয়ের কথা জানতে পারেননি। শুধু এই যুদ্ধে যখন জাপানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হল, তখন তিনি তাঁর পরিবারের কাছে এক চিঠি লিখে এই বিয়ের কথা বলেছিলেন।

জার্মানীর কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার পর আলোচনা শুরু হল, কোন্‌ পথ দিয়ে এবং কী করে সুভাষচন্দ্রকে টোকিওতে নিয়ে যাওয়া হবে। প্লেনে করে যাওয়া নিরাপদজনক ছিল না। এ ছাড়া জার্মানীর কাছে বাড়তি প্লেনও ছিল না। জাহাজে করে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। ঠিক হল, সুভাষচন্দ্রকে জার্মানী থেকে সাবমেরিনে করে সাবাঙ্গে নিয়ে আসা হবে।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র এবং তার সেক্রেটারী আবিদ হাসান সাবমেরিনে করে সাবাঙ্গের দিকে রওনা দিলেন। ২৬শে এপ্রিল মাদাগাসকার এলাকার কাছে জাপানী এবং জার্মান সাবমেরিনের দেখা হল। পরে সুভাষচন্দ্র জাপানী সাবমেরিন করে সাবাঙ্গে এসে পৌছুলেন। এখানে সুভাষ-চন্দ্রের পুরাতন বন্ধু ইয়ামামটো এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর তারা দুজনে প্লেনে করে সায়গন, ম্যানিলা, পেনাঙ্গ এবং তাইওয়ান হয়ে টোকিওতে এসে পৌছলেন ১৯৪৩ সালে ১৬ই মে।

আর সেই দিন থেকে শুরু হল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল। শোনা গেল, আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর পদধ্বনি। কিন্তু সেই অবিস্মরণীয় নেতার বীরত্বের কাহিনী বলবার আগে আমাদের আবার দেশে ফিরে যেতে হবে।

তিন

এবার কাহিনীর নায়ক হলেন পাকিস্তানের সৃষ্টিকর্তা মুসলিম লীগের অধিনায়ক এবং সরোজিনী নাইডুর ভাষায় একদিন যিনি ছিলেন হিন্দু-মুসল-

মান ঐক্যবন্ধনের দূত মুহম্মদ আলি জিন্না। ভাগ্যের এমনিই পরিহাস ছিল যে, পরবর্তীকালে এই জিন্না হলেন ঐক্য বন্ধনের বিরোধী বিদ্রোহী নায়ক। কেন জিন্না তার নীতি পরিবর্তন করলেন? কী কারণে তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে (যে প্রতিষ্ঠানে তার রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল) বেরিয়ে গিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করলেন এবং পরে দেশকে ভাগ করে পাকিস্তান গঠন করেছিলেন? এর জন্যে কে দায়ী? সেই দায়িত্ব কার? সেই কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে আজ জিন্নার জীবন-কাহিনী বিস্তারিত করে বলা দরকার।

জিন্নার জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ সালে এবং মৃত্যুর তারিখ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সাল। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল। তিনি ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

জিন্নার প্রথম জীবনে অখণ্ড ভারত ছিল প্রধান স্বপ্ন, কিন্তু জীবনের শেষে এই স্বপ্ন হল দুঃস্বপ্ন।

জিন্না মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যার সমাধান করেছিলেন শুধু একটি নেতিবাচক জবাব দিয়ে। বারবার 'না' জবাব দিয়ে জিন্না ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যে, তার এই 'না' জবাব থেকে জন্ম নিল পাকিস্তান।

এবার জিন্নার জীবন-কাহিনী জানবার জন্যে করাচি শহরে যাওয়া যাক।

এই শহরে জিন্নার বাবা জিন্নাভাই পুনজা (জন্ম ১৮৫০ সাল) ব্যবসা করতেন। জিন্নাভাই ছিলেন গুজরাতি। ভারতের দুই বড় নেতা গান্ধীজি এবং জিন্না দুজনেই ছিলেন গুজরাতি এবং দুজনেই পেশায় ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী।

জিন্নাভাই পুনজা এবং তার স্ত্রী মিথিভাই: সাত সন্তান ছিল। বড় ছেলের নাম ছিল মুহম্মদ আলি জিন্নাভাই এবং ডাকনাম ছিল মামুদ। পরের জীবনে তিনি তার নাম পরিবর্তন করে মুহম্মদ আলি জিন্না রেখেছিলেন। সংক্ষেপে তার নাম হল এম. কে. জিন্না।

প্রথম জীবনে জিন্না করাচির 'মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া' স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। তার বয়স যখন অল্প তখন তিনি পিসীর সঙ্গে বোম্বাই শহরে বেড়াতে গেলেন। বোম্বাই তার ভাল লাগল। তিনি বোম্বাইতে থেকে গেলেন। কিছুদিনের জন্যে বোম্বাই'র একটি স্কুলে পড়াশুনাও করেছিলেন। ছয় মাস বোম্বাইতে থাকবার পর জিন্না আবার করাচিতে ফিরে গেলেন। এখানে ফিরে এসে তিনি সিন্ধ মাদ্রাসায় ভর্তি হলেন। পড়াশুনায় তার বেশি মন ছিল না। বরং তার ঘোড়ায় চড়ার শখ ছিল এবং প্রায়ই তিনি স্কুল কামাই করতেন।

স্কুলে অনুপস্থিতি থাকার জন্যে স্কুল থেকে তার নাম কাটা গেল। কিছুদিন পরে আবার তাকে ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাই স্কুলে ভর্তি করা হল।

জিন্নাভাই পুনজার ব্যবসার সঙ্গে লণ্ডনের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ডগলাস গ্রাহাম কোম্পানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই কোম্পানীর বড়কর্তার নাম ছিল স্যর ফ্রেডিক লেক্রফট। স্যর ফ্রেডিক মামদ জিন্নাকে খুব ভালবাসতেন এবং তিনি প্রস্তাব করলেন, ব্যবসায় প্রশিক্ষণ নেবার জন্যে মামদ জিন্নাকে লণ্ডনে পাঠাবেন। কিন্তু জিন্নার মা আপত্তি করলেন। বিয়ে না দিয়ে তিনি ছেলেকে বিলেতে পাঠাবেন না। কারণ, তার ভয় হল ছেলে কখন কোন্ মেমসাহেবের খপ্পরে পড়বে। মামদ জিন্নাও বুঝতে পারলেন যে, মায়ের প্রস্তাবানুযায়ী বিয়ে না করলে তার বিলেতে যাওয়া হবে না। অতএব, জিন্না তার মায়ের কথানুযায়ী বিয়ে করতে রাজি হলেন। কনে ঠিক হল এবং বিয়ের আগে জিন্না কনেকে দেখেননি। এই কনের নাম ছিল এমিবাই, বয়স চোদ্দ। বিয়ের পর জিন্না তার বালিকা বধূকে দেশে রেখে বিলেতে চলে গেলেন। দেশে ফিরে জিন্না তার স্ত্রী এবং মাকে দেখতে পাননি। দুজনেই দুরন্ত রোগে মারা গিয়েছিলেন।

লণ্ডন, ১৮৯৩ সাল।

এই শহরে জিন্না ছিলেন নবাগত এবং সবার কাছে অপরিচিত। এই শহরে জিন্নার একমাত্র কাজ ছিল ডগলাস গ্রাহাম কোম্পানীতে যাওয়া এবং সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসা। প্রথম কয়েক মাস জিন্না এই শহরে খুব একা অনুভব করতেন।

লণ্ডনে থাকাকালীন জিন্নার জীবনে কিছু কিছু পরিবর্তন হল। তিনি ইংরাজি ধাঁচে তার নাম লিখতে শুরু করলেন। মহম্মদ আলি জিন্না সংক্ষেপে হলেন এম. কে. জিন্না। ছেলেবেলা থেকে তিনি সাজগোজ করতে ভালবাসতেন এবং বিলেতে সবচাইতে দামী স্যুটের দোকানে, সাভিল রো'তে তিনি স্যুট তৈরি করতেন। জিন্না জীবনে মিতব্যায়ী ছিলেন কিন্তু সাজগোজ করতে এবং থিয়েটার করতে এবং দেখতে ভালবাসতেন। জিন্নার মৃত্যুকাল অবধি তার স্যুটের সংখ্যা ছিল প্রায় দুশো। ব্যারিস্টার জিন্না জীবনে কোনদিন এক সিল্কের টাই দুবার ব্যবহার করেননি। জিন্নার সমকক্ষ সৌখীন পুরুষ ঐ যুগে বড় বেশি ছিল না।

লণ্ডনে থাকাকালীন জিন্নার বাবা নিয়মিতভাবে টাকা পাঠাতেন। জিন্না কেনসিংটন এলাকার এক ল্যাণ্ডলেডীর বাড়িতে থাকতেন। এই ল্যাণ্ডলেডীর একটি আকর্ষণীয়া কন্যা ছিল। মেয়েটি প্রায়ই তার বাড়িতে পার্টি দিত এবং

বাইরের বহু ছেলে-মেয়েরা এই পার্টির নাচ-গানে যোগ দিত। এই পার্টিতে একটি খেলা হত যার নাম ছিল 'কিসিং গেম'। এই খেলায় কেউ যদি কোন ভুল করত তাকে এই ভুলের জন্যে সাজা গ্রহণ করতে হত। একদিন 'কিসিং গেম' খেলতে গিয়ে জিন্না একটি ভুল করে বসলেন। ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে এসে জিন্নার সামনে দাঁড়াল। তাকে চুমু খেতে হবে। কিন্তু জিন্না ল্যাণ্ডলেডীর মেয়েকে চুমু খেতে রাজি হলেন না। এরপর ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে জিন্নাকে আর কোনদিন বিরক্ত করেননি [এই কাহিনী মিস ফতেমা জিন্নার 'মাই ব্রাদার' বইতে পাওয়া যাবে]।

ডগলাস গ্রাহাম কোম্পানীর কাজ জিন্নার ভাল লাগল না। এবার তিনি ঠিক করলেন আইন পড়বেন। কিন্তু আইন পড়তে হলে ল্যাটিন ভাষায় পাশ করতে হত। জিন্না আইন কলেজের কর্তাদের কাছে ল্যাটিন পরীক্ষা দেবার হাত থেকে রেহাই চাইলেন। রেহাইও মিলল। অনেকে বলেন, ঐ অল্প বয়স থেকে জিন্নার রাজনীতি করার শখ ছিল। তাই তিনি আইন পড়তে শুরু করেছিলেন।

১৮৯২ সাল, ইংল্যাণ্ড।

দেশের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন। এই সময়ে বোম্বাই'র পার্শী ব্যবসায়ী দাদাভাই নওরোজী ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য। দাদাভাই'র লণ্ডন এবং লিভারপুলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। দাদাভাই নওরোজী লিবারেল পার্টির টিকিটে পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জিন্নার আদর্শ। দাদাভাই যখন পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিতেন তখন জিন্না দর্শকের গ্যালারী থেকে তার বক্তৃতা শুনতেন। দাদাভাই নওরোজীর বক্তৃতা তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

জিন্না ব্যবসার কাজ ছেড়ে আইন পড়ছেন এই খবর জিন্নার বাবা জিন্নাভাই পুনজার কানে গেল। বাবা ছেলের এই আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। এ ছাড়া ডগলাস গ্রাহাম কোম্পানীর কর্তারাও জিন্নার এই সিদ্ধান্তে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এরপর তারা জিন্নার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

লণ্ডনে আইন পড়বার সময় প্রায়ই জিন্না অক্সফোর্ডে গিয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেন। একবার অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ নৌকো রেসের সময় জিন্না এবং তার বন্ধুদের পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হল। অবশ্যি এ নিয়ে জিন্নাকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। কারণ পুলিশ তাকে ধমক দিয়ে এবং সাবধান করে ছেড়ে দিয়েছিল। এই তার জীবনে প্রথম এবং শেষ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। গান্ধীজি এবং নেহরুর মত জিন্না কোনদিনই জেলখানায় যাননি।

জিন্নার থিয়েটার করবার ভারী শখ ছিল। তিনি খুব ভাল কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি শেক্সপীয়ারের বিভিন্ন নাটকের অংশ থেকে আবৃত্তি করে গেছেন। জিন্নার ইচ্ছে ছিল যে তিনি একজন অভিনেতা হবেন। এই অভিনেতা হবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এবং তার কিছু বন্ধু থিয়েটারের এক ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। ম্যানেজার তাকে শেক্সপীয়ারের দু-একটি নাটক থেকে কিছু অংশ আবৃত্তি করতে বললেন। জিন্নার আবৃত্তি ম্যানেজারকে সন্তুষ্ট করল। এবার অভিনেতা হবার জন্যে জিন্না এক চুক্তিপত্রে সই করলেন। পরে তিনি অভিনেতা হবার সংকল্প তার বাবাকে জানালেন। জিন্নাভাই পুনজা ছেলের সিদ্ধান্তর কথা শুনে অসম্ভব রেগে গেলেন। জিন্না যে তার বংশের কুলাঙ্গার হবেন, তিনি ভাবতেই পারলেন না। ছেলের কাছে খুব কড়া চিঠি লিখলেন। নিরুপায় হয়ে জিন্না থিয়েটারে অভিনয় করবার সংকল্প ত্যাগ করলেন...এবার তিনি গিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজারের কাছে সব খুলে বললেন, তার থিয়েটার করা সম্ভব নয়। অথচ এদিকে তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে অভিনেতা হবার জন্যে এক চুক্তিপত্রে সই করেছেন। কী করবেন? ম্যানেজার এই চুক্তিপত্র নাকচ করে দিতে আপত্তি করলেন না।

সেদিন জিন্না যদি এই চুক্তিপত্র অনুযায়ী অভিনেতা হতেন, তাহলে পাকিস্তান এবং দেশ ভাগ হত কিনা সন্দেহ ['জিন্না অব পাকিস্তান', স্টানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৫]।

এবার জিন্নার বাবা তাকে দেশে ফিরে আসতে বললেন। তার ব্যবসায় ঘাটতি হচ্ছে। ছেলে এসে তার ব্যবসার কাজকর্মে সাহায্য করুক। কিন্তু জিন্না তার বাবার নির্দেশ অমান্য করলেন। তিনি ব্যারিস্টার হতে চান। হলেনও। ১১ই মে, ১৮৯৬ সালে মুহম্মদ আলি জিন্না ব্যারিস্টার এট ল, লণ্ডনের কোর্টে তার নাম লেখালেন। তারপর ১৫ই জুলাই, ১৮৯৬ সালে জিন্না পি এ্যাণ্ড ও জাহাজে করে ভারতের পথে রওনা দিলেন। জিন্না তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মাত্র কয়েকদিন করাচিতে ছিলেন। একমাত্র দেশ ভাগ হবার পরই তিনি তার জন্মস্থান করাচিতে দীর্ঘকাল ছিলেন। জিন্নার বাবা ছিলেন শিয়া মুসলিম, খোজা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরা আগা খানের ইসমাইলদের শিষ্য ছিলেন। এরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন ['জিন্না অব পাকিস্তান', ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৪]।

জিন্না বোম্বাইতে এসে তার আইনের প্র্যাক্টিস শুরু করলেন। এই সময়ে তার এক হিতৈষী বন্ধু তাকে বোম্বাই'র এ্যাকটিং এড্ভোকেট জেনারেল জন মোলেসওয়ার্থ ম্যাকফারসনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ম্যাকফারসন

জিন্নাকে তার দপ্তরের একজন জুনিয়ার হিসাবে কাজ করবার সুযোগ দিলেন। কিছুদিন এখানে কাজ করবার পর জিন্না খবর পেলেন যে, "মিউনিসিপ্যাল জজের" পদ খালি হয়েছে। জিন্না এই জজের পদের জন্যে আবেদন করলেন। এই চাকুরী পেতে তার কোন অসুবিধে হল না। কিন্তু পরে যখন জিন্নাকে এই পদ স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে বলা হল, জিন্না ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করলেন। ঐ চাকুরীর মাইনে ছিল দেড় হাজার টাকা। ১৯০১ সালে দেড় হাজার টাকার অনেক মূল্য ছিল। ঐদিন জিন্না বলেছিলেন, তিনি প্র্যাক্‌টিস করে প্রতিদিন এর চাইতে অনেক বেশি টাকা রোজগার করবেন। জিন্না মিথ্যে দম্ভ করেননি। ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি একজন উঁচুদরের প্রথমশ্রেণীর আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। জীবনে তিনি প্র্যাক্‌টিস করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন।

জিন্না মিউনিসিপ্যাল জজের পদ থেকে ইস্তফা দেবার পর স্বাধীনভাবে প্র্যাক্‌টিস করতে শুরু করলেন। একজন বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি তার চেম্বার খুব ভাল করে সাজালেন। জিন্না যেমনি ভাল ভাল পোষাক পরতে ভালবাসতেন তেমনি বাড়ি-ঘর সাজাবার শখও তার ছিল। জিন্নার বাবা তার পরিবার নিয়ে বোম্বাই-র রত্নগিরি এলাকায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। জিন্নাভাই পুনজার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। জিন্নার সঙ্গে তার বাবার খুব গভীর সম্পর্ক ছিল না। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তার বোন ফতেমা জিন্নার সঙ্গেই তার ছিল ভাল সম্পর্ক। তিনি ফতেমা জিন্নাকে 'ডেন্‌টিস্ট' হবার জন্যে কলেজের সব খরচই দিয়ে ছিলেন।

১৮৭৭ সাল ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর।

ঐ বছর স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান দিল্লীর প্রায় ষাট মাইল দূরে আলীগড়ে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে 'এ্যাংলো ও রয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করেছিলেন। এই কলেজে ছেলেদের থাকবার হোস্টেল ছিল। পরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক মুসলমান মেধাবী ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করেছিল। স্যার সৈয়দ নিজে ইংরেজ শাসনের অনুরাগী ছিলেন এবং তিনি কংগ্রেসের নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি বলেছিলেন, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুধুমাত্র কংগ্রেসের একচেটে ব্যবসা নয়। এর মধ্যে মুসলমানদেরও কিছু অংশ ও অধিকার আছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, 'কংগ্রেস ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞানী। কারণ ভারতবর্ষ হল বহুজাতির দেশ....' এখানে মুসলমানদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নেয়া ঠিক হবে না। [পাকিস্তান মুভমেণ্ট, ঐতিহাসিক ডকুমেণ্ট, করাচি ইউনিভার্সিটি,

পৃঃ-৩] বলা যায়, স্যর সৈয়দই প্রথম হিন্দু-মুসলমানকে দুই জাতি বর্ণনা করেছিলেন।

কিন্তু জিন্না ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখালেন না। তিনি তার আইন ব্যবসায় ব্যস্ত ছিলেন।

রাজনীতিতে জিন্নার আদর্শ ছিলেন দাদাভাই নওরোজী এবং বোম্বাই'র আর এক উল্লেখযোগ্য নেতা, স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহতা। ১৮৯০ সালে স্যর ফিরোজ শাহ্ মেহতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন এবং এই সভায় তিনি সর্বপ্রথম সংখ্যালঘুদের সাহায্য নিয়ে 'এক জাতি' গঠনের উপর গুরুত্ব দিলেন। স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহতা তার বক্তৃতায় আরও বলেছিলেন, পার্শি-হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কারুর যদি দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহলে তিনিই হবেন একজন খাঁটি ভারতীয়। জিন্নাও স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহতার এই মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৯০৪ সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসের এক অধিবেশন হল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার ফিরোজ শাহ মেহতা। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং জিন্নাকে ইংল্যাণ্ডের 'উদারনৈতিক সরকারের' কাছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গুছিয়ে বলবার এবং দরবার করবার জন্যে লণ্ডনে পাঠান হ'ক। কিন্তু অনেক কংগ্রেস নেতা'র কাছে জিন্না ছিলেন অপরিচিত এবং অজ্ঞাত। তাঁকে লণ্ডনে পাঠাবার প্রস্তাবে বিরোধিতা করা হল।

এক সময়ে বোম্বাই'র সামাজিক জীবনের আবর্তে পড়ে এবং আইন ব্যবসায়ের কারণবশত জিন্না ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস-রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন।

১৯০৫ সাল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বছর। কারণ এই বছর ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাকে দুই ভাগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্যে সারা ভারতবর্ষে এক তুমুল আন্দোলন শুরু হল জিন্না অবশ্যি এই আন্দোলনে কোন অংশগ্রহণ করেননি। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করা হল বটে, কিন্তু ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে এক গভীর ছাপ রেখে গেল। এই সময় থেকে ঢাকা হল মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক রাজধানী।

১৯০৬ সালে সিমলাতে মুসলমান সমাজের পঁয়ত্রিশজন গণ্যমান্য মুসলমান আগাখানের নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে দেখা করে তার কাছে এক আর্জি পেশ করলেন। এই আর্জিতে মুসলিম সদস্যরা অনুরোধ করলেন যে, ভারতে য়ুরোপীয় প্রশাসন চালু করবার সময় সংখ্যালঘু মুসলমানদের "জাতীয় স্বার্থের" কথা যেন স্মরণ রাখা হয়। প্রতিনিধিরা সরকারী চাকুরীতে

মুসলমানদের জন্যে পদ সংরক্ষিত রাখবার অনুরোধ করলেন। এছাড়া হাইকোর্ট এবং প্রাদেশিক এসেম্বলীতেও মুসলমানদের জন্যে পদ সংরক্ষিত রাখবার অনুরোধ করা হল। লর্ড মিণ্টো এই আর্জির জবাবে মুসলমান নেতাদের আশ্বাস দিলেন যে, মুসলমানদের দাবীর কথা ব্রিটিশ সরকার স্মরণ রাখবে।

এ ছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যে সংযম দেখিয়েছিলেন তার প্রশংসাও ভাইসরয় করলেন এবং বললেন, 'আমি মুসলমানদের আশ্বাস দিতে চাই।' লর্ড মিণ্টো প্রতিনিধিদের বললেন যে, 'প্রশাসনিক কোন পরিবর্তন করবার আগে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বার্থের কথা স্মরণ রাখা হবে।'

আগা খান এবং অন্যান্য মুসলমান প্রতিনিধিরা লর্ড মিণ্টোর এই আশ্বাসবাণীতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এর পরে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খান ঢাকাতে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেশনের' এক সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় আটান্ন জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। অধিবেশনে 'মুসলিম জনগণের' স্বার্থরক্ষার জন্যে নতুন সংস্থা গঠন করা হল, যার নাম দেওয়া হল "মুসলিম লীগ"। "মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যে বলা হল: আমাদের উন্নতি, সমৃদ্ধি প্রসারের জন্যে সরকারের অনুগত হওয়া দরকার। ইংরেজের আশ্রয় এবং অনুগ্রহে আমরা আমাদের অধিকার পাব" (এস পীরজাদা, 'ফাউণ্ডেশন অব মুসলিম লীগ', পৃষ্ঠা-৪)। ঢাকার মুসলিম লীগের প্রথম সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন, হায়দ্রাবাদের নবাব মুস্তাক হোসেন। তিনি তার বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বললেন: যদি কংগ্রেস নেতারা তাদের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবকে দমন না করেন তাহলে....আমরা কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করব...শুধু বক্তৃতা দিয়ে নয়...প্রয়োজন হলে অন্য উপায়ে....নবাব সলিমুল্লা এই অধিবেশনে চারটি প্রস্তাব পেশ করলেন। একটি প্রস্তাবে বলা হল, লীগ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল—'মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করা এবং ন্যায্য দাবীকে সরকারের কাছে তুলে ধরা।' নবাব সলিমুল্লা লীগ গঠনের প্রস্তাব করতে গিয়ে বললেন: যে লীগ-গঠন এক যুগান্তকারী ঘটনা....।

মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম সভাপতি হলেন আগা খান। অবশ্যি ঐ সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। পরে আগা খান ঠাট্টা করে বলেছিলেন: ঐ সময়ে লীগের সবচাইতে বিরোধী নেতা ছিলেন মুহম্মদ আলি জিন্না। আমি এবং আমার বন্ধুরা যে কাজ করেছি, উনি তার বিরোধিতা করেছেন.......তিনিই একমাত্র মুসলমান যিনি লীগের বিরোধী ছিলেন। কারণ জিন্না বিশ্বাস করতেন,

স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে········ ['মেমোয়ার অব আগা খান', পৃষ্ঠা—১২২-১২৩]।

১৯০৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হল। এই অধিবেশনে জিন্না এবং আরও চুয়াল্লিশ জন মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিলেন। দাদাভাই নওরোজী এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। জিন্না ছিলেন দাদাভাই নওরোজীর সেক্রেটারী। তিনি দাদাভাই নওরোজীর সভাপতির বক্তৃতা লিখে দিয়েছিলেন। দাদাভাই নওরোজী তার বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমানের একতার উপর জোর দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করলেন।

········একতা অর্জন করা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। একতা হলে আমরা বাঁচব, না হলে আমরা মরব· আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ['ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রকাশনা মাদ্রাজ', পৃষ্ঠা—৮৫৩-৮৫৪]।

কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্নার সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। ঐদিন সরোজিনী নাইডু তার দেশপ্রেম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জিন্না এই সময়ে ছিলেন ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক। তার কারণও ছিল, দাদাভাই নওরোজী এবং স্যার ফিরোজ শাহ্ মেহতা'র নীতির প্রভাব তার উপর বিশেষ ছিল। এরা দুজনেই ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করতেন।

১৯০৬-১৯০৭ সালে যে কয়জন গণ্যমান্য নেতার নাম করা যায় তার মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, গোখলে ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই নেতাদের আদর্শের মধ্যে কোন মিল ছিল না। এরা বিভিন্ন উপায়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

গোখলে ছিলেন সংবিধানে বিশ্বাসী······। তিনি বলেছিলেন, "যদি ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করে, তাহলে এডেনে পৌঁছুবার আগেই তাদের ডেকে আনা হবে।" তিনি মিতাচারে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু গোখলের বিরোধী ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনিও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রে "লোকমান্য" নামে একটি সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন। তিনি ব্রিটিশ মিলের তৈরী কাপড়, বিদেশী জিনিস ইত্যাদি বয়কট করবার এবং স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতি ছিলেন।

বাল গঙ্গাধর তিলক 'পূর্ণ স্বরাজে' বিশ্বাসী ছিলেন। তিলক, বিপিন পাল কংগ্রেসের ভেতর এক 'চরমপন্থী' (Extremists) দল গঠন করেছিলেন। এদের বিরোধী দলকে 'মডারেট' (Moderate) বলে ডাকা হত। ১৯০৫ সালে 'চরমপন্থী' এবং 'মধ্যপন্থীর' ঝগড়ার দরুন মতিলাল নেহরুকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হল।

'চরমপন্থীদের' বিরোধী আন্দোলন শুরু করবার জন্যে ১৯০৭ সালে 'মধ্যপন্থীরা' এলাহাবাদে মতিলালের নেতৃত্বে এক সভা করল। 'চরমপন্থীদের' একজন নেতা লালা লাজপত রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করল এবং মান্দালয়ে নির্বাসন করল।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের 'চরমপন্থী' তাদের নির্বাচিত প্রার্থী লালা লাজপত রায়কে কংগ্রেসের সভাপতি করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হল না। 'মধ্যপন্থীরা' জয়লাভ করল এবং 'চরমপন্থীদের' কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হল। ১৯০৮ সালে তিলক পুনা থেকে প্রকাশিত 'কেশরী' পত্রিকায় সরকার বিরোধী কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সরকার তাকে গ্রেপ্তার করল। জিন্না ছিলেন তিলকের ব্যারিস্টার এবং এই কেসে জিন্না বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে জিন্নাকে ভাইসরয়ের ইম্পিরিয়াল কৌন্সিলে মুসলিম সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা হল এই সময়ে কৌন্সিলে তাঁর বক্তৃতা এবং যুক্তি সবাইকে আকৃষ্ট করেছিল।

পুরনো দিনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের অধিবেশন প্রায় একই সময় একই শহরে হত।

১৯১৩ সালে মুসলিম লীগ জিন্নাকে লণ্ডনে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠাল। তাকে বলা হল মুসলিমদের 'স্বার্থরক্ষার' জন্যে ইংরেজ সরকারের কাছে দরবার করতে হবে । কিন্তু জিন্না লীগের নেতাদের বললেন, 'লীগের প্রতি তার এই আনুগত্য কোন প্রকারেই দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী হবে না।' ঐ বছরই তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। করাচিতে অধিবেশন শেষ হবার পর জিন্না আগ্রাতে মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দিলেন। জিন্না এই অধিবেশনে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসকে একত্র করবার চে[illegible] করলেন।

১৯১২ সালে পাটনায় বাঁকীপুর কংগ্রেস এবং লীগের অধিবেশন হল। দুটি দলের অধিবেশনে জিন্না অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ সভায় সরোজিনী নাইডু অংশগ্রহণ করেছিলেন। জিন্নাকে লীগের সভায় বক্তৃতা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, 'সংবিধানকে পরিবর্তন করে দেশে স্বায়ত্তশাসন আনতে হবে। হিন্দু-মুসলমান একতার উপর জোর দিতে হবে এবং অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে' ['জিন্না অব পাকিস্তান', স্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩১]। ১৯১৩ সালে এপ্রিল মাসে জিন্না এবং গোখলে দুজনে একই সঙ্গে জাহাজে করে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। পরে গোখলে সরোজিনী নাইডুকে বলেছিলেন, জিন্না সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার থেকে মুক্ত এবং হিন্দু-মুসলমান একতার শ্রেষ্ঠ রাজদূত হবার যোগ্য ব্যক্তি ['জিন্না

অব পাকিস্তান', স্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৫]।

১৯১৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জিন্না দেশে ফিরে এসে করাচির কংগ্রেস অধিবেশনে অংশগ্রহণ করলেন। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার বিলের তদ্বির করবার জন্যে তাঁকে কংগ্রেসের সদস্য করে বিলেত পাঠান হল। অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ভুপেন বসু এবং লালা লাজপত রায়। ১৯১৪ সালে লণ্ডনে আর একজন গণ্যমান্য অতিথি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। লণ্ডনের সিসিল হোটেলে গান্ধীজির সম্মানার্থে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হল। জিন্না এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন বটে, তবে গান্ধীজির সঙ্গে তার কোন আলাপ-পরিচয় হয়নি।

লণ্ডনে জিন্না যে উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলেন তার সেই উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণ যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা ব্যস্ত ছিলেন এবং ভারতীয় সমস্যার প্রতি ঝোঁক দেবার কোন সময় তাদের ছিল না।

১৯১৪ সালে কংগ্রেস প্রথম মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে সমর্থন করল। ১৯১৫ সালে গোখলে মারা গেল এবং ঐ বছর ফিরোজ শাহ্ মেহতারও মৃত্যু হল। তিলক বর্মার জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তিনি হলেন নতুন কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতা। যদিও এই সময়ে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তবু তিনি প্রথম দু'এক বছর খুব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি। তিলক কংগ্রেসের কাজকর্মের অনেক দায়িত্ব জিন্নার উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

১৯১৫ সালে বোম্বাই'র কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্র সিন্‌হা। তিনি এবং জিন্না দুজনে মিলে এক প্রস্তাব রচনা করলেন এবং ঐ প্রস্তাব সব সম্প্রদায়েরই মনোঃপূত হল। প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল যে, যোগ্য ভারতীয়দের আর্মিতে কমিশন এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দুই, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের সম্প্রসারণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি করতে হবে।

ঐ বছর মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব করেছিলেন মজাহার উল হক। কিন্তু লীগের অধিবেশনে গোলমাল শুরু হল। জিন্না যখন বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তখন একদল সদস্য তাকে উর্দুতে বক্তৃতা দেবার জন্যে দাবী করল। কারণ জিন্না ইংরাজিতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

গোলমালের দরুন লীগের অধিবেশন কিছুদিনের জন্যে মুলতুবী রাখা হল। পরে বোম্বাই'র তাজমহল হোটেলে লীগের অধিবেশন হল এবং জিন্না বক্তৃতা দিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করলেন- যার কাজ হবে দেশের অন্য দলের সঙ্গে এক হয়ে এক 'অখণ্ড ভারতের' উন্নতিসাধন করা।

মুসলিম লীগ জিন্নার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং ৭১ জন সদস্যকে নিয়ে এই কাজ করবার জন্যে এক কমিটি গঠন করা হল ['জিন্না অব পাকিস্তান', স্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৪]।

১৯১৫ সালে গান্ধীজি দেশে ফিরে এলেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে গুজরাত সোসাইটি এক গার্ডেন পার্টি দিয়েছিল। জিন্না ছিলেন এই গুজরাত সোসাইটির সভাপতি। গান্ধীজি তার বক্তৃতায় এক গুজরাতি (জিন্না ছিলেন গুজরাতি এবং গান্ধীজি ও জিন্নার একই মাতৃভাষা, গুজরাতি ছিল) মুসলমানকে এই সমিতির সভাপতিত্ব করতে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন [কালেক্টেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী, (১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯)]। এর আগে কেউ কখনও এত সুস্পষ্টভাবে জিন্নাকে 'মুসলমান' বলে অভিবাদন করেননি। জিন্না নিজেকে সব সময়েই সাহেব বলে মনে করতেন। অতএব গান্ধীজি যখন তাকে 'মুসলমান' বলে সম্বোধন করলেন তখন তিনি অপমানিত বোধ করলেন ['জিন্না অব পাকিস্তান,' স্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩৮]। জিন্না এবার থেকে গান্ধীজীকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে শুরু করলেন।

১৯১৬ সালে তিলক এবং এ্যানি বেশান্ত হোমরুল লীগ স্থাপন করলেন। প্রথমে হোমরুল লীগের উদ্দেশ্য ছিল—হোমরুল সম্বন্ধে বক্তৃতা, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা। জওহরলাল হোমরুল লীগের এলাহাবাদ শাখার জয়েণ্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। এ্যানি বেশান্ত ছিলেন 'নেহরু' পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

এই বছরে জিন্নার সুনাম এবং যশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। জিন্না তার আয়ের বেশ কিছুটা অংশ বোম্বাই হোমরুল লীগের জন্যে ব্যয় করতেন। লেজিসলেটিভ কৌন্সিলরের সদস্য হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম হয়েছিল। তিনি ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। তিনি কৌন্সিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে "ওয়াকফ্ বিলটি" পরিচালনা করে অনেকের প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। তিনি কৌন্সিলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে হয়ে বক্তৃতা দিতেন। হোমরুল লীগের মাধ্যমেই জিন্নার মতিলাল নেহরুর সঙ্গে পরিচয় হল। মতিলাল নেহরু তার বন্ধুদের কাছে জিন্নার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় "জাতীয়তাবাদী" নেতা বলতেন। কিন্তু পরে জিন্না এবং মতিলাল নেহরুর মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। মতিলাল নেহরুর ইচ্ছে ছিল, তিনি নিজে কিংবা তার ছেলে জওহরলাল নেহরু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনা করবেন। কিন্তু জিন্না নিজেও অহঙ্কারী ছিলেন এবং তিনি মতিলালকে এক "প্রাদেশিক এ্যাডভোকেট" হিসাবে গণ্য করতেন। অতএব কেউ কারুর কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত ছিলেন না ['জিন্না অব পাকিস্তান', স্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৪২]।

১৯১৬ সালে 'চরমপন্থী' এবং 'মধ্যপন্থীরা' আবার এক হলেন। এ ছাড়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্র হয়ে "লখনউ চুক্তি" করল। এই "লখনউ চুক্তির" খসড়া মতিলাল নেহরুর এলাহাবাদের বাসভবনে করা হয়েছিল। "লখনউ চুক্তির" বিশেষত্ব ছিল যে, কংগ্রেস লীগ এক হয়ে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দাবী করবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের লেজিসলেটিভ কৌন্সিলে মুসলমানদের জন্যে কিছু আসন 'সংরক্ষিত' রাখতে হবে। এবং কেন্দ্রে মুসলমানদের জন্যে এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। পাঞ্জাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট, বাংলায় চল্লিশ পার্সেন্ট, উত্তরপ্রদেশে ত্রিশ পার্সেন্ট, বিহার ও উড়িষ্যায় পঁচিশ পার্সেন্ট, এবং মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজে পনের পার্সেন্ট আসন মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

এই বছরে জিন্নার ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন ঘটল। এলাহাবাদে 'লখনউ চুক্তির' খসড়া তৈরি করে জিন্না ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিশ্রাম নেবার জন্যে দার্জিলিং-এ গেলেন এবং তাঁর বন্ধু স্যার দীনশা পেতিতের বাড়িতে অতিথি হলেন। স্যার দীনশা বোম্বাই'র এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তার ষোল বছরের একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল 'রতনবাঈ', সবাই তাকে আদর করে "রোটি" বলে ডাকত। জিন্না যখন দার্জিলিং-এ বেড়াতে এলেন তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ। জিন্না প্রথম দর্শনেই রোটির প্রেমে পড়ে গেলেন।

জিন্না দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে প্রথমে আহমেদাবাদে এবং পরে বোম্বাই'র এক সভায় 'হিন্দু-মুসলমানের' একতার উপর জোর দিয়ে এক বক্তৃতা দিলেন। তার বক্তৃতার সারাংশ ছিল, হিন্দু-মুসলমানের একতা ছাড়া দেশ এগোতে পারবে না। তিনি আবার 'অখণ্ড ভারতের' জন্যে 'স্বায়ত্তশাসন' দাবী করলেন।

জিন্না সরকারের কাছে 'লখনউ চুক্তি' গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। জিন্নার কিছু বন্ধু 'লখনউ চুক্তির' কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। জিন্না তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'যদি হিন্দুরা মুসলমানদের স্বার্থকে অবহেলা করে কোন আইন পাশ করতে চায় তাহলে সে-দিনই 'লখনউ চুক্তির' ইতি হবে।' দেশে স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করবার জন্যে হিন্দুদের সাহায্য দরকার হবে ['মুহম্মদ আলি জিন্না', এম. এইচ. সৈয়দ, পৃষ্ঠা-১১৯]।

১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ অধিবেশনে মৌলানা মুহম্মদ আলিকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছিল। মৌলানা মুহম্মদ আলি এবং তার ভাই শৌকত আলি কলকাতায় 'হমদর্দ' এবং 'কমরেড' নামে দুইটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই

পত্রিকায় তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি জানান হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক ইংরেজের বিরোধী ছিল। অতএব শত্রুর প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্যে আলি ভ্রাতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কী কারণে এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অনেকদিন ব্রিটিশ সরকার তার কারণ জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করেননি। পরে এ্যাসেম্বলীতে জিন্নার এক প্রশ্নের জবাবে সরকার কারণ ব্যক্ত করলেন। গান্ধীজি আলি ভ্রাতাদের গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু একই সময়ে তিনি ভারতীয়দের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। অনেকের কাছে গান্ধীজির এই ব্যাপারে দুই নীতি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হল না। জিন্না ভারতীয়দের সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেবার বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর বক্তব্য ছিল যতদিন না ইংরেজ এবং ভারতীয়দের সমান এক দৃষ্টিতে দেখা হয়, ততদিন ভারতীয়দের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া উচিত হবে না।

১৯১৫ সালে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আগমন হল। কিন্তু প্রথম তিন বছর তিনি কোন সক্রিয় আন্দোলন করেননি। ১৯১৮ সালে বিহারের চম্পারন গ্রামে গান্ধীজি নীলচাষে ইংরেজ মালিকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে জনপ্রিয় নেতা হয়েছিলেন। এ ছাড়া আহমেদাবাদের কাপড়ের মিলের মজদুরদের অভাব-অভিযোগের সমর্থন করে তিনি মিল শ্রমিকদের প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের সময় গান্ধীজির সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলাপ হল। এই দুজনের উপরেই গান্ধীজি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইতিমধ্যে জিন্না এবং রোটির মধ্যে প্রেম ভালবাসা আরও দৃঢ় হল। জিন্না এতদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর জোর দিচ্ছিলেন। এবার তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এই দুই সম্প্রদায়কে এক করবার চেষ্টা করলেন। একদিন স্যর দীনশার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে জিন্না দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জিজ্ঞেস করলেন। এই প্রশ্নের পেছনে যে আর একটি গোপন কারণ লুকান আছে এই কথা ঐ মুহূর্তে স্যর দীনশার মনে হয়নি। তিনি সরল মনেই এই প্রশ্নের জবাব দিলেন, বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। এই ধরনের দুই সম্প্রদায়ের বিবাহ জাতীয় সংহতিকে আরও দৃঢ় করবে। জিন্না এই জবাবের সুযোগ নিয়ে এক মুহূর্ত দেরী না করে বললেন: আমি আপনার মেয়ে রোটিকে বিয়ে করতে চাই।

স্যর দীনশা এই বিয়ের প্রস্তাব শুনে হকচকিয়ে গেলেন। তিনি জিন্নার কাছ থেকে এই ধরনের বিয়ের প্রস্তাব শুনতে পাবেন আশা করেননি। তিনি বুঝতে পারলেন জিন্না তাঁর জবাবের সুযোগ নিয়েছেন। স্যর দীনশা রেগে গেলেন

এবং জিন্নার সঙ্গে রোটির বিয়েতে অমত জানালেন। জিন্না তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্যর দীনশার মতের কোন পরিবর্তন হল না। বরং তিনি রোটিকে জিন্নার সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু রোটি কিংবা জিন্না এই নিষেধ মানলেন না। এ ছাড়া কয়েক মাস পর রোটির বয়স আঠার পূর্ণ হল। এবার রোটিকে ঘরে আটকে রাখা গেল না। স্যর দীনশা কোর্টের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু জিন্না ছিলেন সুচতুর ব্যারিষ্টার। অতএব আইনের লড়াইতে জিন্নার জয় হল। ১৯শে এপ্রিল, ১৯১৮ সালে জিন্না রোটিকে ইসলাম ধর্মানুযায়ী বিয়ে করলেন। এই বিয়েতে স্যর দীনশা কিংবা তার কোন আত্মীয়-স্বজন যোগ দেননি। জিন্নার বন্ধুদের মধ্যে রাজা স্যর মামুদাবাদ বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।

'হানিমু'' থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে জিন্নার বোম্বাই'র গভর্নর লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ শুরু হল। এই ঝগড়ার বিভিন্ন কারণ ছিল। একটি কারণ হল, দিল্লীতে যুদ্ধ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে মত-বিরোধ দেখা দিল। এই সম্মেলনে আলি ভ্রাতাদের আমন্ত্রণ করা হল না। গান্ধীজি প্রথমে এই সম্মেলনে যোগ দিতে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু পরে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড এবং তার সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করবার পর গান্ধীজি সম্মেলনে যোগ দিলেন। কথা ছিল গান্ধীজি ভারতীয়দের সৈন্য-বাহিনীতে রিক্রুট করবার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন॥ তিনি করেছিলেনও ··কিন্তু পরে তার অনুতাপ হয়েছিল ['গান্ধীজির আত্মজীবনী', পৃষ্ঠা-৫৪৩]।

জিন্না এই ব্যাপারে গান্ধীজির নীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করে জানালেন, আমরা দেশের যুবকদের শুধুমাত্র নীতির জন্য লড়াই করতে বলতে পারিনে······যেদিন তারা বুঝতে শিখবে যে তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে···সেইদিনই তারা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করবে···একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কংগ্রেস লীগের স্কীম অনুযায়ী দেশকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'ক।···['জিন্না,' এম. এইচ. সৈয়দ, পৃষ্ঠা-১৮১] এই সময়ে যদি গান্ধীজি এবং জিন্না একমত হয়ে কাজ করতে পারতেন তাহলে পরবর্তী জীবনে জিন্না গান্ধীজিকে এত অবিশ্বাস করতেন না।

তিলক এবং এ্যানি বেশান্ত জিন্নার সঙ্গে একমত হলেন, যদিও তিলক এ্যানি বেশান্তকে সুনজরে দেখতে পারতেন না।

বোম্বাই'র গভর্নর লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে মতবিরোধ এবং সেই থেকে জিন্নার সঙ্গে তার বিবাদ বেশ জোরাল হল। ১০ই জুন, ১৯১৮ সালে লর্ড উইলিংডন বোম্বাইতে এক প্রাদেশিক 'যুদ্ধ সম্মেলন' আহ্বান করেছিলেন। লর্ড উইলিংডন তাঁর বক্তৃতায় হোমরুল লীগের সদস্যদের কার্যকলাপের নিন্দা করলেন। (কিছুদিন

আগে মাদ্রাজ সরকার এ্যানি বেশান্তকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।) তিলক প্রতিবাদ করে বললেন যে, হোমরুল ছাড়া হোম ডিফেন্স গঠন করা সম্ভব নয়। তিলককে সভাকক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হল। পরে জিন্না লর্ড উইলিংডনের আচরণের সমালোচনা করে বললেন, হোমরুলের সদস্যরা সবাই আন্তরিক-ভাবে দেশপ্রেমিক, কিন্তু গভর্নর এদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন এরা সবাই মাতৃভূমি এবং সাম্রাজ্যকে এই লড়াইতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই সাহায্য করবার কী শর্ত, কী পন্থা আগে ঠিক করতে হবে? কারণ, হোমরুল সরকারের নীতিকে সমর্থন না করে তিলক সরকারের নীতিকে সংশোধন করবার চেষ্টা করছিলেন··যদি গভর্নর শিক্ষিত লোকদের সাহায্য চান তাহলে তারা এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করুন যেন আমরা সবাই বুঝতে পারি, আমরা এই সাম্রাজ্যের নাগরিক এবং সম্রাটের চোখে আমরা সবাই সমান ['জিন্না', এম. এইচ. সৈয়দ, পৃষ্ঠা-১৮৮]।

শুধু সরকারি কাজকর্মে নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারেও জিন্নার সঙ্গে লর্ড উইলিং-ডনের কোন সদ্ভাব ছিল না। এর কারণও ছিল।

একবার বোম্বাই'র গভর্নমেন্ট হাউসে লর্ড উইলিংডন জিন্না এবং তাঁর স্ত্রীকে এক সামাজিক ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ডিনারে রোটি ও জিন্না খুব সেজেগুজে এসেছিলেন।· তার পরনে ছিল প্যারিসে তৈরি হাল ফ্যাসানের এক লেটেস্ট সূক্ষ্ম গাউন। লেডী উইলিংডন মিসেস জিন্নার এই সূক্ষ্ম গাউন দেখে চাকরকে ডেকে বললেন, মিসেস জিন্নার গায়ে ঠাণ্ডা লাগবার সম্ভবনা আছে। গায়ে জড়িয়ে দেবার জন্যে একটি শাল নিয়ে এসো।

জিন্না লেডী উইলিংডনের এই মেমসাহেবী মেজাজকে একেবারেই সহ্য করতে পারলেন না। তিনি লেডী উইলিংডনকে বললেন, মিসেস জিন্না যদি ঠাণ্ডা অনুভব করেন তাহলে তিনি নিশ্চয় গায়ে দেবার জন্যে শাল চাইবেন। এই বলে জিন্না-দম্পতি গভর্নমেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে গেলেন। এর পর তিনি জীবনে কোনদিন বোম্বাই'র গভর্নমেন্ট হাউসে পা দেননি ['জিন্না অব পাকিস্তান', ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৫৬]।

১৯১৭ সালে এ্যানি বেশান্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু ১৯১৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেসের তরুণদল এবং চরম-পন্থীরা এ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বকে অস্বীকার করল। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই ছিল যুবক সম্প্রদায়। এ ছাড়া কংগ্রেস দলেরও বেশ পরিবর্তন হয়েছিল। অনেক মধ্যপন্থী সদস্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু 'হোমরুল'-এর কার্যকলাপ দেশে এক নতুন উদ্দীপনা এবং আত্মবতা সৃষ্টি করেছিল।

অতএব এক নতুন আশা-উদ্দীপনার বাহক হয়ে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর সঙ্গে রইলেন নেহরু এবং প্যাটেল।

গান্ধীজি যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাতে নিলেন তখন কংগ্রেস ছিল 'পুরান পন্থীদের' হাতে। কংগ্রেসকে এই সময়ে 'বিপ্লবী' দল বলা সম্ভব ছিল না। কারণ কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের কাছে 'গড সেভ দি কিং' এবং চিঠিপত্রে কংগ্রেস লিখত : It's Most Loyal Homage to His Gracious Majesty, the King Emperor.

এবার নেহরু এবং আরও কিছু সদস্য কংগ্রেসকে নতুন শক্তিশালী দল করবার চেষ্টা করলেন।

১৯১৬ সালে যুদ্ধের সময় বিনা বিচারে গ্রেপ্তার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খব করবার জন্যে "ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া" আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু সবাই আশা করেছিল যে, যুদ্ধের পরে এইসব আইন রদ করা হবে। কিন্তু এ কাজ করা হল না। বরং স্যর সিডনী রৌলাটের অধীনে এক কমিটি গঠন করা হল। কমিটি একটি বিল তৈরি করল এবং বিলের আইন অনুযায়ী যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তারও আটক করে রাখা সম্ভব হবে। এই আইন 'রৌলাট এ্যাক্ট' নামে সবার কাছে পরিচিত। জনসাধারণের কাছে এই আইন 'কালা কানুন' নামে পরিচিত হল। গান্ধীজি ভাইসরয়কে এই 'কালা কানুন' রদ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভাইসরয় গান্ধীজির আবেদনে কান দিলেন না, এবং ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে এই কালা কানুন ৩৫-২২ ভোটে এসেম্বলীতে গৃহীত হল। এর প্রতিবাদে এক সত্যাগ্রহ সমিতিগঠন করা হল। ঠিক হল সত্যাগ্রহ সমিতির সদস্যরা এই 'কালা-কানুনের' প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করবে। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হবে সত্যাগ্রহ দিবস। ঐদিন সবাই অনশন কিংবা সভা সমিতি করবে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল। গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হল। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। বিভিন্ন শহরে সভা সমিতি, মিছিল, শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হল। গান্ধীজি পরে এই আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সব চাইতে বেশি গোলমাল হল পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে। ১০ই এপ্রিল, ১৯১৯ সালে অমৃতসর শহরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শহরের দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ডাঃ কিচলু এবং সত্যপালকে তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠালেন এবং পরে তাঁদের আটক করে রাখলেন। কিন্তু বাজারে এই গ্রেপ্তারের খবর রটে গেল। জনতা একত্র হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে মিছিল করে যাবার চেষ্টা করল। পুলিশ গুলি চালাল এবং ভয় পেয়ে সরকার মার্শাল আইন জারী করলেন, এবং মার্শাল আইনের কর্তা হলেন মাইকেল ওডায়ার।

অমৃতসর শহরের মধ্যিখানে জালিয়ানাওলাবাগ বলে একটি পার্ক আছে। এই পার্কে যাবার একটিমাত্র পথ ছিল, বাকী তিনদিক ছিল বন্ধ। ১৩ই এপ্রিল এই পার্কে এক উৎসব উপলক্ষে বেশ কিছু জনতা একত্র হয়েছিল। ওডায়ার এবার ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাস্তার পথ রুখে দাঁড়ালেন। তারপর কাউকে কোন সতর্ক না করে প্রায় দশ মিনিট ধরে তার সৈন্যবাহিনী গুলি চালাল। মোট ১৬৫০ রাউণ্ড গুলি চালানো হয়েছিল। এই গুলি চালনার ফলে চারশো জন নিহত ও বারোশ জন আহত হয়েছিল। সাঁজোয়া বাহিনী রাস্তার মুখে দাঁড়িয়েছিল এবং কোন ডাক্তার, এ্যাম্বুলেন্স আহতদের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া যারা ঐ পথ দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করল তাদের হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে হল। রাস্তায় 'বন্দেভক্ত'দের উপর বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল। পরে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে, যারা কার্ফু লঙ্ঘন করেছিল তাদের বেত মারা হয়েছিল। এছাড়া অমৃতসর শহরের সব জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রায় আটক করে রাখা হয়েছিল।

দেশব্যাপী ওডায়ারের গুলি চালনার তীব্র প্রতিবাদ করা হল। এই প্রতিবাদ এত জোরালো হয়েছিল যে সরকার ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে হাণ্টার কমিশন নিয়োগ করল। এই কমিশনে চারজন ইংরেজ এবং চারজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন। কমিশনের রিপোর্টে সমস্ত ঘটনার জন্যে "দুঃখ" প্রকাশ করা হল এবং ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক" বলা হল। জালিয়ানাওলাবাগের এই নরকীয় হত্যাকাণ্ড ভারত-ইংল্যাণ্ডের মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করল। ১৯১৯ সালে জুন মাসে কংগ্রেস পাঞ্জাবের এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করবার জন্যে এক কমিটি গঠন করেছিল। গান্ধীজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, মালভিয়া এই কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। জওহরলাল হলেন দেশবন্ধুর সেক্রেটারী এবং দেশবন্ধু ও তিনি এই হত্যাকাণ্ডের খবর সংগ্রহ করতে শুরু করলেন [এই ঘটনার পুরো বিবরণী— 'নেহরু,' মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃঃ-৩৯, ' নেহরু, এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফী,' মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা—৬৩-৬৫ এবং জন্ম অব পাকিস্তান,' ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৬৪ এবং 'প্রথম খণ্ড নেহরু', এস. গোপাল, পৃষ্ঠা—৩৫-৩৬ থেকে নেওয়া হয়েছে]। জিন্না সবাইকে জালিয়ানাওলাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা চিন্তা করে দেখতে বললেন। পরে তিনি কলকাতার মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে জালিয়ানাওলাবাগের হত্যাকাণ্ডকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি জালিয়ানাওলাবাগের হত্যাকাণ্ড 'বিবেচনার ভুল" হয় তাহলে 'ব্রিটিশ সরকার কে এই ভুলের জন্যে সাজা পেতে হবে আজ না হয় কাল। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম বন্ধ করা চলবে না। হয়ত জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সময় থেকে গান্ধীজির ভাগ্য-তারকা মধ্যাহ্ন

গগনে উঠেছে; তার নিজের খ্যাতির ভাঁটা পড়বার সম্ভাবনা আছে। জালিয়ানাওলাবাগ ঘটনার কিছুদিন আগে তিনি 'রৌলট এ্যাক্ট' অর্থাৎ কালা কানুনের প্রতিবাদে এসেম্বলীর সদস্যর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।

এর আগে ১৯১৭ সালে সেক্রেটারী অব স্টেট্স এড্উইন মণ্টেগু ভারত পরিভ্রমণ করতে এসেছিলেন। পরে তিনি ভারতের শাসনতন্ত্রের কিছু সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করলেন। অবশ্যি এই সংস্কার সাধনে ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেবার কথা উল্লেখ করা হল না বটে, তবে বলা হল কিছু কিছু ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শাসনতন্ত্রকে এইভাবে ভাগ করে কাজ করবার প্রথাকে বলা হয় 'ডায়ারকি' অথবা 'দ্বৈত শাসন'। এই 'দ্বৈত শাসন' অনুযায়ী দেশের শাসনভার ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঠিক হল কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী শাসনতন্ত্রের সমস্ত দায়িত্ব সেক্রেটারী অব স্টেট্সের হাতে ন্যস্ত থাকবে। তবে পার্লামেণ্টকে দুই ভাগ করা হবে। কৌন্সিলে এবং এসেম্বলী করা হবে। এসেম্বলীর সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। তবে এর মধ্যে কিছু মনোনীত সদস্য থাকবে। যদি কোন কারণে কোন বিশেষ আইন এসেম্বলী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে কিংবা বাতিল করে দেয়, তাহলে ভাইসরয় তাঁর 'বিশেষ ক্ষমতা' দ্বারা ঐ বিলটিকে গ্রহণ এবং আইন করতে পারবেন। প্রদেশগুলিতে এই ধরনের কৌন্সিল ও এসেম্বলী থাকবে এবং এদের হাতেও কিছু ক্ষমতা দেওয়া হবে। কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া প্রদেশের ফিনান্স, বিচার, পুলিশ বিভাগ গভর্নরের নিজের হাতে থাকবে। তবে নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এ ছাড়া গভর্নরদের হাতে 'বিশেষ ক্ষমতা' থাকবে।

মণ্টেগুর এই সংস্করণের প্রস্তাব এবং এই রিপোর্টের জবাব দেবার জন্যে কংগ্রেস ও লীগের এক কমিটি গঠন করা হল। জিন্না হলেন এই কমিটির একজন সদস্য।

সংস্কারের প্রস্তাবের জবাবে কমিটি বলল যে, তারা এই রিপোর্টের আংশিক অংশগ্রহণ করতে রাজি আছেন এবং 'লখনউ চুক্তির' কাঠামোর ভিত্তিতে এক দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই হল কমিটির একমাত্র দাবী। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু মতভেদও দেখা দিল। কারণ, গান্ধীজি এবং আরও কিছু নেতা মণ্টেগুর রিপোর্টের মধ্যে সরকারের সংস্করণের ইচ্ছার আভাস পেলেন। জিন্না বললেন: আমরা মণ্টেগুর এই রিপোর্টকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে রাজি আছি। দেশবন্ধু 'দায়িত্বশীল সরকার' দাবী করলেন।

যুদ্ধের শেষভাগে লর্ড উইলিংডনের বোম্বাই থেকে বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে

এল। এর পরে তিনি ভাইসরয় হয়ে ভারতে আর একবার ফিরে এসেছিলেন।

জিন্না খবর পেলেন লর্ড উইলিংডনের কিছু পার্শী বন্ধু তার জন্যে এক বিদায় সভার আয়োজন করেছেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পার্শী ব্যবসায়ী জামসেদজী জিজিভয়। তিনি আফিমের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন। ঠিক করা হয়েছিল বোম্বাই'র টাউন হলে বিকেল পাঁচটার সময় এই সম্বর্ধনা সভা হবে। জিন্নার প্রায় তিনশো সমর্থক টাউন হলকে ঘিরে দাঁড়াল। জিন্না নিজেও গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুপুর নাগাদ রোটি জিন্না টিফিন ক্যারিয়ার করে তার স্বামীর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এলেন। পরে তিনি এই বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দিলেন। পাঁচটার পর তারা সবাই গিয়ে হলঘরে বসলেন। যেই বোম্বাই'র শেরীফ এবং সভার উদ্যোক্তারা হলঘরে এসে হাজির হলেন অমনি চারদিক থেকে গোলমাল শুরু হল। পুলিশ কমিশনার এসে জিন্না দম্পতিকে এবং তাঁদের সমর্থকদের হলঘর থেকে বের করে দিল। বাইরে বিরাট জনতা দাঁড়িয়ে ছিল। জিন্না এসে এবার এই জনতাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন: আজ একটি স্মরণীয় দিবস। আজ জনগণের সমবেত শক্তির কাছে 'ব্যুরোক্রেসি' নতি স্বীকার করেছে। জনতা জয়ধ্বনি দিল।

পরে জিন্নাকে নিয়ে এক বিরাট মিছিল বার করা হল। রাত্রে বোম্বাইর শান্তারাম হলে এক জনসভা হল। উপস্থিত জনতা সবাই জিন্নাকে তাঁর কাজের জন্যে অভিনন্দন জানাল। পরে চাঁদা সংগ্রহ করা হল। মোটা চাঁদা সংগ্রহ হল ৬৫,০০০ টাকা (১৯১৮ সালে ৬৫,০০০ টাকার মূল্য কম ছিল না)। এই টাকা দিয়ে জিন্নার সম্মানার্থে এক স্মৃতিচিহ্ন করা হল।

আজও বোম্বাই'র কংগ্রেস প্রাঙ্গণে এই স্মৃতিচিহ্ন, এই মেমোরিয়াল হল দেখতে পাওয়া যাবে। এর নাম হল পি. জে. হল, পুরো নাম হল পিপল্‌স জিন্না মেমোরিয়াল হল। জিন্নার সম্মানার্থে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বোম্বাই'র নাগরিকদের দান। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই সময়ে জিন্না ছিলেন ইংরেজ শাসনের বিরোধী এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের একজন প্রধান নেতা। এবার বলব, কেন এবং কী করে জিন্না কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে গেলেন এবং কী করে পাকিস্থান গঠন করলেন।

* * *

১৯১৯ সালে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। মতিলাল সভাপতিত্ব করলেন। গান্ধীজি সবাইকে শান্ত এবং সদাচারী হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। এ ছাড়া তিনি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম গ্রহণ করবার জন্যে আবেদন করলেন—যদিও এই প্রস্তাবে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৯ সালে মণ্টেগু সংরক্ষণ প্রস্তাব আইনে পরিণত হল। এই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হল। বিলের একটি ধারা অনুযায়ী লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সম্প্রসারণ করা হল এবং দুই কক্ষের সদস্য সভা করা হল।

কংগ্রেসের মত লীগেরও অধিবেশন অমৃতশহরে করা হল। জিন্না লীগ এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই অধিবেশনে ঠিক করা হল যে, লীগের পরবর্তী অধিবেশনে জিন্না হবেন সভাপতি।

জিন্না মুসলিম লীগের অনুরোধে লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের কাছে মুসলমানদের 'স্বার্থরক্ষার' জন্যে দরবার করতে গেলেন। তার স্ত্রী রোটিও তার সঙ্গে গিয়েছিলেন। ১৪ই আগষ্ট ১৯১৯, জিন্না, রোটি এবং চমনলাল এক থিয়েটার দেখতে গেলেন। এই থিয়েটারে রোটির প্রসব বেদনা উঠল। তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর মাঝ রাত্রে ১৪-১৫ই আগষ্ট ১৯১৯, জিন্নার কন্যা-সন্তান দীনার জন্ম হল। ভাগ্যের পরিহাসে প্রায় আঠাশ বছর পরে একই দিনের রাত্রে জিন্নার দ্বিতীয় সন্তান 'পাকিস্থানের' জন্ম হয়েছিল। স্যার দীনশা অবশ্যি তার কন্যা এবং নাতনিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

লণ্ডনে থাকাকালীন জিন্না লীগের প্রস্তাব নিয়ে লয়েড জর্জের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই দেখা-সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ হয়নি।

*　　　*　　　*

তিলক মারা যাবার পর গান্ধীজির প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা দেশে আর কেউ রইল না। ১লা আগষ্ট ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবার দিন ধার্য হল। ঐ দিনই লোকমান্য তিলক মারা গেলেন। গান্ধীজি এবং নেহরু বোম্বাইতে তিলককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এলেন।

পরের মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হল। আলোচনার বিষয় ছিল গান্ধীজির প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলন। কিছু নেতারা গান্ধীজির এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। জিন্না, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিন পাল এদের মধ্যে ছিলেন।

তারা গান্ধীজির এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে রাজী হলেন না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই দল থেকে মতিলাল নেহরু চলে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাঁর দলকে শক্তিশালী করলেন। এ ছাড়া গান্ধীজিকে প্রচুর সাহায্য করলেন বোম্বাই'র ব্যবসায়ী মিয়া মুহম্মদ ছোটানী। ছোটানী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক ভাড়া করে এনে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে জড়ো করেছিলেন এবং

এঁরা গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ['জিন্না অব পাকিস্থান', ষ্টানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৬৯]।

গান্ধীজির এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর অসহযোগ হল কংগ্রেসের সরকারী নীতি। গান্ধীজির কর্মসূচী ছিল সহজ ও সংক্ষিপ্ত। প্রথমত বলা হল, ১৯১৯ সালের সরকারী আইন অনুযায়ী যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে, সেই নির্বাচনকে বয়কট করতে হবে। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করা এবং কোর্ট-কাছারি বর্জন করা হবে।

নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, এই অধিবেশনে জিন্না তার গান্ধীজি-বিরোধী মতবাদ পেশ করবার কোন সুযোগ পেলেন না এবং এরপর তিনি কংগ্রেস সংস্থা থেকে পদত্যাগ করলেন। দ্বিতীয়ত, বাংলা থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং অনেক কংগ্রেস সদস্য নাগপুরের এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং দেশবন্ধু গভীর রাত অবধি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজির মত পরিবর্তন করাতে পারেননি। এরপর থেকে গান্ধীজি হলেন কংগ্রেস সংস্থার একচ্ছত্র অধিপতি এবং তিনি এর পর আর পেছনে ফিরে তাকাননি, অর্থাৎ তিনি তাঁর নীতি কিংবা কর্মসূচী তৈরি করবার জন্যে কারুর কাছে কোন জবাবদিহি করেন নি।

নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্না যখন গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠলেন, তখন সদস্যরা তাঁকে বাধা দিল। তিনি যেই বললেন, 'মিষ্টার গান্ধী ' অমনি সদস্যরা চিৎকার করে উঠল। তারা বলল, 'মিষ্টার গান্ধী নয়, বলুন মহাত্মা গান্ধী।' জিন্না বক্তৃতা দেবার আর কোন সুযোগ পেলেন না। এর পর তিনি এবং বৌটি জিন্না ট্রেনে করে বোম্বাই চলে গেলেন। জিন্না মুসলিম লীগের নাগপুরের অধিবেশনে যোগ দেবার প্রয়োজনীয়তা মনে করলেন না।

* * *

নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে ঠিক হল যে 'স্বরাজ' হবে কংগ্রেসের সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু· 'শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ে এই স্বরাজ আনতে হবে'। কিন্তু গান্ধীজি স্বরাজ বলতে কী চান, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না পূর্ণ স্বাধীনতা, ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না। স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু পরে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সদস্যের কাছে লেখা এক চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন· জনগণ হয়ত গান্ধীজির প্রস্তাবের কিংবা স্বরাজ কথার পুরো তাৎপর্য্যের মানে বুঝতে পারবে না· (স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সদস্য স্যর উইলিয়াম ভিনসেন্টের কাছে ৯ই অক্টোবর ১৯২১ সালে স্যর তেজ বাহাদুরের লেখা চিঠি)। জিন্না প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বরাজ' বলতে

গান্ধীজি কী বলতে চান? তিনি কি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না পূর্ণ স্বাধীনতা চান? জিন্না বললেন যে গান্ধীজির এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হবে।

নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, এর পর কংগ্রেস সংস্থাকে একটি জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা হবে। ঠিক হল, এবার থেকে বছরে একবার কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হবে এবং এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া সারা দেশকে ভাষাগত ভিত্তিতে ভাগ করা হবে। প্রতিটি প্রদেশে প্রদেশ কংগ্রেস থাকবে। পরে প্রদেশ কংগ্রেসকে জিলা, শহর, তালুকে, গ্রামে ভাগ করা হবে। কংগ্রেসের সবচাইতে বড কার্যনির্বাহক সমিতি হবে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস সমিতি। এই কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য-সংখ্যা হবে তিনশো থেকে চারশো এবং কংগ্রেসের নিয়ম ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে নির্বাহক সমিতিকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল। এবং এই কার্যনির্বাহক সমিতি এক কার্যকরী সমিতি অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবে। কার্যকরী সমিতি কংগ্রেসের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এই কার্যকরী সমিতি হল, 'হাই কম্যাণ্ড'। এই সংস্থায় প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী থাকবে। এতদিন কংগ্রেস ছিল বড়লোক, উচ্চশ্রেণীর সংস্থা এবং এবার থেকে কংগ্রেস হল চার আনার সদস্য অর্থাৎ জনগণের প্রতিষ্ঠান।

* * *

নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবার আগে বোম্বাইতে ৩রা অক্টোবর ১৯২০ সালে হোমরুল লীগের এক সভা হয়েছিল। গান্ধীজি এবং জিন্না উভয়েই এই সভায় যোগ দিলেন। গান্ধীজি সভাপতিত্ব করলেন। গান্ধীজি তার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্দেশ্যানুযায়ী এবং ভারতের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী 'পূর্ণ স্বরাজ্য' পাবার জন্যে হোমরুল লীগের আদর্শকে পরিবর্তন করতে চাইলেন। জিন্না আপত্তি করে বললেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য হবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কাঠামোর মধ্যে দেশের জন্যে সংবিধানানুযায়ী স্বায়ত্বশাসন দাবী করা।' কিন্তু গান্ধীজি জিন্নাকে স্পষ্ট বললেন, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক থাকেন তাহলে তিনি (জিন্না) হোমরুল লীগ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। ঐ সভায় মাত্র একষট্টিজন সদস্য যোগ দিয়েছিলেন। জিন্নার বন্ধু জমনাদাস এবং কানজী দ্বারকাদাস সংশোধন প্রস্তাব আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। জিন্না এবং তার বন্ধুরা নিরাশ হয়ে সভা থেকে চলে গেলেন। গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হল। মাত্র আঠারজন জিন্নার সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এর পর জিন্না হোমরুল লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন। গান্ধীজি জিন্নাকে তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পূর্ণবিবেচনা করে

দেখতে বললেন। এর জবাবে জিন্না এক চিঠি লিখে গান্ধীজিকে জানালেন : 'আমি আপনার কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারব না। আজ দেশবাসীরা বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন মতে বিভক্ত · আপনার কর্মসূচী দেশের প্রতিষ্ঠানকে বিভক্ত করেছে। আপনি শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেননি, আপনি হিন্দু-হিন্দুদের মধ্যে, মুসলমান-মুসলমানদের মধ্যে, এমনকি বাপ-ছেলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন।'

তিনি আরও বললেন, 'আজ দেশবাসীরা হতাশ হয়ে পড়েছে আপনার কর্মসূচী শুধু অনভিজ্ঞ, নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত যুবকদের আকৃষ্ট করেছে এর পরিণাম যে কি হবে আমি কল্পনা করতে চাইনে আমি জানি যে বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে সরকার দায়ী। আমরা যদি মূল কারণের সমাধান না করতে পারি, তাহলে এর ফলভোগ আমাদেরই করতে হবে। আমি চাইনে আমার দেশবাসীরা ধ্বংসের পথে যাক · · ' ['জিন্না অব পাকিস্তান', ষ্টানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ৭০]।

* * *

জিন্নার অনুমানও আশঙ্কা সত্যি হয়েছিল। কারণ, নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনের পর সত্যাগ্রহ আন্দোলন মাত্র চৌদ্দ মাস ধরে চলল। প্রথমত এই আন্দোলনের শুরু খুব আশাপ্রদজনক হল না। ছাত্ররা সবাই প্রথমে স্কুল-কলেজ বর্জন করল না। কিছু কিছু উকিল-ব্যারিষ্টাররা আইন ব্যবসা ত্যাগ করলেন। এর মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মোতিলাল ছিলেন। কিন্তু সর্বত্রই এই অসহযোগ আন্দোলন বিশেষ সাড়া সৃষ্টি করল না। আন্দোলন ব্যর্থ হল ['নেহরু', এস গোপাল, পৃষ্ঠা-৫৪]। ১৯২১ সালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে পুলিশের গ্রেপ্তার।

জওহরলাল নেহরু এলাহাবাদে এক জনসভা করেছিলেন। গান্ধীজি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সরকার বিরোধী বক্তৃতা দেবার জন্যে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা হল। সরকার ইচ্ছে করেই গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করলেন না। কারণ, ইতিমধ্যে গান্ধীজি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে সরকার দেশে গোলমাল বাড়াতে চাইলেন না। জওহরলাল নেহরুকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হল না। কারণ গভর্নর বাটলার বললেন যে, কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলে তারা জনগণের সহানুভূতি অর্জন করতে পারে না।

১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত ভ্রমণে এলেন। আন্দোলন এবং গোলমালের আশঙ্কা করে পুলিশ মোতিলাল এবং জওহরলাল নেহরুকে গ্রেপ্তার করল।

গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হল না। নেহরু জেলে থাকাকালীন গান্ধীজি আবার সবাইকে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বিদেশী জিনিষ এবং বিদেশী কাপড় বর্জন করা হল। এবং কিছু কিছু ছাত্ররা স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন ছিল অহিংস। কিন্তু ৫ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২২ সালে উত্তরপ্রদেশের চোরীচওড়া গ্রামে এক দুর্ঘটনা ঘটল। কিছু কংগ্রেস সদস্য এবং কিষাণ চৌরীচওড়া গ্রামের থানা আক্রমণ করল। আক্রমণের দরুণ প্রায় বাইশজন পুলিশ কর্মচারী নিহত হল। এই খবর পেয়ে গান্ধীজি তার সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। গান্ধীজি বললেন যে, আমরা এখনও অহিংস আন্দোলনের জন্যে তৈরি হইনি। গান্ধীজির আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সরকার এবং দেশবাসীকে বিস্মিত ও অবাক করল। এরপর থেকে সরকার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের এবং বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল।

* * *

নাগপুরের পরে ১৯২১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী জিন্না পুনার 'সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির' এক সভায় বললেন : গান্ধীজির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু আমি তার কর্মসূচীকে গ্রহণ করতে পারব না।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে কংগ্রেসের এক অধিবেশন হল। সদস্যরা সবাই গান্ধীজিকে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করতে বললেন ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে জিন্না বোম্বাইতে অল পার্টি কনফারেন্স ডাকলেন। প্রায় তিনশোর বেশি লোক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

গান্ধীজিও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন সরকারের দমন-নীতির প্রতিবাদ করল।

চৌরীচওড়ার দুর্ঘটনার পর জিন্না এবং জয়াকর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু নাগপুর কংগ্রেস সম্মেলনের পর থেকেই জিন্নার গান্ধীজির প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল।

জিন্নার ব্যক্তিগত জীবনও বিশেষ সুখের ছিল না। স্ত্রী রোটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হতে লাগল। আইন ব্যবসায়ী হিসাবে চতুর্দিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জিন্না অধিকাংশ সময়ে তার আইন ব্যবসায়ের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। স্ত্রী রোটির দিকে তাকাবার সময়ে তার ছিল না। জিন্না যখন তার কেসের 'ব্রীফ' পড়তেন তখন রোটি জিন্নার টেবিলের উপর বসে তার পা নাচাতেন। কিংবা জিন্নার জন্যে প্রতীক্ষা করতেন, কখন তারা দুজনে একসঙ্গে

বেড়িয়ে যাবেন। জিন্না কোনদিনই তার স্ত্রীর এই আচার-ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করেননি। বিয়ের পর রোটি জিন্নার তাঁর বাবা-মা'র সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। অতএব রোটি জিন্না স্বামীর সঙ্গ না পেয়ে একা অনুভব করতেন। পরে রোটি জিন্না কিছুদিনের জন্যে লণ্ডনে চলে গেলেন।

৩রা মার্চ ১৯২২ সালে জওহরলাল নেহরু জেলখানা থেকে বেড়িয়ে এলেন। এই সময়ে আহমেদাবাদে গান্ধীজির বিচার হচ্ছিল। জওহরলাল আহমেদাবাদে গেলেন। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিত্যাগ করবার পর সরকার কিছুটা আশ্বস্ত হল। তারাও বুঝতে পারল গান্ধীজির কাছ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই, বরং যতদিন গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতা থাকবেন ততোদিন ভয়ের আশঙ্কা কম ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-৪৭]। কিন্তু সরকার নেহরুর প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখল। তাঁকে গ্রেপ্তার করল। পরে তাঁরা নেহরুর 'বিপ্লবের বুলিতে' ভয় পেয়েছিল এবং তাঁকে 'পরম শত্রু' হিসাবেই গণ্য করত। গান্ধীজি কিন্তু মানুষের চরিত্র ভাল বুঝতেন এবং তিনি নেহরুর চরিত্রের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলেন। পরে গান্ধীজিই বিদেশীদের কাছে নেহরুর মূল্য বাড়াবার জন্যে নেহরুকে "বিপ্লবী প্রগতিশীল নেহরু" হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই কাজে ব্রিটিশ সরকার যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পর পর নেহরুকে গ্রেপ্তার করে এবং জেলখানায় আটক রেখে ব্রিটিশ সরকার নেহরুকে জনগণের কাছে 'বিপ্লবী নেহরু' হিসাবে চিহ্নিত করল ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-৮৪]।

আহমেদাবাদের কোর্টের বিচারে গান্ধীজির আড়াই বছরের জেল হল। ১৯২৩ সালের জানুয়ারীতে নেহরুকে মুক্তি দেওয়া হল।

গান্ধীজির অবর্তমানে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি-বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেস দেশবাসীর মনের ভাব জানবার জন্যে 'সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স এনকোয়ারী কমিটি' নিয়োগ করল। এই কমিটির কাছে একটি প্রশ্ন রাখা হল : আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস কী নীতি অবলম্বন করবে? এই ব্যাপারে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু এসেম্বলীতে যোগ দেবার সপক্ষে ছিলেন। এদের বলা হত প্রো চেঞ্জার (Pro Changer)।

তারা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, কংগ্রেস নির্বাচনে যোগ দেবে এবং সংসদে ঢুকে সরকারের নীতির বিরোধিতা করবে। অপরদিকে ছিলেন গান্ধীজির ভক্তবৃন্দ, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের দল। এদের বলা হত 'নো চেঞ্জার' (No Changer)। 'নো চেঞ্জারের' দল দাবী করল যে, সংসদের নির্বাচনকে বয়কট করতে

হবে। ১৯২২ সালে গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে নো চেঞ্জারেরা জয়লাভ করলেন এবং গান্ধীজির নীতি অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন এবং নির্বাচন বয়কট নীতি গ্রহণ করলেন। প্রতিবাদ করে দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এবং 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করলেন। মতিলাল নেহরুও তাঁকে সমর্থন করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহরু জেলখানা থেকে বেড়িয়ে এলেন এবং 'প্রো চেঞ্জার' এবং 'নো চেঞ্জারের' মধ্যে মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করলেন। যদিও দুই দলের মধ্যে এক সাময়িক পূর্ণমিলন হল, তবু দুইপক্ষ কেউ কারুর কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হল না। নেহরু কংগ্রেসের মধ্যে এক 'সেণ্টার পার্টি' গঠন করলেন এবং তার মধ্যস্থতায় ঠিক হল 'প্রো চেঞ্জারে'র দল নির্বাচনে যোগ দেবে এবং 'নো চেঞ্জারে'র দল গান্ধীজির কর্মসূচী নিয়ে কাজ করবে।

১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি কেন্দ্রের সংসদে পঁয়তাল্লিশটি আসন পেল। প্রাদেশিক নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি সুবিধে করতে পারল না, যদিও বাংলাদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছিল। সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে (বর্তমান মধ্যপ্রদেশে) পার্টির নির্বাচনের ফলাফল খুব খারাপ হল না প্রদেশে স্বরাজ পার্টি সরকার গঠন করতে রাজি হল না। এ ছাড়া তারা ঠিক করেছিল যে, কেন্দ্রে সংসদের বিভিন্ন কাজে তারা বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

জিন্না বোম্বাই'র মুসলিম আসনের জন্যে প্রার্থী ছিলেন। জিন্নার বিরুদ্ধে স্বরাজ পার্টি তাদের প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। নির্বাচনের সময় একদিন জিন্না এবং তার সহকারী চাগলা লাঞ্চ খেতে বেরুচ্ছিলেন, এমন সময় রোটি জিন্না (তিনি ইতিমধ্যে লণ্ডন থেকে ফিরে এসেছিলেন) এক টিফিন বাস্কেটে করে স্বামীর জন্যে লাঞ্চ খাবার নিয়ে এলেন। রোটি জিন্না তার স্বামীকে আদর করে "জে" বলে সম্বোধন করতেন। 'জে' আজ তোমার জন্যে ভাল খাবার নিয়ে এসেছি....বলতো কী এনেছি? রোটি জিন্না জিজ্ঞেস করলেন।

আমি কী করে বলব? জিন্না উদাস কণ্ঠেই জবাব দিলেন। রোটি জিন্না এবার গলার স্বর উঁচু করে বললেন, তোমার জন্যে 'হ্যাম সাণ্ডউইচ' এনেছি। রোটির জিন্নার মুখে হ্যাম সাণ্ডউইচের নাম শুনে জিন্না প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, তুমি কী করেছ জান? আমি মুসলিম এলাকা থেকে মুসলিম প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছি। আমার মুসলমান ভোটাররা যদি জানতে পারে আমি হ্যাম সাণ্ডউইচ খাই, তাহলে ওরা আমাকে একটি ভোটও দেবে না (মুসলমানদের ধর্মে হ্যাম খাওয়া নিষেধ)। জিন্নার এই জবাব শুনে রোটি জিন্নার মুখ কালো হল। তিনি স্বামীর দিকে না তাকিয়ে টিফিন বাস্কেট নিয়ে ফিরে চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর জিন্না এবং চাগলা একটি ফ্যাসনেবল রেস্তোরাঁয় কফি এবং লাঞ্চ খেতে গেলেন। জিন্না দু'কাপ কফি এবং দুটু প্লেট সসেজ (পর্ক মুসলমানদের খাওয়া নিষেধ) অর্ডার দিলেন। তারা যখন কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েছেন তখন এক গরীব মুসলমান ভিখিরী এবং তার ছেলে ভিক্ষের জন্যে তাদের কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াল। কিন্তু জিন্না এবং চাগলা সন্দেহ করলেন যে, এই দুইজন নির্বাচন এলাকা থেকে তাদের পেছু নিয়েছে এবং তাদের এখানে আসবার পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। চাগলা সসেজের প্লেট দুটি ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন। ছেলেটি খুশি মনে সসেজগুলি খেতে শুরু করল। জিন্না এবার রাগ প্রকাশ করে বললেন, তুমি একি করলে? জান ওর সসেজ খাওয়া নিষেধ। চাগলা হেসে জবাব দিলেন, ওর ধর্ম থাক বা না থাক, তুমি তো নির্বাচনের ঝামেলার হাত থেকে বাঁচালে ['রোজেজ ইন ডিসেম্বর', এম-সি চাগলা, পৃষ্ঠা-১১৯]।

যদিও জিন্না গোঁড়াপন্থী মুসলমানদের বাধা রীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, শুধু নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের কোন বাধা-নিষেধে তিনি কান দিতেন না। এইসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন পাকা সাহেব। আর একবার ১৯২৫ সালে মামুদাবাদের রাজা একজন বিদেশীর কাছে নিজেকে প্রথমে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। জিন্না তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি প্রথমে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দেবে পরে নিজেকে মুসলিম বলবে ['মেমোরী রাজা অব মামুদাবাদ', পৃষ্ঠা-৩৮৫]।

নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর জিন্নার নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল। এবার থেকে তিনি রাজনীতি করবার জন্যে একটি নতুন পথ বেছে নিলেন। আর সেই পথ হল পাকিস্থানের পথ এবং পাকিস্থানে পৌঁছুবার জন্যে তার বাহক হল মুসলিম লীগ।

১৯২৪ সালের মাঝামাঝি শারীরিক অসুস্থতার কারণবশত গান্ধীজিকে মুক্তি দেওয়া হল। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে গান্ধীজি বোম্বাইতে এলেন। স্বরাজ পার্টির নেতারা গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন, যেন তিনি তাদের দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য না করেন। কারণ, গান্ধীজি ইচ্ছে করলেই স্বরাজ পার্টির অনেক ক্ষতি করতে পারতেন। বোম্বাইতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে এলেন মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং জওহরলাল।

স্বরাজ পার্টি জিন্নার সঙ্গে সংসদে সহযোগিতা করে কাজ করবার জন্যে জিন্নার সহানুভূতিসম্পন্ন কিছু নির্দলীয় সদস্য এবং স্বরাজ পার্টিকে নিয়ে সরকার বিরোধী একটি দল গঠন করল। এই নির্দলীয় স্বাধীন দলের ভোট-সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ।

কিন্তু গান্ধীজি স্বরাজ পার্টির সংসদে কাজ করবার বিরোধী ছিলেন। অতএব গান্ধীজি জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসবার পর এক কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। গান্ধীজি, মতিলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দীর্ঘ আলোচনা করে ঠিক করলেন যে, সংসদে স্বরাজ পার্টি সংসদের কাজ করবে এবং বাইরে রাজগোপালাচারী এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাদের গঠনমূলক কাজ করবে। স্বরাজ পার্টিকে কংগ্রেসের সাংবিধানিক অঙ্গ বলে গণ্য করা হল। কিন্তু কিছুদিন পরে গান্ধীজি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে এক প্রস্তাব করলেন এবং এই প্রস্তাবে বলা হল, যারা ম্যাসে দু-হাজার গজ সুতো কাটতে পারবে তাদেরই কংগ্রেসের সদস্য করা হবে। মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বুঝতে পারলেন এই প্রস্তাব তাদের উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে। স্বরাজ পার্টির নেতারা সভা থেকে বেড়িয়ে গেলেন। প্রস্তাব গৃহীত হল বটে, কিন্তু পরে প্রস্তাবটি তুলে নেওয়া হল। একটি সামান্য বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে গৃহবিবাদ করতে কেউ চাইলেন না। এইসব গোলমালে জিন্নার সঙ্গে একত্রিত হয়ে সংসদে কাজ করবার জন্যে যে চুক্তি করা হয়েছিল, সেই চুক্তি বাতিল হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে জিন্নার মেয়ে দীনা বড় হবার পর রোটি জিন্না মেয়েকে মাদ্রাজের এক বোর্ডিং হোষ্টেলে পাঠাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু জিন্না স্ত্রী'র এই চেষ্টায় বাধা দিলেন। কারণ, তিনি ভয় করেছিলেন যে, মাদ্রাজের স্কুলে পড়াশুনা করলে দীনা তার হাতের বাইরে চলে যাবে। জিন্না দিল্লীতে থাকাকালীন তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং তাঁর ফুসফুসের ব্যারাম হয়। পরে ফুসফুসের ক্যানসারে তিনি মারা গিয়েছিলেন।

এর পর থেকে জিন্নার স্ত্রী'র সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন দিল্লীতে থাকতেন রোটি জিন্না বোম্বাই'র তাজ হোটেলে থাকতেন।

জিন্নার আইনের পসারও বেড়ে গিয়েছিল। অতএব জিন্নার তার স্ত্রী'র সঙ্গে প্রায় দেখা হত না। আর একটি ব্যাপারে রোটি জিন্না তার বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

বাজারে গুজব রটল যে, ভাইসরয় জিন্নাকে 'স্যর' উপাধি দেবেন। রোটি জিন্না বললেন, এই গুজব যদি সত্যি হয় তাহলে আমি জিন্নাকে ডিভোর্স করব। জিন্না অবশ্যি 'স্যর' উপাধি পাবার আর কোন চেষ্টা করলেন না।

কিন্তু কিছুদিন পরে রোটি জিন্নার স্বাস্থ্যের অবনতি হল। এই সময় থেকে রোটি জিন্না ঘুমের ওষুধ এবং অনান্য ড্রাগস খেতে শুরু করেছিলেন।

এদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বরাজ পার্টি কেন্দ্রীয় সংসদ ত্যাগ করবার পর এবং দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সামনে

বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এসে দেখা দিয়েছিল

সাম্প্রদায়িক ঘটনার প্রতিবাদে গান্ধীজি একুশ দিনের অনশন শুরু করলেন। এই অনশন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে এক 'ইউনিটি' কনফারেন্স করা হল। কিন্তু গান্ধীজি নির্দিষ্ট দিনের আগে তার অনশন ভাঙলেন না। এই সময় থেকে জওহরলাল এলাহাবাদে স্থানীয় রাজনীতি করতে শুরু করলেন এবং ১৯২৩ সালে তাকে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হল। কিছুদিন পরে মতিলাল নেহরু হলেন কেন্দ্রীয় সংসদের বিরোধী নেতা। তখন সবাই বলতে শুরু করলেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ট্রিনিটি অর্থাৎ পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হলেন মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, এবং মহাত্মা গান্ধী (Indian Nationalism had its Trinity, Father, Son and the Holy Ghost.) ['নেহরু', মাইকেল এডওয় ডস, পৃষ্ঠা-৫০]।

*　　　*　　　*

নেহরু ১৯২৬ সালে তার স্ত্রী কমলা নেহরুকে নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের শেষে তিনি দেশে ফিরে এলেন ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হল। গান্ধীজি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। তার অনুপস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। কিন্তু গান্ধীজি এই প্রস্তাবে আপত্তি করলেন কারণ, তাঁর মতানুযায়ী এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব নয় ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-১১২]। কিন্তু এই অধিবেশনে আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সাইমন কমিশনকে বয়কট করা হবে।

১৯১৯ সালে 'মণ্টেগু রিফর্মস' প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, দশ বছর পরে ভারত সরকারের ১৯১৯ এ্যাক্টের কার্যকারীতা সম্বন্ধে পুর্ণবিচার করে থা হবে। ব্রিটিশ সরকার এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেটস এই আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে বিচারের কাজ করবার জন্যে স্যর জন সাইমনকে নিয়ে এক কমিশন গঠন করলেন। যার প্রধান উদ্দেশ্য ঘোষিত হল যে, সাইমন কমিশন সংবিধানের কাজকর্ম নিয়ে পরীক্ষা করবেন এবং ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান পরিবর্তন করা উচিত কিনা তার বিচার করবেন।

কমিশনের সদস্য-সংখ্যা ছিল সাত, কিন্তু সবাই ছিলেন ব্রিটিশ। কোন ভারতীয়কে এই কমিশনে নেওয়া হল না। কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন এক অজ্ঞাতনামা ইংরেজ ক্লেমেণ্ট এটলী, যিনি কুড়ি বছর পরে ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতের

সর্বত্র এই সাইমন কমিশনকে বয়কট করতে হবে এবং যেখানেই কমিশন যাক না কেন, সেই শহরে হরতাল পালন করতে হবে।

জিন্না বোম্বাইতে সাইমন কমিশনকে বয়কটের আয়োজন করলেন। যদিও জিন্না কংগ্রেসের পতাকার নীচ থেকে সরে এসেছিলেন, তবু তার "দেশপ্রেম" এবং "জাতীয়তাবাদ" সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি সাইমন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ছিল শারীরিক হত্যাকাণ্ড এবং সাইমন কমিশন হল আত্মার হত্যাকাণ্ড।' ইতিমধ্যে জিন্না মুসলিম লীগের সদস্যদের বলেছিলেন, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী যেন তারা দাবী না করেন এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একই যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী থেকে দাঁড়াতে কোন আপত্তি না করেন। জিন্না বললেন, সাইমন কমিশনকে বয়কট পুরো এবং সার্থক করতে হবে। তাঁর নেতৃত্বে বোম্বাইতে সাইমন কমিশনের বয়কট সম্পূর্ণ সার্থক হল। তাঁর কাজ এত ভাল হয়েছিল যে গান্ধীজি তাকে অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন, 'উদারপন্থী, নির্দলীয় এবং কংগ্রেস একসঙ্গে একত্র হয়ে এই বয়কটের এত ভাল কাজ করেছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি' ['ইয়ং ইণ্ডিয়া, কালেক্টড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী', ছত্রিশ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২]।

লখনউতে জওহরলালের নেতৃত্বে সাইমন কমিশনকে বয়কট করা হল।

সাইমন কমিশনের আগমনের পরে জিন্না নিজেও কিছুদিনের জন্যে ইংল্যাণ্ডে গেলেন। এই সময়ে স্ত্রী রোটি জিন্না তাঁর মার সঙ্গে চিকিৎসার জন্যে প্যারিসে গিয়েছিলেন।

জিন্নার অনুপস্থিতিতে কংগ্রেস এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতারা দেশের সর্বসম্প্রদায়ের জন্যে এক সংবিধান রচনা করবার চেষ্টা করলেন। বোম্বাইতে জুলাই মাসে এক অল পার্টি কনফারেন্স করা হল। ঠিক হল মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে 'জাতীয়তাবাদী সংবিধান' রচনা করবার জন্যে এক কমিশন গঠন করা হবে। পরে এই কমিশন 'নেহরু কমিশন' (সাইমন কমিশনের পাল্টা জবাব) নামে পরিচিত হয়েছিল। এই কমিশনের রিপোর্ট তৈরি করতে পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এই কমিশনের রিপোর্টটির দুইটি ধারা দেশে বিতর্কের সৃষ্টি করল। একটি ধারা হল, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর সমাপ্তি। দ্বিতীয় ধারাটি হল যে, অবিলম্বে ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দিতে হবে। বিভিন্ন কারণে দুইটি ধারার আপত্তি করা হয়েছিল।

আগস্টের শেষে 'নেহরু কমিশন রিপোর্টে'র শেষ কয়েক পাতা লিখবার জন্যে নেহরু কমিশনের সদস্যরা লখনউতে মিলিত হয়েছিলেন। মতিলাল নেহরু জিন্নার আপত্তির কথা স্মরণ রেখে তার সহকারী চাগলাকে রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি

নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে লখনউতে নিমন্ত্রণ করলেন। ঐ সময়ে সরোজিনী নাইডু, এ্যানি বেশান্ত মতিলালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। চাগলা বললেন যে তিনি যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর বিশ্বাসী...মতিলাল নেহরু বললেন, রিপোর্ট এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এই রিপোর্ট সংখ্যালঘুদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। অতএব আমাদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব করা দরকার। এর জবাবে চাগলা বললেন, আমরা ভবিষ্যতের জন্যে এই সংবিধান রচনা করছি, আজকের জন্যে নয় (এই সময়ে চাগলার বয়স ছিল মাত্র সাতাশ)। তিনি আরও বললেন, এই ডকুমেন্ট দীর্ঘকালের জন্যে মেয়াদী হবে এবং আমরা এই ডকুমেন্টে এমন কিছু যোগ করব না যা জাতীয় বিরোধী হয়। মতিলাল চাগলার যুক্তিকে স্বীকার করে নিলেন এবং সেই অনুযায়ী পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীকে বিসর্জন দিয়ে যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব করা হল।

কিছুদিন পরে জিন্না বিলেত থেকে বোম্বাইতে ফিরে এলেন। চাগলা গিয়ে জাহাজে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। চাগলার কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণী শুনে জিন্না রেগে ক্ষিপ্ত হলেন। আমরা এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করব না এবং মুসলিম লীগের অধিবেশনে এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব। এরপর জিন্না এবং চাগলার মধ্যে বন্ধুত্বের চিড় ধরল। জিন্না বললেন, নেহরু রিপোর্ট হিন্দুর রিপোর্ট ছাড়া আর কিছু নয়। এর পর জিন্নার চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। জিন্না স্বীকার করলেন যে, নেহরু রিপোর্ট গণতান্ত্রিক হতে পারে বটে, কিন্তু এই রিপোর্ট লখনউ চুক্তির মনোভাবের বিরোধী ['রোজেজ ইন ডিসেম্বর', চাগলা, পৃষ্ঠা-৯৬]।

জিন্না মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হতে বললেন। ভয় পাবার কিছু নেই। তিনি মুসলমানদের আশ্বস্ত করলেন। জিন্নার এই বিবৃতির পর মতিলাল জিন্নাকে কামশনের পরবর্তী সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু জিন্না মতিলালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

নেহরু রিপোর্টের দ্বিতীয় বিতর্কমূলক ধারাটি ছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে। দেশের স্বাধীনতা কী ধরনের হবে এই নিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের মধ্যে মতভেদ ছিল। মতিলাল নেহরু, গান্ধীজি এবং গোঁড়াপন্থী নেতারা এই রিপোর্টে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দাবী করলেন। কিন্তু এই দাবীর প্রতিবাদ করলেন জওহরলাল নেহরু এবং ত্রিশ বছরের এক যুবক, তার নাম ছিল সুভাষচন্দ্র বসু। মতিলাল নেহরু ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দাবীর সম্বন্ধে স্পষ্ট মত ছিল। জওহরলাল নেহরু সাম্প্রদায়িক সমস্যা ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবটি

সহজে গ্রহণ করতে পারলেন না।

পরে জওহরলাল নেহরু এবং সুভাস বোস কংগ্রেসের ভেতরেই 'ইনডিপেনডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লীগ' নামে একটি দল গঠন করলেন। এই লীগে শুধু কংগ্রেসের সদস্যদের যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া হল এবং বলা হল, লীগের উদ্দেশ্য হবে কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবী করা। অবশ্য লীগ এক বছরের বেশী টি঱কে থাকতে পারেনি। কারণ, লীগের ভেতরে কাজকর্ম করবার জন্যে উপযুক্ত কর্মঠ লোকের অভাব ছিল।

যদিও কংগ্রেসের কমিটিতে নেহরু রিপোর্ট এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল সেই প্রশ্নটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হল এবং পরে গৃহীত হয়েছিল। জিন্না এবং মুসলিম লীগ তাদের স্পষ্ট মতামত জানাতে সময় নিল। প্রথমত মুসলিম লীগের লখনউর অধিবেশনের অনেক সদস্যই নেহরু রিপোর্টকে 'উপযুক্ত এবং সমর্থনযোগ্য' বলে মতামত প্রকাশ করলেন। কিন্তু জিন্না চুপ করে রইলেন। কিছু কংগ্রেস সদস্য ডাঃ আনসারী এবং মৌলানা আজাদ জিন্নাকে 'নেহরু কমিটিতে' অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, কিংবা কলকাতায় আসন্ন অল পার্টি কনফারেন্সে তার এই রিপোর্ট সম্বন্ধে মতামতকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে বললেন। পরে বোম্বাইর মুসলিম লীগের এক অধিবেশনে জিন্না 'নেহরু রিপোর্ট' নিয়ে আলোচনা শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে চাগলা নেহরু রিপোর্টকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। জিন্না ইচ্ছে করেই এই সভায় কোন ভোট গ্রহণ করলেন না। ২২শে ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে কলকাতায় মুসলিম লীগের এক বিশেষ অধিবেশন হল এবং লীগ তেইশ সদস্যর এক ডেলিগেশন নিয়োগ করে বলল যে, এই ডেলিগেশন জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায় যে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে সেই অল পার্টি ন্যাশনাল কনভেনশনে অংশগ্রহণ করবে। জিন্না নেহরু কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করবার পক্ষে ছিলেন। পরে লীগের অধিবেশনে বিস্তৃত আলোচনার পর ঠিক হল যে, পৃথক নির্বাচনের ধারা বজায় রাখতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সংসদে এক তৃতীয়াংশ আসন সংখ্যালঘুদের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশকে দিতে হবে ['রোজেজ ইন ডিসেম্বর', চাগলা, পৃষ্ঠা-৯৬]।

২৮শে ডিসেম্বর অল পার্টি কনভেনশনে মুসলিম লীগের তরফ থেকে জিন্না সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন ভারতকে এগিয়ে যাবার জন্য হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত এবং এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যেন দেশের সর্ব সম্প্রদায় সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। জিন্নার বক্তৃতার সমালোচনা করলেন স্যার তেজবাহাদুর

সঙ্গে, এম. আর. জয়াকর প্রমুখ। স্যার তেজবাহাদুর জিন্না এবং মুসলিম লীগের দাবীকে খুব অযৌক্তিক বলে মনে করলেন না। তিনি বললেন, যদি জিন্না খারাপ এবং দুষ্ট ছেলে হন...তাহলে উনি যা চান তাই দিন। এম. আর. জয়াকর প্রতিবাদ করে বললেন, জিন্না খারাপ কিংবা দুষ্ট ছেলে নন। দেশের গণ্যমান্য মুসলিম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ আনসারী, ডাঃ কিচলু সবাই নেহরু রিপোর্টকে সমর্থন করেছেন। এ ছাড়া মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্যই নেহরু রিপোর্টকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। মিস্টার জিন্না হলেন মুসলিম লীগের একমাত্র একজন সংখ্যালঘু সদস্য।

এই দুইটি বক্তৃতাই জিন্নার মনে আঘাত দিল। তিনি এবার ধীর শান্তকণ্ঠে বললেন, আজ আমরা এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা চাই হিন্দু-মুসলমান স্বাধীনতার পথে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাক। এই কাজ করবার জন্যে আপনাদের শুধু মুসলিম লীগ নয়, সমস্ত ভারতের মুসলমানদের সাহায্যের দরকার হবে এবং আজ আমি আপনাদের কাছে একজন মুসলমান নাগরিক হিসাবে নয়, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বলছি, আপনারা কি সামান্য কয়েকজনের কাছ থেকে সাহায্য পেলেই সন্তুষ্ট হবেন? আপনারা কি চান না যে, মুসলিম ভারত আপনাদের সঙ্গে এগিয়ে যাক। সংখ্যালঘুদের কি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দেবার মত কিছুই নেই? অতএব আমার এই "সামান্য ছোট দাবীকে" অস্বীকার করা কিংবা আমি যেন কোন চাপ সৃষ্টি না করি এই অনুরোধ করা বৃথা। আমার এই দাবী যদি সামান্য 'ছোট দাবী' হয় তাহলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি কেন? শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠই এই দাবীকে স্বীকার করে নিতে পারে। আমি এই দাবী পেশ করছি কারণ, আমার মনে হয় মুসলমানদের কাছে এই দাবী যুক্তিসঙ্গত। আমরা সবাই এই দেশের সন্তান, অতএব আমাদের একসঙ্গে বসবাস করতে হবে, কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে যতই বিভেদ থাক না কেন, ঝগড়া-বিবাদ বাড়িয়ে কোন ফল হবে না। আমরা যদি এই বিষয়ে একমত না হতে পারি, অন্তত আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে এই কথাটি স্বীকার করতে পারি, বন্ধু হিসাবে আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। বিশ্বাস করুন, যতদিন ভারতের হিন্দু-মুসলমান এক না হবে, ততোদিন দেশের কোন উন্নতি হবে না, এবং আমি মনে করি কোনপ্রকার যুক্তি, তর্ক, বাধা-বিপত্তি আমাদের মীমাংসার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন দেখলে আমি সবচাইতে বেশি খুশি হব ['মুহম্মদ আলি জিন্না', এম. এইচ. সৈয়দ, পৃষ্ঠা—৪৩২-৪৩৫]।

জিন্নার বক্তৃতার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অংশ হল, আমরা বন্ধু হিসাবে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। এই কথাটি বলবার সময় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-৭৩]।

কলকাতার এই কনভেনশনের পর থেকে জিন্নার রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এল। নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পরাজয় হয়েছিল, কলকাতার অল পার্টি কনভেনশনে তার দ্বিতীয় পরাজয় হল। তারপর কিছুদিনের বিশ্রাম এবং এর পর থেকে আমরা তাকে ভিন্নরূপে মুসলমান জনগণের নেতা হিসাবে দেখতে পাব।

কংগ্রেস নেতারা অখণ্ড স্বাধীন ভারত পাবার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু কলকাতার কনভেনশনের পর তারা অন্ধের মত এমন সব ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে লাগলেন যে, তাদের নির্বুদ্ধিতার দরুন এই দেশ দুই ভাগ হল। দেশবাসীরা পেলেন ভারত এবং পাকিস্তান। এই দেশভাগ করবার জন্যে কে দায়ী ছিলেন? ব্রিটিশ সরকার, জিন্না, না কংগ্রেস নেতারা নেহরু, প্যাটেল? রাজনীতির দাবার ভুল চাল কে দিয়েছিলেন? যখন সত্যিই দেশভাগ নিয়ে দিল্লী এবং সিমলাতে চূড়ান্ত শীর্ষ বৈঠক শুরু হল, তখন কেন গান্ধীজি এই জটিল সমস্যাকে এড়াবার জন্যে শান্তি বজায় রাখবার অজুহাত দিয়ে দিল্লী থেকে হাজার মাইল দূরে নোয়াখালিতে গিয়ে বসে রইলেন তার কারণ জানা দরকার।

১৯২৮ সালের কলকাতার অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস সমিতির অধিবেশনে কয়েকটি আলোচনার বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এই অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কী হবে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তারা কী দাবী করবে? প্রথমত, নেহরু রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক সমস্যার যে সমাধান করা হয়েছিল জিন্না সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয় ছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে কংগ্রেস কী দাবী করবে? ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না পূর্ণ স্বাধীনতা? মতিলাল নেহরু, গান্ধীজি সবাই 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের' সপক্ষে রায় দিলেন। কিন্তু জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ বোস 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবী করলেন। কারণ, ১৯২৭ সালে মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজির অনুপস্থিতিতে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' এবং নেহরুর রিপোর্টকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজির সমর্থকেরা এই প্রস্তাবের আংশিক অদলবদল করেছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে কলকাতার কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে গান্ধীজি দাবি করলেন যে, নেহরু রিপোর্টের পুরো অংশটুকু গ্রহণ করতে হবে। এখানে বলা

সরকার নেহরু রিপোর্টে 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' দাবী করা হয়েছিল।

(১৯২০ সালে কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে স্বরাজ অর্থাৎ 'স্বায়ত্বশাসনকে' কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু তারপর ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সালে পর্যন্ত প্রতিবারই 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবী করা হয়েছিল)।

গান্ধীজি স্পষ্ট করে বললেন যে, নেহরু রিপোর্টটির পুরো অংশকে স্বীকার করে নিতে হবে, কিছুই বাদ দেওয়া চলবে না। গান্ধীজির এই প্রস্তাব নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। পরে এক মীমাংসায় ঠিক করা হল যে, ব্রিটিশ সরকারকে আর এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেবার জন্যে সময় দেওয়া হবে। বলা হল, যদি সরকার ১৯৩০ সালের মধ্যে এই দাবী স্বীকার করে না নেয় তাহলে গান্ধীজি আবার তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবেন।

সুভাষ বোস প্রথম থেকে 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবী করলেন। নেহরু তাঁকে সমর্থন করলেন। পরে সদস্যদের ভোটগ্রহণে দেখা গেল গান্ধীজির প্রস্তাব ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে গৃহীত হয়েছে। কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে নেহরুর 'দুই নৌকোর নীতি' অর্থাৎ কখনও গান্ধীজির সপক্ষে এবং কখনও সুভাষ বোসের পক্ষে। এই নীতিকে ব্যঙ্গ করে সুভাষ বোস বলেছিলেন: আমরা বাঙ্গালী, আমরা বিপ্লবী, কাজ করি। নেহরু শুধু কথা বলেন ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-৭৩]।

* * *

কলকাতার অল পার্টির কনভেনসনের পর জিন্না তার নিজের আইন ব্যবসা নিয়ে মেতে রইলেন। স্ত্রীর প্রতি ঝোঁক দেবার তাঁর কোন সময় ছিল না। রোটি জিন্না এবার তার আবাস পরিবর্তন করে 'তাজমহল' হোটেলে গিয়ে রইলেন। কিছুদিন পরে তিনি গুরুতর অসুস্থ হলেন। ঐ সময়ে জিন্না ছিলেন দিল্লীতে।

একদিন দিল্লীর ওয়েষ্টার্ন কোর্টে জিন্না তার বন্ধু চমনলালের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন, এমন সময় বোম্বাই থেকে এক টেলিফোন এল। জিন্না কথা বললেন এবং একটু পরে এসে চমনলালকে বললেন: কে টেলিফোন করেছিল জান? রোটির বাবা। রোটি সাংঘাতিক অসুস্থ। আমাকে আজকের ট্রেনেই বোম্বাই ফিরে যেতে হবে। রোটির বাবা স্যার দীনশা পেতিত, বিয়ের পর এই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে কথা বললেন। পরের দিন ফ্রন্টিয়ার মেলে জিন্না বোম্বাইতে চলে গেলেন। সেদিন জিন্না শুধু একটি কথা তার বন্ধু চমনলালকে বলেননি। রোটি সাংঘাতিক অসুস্থ ছিল না, সে মারা গিয়েছিল। তাই

রোটির বাবা তাঁর দীর্ঘদিনের মৌনভঙ্গ করেছিলেন।

রোটিকে বোম্বাই-এর মুসলমানদের কবরখানায় কবর দেওয়া হল। রোটির পারিবারিক এবং জিন্নার বন্ধু কানজী দ্বারকাদাস মৃদু আপত্তির সুরে বলেছিলেন, রোটির বড় ইচ্ছে ছিল তার দেহ যেন দাহ করা হয়। কিন্তু জিন্না সেদিন ইসলাম ধর্মানুযায়ী রোটির দেহ কবর দিয়েছিলেন। রোটির দেহ যখন কবরে নামান হল তখন জিন্নার চোখে ছিল জল। এই প্রথম আমি তার চোখে জল দেখতে পেলাম, জিন্নার সহকারী চাগলা বলেছিলেন ['রোজেজ ইন ডিসেম্বর', চাগলা, পৃষ্ঠা-১২১]।

জিন্না কিছুদিন চুপ করে রইলেন।

একদিন কেন্দ্রীয় সংসদে তিনি মতিলাল নেহরুর বক্তৃতার জবাবে বলেছিলেন, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে 'নেহরু রিপোর্ট' মুসলমানরা গ্রহণ করবে না।

১৯৩০ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

১৯৩০ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৭ সাল থেকে মতিলাল নেহরুর বড় ইচ্ছে ছিল যে জওহরলাল যেন সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ইচ্ছা গান্ধীজির কাছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি বিভিন্ন কারণে মতিলালের অনুরোধ রক্ষা করেননি। তিনি আশা করেছিলেন যে, ডাঃ আনসারীকে কংগ্রেসের সভাপতি করলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আরও ভাল হবে। তিনি মতিলালকে এক চিঠি লিখে জানালেন, ['কালেক্টেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী', ৩৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১] কংগ্রেসের বর্তমান ঘরোয়া পরিস্থিতি এমন যে জওহরলালের সভাপতি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিছুদিন পরে সবাই একজন দক্ষ কড়া শাসক চাইবে, তখনই জওহরলাল সভাপতি হবেন।

'রাজবংশীয়' ক্ষমতা হস্তান্তরিতের পূর্বাভাস এখান থেকেই পাওয়া যাবে ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-৭৬]।

১৯২৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন আরও কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এক সংঘর্ষের আশঙ্কা করেছিল। এই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী চিন্তা করে কংগ্রেস সদস্যরা সত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। সবাই এই আন্দোলনে গান্ধীজির নির্দেশ এবং নেতৃত্ব আশা করেছিলেন। এই সময়ে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি

নির্বাচন করবার প্রশ্ন উঠল। সদস্যরা এই নির্বাচনের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে গান্ধীজির শরণাপন্ন হলেন। আঠারটি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির মধ্যে দশটি প্রাদেশিক সমিতি গান্ধীজির নাম, পাঁচটি সর্দার প্যাটেলের নাম এবং তিনটি জওহরলাল নেহরুর নাম প্রস্তাব করল। এই সময়ে জওহরলাল নেহরুর বয়স ছিল উনচল্লিশ। গান্ধীজি প্যাটেলকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নাম তুলে নেবার নির্দেশ দিলেন, যদিও নিয়ম অনুযায়ী গান্ধীজির পরে বেশি ভোট পাবার দরুন প্যাটেলের সভাপতি হবার অধিকার ছিল। পরে গান্ধীজি এক বিবৃতিতে বললেন, তিনি তিনটি বিশেষ কারণে নেহরুর নাম আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হবার জন্যে প্রস্তাব করছেন। এক, আসন্ন সংগ্রামে সৈনিক হবেন ভারতের তরুণ দল। জওহরলাল হলেন ঐ নবীন যুবকদের নেতা। দুই, কংগ্রেসের ক্ষমতা পাবার পর তিনি আরও সংযত ও নরম হবেন। তিন, জওহরলালের সভাপতি হওয়া মানেই আমার সভাপতি হওয়া। গান্ধীজি বললেন, এইসব কারণে তিনি লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর নাম প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু জওহরলালকে সভাপতি করবার আরও কয়েকটি গৌণ কারণ ছিল যা গান্ধীজি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেননি। প্রথমত, তিনি ভেবেছিলেন যে, নেহরুর সাহায্য নিয়ে তিনি দেশের তরুণ যুবকদের 'কম্যুনিজমের' প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন এবং তাদের কংগ্রেস সংস্থায় টানতে পারবেন। এছাড়া তিনি চেষ্টা করলেন জওহরলাল নেহরুকে বামপন্থী নীতি থেকে সরিয়ে রাখবার। কারণ ১৯২৭-২৮ সালে নেহরু মার্কসবাদী নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ['নেহরু', মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা-১৩০]। অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন, নেহরু কী আদৌ মার্কসবাদী ছিলেন? ১৯২৭ সালে য়ুরোপ ভ্রমণের সময় জওহরলাল নেহরু ব্রাসেলসের 'উৎপীড়িত জাতির সম্মেলনে' যোগ দিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁর অনেক বামপন্থী নেতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। নেহরুর মার্কসবাদ সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, তাঁর মার্কসবাদ ভাবপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। মার্কসবাদের আদর্শের চাইতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ঐক্যের বাণী, স্বার্থত্যাগ, সমাজসেবা, দরিদ্র জনগণের সেবা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। গান্ধীজির মাধ্যমে জওহরলাল ভারতের দরিদ্র জনগণের, কৃষকদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এইসব কারণে জওহরলাল নেহরু মার্কসবাদের নীতিকে (শহরের প্রলেটারিয়েটের মাধ্যমে বিপ্লব করা সম্ভব) স্বীকার করে নিতে রাজি হননি ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-৬৩]।

প্যাটেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যাবার পর নেহরু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

কংগ্রেসের সভাপতি হলেন।

* * *

ভাইসরয় আরউইন এবার ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতের মধ্যে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়া হোক। কিন্তু সেক্রেটারী অব ষ্টেটস এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না।

১৯২৯ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেবার সংকল্প করেছিলেন। গান্ধীজি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে বর্ণনা করলেন। কিন্তু নেহরু এবং আরও কিছু কংগ্রেস সদস্য এই ঘোষণার উপর বেশি গুরুত্ব দিলেন না। ভাইসরয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকের প্রস্তাব করলেন। বলা হল, তিনি সাইমন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান।

পরে উনিশজন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দ, জিন্না, ভুলাভাই দেশাই, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন এবং এই বৈঠকে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কংগ্রেস এবং আরও ত্রিশজন উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর একটি বিবৃতিতে বৈঠকে অংশগ্রহণ করবার জন্যে চারটি শর্ত আরোপ করলেন। শর্তে বলা হল যে, সম্মেলনকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের সংবিধান রচনা করবার ক্ষমতা দিতে হবে। এ ছাড়া সম্মেলনের অধিকাংশ সদস্য হবে কংগ্রেসের মনোনীত প্রতিনিধি। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং সাময়িককালের জন্যে ডোমিনিয়ন সরকারের কাঠামোয় এক সরকার গঠন করতে হবে। নেতাদের এই দাবীকে 'দিল্লী ম্যানিফেষ্টো' বলা হয়ে থাকে।

নেহরু 'দিল্লী ম্যানিফেষ্টো'তে সই করেছিলেন। পরে তার মনে অনুতাপ হল। কারণ 'দিল্লী ম্যানিফেষ্টো'তে বলা হয়েছিল, যদি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়া হয় তাহলে সত্যাগ্রহ করবার প্রয়োজন হবে না। নেহরু গান্ধীজির কাছে স্বীকার করলেন যে, এই পরিস্থিতিতে তার কংগ্রেসের সভাপতি হবার কোন ইচ্ছে নেই।

গান্ধীজি নেহরুকে এক চিঠি লিখে আশ্বস্ত করলেন, তাঁর 'দিল্লী ম্যানিফেষ্টো'তে সই করা ভুল কিংবা অন্যায় হয়নি। আমার মতানুযায়ী দিল্লী ম্যানিফেষ্টো'তে সই করা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে ['মহাত্মা অষ্টম খণ্ড', লেখক টেণ্ডুলকার, গান্ধীজী-নেহরু চিঠি, পৃষ্ঠা-৩৫৫]। এবার জওহরলাল নেহরু গান্ধীজির পরামর্শানুযায়ী দিল্লী ম্যানিফেষ্টোকে স্বীকার করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার সুভাষ বোসের

সঙ্গে একমত হয়ে তিনি দিল্লীর ম্যানিফেস্টোকে 'ফাঁকা বুলি' বলে বর্ণনা করলেন। (নেহরু দুর্বল চরিত্রের নেতা ছিলেন এবং তার উপর গান্ধীজির প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, গান্ধীজির সঙ্গে কোন প্রকারের যুক্তিতর্ক করবার কোন সাহস তার ছিল না।)

কিন্তু লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবার আগেই দেশের সন্ত্রাসবাদীরা ভাইসরয় আরউইনকে বোমা ছুঁড়ে হত্যা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

লাহোর কংগ্রেস অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ছিল, সংগ্রাম না শান্তি। গোড়াপন্থীরা, সরোজিনী নাইডু, রাজাগোপালাচারী, প্যাটেল প্রমুখ এক সাবধানী সতর্ক নীতি অবলম্বন করতে চাইলেন। সুভাষ বোস, জওহরলাল ছিলেন অপর দিকে। গান্ধীজি, মতিলাল নেহরু ছিলেন দুই দলের মধ্যিখানে।

বেশ ধুমধাম করে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হল। জমকালো মিছিলের পর মতিলাল নেহরু নিজে ছেলেকে কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসালেন। ঐ দিন জওহরলাল নেহরুর মাও অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে গান্ধীজি বোমা বিস্ফোরণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ভাইসরয়কে শুভকামনা জানিয়ে এক প্রস্তাব পেশ করলেন। সুভাষ বোস এবং বামপন্থীরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং খুব অল্প ভোটে (গান্ধীজির পক্ষে ৯৩৫ এবং সুভাষ বোসের পক্ষে ৮৯৭) গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরে গান্ধীজি তার মূল প্রস্তাব অধিবেশনের সামনে রাখলেন। গান্ধীজির প্রস্তাব ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাউণ্ড টেবিলে যোগ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। দুই, কংগ্রেসের আদর্শ হল 'স্বরাজ' মানে পূর্ণ স্বাধীনতা। এই পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার জন্যে সংসদ, বিধানসভাকে বর্জন করতে হবে। গান্ধীজির প্রস্তাবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল যে, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের হাতে আসন্ন সত্যাগ্রহ এবং ট্যাক্স না দেবার আন্দোলন শুরু করবার পুরো ক্ষমতা দেওয়া হ'ক। ডানপন্থীরা সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখবার জন্যে এক সংশোধনী প্রস্তাব করলেন। ভোটে ডানপন্থীদের পরাজয় হল। পরে সুভাষ বোস মূল প্রস্তাবের আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। এই প্রস্তাবে সুভাষ বোস আরও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার দাবী করলেন। সুভাষ বোস বললেন, কোন প্রকারেই মীমাংসার আলোচনা করা হবে না। তিনি আরও বললেন, শুধু পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, আমাদের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এ ছাড়া সত্যাগ্রহ শুরু করতে হলে সমান্তরাল সরকার গঠন করতে হবে। ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস হলে ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে কিছু:সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার মানে হল যে, ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে

কোন সম্পর্ক থাকবে না।

১৯৪৭ সালে আইনত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসই পেয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন ভাষার অলঙ্কার দিয়ে এই কথাটি ঢাকা হয়েছিল। (পরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।) এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় নেহরু কোন অংশগ্রহণ করেননি ['ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ৪৮তম লাহোর কংগ্রেসের রিপোর্ট ১৯২৯' নেহরু, মাইকেল ব্রেচার, পৃষ্ঠা—১৪৩-১৪৪]। সুভাষ বোস বুঝতে পারলেন নেহরু গণতান্ত্রিক পন্থীদের পক্ষে কিছু বলবেন না। তবে পরে জওহরলাল নেহরু সভাপতির ভাষণে তার মত ব্যক্ত করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন সভাপতি, অতএব প্রকাশ্যে তিনি গান্ধীজির এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বিরোধিতা করতে পারলেন না। সুভাষ বোস পরে বললেন, নেহরু শুধু কথা বলেন আর কিছুই নয় ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-৭৮]। সুভাষ বোস এবং তাঁর দল এবার কংগ্রেস দলের মধ্যে এক ডেমোক্রেটিক দল গঠন করেছিলেন।

লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা হল এগার বছর পরে মুসলিম লীগ ঐ শহরেই 'পাকিস্থান' দাবী প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

গান্ধীজি বললেন যে, তার প্রস্তাব পুরোপুরি বিনা সংশোধনে গ্রহণ করতে হবে। তিনি সুভাষ বোসের 'সমান্তরাল সরকার' গঠনের প্রস্তাবকে অকার্যকরী বলে বর্ণনা করলেন।

পরে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী এ-আই-সি-সি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি গঠন করবার প্রস্তাব করল। গান্ধীজি দশজন সদস্যর নাম কার্যকরী সমিতির জন্যে পেশ করলেন। সুভাষ বোস ডেমোক্রেটিক দলের তরফ থেকে কিছু নাম সংশোধন প্রস্তাব হিসাবে পেশ করলেন। কিন্তু সভাপতি নেহরু বামপন্থীদের সংশোধন প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করলেন তার এই সংশোধন অগ্রাহ্য করবার যুক্তি ছিল, যারা গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন তাদের কার্যকরী সমিতিতে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না।

* * *

সত্যাগ্রহ প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার পর কংগ্রেস আবার গান্ধীজির শরণাপন্ন কংগ্রেসের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে সংসদ ও বিধানসভার সদস্যদের ইস্তফা দেবার জন্যে বলা হল। পরে সদস্যরা এই প্রস্তাবের নির্দেশানুযায়ী ইস্তফা দিলেন। এ ছাড়া ২৬শে জানুয়ারীকে 'স্বাধীনতা দিবস' বলে ঘোষণা করা হল। ঠিক হল, ঐ দিনে সবাইকে 'পূর্ণ স্বরাজের' শপথ গ্রহণ করতে হবে। এবার সবাই জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন, গান্ধীজি কবে থেকে তার আন্দোলন শুরু করবেন। এ-আই-সি-সি

গান্ধীজিকে এই আন্দোলন শুরু করবার পূর্ণ ক্ষমতা দিল। ঠিক হল, গান্ধীজি তার আন্দোলন শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বর্জন করবে, উকীল কোর্টে যাবেন না, আইন-আদালত বর্জন করা হবে। এ ছাড়া মদ প্রস্তুত করা বন্ধ করতে হবে, জমির কর হ্রাস করতে হবে, সৈন্যবাহিনীর খরচ কমাতে হবে, পুলিশের ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগকে বন্ধ করতে হবে এবং লবণ থেকে ট্যাক্স সরিয়ে নিতে হবে। কারণ, লবণ হল দেশের সর্বশ্রেণীর ব্যবহারের বস্তু। সব মিলিয়ে গান্ধীজি সরকারের কাছে এগার দফার দাবী করলেন। যদি সরকার এই এগার দফার দাবীকে গ্রহণ না করে তাহলে গান্ধীজি লবনকর রদের দাবী করে সত্যাগ্রহ করবেন ['ডিক্লারেশন অব ইন্‌ডিপেনডেন্স', কংগ্রেসের ইতিহাস পট্টভি সীতারামিয়া, পৃষ্ঠা-৩৬৩ এবং 'কালেক্টেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী', খণ্ড ৪৩, পৃষ্ঠা—৪১১-৪১৬]। গান্ধীজির আরউইনের কাছে লেখা চিঠির তারিখ ১৯৩০ সালের ১৮ই মে, ['নেহরু', লেখক মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা ১৪৮]।

ভাইসরয় গান্ধীজির এই চিঠির কোন গুরুত্ব দিলেন না। কিছুদিন পরে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন যে, তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে ২৪১ মাইল হেঁটে আরব সাগর তটে এক ছোট্ট শহর 'ডাণ্ডীতে' গিয়ে সমুদ্রের নোনা জল থেকে লবণ তৈরি করবেন। গান্ধীজির এই লবণ আইনভঙ্গ দেশে আলোড়ন উত্তেজনা সৃষ্টি করল। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজি তাঁর ৭৮ জন অনুচরসহ ডাণ্ডীর পানে হেঁটে রওনা দিলেন। এই সময়ে গান্ধীজির বয়স ছিল একষট্টি। রাস্তায় এবং বিভিন্ন গ্রামে গান্ধীজি তার অহিংসার মন্ত্র প্রচার করলেন। গান্ধীজি ৫ই এপ্রিল ডাণ্ডীতে গিয়ে পৌছুলেন এবং ওখানে গিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। ইতিমধ্যে দেশের বহু ছেলে স্কুল বর্জন করল এবং অনেকে সরকারি চাকুরী থেকে ইস্তফা দিলেন। প্রথমে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হল না, কিন্তু ৫ই মে তাকে আটক করা হল।

গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের চারদিকে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হল। বোম্বাইতে বিক্ষোভ আন্দোলন সবচাইতে তীব্র হল। সংবাদপত্রের উপর সরকার সেন্সরশিপ জারী করল। বহু মহিলা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আন্দোলন পুরোপুরি অহিংস হয়েছিল। আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এই সময়ে সূর্য সেনের পরিচালনায় চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করবার চেষ্টা করা হল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে পাঁচদিন ধরে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ হল। সংঘর্ষকারীদের নাম ছিল 'খুদাই খিদমদগার' (আল্লার সেবক) রেড সার্ট বাহিনী। এদের নেতা খান আবদুল গফর খান

ছিলেন গান্ধীজির বন্ধু ও ভক্ত। তার আর এক নাম হল 'সীমান্ত গান্ধী'। খুদাই খিদমদগার এবং পুলিশের সংঘর্ষের দরুন প্রায় ত্রিশজন নিহত এবং তেত্রিশজন আহত হল।

১৪ই এপ্রিল এলাহাবাদে জওহরলালকে গ্রেপ্তার করা হল এবং ছয় মাসের জন্যে তাকে জেল দেওয়া হল।

*　　　　*　　　　*

১৯৩০ সালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এলাহাবাদের মুসলিম-লীগের অধিবেশন। এই অধিবেশনে মুসলমান কবি দার্শনিক মুহম্মদ ইকবাল সর্বপ্রথম তার দেশভাগের প্রস্তাবটি পেশ করলেন। গান্ধীজি যখন তার লবণ আইন ভঙ্গ এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, জিন্না ভাইসরয়ের সঙ্গে রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন এলাহাবাদের মুসলিম লীগের অধিবেশনে ইকবাল তার 'দুই জাতি' মতবাদটি ব্যক্ত করলেন। এই 'দুই জাতি' মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল 'পাকিস্থান' শব্দটি উচ্চারণ করেননি বটে, তবে তিনি বললেন যে মুসলিমদের জন্যে ভারতের মধ্যে এক মুসলিম ভারত গঠন করতে হবে। পাঞ্জাব, নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ, সিন্ধ, বালুচিস্থান নিয়ে এই 'মুসলিম ভারত' তৈরি করা হবে। জিন্না এই সময়ে রাউণ্ড টেবিল সম্মেলন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং তার এই 'দুই জাতি' মতবাদ নিয়ে চিন্তা করবার কোন সময় ছিল না। এ ছাড়া তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

এদিকে ব্রিটিশ সরকার রাউণ্ড টেবিল সম্মেলন করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কিন্তু এই সম্মেলনে গান্ধীজির উপস্থিতি আবশ্যক ছিল। কিন্তু গান্ধীজি এই রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনে যোগ দেবার বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করতে হবে। উদারপন্থী দুই নেতা এম. আর. জয়াকর এবং স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ভাইসরয়ের কাছে গিয়ে বললেন যে, তারা গান্ধীজির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করবার চেষ্টা করবেন। সরকার দুই নেতাকে গান্ধীজির সঙ্গে জেলখানায় দেখা করবার অনুমতি দিলেন।

পুনাতে গিয়ে সপ্রু এবং জয়াকর গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজি বললেন, যদি সরকার তার এগারদফার দাবীকে স্বীকার করে নেয় এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেয় তাহলেই তিনি তার সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে প্রত্যাহার করবেন। গান্ধীজি আরও বললেন, এখনও আলাপ-আলোচনা, মীমাংসার সময় হয়নি। এছাড়া তিনি জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আলোচনা না করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ

করবেন না। অতএব স্যর তেজবাহাদুর ও জয়াকর নৈনী জেলে গিয়ে জওহরলাল এবং মতিলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁরাও গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা না করে কোন কিছু বলতে চাইলেন না। এক উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। কিন্তু ভাইসরয় এই পরিস্থিতির সমাধান করলেন। এক বিশেষ ট্রেনে করে মতিলাল নেহরু এবং জওহরলাল নেহরুকে পুনার ইয়ারভেদা জেলে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হল। নেতাদের মধ্যে আলোচনা হল, কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হল। কিছুদিন পরে মতিলাল নেহরুর স্বাস্থ্যের অবনতি হবার দরুন তাকে মুক্ত দেওয়া হল। জওহরলাল নেহরুরও কারাগারের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছিল। তাকে ছেড়ে দেওয়া হল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হল।

১৯৩০ সালে নভেম্বর মাসে লণ্ডনে প্রথম রাউণ্ড টেবিল সম্মেলন শুরু হল। সম্মেলনে কংগ্রেস ছাড়া সব দলের নেতারাই যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের সদস্যরা সবাই একবাক্যে দাবী করলেন যে, ভারতকে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করবার ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ঐ দাবী স্বীকার করে নিতে রাজি হল না। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দিতে রাজি হল এবং বলল, ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হবে।

সম্মেলনকে সফল করবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার এবং ভাইসরয় গান্ধীজির কাছে নতুন করে আবেদন করলেন। তাদের সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে সরকার গান্ধীজি এবং কংগ্রেস কর্মীদের জেলখানা থেকে মুক্ত দিল।

এদিকে মতিলাল নেহরু তখন মৃত্যুশয্যায়। গান্ধীজি জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাহাবাদে মতিলালকে দেখতে গেলেন। মতিলালের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে জওহরলালকে মুক্তি দেওয়া হল।

মতিলালের মৃত্যু জওহরলালকে বিশেষভাবে বিচলিত ও অভিভূত করেছিল। কারণ পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল গভীর। মতিলালের মৃত্যুর আগে জওহরলালও দোটানার ভেতর ছিলেন। তার একদিকে ছিলেন মতিলাল নেহরু, অপর দিকে গান্ধীজি। এবার মতিলালের মৃত্যুর পরে জওহরলাল গান্ধীজির উপর নির্ভর করতে শুরু করলেন। গান্ধীজিও জওহরলালকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছিলেন যে, নেহরু কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গান্ধীজির পরামর্শ ছাড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন না।

প্রথম রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনে যে-সব ভারতীয় সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা মতিলালের মৃত্যুর দিনই দেশে ফিরে এলেন। এইসব পরে নেতাদের চেষ্টায় রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনকে আবার পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা করা হল।

গান্ধীজি ভাইসরয়ের কাছে এক চিঠিতে রাউণ্ড টেবিল সম্মেলনে যোগ দেবার শর্ত হিসাবে দাবী করলেন—সব রাজনৈতিক বন্দীদের (যাদের বন্দী দেওয়া হয়নি) মুক্তি দিতে হবে, দমন নীতি বন্ধ করতে হবে, যে-সব সরকারী কর্মচারীকে রাজনৈতিক কারণে ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদের আবার নিয়োগ করতে হবে, সরকারের লবণের একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করতে হবে এবং পুলিশ অত্যাচারের তদন্ত করতে হবে। ভাইসরয় আরউইন গান্ধীজির কাছে আবেদন করে বললেন, অতীতকে ভুলে যান ভবিষ্যতের দিকে তাকান। তবে সরকার কোন শর্ত আগে থেকে গ্রহণ করতে পারবে না।

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে গান্ধীজি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন। কংগ্রেসের বামপন্থীরা এবং নেহরু গান্ধীজির সিদ্ধান্তকে খুব খুশী মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু গান্ধীজি কংগ্রেসের মধ্যপন্থীদের চাপে পড়ে এবং কিছুটা নিজের ইচ্ছায় এই আলোচনা শুরু করতে রাজি হয়েছিলেন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি অনুরোধ করল, গান্ধীজি যেন সহজে ভাইসরয়ের কাছে নতি স্বীকার না করেন। পরপর ছয়বার গান্ধীজি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন এবং আলোচনা-অন্তে ভাইসরয় এবং গান্ধীজির সঙ্গে এক চুক্তি হল। এই চুক্তি 'গান্ধী আরউইন প্যাক্ট' কিংবা 'দিল্লী প্যাক্ট' নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী গান্ধীজি লণ্ডনে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হলেন। সরকার লবণকর রদ করতে অস্বীকার করল বটে, তবে বিশেষ যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছিল সেই অর্ডিন্যান্স বাতিল করতে রাজি হল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে স্বীকার করা হল এবং গান্ধীজির আরও কয়েকটি শর্ত স্বীকার করে নেওয়া হল। কিন্তু গান্ধীজির এগার দফার সব শর্ত স্বীকার করে নেওয়া হল না। বিশেষ করে চুক্তির দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ শাসনকার্যের জন্য সরকারের বিশেষ ক্ষমতা সংস্করণ করবার সিদ্ধান্তকে গান্ধীজি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই চুক্তি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের বিশেষ করে নেহরুকে নিরাশ করল। নেহরু আপত্তি করলেন। তিনি বললেন, এই চুক্তি করা উচিত হয়নি। কারণ এই চুক্তি আমাদের আন্দোলনকে দুর্বল করবে। এর জবাবে গান্ধীজি বললেন, বেশ তুমি যদি চাও তাহলে আমি এক্ষুনিই ভাইসরয়কে টেলিফোন করে এই চুক্তি নাকচ করতে বলব। কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর নেহরু জবাব দিলেন, এর দরকার হবে না। সাধারণত গান্ধীজির কাছে নেহরু নিজেকে খুব দুর্বল বলে মনে করতেন। এর পরবর্তীকালে নেহরু স্বীকার করেছিলেন যে, ঐদিন তিনি মতিলাল নেহরুর অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন।

'আরউইন গান্ধীর প্যাক্ট' অর্থাৎ 'দিল্লী প্যাক্ট' সই করা হল বটে, কিন্তু চুক্তি অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে করাচিতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই চুক্তি কংগ্রেস সদস্যদের কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হল। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সর্দার প্যাটেল। গান্ধীজির করাচি অধিবেশনের আগে বিপ্লবী ভগৎ সিং'কে সরকার ফাঁসি দিয়েছিল এবং গান্ধীজির আবেদন করা সত্ত্বেও ফাঁসির হুকুম মকুব করা হয়নি। অতএব করাচি শহরে সর্বত্রই 'বিক্ষোভ মিছিল বার করা হয়েছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস সদস্যরা গান্ধীজির প্রস্তাব এবং এই চুক্তিকে অনুমোদন করল। প্রথমে জওহরলাল আপত্তির সুর তুলেছিলেন, কিন্তু পরে গান্ধীজির নির্দেশে তিনি এই চুক্তিকে স্বীকার করে নিলেন। ঠিক হল, গান্ধীজি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন। তাঁকে আলোচনা করবার জন্যে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে আরউইনের পরিবর্তে দেশে নতুন ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড উইলিংডন। এ ছাড়া অনেক প্রদেশের গভর্ণর ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীজির যে চুক্তি হয়েছিল, সেই শর্তগুলি কার্যে পরিণত করতে সময় নিলেন। কিছুদিন পরে শোনা গেল যে, গান্ধীজি রাউণ্ড টেবিলে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল ব্যর্থ হয়েছে। এই বৈঠকের প্রধান কাজ ছিল যে, ভারতে সর্বভারতীয় ফেডারেশন সরকার গঠন করার জন্যে সংবিধান রচনা করা। কিন্তু পরে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে মতভেদ দেখা দিল। গান্ধীজি পৃথক নির্বাচনের দাবী স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন। অতএব বৈঠক মুলতুবি রাখা হল।

গান্ধীজির অনুপস্থিতিকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। বাংলায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারী এবং হিজলী ডিটেনশনের বন্দীদের উপর পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। পরে সরকার জরুরী ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন। 'খুদাই খিদমদগারের' উপর অত্যাচার করা হল এবং পরে তাদের সংস্থাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হল। উত্তরপ্রদেশে কিষাণদের আন্দোলনও বেশ জোরদার হয়েছিল। এছাড়া দেশের সর্বত্রই পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী শোনা গেল। কংগ্রেস সরকারের এই দমন নীতির ক্ষীণ প্রতিবাদ করল। সরকারের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা কিংবা সংগঠন শক্তি হয়ত তাদের ছিল না। গান্ধীজি দেশে ফিরে এসে এই অত্যাচার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করলেন। সরকার তার সেই কথা কানে তুলল না। বরং তাকে গ্রেপ্তার করা হল।

*　　　　*　　　　*

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে, ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চৌত্রিশ বছরের এক ছাত্র রহমত আলি 'Now or Never' নামে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। পুস্তিকার আর একটি ছোট শিরোনামা ছিল : Are we to live or perish forever.

রহমত আলি নিজেকে পাকিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচয় দিলেন। তার দলে আরও তিনজন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। রহমত আলি তাঁর পুস্তিকায় বললেন যে, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে ভারতের পাঁচটি প্রদেশ পাঞ্জাব, নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধ এবং বেলুচিস্থানকে নিয়ে এক পৃথক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এই নতুন রাষ্ট্রের প্রথম অক্ষর নিয়ে (Punjab, Afgan N. W. Frontier Province, Kashmir, Iran, Sindh, Turkisthan, Afganisthan and Balchisthan.) নাম দেওয়া হল Pakisthan। ইকবাল তার বক্তৃতায় দুই জাতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগের প্রস্তাব করেছিলেন এবং তার নতুন রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানের মধ্যেই গঠন করা হবে এই ছিল তার বক্তব্য। কিন্তু রহমত আলি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বাধীন স্বতন্ত্র করবার দাবী করলেন। কারণ রহমৎ আলি বললেন, ইকবাল তার মুসলিম রাষ্ট্রকে ভারতের মধ্যেই দাবী করেছেন কিন্তু আমরা চাই এক নতুন স্বাধীন দেশ। রহমৎ আলি তার পাকিস্তান পুস্তিকা ইংল্যাণ্ডের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিছু ইংরেজ সরকারি কর্মচারী এই পাকিস্তান পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। অনেকে সন্দেহ করেন, কুখ্যাত মাইকেল ওডায়ার রহমৎ আলিকে এই পাকিস্তান প্রস্তাবের ইন্ধন যুগিয়েছিলেন ['জিন্না অব পাকিস্তান', ষ্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা—১৩১-১৩২]। তবে ইংরেজ সরকারি কর্মচারীরা পাকিস্তান প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারি কর্মচারীরা পাকিস্তান প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করবার জন্যে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু অনেক মুসলমান নেতার কাছে এই পাকিস্তান প্রস্তাব অজানা ছিল। স্যর জাফরুল্লা খান আলি ছিলেন তার মধ্যে একজন।

জিন্না এই সময়ে লণ্ডনে আইন প্র্যাক্টিশ করছিলেন। রহমৎ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জিন্না তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কিংবা পাকিস্তান গঠন ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হলেন না ['জিন্না অব পাকিস্তান', ষ্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৩২]।

কিছুদিন পরে জিন্না মুসলিম লীগের অনুরোধে দেশে ফিরে এলেন। লিয়াকৎ আলি খান তাকে দেশে ফিরবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি লণ্ডনে তার কন্যা দীনা এবং বোন ফতিমাকে নিয়ে বসবাস করতেন। তার মাসিক আয় ছিল চল্লিশ হাজার টাকা।

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তার রায় প্রকাশ করলেন। এই রায়ের ধারা অনুযায়ী তপশীলি সম্প্রদায়ের জন্যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের কথা বলা হল। ব্রিটিশ সরকারের এই রায়ের প্রতিবাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে গান্ধীজি আমরণ মৃত্যু উপবাস করতে শুরু করলেন। এই উপবাস শুরু করবার সময় গান্ধীজি জেলে ছিলেন। কয়েকটি শর্তে গান্ধীজিকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেওয়া হল। তপশিলী সম্প্রদায়ের নেতা ডাঃ আম্বেদকর এই পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী করেছিলেন। তিনি তার দাবী এবং সংকল্প থেকে বিচ্যুত হতে চাইলেন না। পরে বহুজনের অনুরোধে আম্বেদকর এক চুক্তিতে সই করলেন। এই চুক্তির শর্ত ছিল যে, তপশীলি সম্প্রদায়ের জন্যে কিছু আসন হিন্দু আসনগুলির মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হবে। এই চুক্তিকে 'পুনা প্যাক্ট' বলা হয়। গান্ধীজি এবং সরকার এই চুক্তিকে স্বীকার করে নিল। গান্ধীজি অনশন ভাঙলেন।

জিন্না যখন ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে এলেন তখন মুসলিম লীগ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। একটি দলের নাম ছিল আজিজ গ্রুপ, অপর দলের নাম ছিল হাফিজ হিদায়েৎ হোসেন গ্রুপ।

জিন্না ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বিরোধী দলই তাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানাল।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে স্যর স্যামুয়েল হোর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের নতুন সংবিধান রচনা করে একটি 'শ্বেতপত্র' ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করলেন। জিন্না স্যর স্যামুয়েল হোরের এই শ্বেতপত্রের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

জিন্না দেশে ফিরে এসে মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ হলেন। কারণ মুসলিম লীগই আমাকে রাজনীতি করবার সুযোগ দিয়েছেন, জিন্না এক সমালোচকের প্রশ্নের জবাবে বললেন।

এবার তিনি মুসলিম লীগকে পুনর্গঠন করবার কাজে হাত দিলেন। পরে তার কাজ হল, ১৯৩৫ সালে গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া আইন অনুযায়ী দেশে নির্বাচন করা হবে এবং সেই নির্বাচনের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা হবে। এছাড়া বলা প্রয়োজন, ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি বোম্বাই'র মুসলমান আসনের জন্যে বিনা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সংসদে স্যামুয়েল হোরের শ্বেতপত্রের সমালোচনা করে বক্তৃতা দিলেন।

জিন্না লীগকে কংগ্রেসের অনুকরণে একটি শক্তিশালী জনপ্রতিষ্ঠান করবার চেষ্টা করলেন। জেলায় স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হল। এইসব সদস্যদের কাজ হল, নতুন সদস্য নিয়োগ করা। তাদের লীগের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করবার দায়িত্ব দেওয়া হল। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু ছাত্রকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োগ করা হল। এদের কাজ হল, দেশ জুড়ে মুসলিম লীগের সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। তিনি কংগ্রেসের নকলে নির্বাচনী কাজকর্ম পরিচালনা করবার জন্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করলেন। কেন্দ্রের পার্লামেন্টারী বোর্ডে তিনি প্রথমে চুয়ান্নজন সদস্য নিয়োগ করলেন। কবি ইকবাল ছাড়া তার প্রথম কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডে তখন ছিলেন লিয়াকৎ আলি (উত্তরপ্রদেশ), এইচ. এস. সুরাবর্দী (বাংলা) এবং ইসমাইল আই চুন্দ্রীগড (বোম্বাই)। লীগের আর একটি বড় সমস্যা ছিল অর্থ। রাজা অব মামুদাবাদ বার্ষিক তিন হাজার টাকা লীগের জন্যে বরাদ্দ করলেন। এছাড়া কলকাতার মুসলমান ব্যবসায়ী এম. এইচ. ইস্পাহানী লীগের ফাণ্ডে চাঁদা দিলেন। ইস্পাহানীর সঙ্গে জিন্নার লণ্ডনে থাকাকালীন আলাপ হয়েছিল। ইস্পাহানী ছিলেন রোটির ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঐ সূত্র ধরে তাদের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। জিন্না যখন নতুন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করলেন তখন ইস্পাহানীকে ঐ বোর্ডে নেওয়া হল। এরপর থেকে ইস্পাহানী হলেন জিন্নার ডান হাত এবং বাংলায় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় নেতা।

১৯৩৬ সালে বাংলায় বাঙ্গালী মুসলমানদের দুইটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল।

এক, ঢাকার নবাব পরিচালিত 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' ও দুই, ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা সমিতি'। ইউনাইটেড পার্টির এক সভায় ফজলুক হক বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করবার সময় সভায় গোলমাল শুরু হল এবং সভা মুলতুবী রাখা হল। এই গোলমাল হাঙ্গামার পেছনে ইস্পাহানীর হাত ছিল। তিনি জিন্নাকে অবিলম্বে এক তার পাঠালেন—'আপনার কলকাতায় উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না ['জিন্না', ষ্টানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৪৩]।'

জিন্না দেরী না করে কলকাতায় এলেন এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করলেন। ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি এবং খাজা নাজিমুদ্দিন, এইচ. এস. সুরাবর্দী মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। ফজলুক হকও প্রথমে মুসলিম লীগে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। জিন্না তাকে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী

বোর্ডে নিয়োগ করলেন। পরে জিন্নার সঙ্গে 'জমিদারী প্রথা' বিলোপ করা এবং প্রাইমারী পর্যায়ে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যাপার নিয়ে তার মতবিরোধ হল! আসন্ন নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা সমিতি মুসলমান আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল এবং চল্লিশটি আসন দখল করল। লীগ পেল আটত্রিশটি। পরে জিন্না বিধানসভা শুরু হবার কিছু আগে ফজলুল হকের সঙ্গে এক চুক্তি করে লীগ কৃষক প্রজা সমিতি এক সম্মিলিত লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এর পর শুরু হল, উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস লীগ সমঝোতা এবং নেহরু-জিন্নার ঝগড়া। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনা পরবর্তীকালে দেশের রাজনীতির উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার আগে আমাদের ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী নির্বাচনের কিছু বিবরণী দেওয়া দরকার।

সাইমন কমিশনের রিপোর্টকে ভিত্তি করে এই ১৯৩৫ সালে ভারত সরকারের এ্যাক্ট তৈরি করা হয়েছিল। প্রথমে সাইমন কমিশন তার রিপোর্ট দাখিল করলেন, পরে তিনটি রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে এই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হল। পরে স্যামুয়েল হোর এই রিপোর্টকে এক শ্বেতপত্র হিসাবে প্রকাশ করলেন। তারপর জয়েন্ট পার্লামেন্টারী জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি এই শ্বেতপত্র নিয়ে তাদের মন্তব্য করলেন এবং সর্বশেষে এই রিপোর্ট হল ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট। সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রথম পর্যায় থেকে এই আইন হতে মোট আট বছর সময় লেগেছিল।

এই এ্যাক্টে ভাইসরয়কে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ভাইসরয়কে স্বেচ্ছামত কাজ করবার স্বাধীনতা দেবার জন্যে প্রায় ৯০টি ধারা ছিল। এ ছাড়া ভাইসরয়ের জন্যে ডিফেন্স, বিদেশমন্ত্রণালয়, গির্জা সম্পর্কীয় এবং সীমান্ত এলাকা শাসন করবার জন্যে বেশ কিছু ক্ষমতা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

এইসব বিশেষ মন্ত্রণালয় দপ্তরের কাজকর্মের ব্যাপারে ভাইসরয়ের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। তারপর ভাইসরয়ের হাতে ছিল বিভিন্ন 'রক্ষা কবচ' কিংবা বলা যায় 'বিশেষ দায়িত্ব' যার দ্বারা তিনি দেশে শান্তির ব্যাঘাত হলে কিংবা ইংল্যাণ্ডের জিনিষের আমদানীর ব্যাপারে কোন তারতম্য ঘটলে এবং রাজকুমার-মহারাজাদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটলে সবপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন। এ ছাড়া কেন্দ্রে ফেডারেল সংসদে রাজকুমার রাজা-মহারাজাদের প্রতিবেশী পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়েছিল। কাউন্সিল অব ষ্টেটসে রাজকুমারদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট এবং ফেডারেল এসেম্বলী (কেন্দ্রীয় লোকসভা)। তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তেত্রিশ পার্সেন্ট; অথচ রাজকুমার

রাজা-মহারাজাদের ছ'শোটি ষ্টেটের জনসংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার চব্বিশ পার্সেন্ট। এ ছাড়া রাজকুমার রাজা-মহারাজাদের প্রতিনিধি মনোনীত করবার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের এ্যাক্ট অনুযায়ী এই দেশ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শাসন করা হয়েছিল। পরে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই আইন সংশোধন করে দেশ শাসনের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল।

আজও বর্তমান সংবিধানে এই ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের এ্যাক্টের ছাপ পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল আদি এই এ্যাক্ট এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যে, ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছিল বলা ভুল হবে। কারণ প্রতি ব্যাপারে রাজার প্রতিনিধি, ভাইসরয়ের ও গভর্ণরের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল এবং তারা ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারতেন।

কিন্তু কেন্দ্রের অর্থাৎ ফেডারেল অংশের চাইতে প্রদেশ সরকারের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা ছিল। যদিও গভর্ণরের হাতে কিছু ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল। সাধারণত গভর্ণর এই ক্ষমতা সচরাচর ব্যবহার করতেন এবং প্রাদেশিক সরকার দৈনন্দিন শাসনের কাজ নির্বিঘ্নে করতে পারতেন……। বিধানসভা থেকে মন্ত্রীসভা গঠন করা হত……। বিধানসভার সদস্য জনসাধারণ নির্বাচন করতে পারত।

প্রাদেশিক সরকারের হাতে এই ক্ষমতা সীমিত হলেও বহু মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতারা ক্ষমতা পাবার লোভে এই ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নেহরুর তীব্র আপত্তি ছিল। কারণ, তিনি মনে করতেন এই আইন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি করবে।

নেহরু এই এ্যাক্টকে 'ক্রীতদাসের সংবিধান' বলে অ্যাখ্যা দিলেন। কংগ্রেস গোড়া পন্থীদের নীতির বিরোধিতা করে এবং প্রগতিশীল নীতি গ্রহণের দাবী করে কিছু সদস্য জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আচার্য নরেন্দ্রদেবের নেতৃত্বে 'কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি' গঠন করেছিলেন। কিন্তু এই কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরেই তাদের রাজনীতি করছিল। এরা বামপন্থী সমাজতন্ত্রী নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেসকে আরও প্রগতিশীল করবার চেষ্টা করছিল এবং গোড়াপন্থী কংগ্রেস নীতি ও নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। এই কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি যখন গঠন করা হল, তখন নেহরু জেলে ছিলেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেননি। বরং তাদের প্রতি এক অবজ্ঞার ভাব ছিল ['নেহরু', এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-১৮৮]।

নেহরু বিভিন্ন কারণে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেননি। একটি কারণ ছিল ব্যক্তিগত।

তিনি জাতীয় নেতা হতে চেয়েছিলেন। কোন বিশেষ দলের বা গ্রুপের নয়। এ ছাড়া তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, কংগ্রেস বামপন্থী সদস্যরা ডান-গোড়া পন্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অতএব তিনি স্থির করলেন, এই দুই দলের ঝগড়া-বিবাদে তার কাজ হবে নিরপেক্ষ, সালিশের কাজ। গান্ধীজি নিজেও নেহরুর এই মধ্যস্থতার কাজ করবার নীতিকে সমর্থন করলেন। এই সময়ে এ-আই-সি-সির এক তৃতীয়াংশ সদস্য ছিল কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি।

এখানে বলা দরকার যে, ১৯৩৪ সালে এবং তার পরবর্তী বছরে কংগ্রেস ছিল ডানপন্থীদের হাতে এবং তাদের এই ক্ষমতা প্রত্যাহার করবার ইচ্ছে ছিল না এবং সর্দার প্যাটেল এর আভাসও গান্ধীজিকে দিয়েছিলেন। ডানপন্থীরা নেহরুর প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেন না বটে, কিন্তু অন্য উপায়ে তাকে পরাজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

যদিও নেহরু তার বক্তৃতায় সমাজতন্ত্রী নীতির কথা এবং বামপন্থীদের সমথন করে কথা বলছিলেন, তবু বামপন্থীরা নেহরুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না। ডানপন্থীরা সতর্ক হলেন। দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। নেহরুর বন্ধুরা (রফি আহম্মদ কিদোয়াই) এসে তাকে সাবধান করে বললেন, আপনি যে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি গঠন করেছেন এই সমিতির সদস্যরা প্রতি-ক্রিয়াশীল এবং এরা আপনার নীতির বিরোধিতা করবে। নেহরু ইচ্ছে করলেই কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি গঠনের সময় তার নিজের সমর্থকদের দলে টানতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। পরে ১৯৩৬ সালে জুন মাসে ছয়জন ডানপন্থী সদস্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, প্যাটেল আরও কিছু সদস্য কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করলেন। তারা অভিযোগ করলেন যে, নেহরু সমাজতন্ত্রবাদের বাণী প্রচার করছেন যদিও কংগ্রেস এই নীতিকে এখনও অবধি সমর্থন করেননি। এই নীতি প্রচার করে দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন করা সম্ভব হবে না। নেহরু অভিযোগ অস্বীকার করলেন না এবং তিনি গান্ধীজির কাছে এক চিঠি লিখে তার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফার কথা জানালেন। গান্ধীজি ডানপন্থী সদস্যদের পদত্যাগপত্র তুলে নেবার জন্যে অনুরোধ করলেন এবং কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া-বিবাদ সাময়িকভাবে মিটল।

এদিকে ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসছিল। এবার কংগ্রেস নেতাদের কাছে বড় প্রশ্ন হল, নির্বাচনের বছরে কংগ্রেসের সভাপতি কে হবেন? কে নির্বাচন পরিচালনা করবেন? নেহরুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সর্দার

প্যাটেল। কিন্তু গান্ধীজির চাপে পড়ে প্যাটেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গেলেন···(প্যাটেল পর পর তিনবার ১৯২৯, ১৯৩৬ এবং ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে গিয়েছিলেন। তিনবারই খুব উল্লেখযোগ্য সময় ছিল)। কিন্তু সর্দার প্যাটেল খুব স্পষ্ট ভাষায় গান্ধীজিকে বললেন: যদিও আমি সভাপতির পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। তবু আমি বলতে চাই যে, আমি জওহরলালজীর নীতির সব অংশকে সমর্থন করি না। এছাড়া প্যাটেল পার্টি পরিচালনার লাগাম অন্য কারুর হাতে দিতে রাজি হলেন না। নেহরুর যদিও এই বছর সভাপতি হবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না, তবু তিনি সভাপতি হলেন।

কংগ্রেসকে আর একটি বড় সমস্যার সমাধান করতে হল। ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা এবং পরে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করবে কিনা এই নিয়ে দুইটি মতবাদ দেখা দিল। নেহরু ও বামপন্থী নেতারা নির্বাচনে যোগ দেবার এবং মন্ত্রীসভা গঠনের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু ডানপন্থীরা এবং আরও বেশ কিছু কংগ্রেস সদস্য নির্বাচনে ও ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। এক মীমাংসা-প্রস্তাব গ্রহণ করা হল এবং এই প্রস্তাবানুযায়ী ঠিক হল যে, যেসব প্রদেশে গভর্নর তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দেবেন, ঐসব প্রদেশেই কংগ্রেস সরকার গঠন করবে। যদিও কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী নির্বাচনে যোগ দিতে রাজি হল। তারা ঐ এ্যাক্ট অনুযায়ী কেন্দ্রে অর্থাৎ ফেডারেশন গঠনের তীব্র বিরোধিতা করল।

জিন্নাও ফেডারেশন গঠনের বিরোধিতা করলেন·······এই ফেডারেশনের প্ল্যান কখনই কার্যকরী হবে না, জিন্না বললেন।

ইতিহাস অনুযায়ী জিন্না ১৯৩৮ সাল অবধি একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। তিনি নেহরুর কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

'প্রতি জাতীয়তাবাদী নেতার, তিনি যে-কোন দলের কিংবা সম্প্রদায়ের হন না কেন, তার প্রধান কাজ হবে একতার জন্যে এক যুক্তফ্রন্ট তৈরি করা।' কিন্তু দুই বছর পরে জিন্না হলেন দেশভাগের প্রধান নেতা এবং সাম্প্রদায়িক দলের নেতা ['নেহরু', মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা-২৩৩]।

লর্ড উইলিংডনের পরে ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড লিনলিথগো।

এরপর শুরু হল নির্বাচন। জওহরলাল নেহরু বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই মর্মে তিনি স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসকে (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭) এক চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের সময় এই সংস্থার একটি দুর্বলতা স্পষ্ট হল যে, কংগ্রেসের মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হল এব তাদের সম্পর্ক আরও গভীর ও দৃঢ় হওয়া দরকার উপলব্ধি করা হল।

এই কাজের জন্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির প্রতি জিলায় একটি বিশেষ দপ্তর খোলা আবশ্যক। এই সব দপ্তরে মুসলিমদের জন্যে একটি বিশেষ শাখা খোলা দরকার। এ ছাড়া মুসলিমদের কাছে উর্দুতে প্রচারপত্র বিলি করতে হবে। গান্ধীজি এই জনসংযোগ (Mass Contact) প্রোগ্রাম আপত্তি করলেন। বরং তিনি মুসলিম জনতার কাছে এবং তাদের সমাজে গঠনমূলক কাজ করবার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করলেন। কিন্তু কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি নেহরুর প্রস্তাবকে অনুমোদন করল। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বক্তব্য ছিল যে, গান্ধীজির গঠনমূলক কাজে মুসলিম সমাজকে আকৃষ্ট করবে না কিংবা তাদের মধ্যে কোন প্রেরণা সৃষ্টি করবে না। কারণ, গান্ধীজি মুসলিম জনতার কাছে জনপ্রিয় নন, বরং তারা তাকে শত্রু বলে গণ্য করেন ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২৬৫]।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন এবং মন্ত্রীসভার গঠনের চক্রান্ত শুরু হল। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দল ছিল ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল পার্টি, মুসলিম লীগ নয়। এই ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল পার্টির সদস্যরা ছিলেন জমিদার তালুকদার এবং ব্রিটিশ সরকার এদের পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং কংগ্রেসের বিরোধী দল বলে গণ্য করত। এই দল আরও কিছু সদস্যকে নিয়ে মুসলিম কনফারেন্স গঠন করল। উত্তরপ্রদেশ মুসলিম কনফারেন্সের একজন নেতার নাম ছিল নবাব ছাত্তারীর নবাব। নির্বাচনে মুসলিম লীগ কিছু গোড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল : জমায়েত উল উলেমা হিন্দ ও মুজাহিদ। এর আর একটি নাম ছিল 'ভারতীয় উলেমা পার্টি'। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় এই উলেমা পার্টি গঠন করা হয়েছিল। উলেমা পার্টির আদর্শ ছিল মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন করা এবং উর্দু ভাষার উন্নতি ও প্রসারণ করা। উলেমা পার্টির দুই নেতার নাম ছিল মৌলনা হুসেন আহমদ মাদানী এবং মৌলানা আহমদ সৈয়দ। কিন্তু পার্টি বিশেষ তৎপর সক্রিয় ছিল না। নির্বাচনের আগে এই উলেমা পার্টি মুসলিম কনফারেন্সের সঙ্গে যোগ দিল এবং নতুন দলের নাম হল : মুসলিম ইউনিটি বোর্ড। এই মুসলিম ইউনিটি বোর্ডের সভাপতি হলেন সালেমপুরের রাজা এবং সেক্রেটারী হলেন চৌধুরী খলিকুজ্জামান। পরে চৌধুরী খলিকুজ্জামান দিল্লীতে গিয়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। জিন্না বললেন, তাদের প্রাদেশিক পার্লামেন্টারী বোর্ডে স্থান দেওয়া হবে যদি তারা লীগের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। চৌধুরী খলিকুজ্জামান রাজি হলেন।

লিয়াকৎ আলি খান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লীগের পার্লামেন্টারী

বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন।

এই নির্বাচনের সময় নেহরু-জিন্নার ঝগড়া বেশ জোরাল হল। জিন্না ছিলেন ব্রিটিশদের প্রধান শত্রু ['নেহরু', এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৬]। নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এত প্রকট ছিল না, যা নির্বাচনের পরে হল।

মুসলিম লীগ 'তৃতীয় শক্তি' হিসেবে কোন দাবীও তখন করেনি। কারণ, উত্তরপ্রদেশের মুসলিমদের প্রধান সমস্যা ছিল তাদের উপর জমিদারের কর্তৃত্ব। চৌধুরী খলিকুজ্জামান নিজে ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য এবং নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নির্বাচনের সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই কংগ্রেস এবং লীগ সহযোগিতা করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

জিন্না মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইস্তাহার লিখে দিয়েছিলেন এবং এ ইস্তাহার কংগ্রেসের অনুরূপ ছিল। ১৯৩৬ সালে জিন্না এবং নেহরু অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশনে একই মণ্ডপে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং দুজনেই জাতীয়তাবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন। ['নেহরু', এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৩]।

নির্বাচনের পর অবস্থার পরিবর্তন হল। দেশের সর্বত্র হল কংগ্রেসের জয়-জয়কার। এগারটি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেস ৭১৬টি আসন (মোট ১৫৮৫ আসনের মধ্যে) পেল এবং দেশের সর্বত্রই কংগ্রেস হল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রতি প্রদেশেই অধিক সংখ্যক মুসলমান আসন দখল করল। পাঞ্জাবে ৭ জন লীগ প্রার্থীর মধ্যে ২জন লীগ প্রার্থী জয়লাভ করল, আসামে ৩৪ জনের মধ্যে ৯ জন, বাংলায় ১১৭ জনের মধ্যে ৩৯ জন, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে লীগের প্রায় সব প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিল। মোট দেশে লীগ প্রায় ১০৯টি মুসলমান আসন দখল করল। এর তুলনায় কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ছাব্বিশটি আসন। জিন্না'র হিসেব অনুযায়ী লীগ প্রায় ৬০/৭০ পার্সেণ্ট মুসলমান আসন পেয়েছিল।

কংগ্রেসের এই সাফল্যের পর নেহরু রাজনীতির এক বড় ভুল দাবায় চাল দিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি এই ভুলের জন্যে অনুতাপ করেছিলেন। তিনি লীগকে রাজনৈতিক দল হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না এবং দেশে যে সাম্প্রদায়িক কোন সমস্যা আছে, সেইটিও অস্বীকার করলেন। তিনি এক বক্তৃতায় বললেন: আজ দেশে মাত্র দুইটি শক্তি আছে, কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকার। কংগ্রেসের বিরোধিতা করা মানে হল ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করে নেওয়া। বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বার্থগত ব্যাপারে আজ কংগ্রেসের বিরোধী এবং একত্র হয়েছে। এদের সঙ্গে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৪]।

জিন্না এর জবাব দিলেন। বললেন, আমি কংগ্রেসের সঙ্গে কোন তর্কবিতর্কে যেতে চাইনে… …তবে আমি বলতে চাই, দেশে আর একটি 'তৃতীয় শক্তি' আছে। সেই 'তৃতীয় শক্তি' হল মুসলিম লীগ ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৪]।

তারপর নেহরু এবং জিন্না একে অন্যকে দোষারোপ করতে শুরু করলেন। জিন্না নেহরুকে বললেন, মুসলিমদের নিয়ে আপনি কোন চিন্তা-ভাবনা করবেন না। ওদের বাদ দিয়ে কথা বলুন।

আবার নেহরু বললেন, জিন্না আপত্তি করছেন কংগ্রেস যেন বাংলার মুসলিম-দের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করেন… কিন্তু আমি জানতে চাই মুসলিম কে? যারা জিন্না এবং মুসলিম লীগকে অনুসরণ করে, তারাই কী মুসলিম? এরা কী চায়? মুসলিম লীগের দাবী কী? নেহরুর এই বক্তৃতায় বিদ্রূপ এবং শ্লেষের সুর ছিল। নেহরু আবার ঠাট্টার সুরে বললেন: মুসলিম লীগ কী ভারতের স্বাধীনতা দাবী করে? তারা কী সাম্রাজ্যবাদীর বিরোধিতা করে? এই মুসলিম লীগের সদস্যরা হলেন এক মুষ্টিমেয় মুসলিম গোষ্ঠীর প্রতিনিধি… বড়লোক সম্প্রদায়… এদের মুসলিম জনগণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই… খুব অল্প সংখ্যক মুসলিম লীগের প্রতিনিধি মুসলিম সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংস্পর্শে এসেছেন… আমি মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের চাইতে প্রতিদিন আরও অসংখ্য মুসলিম জনগণের সংস্পর্শে আসি ['জিন্না', ষ্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা—১৪৭-১৪৮; 'নেহরু', এস. গোপাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৫; 'নেহরু এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি', মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা-২৩৩]।

এর পর নেহরু জিন্নাকে তার ড্রয়িংরুম রাজনীতি ত্যাগ করে মাঠে ময়দানের মুসলিমদের কাছে এসে দাঁড়াতে বললেন। জিন্না জবাবে বললেন: পিটার প্যানের মত নেহরু কখনই বড় হবেন না। নেহরু নিজেকে এক সবজান্তা ব্যক্তি বলে গণ্য করেন… নিজের ব্যাপার ছাড়া তিনি দুনিয়ার সব সমস্যার ঝুঁকি নিজের কাঁধে নিতে চান… এবং অন্যের ব্যাপারে অনর্থক নাক গলান ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-২২৪; 'জিন্না', ষ্টানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৪৮]।

যদিও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস বিজয়ী হয়েছিল, তবু প্রথমে কংগ্রেস মন্ত্রী-সভা গঠন করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের মধ্যে ভাঙ্গন ধরল। সরকার তাদের অনুগত কিছু সদস্যদের নিয়ে সময়কালীন এক সরকার গঠন করল। খলিকুজ্জামানকে মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হল, কিন্তু তিনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। লীগের আর একজন সদস্য সরকারে যোগ দিল এবং জিন্না তাকে লীগ থেকে বের করে

দিলেন। এর পর উলেমা পার্টির কিছু সদস্য লীগ থেকে পদত্যাগ করল। এই সময়ে পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং চৌধুরী খলিকুজ্জামানকে অনুরোধ করলেন, 'আপনি আবার কংগ্রেসে যোগ দিন' (খলিকুজ্জামান কংগ্রেসেরই সদস্য ছিলেন)।

খুব সম্ভবত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং মোহনলাল সাকসেনা এক চুক্তির প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু নেহরু চুক্তির খবর পেয়ে এর বিরোধিতা করলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নেহরুকে সমর্থন করলেন। চুক্তি কোন প্রকারেই নয়।

কিছুদিন পরে কংগ্রেস ঠিক করল তারা সরকার গঠন করবে। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে বিভেদ খুব কম ছিল। জিন্না খবর পেলেন, খলিকুজ্জামান তার কিছু সমর্থক নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেবার পরিকল্পনা করছেন এবং এই খবর পেয়ে তিনি লখনউতে চলে এলেন। এবার থেকে তিনি নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত সরকার গঠনের কাজ পরিচালনা করবেন। তিনি খলিকুজ্জামানকে বললেন: যদি লীগকে পৃথকভাবে কংগ্রেসের সমান মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কংগ্রেস-লীগ সম্মিলিত সরকার গঠন করতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাবে রাজি হল না। পরে যখন কারুর মনে কোন সন্দেহ রইল না যে কংগ্রেস সরকার গঠন করবে, তখন খলিকুজ্জামান ও নবাব ইসমাইল খান আবার উত্তর প্রদেশে সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রস্তাব করলেন। খলিকুজ্জামান কংগ্রেস নেতাদের বললেন, লীগ যে-কোন সর্তে এই সম্মিলিত সরকারে যোগ দিতে রাজি আছেন, যদি খলিকুজ্জামান ও ইসমাইল খানকে সরকারে নেওয়া হয়। এই প্রস্তাব নেহরুকে আকর্ষণ করল না। কিন্তু আজাদ রাজি হলেন। কারণ তিনি এই সুযোগে 'পৃথক দল' হিসেবে লীগের বিলোপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করলেন। আজাদ, নেহরু এবং পন্থের সঙ্গে আলোচনা করে এক প্রস্তাব করলেন··লীগের সদস্যরা লীগ ত্যাগ করে কংগ্রেসের নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তাদের দলে নেওয়া হবে। আরও সহজ ভাষায় লীগকে অস্তিত্ব বিলোপ্তি করতে বলা হল। সর্ত খুব কঠিন ছিল, তবু খলিকুজ্জামান এই সর্ত স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন, শুধু দুটি সর্ত ছাড়া। এক, লীগের পার্লামেণ্টারী বোর্ডকে বিলোপ্তি করা চলবে না। দুই, উপনির্বাচনে লীগের সদস্যদের যোগ দেবার সুযোগ দিতে হবে।

খলিকুজ্জামান নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই দুটি সর্ত স্বীকার করে নিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তার হাত-পা বাঁধা ছিল। তিনি ঠিক করলেন, উত্তরপ্রদেশে লীগের এক বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই ব্যাপার নিয়ে

আলোচনা করবেন। কিন্তু আজাদ এবং নেহরু বললেন: সব সর্তই স্বীকার করে নিতে হবে। অতএব সম্মিলিত সরকার গঠনের প্রস্তাব ভেঙে গেল ['নেহরু', এস. গোপাল, পৃষ্ঠা—২২৬-২২৮]।

তারপর জিন্না এবং নেহরুর চিঠিপত্র লেখা-লিখি শুরু হল। নেহরু জিন্নাকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কী প্রস্তাব নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চান? এর জবাবে জিন্না বললেন, তিনি তার চোদ্দ দফার দাবী নিয়ে আলোচনা করতে চান। লীগ এই চোদ্দ দফার দাবী ১৯২৯ সালে উত্থাপন করেছিল। অতএব এই দফাগুলি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। নেহরু বললেন, ঐ চোদ্দ দফা দাবী পূরণ করা অসম্ভব। আজকের দিনে ঐ দফাগুলি অকেজো। আমার অবশ্যি অন্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে কোন আপত্তি নেই। বিশেষ করে 'সাম্প্রদায়িক রায়' সম্বন্ধে। অবশ্যি আমরা এই ব্যাপার সম্বন্ধে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন আলোচনা না-করে কিছু করব না, নেহরু জিন্নাকে আশ্বাস দিলেন। এছাড়া মুসলিম লীগের সাংস্কৃতিক ও ধর্মের দাবী সম্বন্ধে ১৯৩১ সালে কংগ্রেস তার নীতি বললেন করাচি কংগ্রেস অধিবেশনে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে বলেছে। এই ব্যাপারে অবশ্যি প্রাদেশিক সীমান্ত পরিবর্তনের ব্যাপারটি হল স্থানীয় বাসিন্দাদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। জিন্না উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গণ্য করবার দাবী করেছিলেন। নেহরু সেই দাবীকে অগ্রাহ্য করলেন, যদিও নেহরু জিন্নার প্রস্তাবের মধ্যে কিছু যুক্তি খুঁজে পেলেন। জিন্নার দাবী যে, মুসলিম লীগ এই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি—তিনি এই দাবী স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন না। নেহরু জিন্নাকে এলাহাবাদে এসে আলাপ-আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। জিন্না এর জবাবে লিখলেন: তার (নেহরুর) চিঠি পড়ে তিনি দুঃখিত হয়েছেন....এবং তিনি (নেহরু) লীগের মতবাদগুলি সম্বন্ধে তার মতামত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেননি। যদি আপনি লীগকে কংগ্রেসের সমান সমান হিসাবে গণ্য না করেন তাহলে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। আপনি যদি বোম্বাইতে আসেন তাহলে আমার চিঠি পড়ে আপনি দুঃখিত হয়েছেন জেনে আমিও দুঃখিত হলাম। আমি আন্তরিকভাবে চাই সমস্ত সমস্যার একটা সমাধান হ'ক। নেহরু জিন্নার সঙ্গে বোম্বাইতে দেখা করতে অস্বীকার করলেন।

যখন জিন্না এবং নেহরু চিঠিপত্রের মাধ্যমে একে অন্যকে দোষারোপ করছিলেন তখন মুসলিম লীগ অভিযোগ করল যে, কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলিমদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তদন্ত করবার জন্যে মুসলিম লীগ এক কমিটি তৈরি করল। কমিটি তাদের রিপোর্টটি কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের

উপর নিপীড়ন এবং অত্যাচার করা হচ্ছে। কতকগুলি অভিযোগ ছিল অতি সামান্য। যেমন বিভিন্ন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত গাইতে বলা হচ্ছে। আমাদের এই অভিযোগ গুরুতর। ভারত স্বাধীন হলেই এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হতে পারে, কিংবা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান হলেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে পারে। মুসলিম লীগের এই রিপোর্টে বলা হল।

নেহরু এবং অন্যান্য কংগ্রেসী সদস্যরা যখন দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন তখন একদিন পাটনার মুসলিম লীগের অধিবেশনে (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮) শোনা গেল অজস্র মুসলিম জনগণের সমবেত কণ্ঠস্বর 'আল্লাহ্ আকবর'। ইসলাম ইন ডেঞ্জার।

নতুন করে জন্ম নিয়েছে মুসলিম লীগ। এবং ঐ দলের নেতা হয়েছেন···· কায়েদই আজম (দি গ্রেট লীডার), নামটি দিয়েছিলেন দিল্লীর এক সংবাদপত্রের সম্পাদক, মৌলানা মজহীরুদ্দিন আহমদ। নেহরু ভুল অনুমান করেছিলেন সাধারণ মুসলমান জনগণ আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তন চায়, না তারা চায় ধর্ম····১৯৩৮ সালের লীগের পাটনার অধিবেশনে এই কথাটি প্রমাণিত হল। এবং ঐ পাটনার মুসলিম লীগের অধিবেশনের পর এই দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা শুরু হল এবং পরে হল।

* * *

ঐদিন জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন····ভারতের মুসলমান নাগরিকেরা স্থির করেছে যে, তারা তাদের ন্যায্য অধিকার কংগ্রেসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে··· গান্ধী এই দেশে এক 'হিন্দু ধর্ম' এবং 'হিন্দু রাজ্য' স্থাপন করতে চান··· তিনি কংগ্রেসের আদর্শকে ধ্বংস করেছেন ·· আমরা কারুর কাছ থেকে কোন দান চাইনে····আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পেতে চাই···· ['ফাউণ্ডেশন অব পাকিস্তান', দ্বিতীয় খণ্ড, সৈয়দই সফুউদ্দিন পীরজাদা, পৃষ্ঠা— ৩০৪-৩০৬]।

* * *

জিন্না যখন তার মুসলিম লীগকে এক শক্তিশালী সংগঠন করে তুলবার চেষ্টা করছিলেন তখন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা এবং মন্ত্রীরা তাদের সুখ-সুবিধা আদায় করবার চেষ্টা করছিলেন। নির্বাচনের আগে তারা জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তারা অনেক বাধা-বিপদের সম্মুখীন হলেন। জমিদারী প্রথা এবং ভু-সম্পত্তির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব

হল না। কারণ এই প্রথা পরিবর্তন করতে গেলে কংগ্রেস সমর্থকদের অনেক অসুবিধে হত। এছাড়া তাদের অন্য প্রতিশ্রুতি পালন করাও সম্ভবপর ছিল না।

এ ছাড়া বিভিন্ন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলি থেকে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ শোনা গেল। মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারীর যথেচ্ছাচারিতার অভিযোগ কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির কানে এসে পৌঁছুল। তারা এই নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গান্ধীজি এই আলোচনায় বাধা দিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছিল রাজগোপালাচারী মাদ্রাজে কংগ্রেসের নীতিবিরোধী কাজ করছেন। তিনি পুলিশের চর দিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের কাজকর্মের খবরাখবর সংগ্রহ করছেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার করছেন ·· গভর্নর এরসকিনের সঙ্গে এক জোট হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনে বাধা দিচ্ছেন। তার সমর্থকদের ব্রিটিশ সরকারের খেতাব উপাধি দেবার চেষ্টা করছেন এবং রাজার করোনেশন উপলক্ষে দরবার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রাজাগোপালাচারী সম্বন্ধে গভর্নর এরসকিন মন্তব্য করেছিলেন: উনি আমার চাইতে বেশি রক্ষণশীল ব্যক্তি। আমি যদি কুড়ি বছর আগের কাহিনী বলি, উনি ·· ··কে দু-হাজার বছর আগে ভারতে শাসন-পদ্ধতির কাহিনী শোনান····

এ ছাড়া বোম্বাই'র মন্ত্রীসভা গভর্নরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করত। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি কংগ্রেস প্রশাসিত বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বোম্বাই'র স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কে এম মুন্সি যাকে রাজার চাইতে বেশি রাজভক্ত ব্যক্তি বলা হত। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির নির্দেশ অমান্য করেন। তিনি বামপন্থী নেতাদের বিশেষ করে কম্যুনিষ্টদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ন নজর রাখবার জন্যে ভাইসরয়কে অনুরোধ করলেন, যেন বাংলার পুলিশ সি-আই ডি'দের বোম্বাই'র ·· পন্থী ও কম্যুনিষ্ট নেতাদের দমন করতে সাহায্য করে। জওহরলাল মুন্সীকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি পুলিশ অফিসারের মত কাজকর্ম করবেন না। কিন্তু মুন্সি গান্ধীজির শরণাপন্ন হলেন এবং তার পরেও বোম্বাই'র গভর্নরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে কংগ্রেস সদস্যদের উপর পুলিশের পাহারা রাখলেন। পরে নেহরু আরও খবর পেলেন, বোম্বাই'র কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী বি-জি খের এবং স্বরাষ্ট্রসচিব ভাইসরয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে বোম্বাই প্রদেশ প্রশাসন করেন। শুধু তাই নয়। আর একটি খবরে জানা গেল যে, খের ও মুন্সী কংগ্রেসের ঘরের আভ্যন্তরীন সব খবর নিয়মিতভাবে ভাইসরয়কে ·· য়ে থাকেন ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস· গোপাল, পৃষ্ঠা-২৩০]।

ভাইসরয় লিনলিথগো বোম্বাই'র গভর্নর লর্ড ব্রেবোর্নকে এক চিঠি লিখে

জানালেন: আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে, আপনি খের ও তার সহকর্মীকে তাদের নিজেদের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করবেন····এবং এই ব্যাপারে তাঁরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-১৩০]।

নেহরু পরে সমস্ত ঘটনা প্যাটেলের কর্ণগোচরে আনলেন এবং কংগ্রেস দলের উপর প্যাটেলের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। তিনি খের ও মুন্সীকে গভর্নর এবং ভাইসরয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করতে নিষেধ করলেন।

* * *

১৯৩৮ সালে নেহরু য়ুরোপ ভ্রমণের পর দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু এই বছর তিনি আবার কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন এবং পরে প্রকাশ্য ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন। এই ঝগড়া-বিবাদে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, সুভাষ বোসের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হল। যদিও নেহরু জনতার কাছে প্রিয় ছিলেন, কিন্তু বামপন্থী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বিশেষ করে বাংলার যুবকদের কাছে সুভাষ বোস আরও বেশী জনপ্রিয় হয়েছিলেন ['নেহরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা-১২৫]।

তিনি ব্রিটিশ কারাগারে ছিলেন এবং অনেকের মতে ১৯১৮ সালে সুভাষ বোসই ছিলেন সবচাইতে উপযুক্ত রাজনীতিবিদ। অতএব, ১৯৩৮ সাল থেকে গান্ধীজির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া। কারণ, সুভাষ বোস প্রথম দিন থেকেই গান্ধীজির নীতি ও রাজনীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। গান্ধীজি তার বিরোধী কোন নেতাকে কংগ্রেস সংস্থার ভেতর কাজ করবার কোন সুযোগ কখনই দিতেন না।

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি দল ছিল। একদল ছিলেন গান্ধীজির ভক্ত। আর একদল যারা নতুন আধুনিক নীতি অনুসরণ করবার চেষ্টা করছিলেন। সংরক্ষণশীল গোড়া-পন্থীরা ও সমাজতন্ত্রীরা অধিকাংশই ছিলেন গান্ধীবাদী এবং এরা সবাই গান্ধীজির নীতির অনুসরণ করতেন। শুধুমাত্র কংগ্রেসের মধ্যে কিছু অল্প-সংখ্যক কম্যুনিষ্ট ছিলেন, যারা গান্ধীবাদে বিশ্বাস করতেন না। বলা যায় গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা।

এই সময়ে বাংলার কিছু সদস্য সুভাষ বোসের নেতৃত্বে গান্ধীবাদে প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। এ ছাড়া সুভাষ বোস এবং প্যাটেল একে অন্যকে সুনজরে দেখতে পারতেন না।

কংগ্রেসের বাইরে অনেক বামপন্থী রাজনীতিবিদ সুভাষ বোসকে নেহরুর চাইতে বেশি পছন্দ করতেন। সুভাষ বোস নিজে সক্রিয় রাজনীতিতে বিশ্বাস

করতেন এবং প্রায়ই গান্ধীজি ও গোড়াপন্থীদের নীতির বিরোধী কাজ করতেন ; শুধু তাই নয়, সুভাষ বোস গান্ধীজি-অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। আর একটি ব্যাপারে বাংলার রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণের মধ্যে এক পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ছিল যে, যদিও ভারতের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রথম যুগে বাঙালীর অবদান সবচাইতে বেশি ছিল তবু পরবর্তী যুগে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নেতৃবৃন্দ (নেহরু, গান্ধীজি, প্যাটেল) কংগ্রেসের রাজনীতি পরিচালনা করতেন। আরও বলা যায় যে, এই ঝগড়া-বিবাদের একদিকে ছিলেন বাঙালী নেতৃবৃন্দ ও সুভাষ বোস এবং অপর দিকে ছিলেন গান্ধী-নেহরু প্যাটেলের দল। সুভাষ বোস কংগ্রেসে এক 'সংগ্রামী নীতি' অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি এর বিরোধী ছিলেন।

গান্ধীজি সুভাষ বোসকে বশ করবার জন্যে ১৯৩৮ সালে তাকে কংগ্রেসের সভাপতির পদে আসীন করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সুভাষ বোসের কংগ্রেস গোড়াপন্থী এবং গান্ধীজির সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিল

গান্ধীজি বুঝতে পারলেন যে, সুভাষ বোসকে বশ করা খুব সহজ কাজ হবে না। সুভাষ বোস প্রথম বছর তার সভাপতিত্বকালে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করলেন না এবং নতুন কোন পদক্ষেপের কথাও তিনি তাঁর ভাষণে উচ্চারণ করলেন না। অতএব গান্ধীজি এবং গোড়াপন্থীদের সঙ্গে তার কোন মতবিরোধ হল না কিন্তু ১৯৩৯ সালে সুভাষ বোস এবং গান্ধীজির মধ্যে মতবিরোধ স্পষ্ট হল

যখন নেহরু যুরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন তখন গান্ধীজি তাকে আগামী বছরের কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি গান্ধীজির এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং মৌলানা আজাদের নাম প্রস্তাব করলেন। প্রথমে আজাদ সভাপতি হতে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু পরে যখন এই সভাপতি পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবার কথা শুনলেন তখন তিনি তার নাম তুলে নিলেন। গান্ধীজি ও নেহরুর নিষেধ সত্ত্বেও সুভাষ বোস দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হবার চেষ্টা করলেন।

সুভাষ বোসের বক্তব্য ছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার সম্ভাবনা আছে এবং এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলন শুরু করা উচিত। এই কাজের জন্যে সুভাষ বোস দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হতে চাইলেন। গান্ধীজি সুভাষ বোসের নীতির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কোন মতবিরোধ প্রকাশ করতে চাইতেন না। অতএব ডান গোড়াপন্থী নেতারা মাদ্রাজের পট্টভি সীতারামিয়াকে কংগ্রেসের সভাপতি করবার জন্যে তার নাম প্রস্তাব

করলেন। অতএব, সভাপতি বাছাই করবার জন্যে নির্বাচনের প্রয়োজন হল।

১৯৩৯ সালের ২৯শে জানুয়ারী এই নির্বাচনের দিন ধার্য হল। ২৪শে জানুয়ারী ডানপন্থী নেতৃবৃন্দ প্যাটেল-রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতিতে সুভাষ বোসের বিবৃতির প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করলেন। পরে প্যাটেল নেহরুর কাছে স্বীকার করেছিলেন, গান্ধীজি তাকে জোর করে এই বিবৃতিতে সই করিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, ভবিষ্যতে লোকে আমাকে এ কাজ করবার জন্যে দুষবে। কিন্তু গান্ধীজি পীড়াপীড়ি করবার পর আমি ঐ বিবৃতিতে সই করতে বাধ্য হলাম ['প্যাটেল টু নেহরু' ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯, 'নেহরু', মাইকেল ব্রেখার, পৃষ্ঠা-২৪৭]। তারা এই বিবৃতিতে বললেন যে, আগের বছর সভাপতি নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে করা হয়েছিল এবং এবার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কংগ্রেসের একতার ব্যাঘাত ঘটবে। অতএব, তারা সুভাষ বোসকে এই নির্বাচন থেকে তার নাম তুলে নেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। পরের দিন সুভাষ বোস এক চিঠি লিখে আপত্তি করলেন যে, কোন বিশেষ নেতার সপক্ষে বিবৃতি দেওয়া খুব যুক্তিসঙ্গত কিংবা ন্যায় কাজ নয়। সুভাষ বোস পট্টভি সীতা' রামিয়াকে এই নির্বাচনে দাঁড় করাবার ব্যাপারটিকে এক চক্রান্ত বলে মনে করলেন। সুভাষ বোস আরও বললেন যে, তিনি খবর পেয়েছেন ডানপন্থীরা ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট অব ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে রাজি হয়েছেন। তিনি খাঁটি সৎ নেতা আচার্য নরেন্দ্রদেবের সপক্ষে, যিনি ফেডারেশনের বিরোধিতা করেন। যদি নরেন্দ্রদেব এই নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন, তাহলে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নিতে রাজি আছেন।

কিন্তু গোঁড়াপন্থীরা কোন মীমাংসা করতে রাজি হলেন না। পরে সুভাষ বোস বললেন, তিনি নির্বাচন থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেবেন না। এবার নেহরু এই বাগ-বিতণ্ডায় অংশগ্রহণ করলেন। তিনি অনুযোগ করলেন যে, ভুল নীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক করা হচ্ছে। কারণ, ফেডারেশনের ব্যাপারটি নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তাহলে ঝগড়ার কী কারণ থাকতে পারে?

তবু নির্বাচন হল। সুভাষ বোস ১,৫৮০ ভোটের সপক্ষে এবং ১,৩৭৫ ভোটের বিপক্ষে জয়লাভ করলেন।

এবার গান্ধীজি এই বাদানুবাদে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি এক বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সুভাষ বোসের সভাপতি হবার বিরোধিতা করেছিলেন··সুভাষ বোস গান্ধীজির এই বিবৃতিতে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

পরে সুভাষ বোস গান্ধীজির সঙ্গে এক নতুন কার্যকরী সমিতির গঠন নিয়ে

আলোচনা করলেন; কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল না। সুভাষ বোস খবর (এই সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন) পেলেন যে, পুরাতন কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এক বৈঠক করে ফেডারেশনের সমস্যাটি নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করছেন। তিনি টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, পুরাতন কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। ইতিমধ্যে পনের জন কংগ্রেস কার্যকরী সদস্যদের মধ্যে বারো জন সদস্য পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেসের মধ্যে এক সংকট অবস্থার সৃষ্টি হল। অনেকে সন্দেহ করলেন, গান্ধীজি এই পদত্যাগপত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন। শুধু নেহরু এবং শরৎ বোস পদত্যাগ করলেন না। নেহরু এবার মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার চেষ্টা সফল হল না। তিনি গোড়াপন্থীদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি পদত্যাগ করলেন না বটে, তবে নতুন কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্য হতে অস্বীকার করলেন।

বাজারে রটে গেল, নেহরু পদত্যাগ করেছেন। এর জবাবে নেহরু বললেন: এখনও নয় তবে... ...এর পরে আবার বললেন: তবে· তিনি কী বলতে চ ২.২ন বুঝতে অসুবিধে হল না। নেহরু গোড়াপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তখন সুভাষ বোস বিপদের আশঙ্কা করলেন। তারপর ঝগড়ার কারণ হল, কোন্ কোন্ সদস্যদের নিয়ে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠন করা হবে? গোড়াপন্থী নেতারা এবং গান্ধীজি বললেন, এক সমজাতীয় কার্যকরী সমিতি গঠন করা হোক। সুভাষ বোস বিভিন্ন নীতির সদস্যদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব করলেন। নেহরু এক মধ্যপন্থী-নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করলেন।

পরে ৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেসে এই মতবিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হল। পুরান গোড়াপন্থীরা তাদের সমর্থকদের নিয়ে সুভাষ বোসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন ঠিক করলেন। ঠিক এই সময়ে কংগ্রেস অধিবেশন নিয়ে যখন বাগ-বিতণ্ডা চলছে তখন গান্ধীজি রাজকোটের সরকারের এক নীতির প্রতিবাদে অনশন শুরু করলেন।

সুভাষ বোস অসুস্থ শরীর নিয়ে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যোগ দিতে গেলেন। প্রথমে গোড়াপন্থীদের একজন নেতা পণ্ডিত পন্থ এক প্রস্তাব পেশ করে গান্ধীজির নেতৃত্বের এবং তার নীতির উপর আস্থা প্রকাশ করলেন। প্রস্তাবে পুরনো কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির উপর বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ করে বলা হল, সুভাষ বোস এই সমিতির নামে মিথ্যা দুর্নাম রটিয়েছেন। এই প্রস্তাবের পর সভায় গোলমাল হৈ-চৈ শুরু হল। সুভাষ বোসের সমর্থকেরা প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু পন্থের প্রস্তাবই গৃহীত হল।

পরের দিন সুভাষ বোস অসুস্থ শরীর নিয়ে সভামণ্ডপে এলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি সভায় তিনটি প্রস্তাব রাখলেন: প্রথমত, সরকারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক চরমপত্র দেওয়া হোক। দ্বিতীয়ত, যদি সরকার এই চরমপত্রানুযায়ী কোন কাজ না করে তাহলে গণ-আন্দোলন সত্যাগ্রহ শুরু করতে হবে। তৃতীয়ত, রাজকুমার মহারাজদের প্রদেশে আন্দোলন শুরু করবার জন্যে এক সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হোক এবং সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে কিষাণদের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করা হোক। পরের দিন অসুস্থতার জন্যে সুভাষ বোস সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং আজাদ সভায় সভাপতির কাজ করলেন। গোড়াপন্থীরা দাবী করলেন যে, তাদের প্রস্তাবটি মুলতুবী রাখা হোক। সভায় হট্টগোল শুরু হল।

নেহরু শরৎ বোসের পানে তাকিয়ে এইসব গুণ্ডাদের কাজ-কারবার ও ব্যবহারের জন্যে নিন্দা করলেন। এর পর জয়প্রকাশ নারায়ণ এক "জাতীয় দাবী" সভার সকলের কাছে রাখলেন। এই প্রস্তাবে পার্টির লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করা হল কিন্তু 'চরমপত্রের' কোন উল্লেখ করা হল না। শরৎ বোস বিরোধী দলের প্রস্তাবগুলিকে 'শুধু ফাঁকা বুলি' বলে বর্ণনা করলেন। নেহরু সরকারি প্রস্তাবের (বিরোধী গোড়াপন্থীদের) নীতিকে সমর্থন করলেন। পরে সুভাষ বোসের কার্যকলাপের বিরোধী নিন্দার প্রস্তাবটি গৃহীত হল। বলা যায়, গান্ধীজির জয় হল।

পরে নেহরু গান্ধীজি এবং সুভাষ বোসের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছিল, সেই ভাঙন রোধ করবার চেষ্টা করলেন। সুভাষ বোস মীমাংসার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস থেকে সুভাষকে তাড়াবার জন্যে গান্ধীজি বদ্ধপরিকর ছিলেন ['নেহরু', মাইকেল ব্রেশ্চার, পৃষ্ঠা-২৫৩]

কিন্তু এই ব্যর্থতার পর গান্ধীজি এবং সুভাষ বোসের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলে। কারণ, দু-একদিন পরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠকের দিন ধার্য হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে কোন মীমাংসা করা সম্ভব হল না। সুভাষ বোস পদত্যাগ করলেন এবং কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত তাঁর প্রতিষ্ঠান "ফরোয়ার্ড ব্লক" গঠন করলেন। সুভাষ বোসের পরিবর্তে গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়া হলেন কংগ্রেসের সভাপতি।

কিছুদিন পরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। সমস্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে এক নির্দেশে বলা হল, যেন তারা প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে এবং কংগ্রেসের বিনানুমতিতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু না করে। সুভাষ বোস এই দুইটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। এবার তাকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হল

১৯৪১ সালে সুভাষ বোস ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। প্রায় দেড় বছর পরে সিঙ্গাপুরের এক সভায়, তাকে আবার দেখা গেল।

সেখানে অসংখ্য ভারতীয় জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন—'তুমি আমাকে একবিন্দু রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব'.... 'ব্লাড ফর ফ্রীডম'।

কিন্তু সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী পরে বলা হবে।

* * *

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

ভাইসরয় রাজার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবার কংগ্রেসের প্রধান কাজ হল, এই যুদ্ধে তারা নীতি গ্রহণ করবে।

১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হল।

নেহরু এই যুদ্ধে ডানপন্থী নেতাদের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি বললেন, শুধু ইংরেজদের মুক্তি দিয়ে ফ্যাসিনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। গান্ধীজি যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হতে চাইলেন না; কিন্তু তিনি নৈতিক সমর্থনের পক্ষে ছিলেন। নেহরু এক প্রস্তাব করলেন এবং ঐ প্রস্তাবে দাবী করা হল, ইংরেজ সরকার কি উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করছে সেইটে ব্যক্ত করা প্রয়োজন। যদি ইংরেজদের এই লড়াই করবার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় 'তাদের সাম্রাজ্য এবং উপনিবেশ রক্ষা করা' তাহলে কংগ্রেস এই যুদ্ধে সরকারকে কোন সাহায্য করবে না। যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় 'সকলের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা' তাহলে তারা এই যুদ্ধকে সমর্থন করবে। মুসলিম লীগও সরকারকে সমর্থন করল এবং বলল যে, ভারতের ভবিষ্যত-নীতি নির্ধারণ করবার আগে মুসলিম লীগের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করা আবশ্যক। কারণ, মুসলিম লীগই হল ভারতের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ছিলেন গোড়াপন্থী পুরান ভিক্টোরিয়ান আমলের লোক এবং ভারতবাসীদের হাতে শাসন তুলে দেবার নীতির ঘোর-বিরোধী ছিলেন। তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের ঘোর-বিরোধী ছিলেন এবং পরে বলেছিলেন, কংগ্রেস হল "হিন্দু গুণ্ডাদের সংস্থা"। লিনলিথগো যখন শুনতে পেলেন, নেহরু জিন্নার মধ্যে মীমাংসার আলোচনা হচ্ছে তখন তিনি বোম্বাইর গভর্নর রজার সামলীকে বললেন যেন তিনি জিন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেন। এছাড়া সরকার কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করল।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের রামগড়ে এক অধিবেশন হল। এই অধিবেশনে গান্ধীজি এক 'সত্যাগ্রহ আন্দোলনে'র প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, কংগ্রেস এখনও কোন আন্দোলন শুরু করবার জন্যে তৈরি হয়নি। সবাই গান্ধীজির নীতিকে সমর্থন করলেন। সুভাষ বোস এক "মীমাংসা বিরোধী সম্মেলনে" এক আন্দোলন শুরু করবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু বস্তুত কিছুই করা হল না এবং সবাই গান্ধীজির নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলেন। পরে য়ুরোপের যুদ্ধের গতি আরও দ্রুত হবার পর কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হল। এই অধিবেশনে কংগ্রেস যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা করবার (Complete Cooperotion) প্রস্তাব করা হল। তবে সহযোগিতা করবার দুটি সর্ত বেঁধে দেওয়া হল এক, যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করতে হবে এবং প্রতিশ্রুতির চিহ্ন স্বরূপ বর্তমানে সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। দুই, সৈন্য বাহিনী ব্রিটিশ সেনাপতির অধীনে থাকবে এবং ভাইসরয়ের ক্ষমতার কোন পরিবর্তন করা হবে না তবে তিনি তার বিশেষ ক্ষমতা অপ্রয়োজনে ব্যবহার করবেন না। কিন্তু এই প্রস্তাবে এক গলদ দেখা দিল। কারণ ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস এক বৈঠক করেছিল যে, দেশ স্বাধীন হবার পর কোন সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হবে না। ঐ সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু এবার এইনীতির ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন হল।

নেহরু রাজাগোপালাচারী এবং আজাদ বললেন যে, দেশের অভ্যন্তরে অহিংস নীতি উপযোগী ও কার্যকরী নীতি হতে পারে বটে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণের কবল হতে দেশরক্ষার কাজের জন্যে এই নীতি উপযোগী নয়।

নেহরু এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নেহরুর কিংবা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে রাজি হল না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যুদ্ধকালীন সময়ে কি নীতি গ্রহণ করা হবে এই নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। গান্ধীজি বললেন: তিনি (নেহরু) চিন্তা-ভাবনায় এবং হাবভাবে ভারতীয়দের চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ...He is more English than Indian in his thoughts and make up ['মহাত্মা', লেখক টেণ্ডুলকার, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০৪-২০৫]।

প্রকাশ্য ঝগড়া-বিবাদ এড়ান হল; কারণ দেশের স্বাধীনতার জন্যে গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল।

ভাইসরয় কংগ্রেসের দাবীর জবাবে শুধু বললেন যে, তিনি তার এক্সিকুইটিভ

কৌন্সিলে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা বাড়াতে রাজি আছেন, কিন্তু অবিলম্বে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সম্ভব নয়।

তবে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের পরে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের এ্যাক্টের অদলবদল নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু এ ছিল ভবিষ্যৎ; এ শুধু আলোচনা করবার স্বীকৃতি। ভাইসরয়ের জবাব কংগ্রেস নেতাদের সন্তুষ্ট করল না। পরে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি ভাইসরয়ের প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করল।

ভাইসরয়ের এই জবাবের পর আবার সবাই গান্ধীজির শরণাপন্ন হল। কী করা যায়?

এর আগে গান্ধীজি সত্যাগ্রহের প্রস্তাব করেছিলেন। এবার তিনি কী করবেন? ইতিমধ্যে সুভাষ বোস আন্দোলনের সপক্ষে ডাক দিলেন। কারণ, তার বক্তব্য ছিল ইংরেজের এই বিপদের সুযোগ নিতে হবে। গান্ধীজি আশা করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার মীমাংসার প্রস্তাব করবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মীমাংসার জন্যে কোন আগ্রহ দেখাল না। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঠিক হল সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা হবে, কিন্তু এই সত্যাগ্রহে জনতা অংশগ্রহণ করবে না। শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সত্যাগ্রহ করবে এবং দেশের আইন ভঙ্গ করে জেলে যাবে।

প্রথম সত্যাগ্রহী হলেন বিনোভাভাবে। বিনোভাভাবে ছিলেন গান্ধীজির শিষ্য এবং ভূদান আন্দোলন করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে জেলে গেলেন। তারপর এল নেহরুর সত্যাগ্রহ করবার পালা। কিন্তু তিনি কোন সত্যাগ্রহ করবার আগেই তাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হল। তৃতীয় সত্যাগ্রহী ছিলেন এক অপরিচিত এবং তাঁর নাম ছিল ব্রহ্ম দত্ত। কিছুদিন পরে সত্যাগ্রহের ধারা পরিবর্তন করা হল। গান্ধীজি ভাইসরয়কে জানালেন, এবার সত্যাগ্রহীরা পালা করে সত্যাগ্রহ করবে; অর্থাৎ বদলে একসঙ্গে তিনজন করে সত্যাগ্রহ করবে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, প্রায় বারো'শ কংগ্রেস সদস্য এই পালা করে সত্যাগ্রহ করবে।

কিন্তু পরে সাত'শ সত্যাগ্রহী কারাগার বরন করবার পর ক্রীস্‌মাস উপলক্ষে এই আন্দোলন বন্ধ রাখা হল।

আন্দোলনের পরবর্তী দিন ঠিক হল, জানুয়ারী ১৯৪১ সাল। কিন্তু তারপরে পার্ল হারবার আক্রমণের পর ব্রিটিশ সরকার নেহরু আজাদ সবাইকে মুক্তি দিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লড়াই ভারতের সীমান্তে এসে পৌঁছুল।

ঠিক এই সময়ে শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এলেন ক্রীপস, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। পরে গান্ধীজি তাঁর 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনের বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করলেন।

*   *   *

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর একটি উল্লেখযোগ্য বছর ছিল ১৯৪০ সাল। কারণ, এই বছর জিন্নার নেতৃত্বে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কৌন্সিল লাহোরের অধিবেশনে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সেই সিদ্ধান্ত হল, দেশভাগের দাবী এবং পরবর্তীকালে ভারতের জনগণের কাছে এই দাবী 'পাকিস্থান' দাবী নামে পরিচিত হবে।

কংগ্রেস সদস্যরা যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন; তখন জিন্না এবং মুসলিম লীগের সদস্যরা তাদের লীগ সংগঠনকে আরও সুষ্ঠু ও শক্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ইস্তফা দিয়েছিল। কিন্তু লীগ সরকার করেনি। ১৯৪০ সালের ১৯শে মার্চ লাহোর শহরে খাকসার আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। এই সময়ে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্যর সিকান্দার হায়াৎ খান। তিনি ছিলেন ইউনিয়ানষ্ট পার্টির নেতা। তিনি জিন্নার দলে যোগ দেননি, কারণ ইউনিয়ন পার্টি হিন্দু সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। ১৯শে মার্চ ১৯৩০ সালে পাঞ্জাবে পুলিশ এবং খাকসার দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল।

এই আন্দোলন শুরু হবার আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে, ২২শে মার্চ লাহোর শহরে মুসলিম লীগের অধিবেশন হবে। কিন্তু শহরে গোলমালের আশঙ্কা করে স্যর সিকান্দার হায়াৎ খান জিন্নাকে অনুরোধ করলেন: আপনি এই গোলমালের সময় লাহোরে আসবেন না। কিন্তু জিন্না সবার অজ্ঞাতসারে ফ্রন্টিয়ার মেলে লাহোরে এসে উপস্থিত হলেন এবং লুকিয়ে লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে দাঙ্গায় পুলিশের গুলিতে আহত খাকসারদের দেখতে গেলেন। এই খাকসার সম্প্রদায় ব্রিটিশ সরকারকে যেমন বিষ নজরে দেখত, ঠিক তেমনি মুসলিম লীগের সঙ্গেও তাদের বিশেষ কোন সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু জিন্না হাসপাতালে গিয়ে তাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলেন এবং খাকসারদের রাগ মেটাবার চেষ্টা করলেন।

খাকসারের দল সাময়িককালের জন্যে শান্ত হলেও, পরে তারা জিন্নাকে হত্যা করবার বহু চেষ্টা করেছিল।

২২শে মার্চ প্রায় দুপুর দুটোর সময় কায়েদই আজম মুহম্মদ আলি জিন্না চুড়িদার আচকান পরে মুসলিম লীগের অধিবেশনের মণ্ডপে ঢুকলেন। সেদিন ঐ সভায় প্রায় ষাট হাজারের বেশি লোক হয়েছিল।

জিন্না প্রথমে উর্দুতে তার বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন, কিন্তু দু-চার মিনিট উর্দুতে বলবার পর তিনি ইংরাজিতে ভাষণ দিতে লাগলেন। (জিন্না ভাল উর্দু বলতে পারতেন না। গান্ধীজির মত তারও মাতৃভাষা ছিল গুজরাতি।) তিনি গান্ধীজিকে উদ্দেশ্য করে বললেন: আপনি "হিন্দু" দলের নেতা এবং আমি "মুসলমানদের"। আসুন আমরা এই পরিচয় দিয়ে দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে আমাদের দুই জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু করি ·· মুসলিমরা কোন সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় নয়····মুসলিমরা হল একটি জাতি · · যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আন্তরিকভাবে এই দেশের জনগণের সুখ ও শান্তি কামনা করে, তাহলে তাদের উচিত কাজ হবে এই দুই জাতির মধ্যে দেশকে পৃথক ও স্বতন্ত্র দেশ হিসাবে ভাগ করে দেওয়া। জিন্না তার বক্তৃতায় 'পাকিস্থান' নামটি উচ্চারণ করেননি বটে, কিন্তু তিনি দাবী করলেন দুই জাতির মধ্যে দেশকে ভাগ করে দুইটি দেশ গঠন করতে হবে।

জিন্নার বক্তৃতার পর মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন শুরু হল এবং এই অধিবেশনে 'পাকিস্থান' মূল প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল। পাকিস্থান প্রস্তাবের একমাত্র বিরোধী ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান। কারণ, পাঞ্জাবে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিল হিন্দু-মুসলমান-শিখ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত শক্তি।

লীগ কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে 'পাকিস্থান' প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল।

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন ফজলুল হক। তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হল: অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের দাবী হল যে, ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি না করা হয়। মৌলিক নীতি হল:—সীমা নির্ধারণ করে এমনভাবে প্রদেশ গঠন করতে হবে যাতে প্রয়োজনবোধে ঐ সীমা পুনরায় নির্ধারণ করবার পর যে-সব অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, (উদাহরণস্বরূপ নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রণ্টিয়ার প্রদেশ এবং নর্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া) তারা একসঙ্গে এক স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়।

অবশ্যি ১৯৪০ সালে লাহোরের প্রস্তাবেও 'পাকিস্থান' নামটি উল্লেখ করা হল না। এছাড়াও এই প্রস্তাবের ভাষায় আরও কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেল। যেমন, এই প্রস্তাব থেকে স্পষ্ট হল না যে দুইটি অংশকে একত্র করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা হবে; না দুইটি স্বশাসিত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হবে। অর্থাৎ একদিকে থাকবে নর্থ-ওয়েষ্ট এলাকা (লাহোর-করাচি) এবং অপরদিকে থাকবে পূর্বাঞ্চল, বর্তমান

বাংলাদেশ। 'শের-ই' বাংলা ফজলুল হক যখন উচ্চকণ্ঠে প্রস্তাব পড়ছিলেন তখন মনে হল, হয়ত তিনি দুই পাকিস্থানের কথা চিন্তা করেই এই প্রস্তাবটি রচনা করেছিলেন। এক সাংবাদিক জিন্নাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, একটি না দুইটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। জিন্না এর জবাবে এক মুসলিম জাতির কথা উল্লেখ করলেন। পরের দিন ভারতের সব সংবাদপত্রে এই প্রস্তাবের সঙ্গে 'পাকিস্থান' নামটি জড়িত করলেন।

স্যর সিকান্দার কেন্দ্রে এক ফেডারেশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল না। কিন্তু পাঞ্জাবের গভর্নর স্যর হেনরী ক্রেক ভাইসরয়কে এক চিঠিতে লিখলেন, লাহোরের এই প্রস্তাব হয়েছে কংগ্রেসের পাল্টা জবাব। এর পর কংগ্রেস আর কখনই 'অখণ্ড ভারত' দাবী করতে পারবে না ['জিন্না', ষ্টানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-১৮৫]।

এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সাংবাদিকেরা গান্ধীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, কায়েদই আজম হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং মুসলিম লীগ ভারতকে দুই খণ্ডে ভাগ করবার দাবী করেছে, এর পর আপনি কী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবেন?

এর জবাবে গান্ধীজি বললেন: মুসলিম লীগের লাহোরে গৃহীত প্রস্তাব আমাদের হতবুদ্ধি করেছে। কিন্তু এই প্রস্তাব এমন হতবুদ্ধিজনক নয় যে, আমি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করতে পারব না। অন্যান্য ভারতবাসীদের মত মুসলমানদেরও স্বায়ত্ত শাসন দাবী করবার অধিকার আছে। বর্তমানে আমরা এক যৌথ পরিবার।

'পরিবারের যে কেউ পৃথক হবার দাবী করতে পারে' ['কালেক্টেড ওয়াকস অব মহাত্মা গান্ধী', একাত্ম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৮০-৩৮৮]। নেহরু জিন্নার এই প্রস্তাবকে 'কাল্পনিক' বলে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, এ হল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিড়ালের থাবার মত।

পরে রামগড়ে কংগ্রেস প্রস্তাবে বলা হল: ভারতের সংবিধান স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং জাতীয় একতার উপর ভিত্তি করে করতে হবে।

অর্থাৎ কংগ্রেস জিন্নার মুসলিম লীগের দাবী ভারতকে ভাগ করা স্বীকার করে নিলেন না। (এই প্রসঙ্গে আর একটি ছোট কাহিনী বলা দরকার। এই কাহিনীর বক্তা হলেন জ্যাক মারকুউস লেখক, 'ফরেইন ডেভিল' সম্পাদনা রিচার্ড হিউজস, পৃষ্ঠা—২৮৯-২৯২)।

তিনি নেহরু সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: ১৯৪৬ সালে আমি ভারত থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম। আমি দিল্লীতে দীর্ঘকাল ধরে ছিলাম। আমি নেহরুকে

কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। আমরা দুজনে বিশেষ করে নেহরুর সঙ্গে প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করলাম। আমি যেই উঠে যাবার চেষ্টা করলাম, নেহরু আমার সঙ্গে দরজা অবধি এগিয়ে এলেন। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, মারকুউজে তুমি তিনটি জিনিষ মনে রেখ—ভারত ডোমিনিয়ন কথনই হবে না; দুই, পাকিস্থান কথনই হবে না এবং যথন ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাবে তথন এই দেশে কথনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে না।

আমি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর আবার দিল্লীতে ফিরে এলাম। নেহরুর সঙ্গে দেখা করে তার এই তিনটি ভবিষ্যবাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবার মত আমার মনের জোর ছিল না। তবে যথন দেখা হল, তথন আমি এই প্রশ্ন তিনটি না করে পারলাম না। এই প্রশ্নগুলি করে আমি নিজেই অপ্রস্তুত বোধ করলাম। নেহরু আমার প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, তোমার মনে আছে মারকুউজ; তোমাকে কি বলেছিলাম নো ডোমিনিয়ন, নো পাকিস্থান··· নো···

নেহরু এবার বলতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলেন। হয়ত আমি ভুল বলেছিলাম।

আমার মনে হল, সত্যিই এ হল নেহরুর মহানুভবতা·······।

*　　*　　*

১৯৪০ সালের মাঝামাঝি গান্ধীজি ভাইসরয়ের কাছে খোলা চিঠি লিখে লড়াই বন্ধ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন—আমি চাইনে এই যুদ্ধে ব্রিটেনের পরাজয় হয়····আপনারা অস্ত্র ছাড়াই নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন···· প্রয়োজন হলে ভাইসরয় আমাকে এ কাজের জন্যে ব্যবহার করতে পারেন ['কালেক্টেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী', বাহান্ন খণ্ড, পৃষ্ঠা—২২৯-৩১]।

কিন্তু ভাইসরয় গান্ধীজির আবেদনে কান দিলেন না। বরং তিনি জিন্নার পরামর্শানুযায়ী তার এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলের সম্প্রসারণ করলেন।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে লীগ কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হল। লীগ কার্যকরী সমিতি পুনরায় পাকিস্থান দাবী করল এবং ভাইসরয় আশ্বাস দিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন সংবিধান সাময়িককালের কিংবা পাকাপাকিভাবে লীগের সঙ্গে পরামর্শ না করে গ্রহণ করা হবে না।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শাহ্‌নওয়াজ থান 'জিন্নার জন্যে পাকিস্থান কী' এবং তার জনসংখ্যার ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্লেষণ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করলেন। এই রিপোর্টে তিনি পাকিস্থান গঠনের সুবিধা-অসুবিধার কথা উল্লেখ করলেন। (বলা দরকার, কংগ্রেস পাকিস্থানের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কোন রিপোর্ট কথনই তৈরি করেনি।)

১২ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালে মাদ্রাজে পিপলস্ পার্কে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন হল। জিন্না তার বক্তৃতায় বললেন: আমরা খুব স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় পাকিস্থান গঠনেব সমস্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। এতদিন মুসলিম ভারত-অন্ধকারে ছিল। আমরা শুধু আমাদের উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়িয়েছি। আজ আমরা জানতে পেরেছি, আমরা কী চাই? আমরা চাই 'পাকিস্তান'।

* * *

তারপর বছব ঘুবে এল ১৯৪২ সাল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এলেন ক্রীপস এবং তাঁর দিল্লীতে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার পর গান্ধীজি তার ঐতিহাসিক আন্দোলন 'ইংরেজ ভারত ছাড' শুরু করলেন।

* * *

এই কাহিনীব চতুর্থ নায়ক লর্ড ওয়েভেল

২০শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে ভারতের নতুন ভাইসবয় হয়ে এলেন লর্ড আরচিবল্ড ওয়েভেল। ভারতবাসীদেব কাছে তিনি একেবারে অপরিচিত-অজানা ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভাইসবয লিনলিথগোর এক্সকিউটিভ কৌন্সিলে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সদস্য। এর আগে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইংরেজ সৈন্যবাহিনীব 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ' ছিলেন

ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলেব্ শাসনকালে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এক, লর্ড ওযেভেলের পরামর্শে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করল যে আঠার মাসের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হবে। দুই, ইংরেজ এখান থেকে যাবার আগে এই দেশকে 'হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে' ভাগ করে দেবে। অর্থাৎ দেশভাগ এবং দেশত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত একই সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। পরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এসে ব্রিটিশ সরকারের এই দুইটি সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করলেন।

কী করে সামান্য এক কল্পনায় 'পাকিস্থান' বাস্তব হল এবং কেন ইংরেজকে লেখকের ভারত ছাডতে হয়েছিল, এবাব সেই কাহিনী বলব—

প্রথমত, ১৯৪২ সালে 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনেব পব যখন কংগ্রেস নেতারা জেলখানায় ছিলেন তখন জিন্না এবং লীগের নেতারা কারাগারের বাইরে ছিলেন। এই সময়ে লীগের প্রভাব শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, ব্রিটিশ সরকারের বহু আই. সি. এস. কর্মচারীদের উপরও বিস্তার করেছিল। এই কথা স্বীকার করে লর্ড লিনলিথগো এই দেশ থেকে যাবার আগে সেক্রেটারী অব ষ্টেটস আমেরীকে লিখলেন: গত দু-তিন বছরের মধ্যে লীগ তার শক্তি ও প্রস্তাবকে বিস্তার করেছে এবং তারা আরও অধিকতর সাম্প্রদায়িক হয়েছে।

কলকাতায় ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সালের ডিরেক্ট এ্যাকশন ডে এবং হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর ওয়েভেল উপলব্ধি করলেন, যদি কংগ্রেস-লীগের মধ্যে কোন মীমাংসার পথ খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার বীজ দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। সেইদিন ঐ মুহূর্তে কেউ লর্ড ওয়েভেলের চেতাবাণীকে বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু তারপর যখন ওয়েভেল ও ভারতের সৈন্যবাহিনীর কর্তা ক্লড অকিন্‌লেক আবার ব্রিটিশ সরকারকে বললেন, সুভাষ বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্ব-কাহিনী এবং সুভাষ বোসের দেশপ্রেম ভারতের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে বিচলিত ও দুর্বল করে তুলেছে এবং এই সৈন্যবাহিনী দিয়ে দেশ শাসন করা যাবে না। আমাদের এই দেশ থেকে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে চলে যেতে হবে। তখন ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর সবাই বিস্মিত ও হতবাক হলেন। 'ভারত থেকে চলে যেতে হবে' এ কথা ইংরেজ নাগরিকের কল্পনাশক্তির বাইরে ছিল। এই কথা শুনবার পর ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী বেভিন মন্তব্য করলেন: অসম্ভব! He is a defeatest. তিনি (ওয়েভেল) হলেন পরাজিত মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। একে দিয়ে কাজ চলবে না। প্রধানমন্ত্রী এটলীও বেভিনের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি সহকর্মীদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমরা ওকে বরখাস্ত করব। ওয়েভেলের চাকুরী গেল বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। কারণ নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসে বললেন, আমার মনে হয় আমাদের আরও তাড়াতাড়ি এই দেশ থেকে চলে যেতে হবে। হতভম্ব, বিস্মিত ব্রিটিশ শ্রমিক নেতারা অনন্যোপায় হয়ে মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং যাত্রার দিন ঠিক হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। আর ঐ দিনই জন্ম নিল, নতুন স্বাধীন ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান।

এবার আর কেউ অস্বীকার করতে পারল না যে, ওয়েভেলের ব্যর্থতাই হয়েছে মাউন্টব্যাটেনের সাফল্য'।

ওয়েভেলের শাসনকালে উদ্ভব আর একটি বিশেষ গুরুতর সমস্যা হয়েছিল। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর তিনজন সৈন্যকে দেশ-দ্রোহিতার অভিযোগে লালকেল্লার এক বিচারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের কোন শাস্তি দিতে পারেননি। বরং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই বিচার শুরু করেছিলেন, তাঁর সেই উদ্দেশ্য (অভিযুক্ত সৈন্যরা রাজার বিরোধী বিদ্রোহ করে গুরুতর অপরাধ করেছে) ব্যর্থ হল। ফল হল ঠিক উল্টো। দেশের সব জনগণ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর বীরত্বের কাহিনী শুনে উত্তেজিত ও উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

ওয়েভেলের আমলে আরও একটি ঘটনা ছিল, বোম্বাই'র ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ। কিন্তু ১৯৪৩ সালে বাংলায় মন্বন্তর দুর্ভিক্ষের ছায়া সব বাঙালীর স্মৃতি রেখে গেল। যখন বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে এসে পড়ল দুর্ভিক্ষ এবং ঐ মন্বন্তরের তীব্র আঘাতে বাঙালীর সামাজিক জীবন ভেঙে গেল তখন এল দুর্যোগ, এল ঝড়। তারপর হল দেশভাগ। সব ঘটনা মিলিয়ে যে বাঙালী ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে, ক্রমে ক্রমে সেই বাঙালী স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে হটে যেতে লাগল।

ঐ কাহিনী বলবার আগে বলা দরকার—কেন এবং কী কারণে ওয়েভেলকে এই দেশের ভাইসরয় নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ভাইসরয় হয়ে তিনি কী করেছিলেন?

* * *

১লা এপ্রিল ১৯৪৩ সাল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্তারা ওয়েভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। কারণ, তারা 'আরাকান বর্মাপ্রান্তের যুদ্ধ নীতি' নিয়ে ওয়েভেলের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চান।

১৯৪২ সালে শেষভাগে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর চোদ্দ নম্বর ডিভিসন আরাকান অঞ্চলের আকিয়াব শহরকে পুনর্দখল করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সেই আক্রমণ ব্যর্থ হল। এই আক্রমণ ব্যর্থ হবার কী কারণ, সেইটা জানবার জন্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্তারা এই আক্রমণের কম্যাণ্ডার ওয়েভেলকে ডেকে পাঠালেন।

ওয়েভেল লণ্ডনে পৌছুবার পরেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আমেরিকা পানে রওনা দিলেন। দূরপ্রাচ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ রণাঙ্গনের নীতি এবং এই সাউথ এশিয়া কম্যাণ্ডের জন্যে একজন প্রধান সেনাপতি নিয়োগের ব্যাপার নিয়ে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চান। ওয়েভেলকে এই ডেলিগেশনের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হল।

কিন্তু আমেরিকা রওনা দেবার আগে ওয়েভেল গিয়েছিলেন সেক্রেটারী অব ষ্টেটস ফর ইণ্ডিয়া আমেরীর সঙ্গে দেখা করতে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমেরী ওয়েভেলকে বললেন: চার্চিলের ভারী ইচ্ছে যে লিনলিথগোর পর ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী এন্থনি ইডেন ভারতবর্ষে ভাইসরয় হয়ে যান। এই পদ ইডেনকে অফার করেছেন এবং ইডেন এর কোন জবাব দেননি। তাকে এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করবার জন্যে কিছু সময় দেওয়া হয়েছে। আপনি গিয়ে একবার ইডেনের সঙ্গে দেখা করুন এবং তাঁকে বলুন, তিনি যেন এই পদটি গ্রহণ করেন।

আমেরী ওয়েভেলকে আরও বললেন, এই ব্যাপার নিয়ে ইডেন আপনার সঙ্গে

আলোচনা করতে চান।

আমেরীর নির্দেশানুযায়ী ওয়েভেল গেলেন বিদেশ মন্ত্রণালয়ে ইডেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। ইডেন বললেন, চার্চিল চায় আমি দিল্লীতে ভাইসরয় হয়ে যাই। ভাইসরয় হয়ে যাবার জন্যে প্রলোভন আমার আছে বটে, কিন্তু আসলে আমার যাবার কোন ইচ্ছেই নেই। কারণ, পাঁচ বছর ধরে দেশের রাজনীতির স্রোতের বাইরে থাকবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার সফর থেকে ফিরে এলে আমাকে এই বিষয়ে আমার স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে হ্যাঁ কি না।

ওয়েভেল ইডেনকে ভাইসরয় হয়ে যাবার জন্যে পরামর্শ দিলেন।

৪ঠা মে চার্চিল সদলবলে 'কুইন মেরী' জাহাজে করে আমেরিকার পানে রওনা দিলেন। জাহাজে যাত্রার সময় চার্চিল চোদ্দ ডিভিসন আর্মির আরাকান অভিযানে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বেশ কিছু কটু মন্তব্য করলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই কটু মন্তব্য শুনে ওয়েভেল ব্যথিত হলেন এবং তিনি এর প্রতিবাদে ভারতের সৈন্যবাহিনীর প্রধান কর্তার পদ থেকে ইস্তফা দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু চার্চিলের পরামর্শদাতা ওয়েভেলকে এই পদত্যাগ করতে নিষেধ করলেন।

ওয়েভেল ঠিক করেছিলেন যে, ওয়াশিংটনের সম্মেলনের পর তিনি ভারতে ফিরে যাবেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসবার পর সৈন্যবাহিনীর কর্তারা তাকে আরও কিছুদিনের জন্যে ইংল্যাণ্ডে থাকতে বললেন। ওয়েভেলের মনে মনে আশা ছিল যে, সাউথ এশিয়া কম্যাণ্ডের প্রধান কর্তার পদটি তাকে দেওয়া হবে।

কিন্তু আমেরিকার সফরের পরই চার্চিল আবার সাউথ আফ্রিকার ট্যুরে চলে গেলেন। অতএব, তাকে আরও কিছুদিনের জন্যে লণ্ডনে কাটাতে হল।

একদিন ওয়েভেল এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেটস দুজনে এক গাড়ি করে লণ্ডনের বাইরে Week-end কাটাতে গেলেন। ওয়েভেল যাচ্ছিলেন তার বোনের কাছে এবং আমেরী যাচ্ছিলেন তার কোন এক বন্ধুর বাড়িতে। আলোচনাকালীন ওয়েভেল জিজ্ঞেস করলেন, ভারতবর্ষে কাকে ভাইসরয় করে পাঠান হচ্ছে? কারণ, ইতিমধ্যে ওয়েভেল জানতে পেরেছিলেন যে ইডেন এই পদটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এই প্রশ্নের জবাবে আমেরী খুব ছোট জবাব দিলেন, কোন কিছু ঠিক করা হয়নি। গাড়িতে বসে, আমেরী ওয়েভেলকে ভারত সম্বন্ধে ভাল-মন্দ মিলিয়ে হাজার প্রশ্ন করলেন।

পরের দিন দুপুরের পর ওয়েভেল চার্চিলের সেক্রেটারীর কাছ থেকে এক

টেলিফোন পেলেন। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে এসেছেন এবং আপনার সঙ্গে একটি জরুরী বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান। আপনি কাল রাত্রে ওনার সঙ্গে ডিনার খাবেন।

এই বিষয়টি কী সেইটে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী আর ব্যাখ্যা করে বললেন না। অতএব, ওয়েভেলের মনে বেশ একটা উৎকণ্ঠা রয়ে গেল।

বিকেলে ওয়েভেল তার বোনের সঙ্গে লর্ড ক্র্যানবোনের বাড়িতে ককটেল খেতে গেলেন। লর্ড ক্র্যানবোর্ন ছিলেন ব্রিটিশ কনসাবভেটিভ দলের চেয়ারম্যান এবং উপনিবেশ মন্ত্রণালয়ের ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ঐ রক্ষণশীল দলের মধ্যে তার বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বিকেলে ক্র্যানবোর্নের বাড়িতে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই তাকে অভিনন্দন জানালেন।

অবাক হয়ে ওয়েভেল সবার মুখেব দিকে তাকালেন। 'কিছু একটা হয়েছে, অথচ ব্যাপারটি কী তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন না। নইলে সবাই তাকে কোন কথা স্পষ্ট করে খুলে বলছে না কেন? কী ব্যাপার? তাহলে কী তাকে সাউথ এশিয়া কম্যাণ্ডের পোষ্ট দেওয়া হয়েছে। ওয়েভেলের মনের উত্তেজনা বাড়ল। কিন্তু তার একবারও মনে হল না যে, তাকে আর চব্বিশ ঘণ্টা পরেই ভারতের ভাইসরয় হয়ে যাবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হবে। ভাইসরয়ের কাজটি ছিল ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের সব চাইতে বড় ও সম্মানী পদ।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ওয়েভেল দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে পৌছুলেন। একটু বাদে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর মনের কৌতূহল দূর করলেন। তিনি কোন ভনিতা না করে বেশ স্পষ্ট সহজ ভাষায় বললেন, আমি ঠিক করেছি আপনি হবেন ভারতের ভবিষ্যৎ ভাইসরয়। বলুন, এই ব্যাপারে আপনার কী মত?

প্রথমে এই প্রস্তাব শুনে ওয়েভেল বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তার বড় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি সাউথ এশিয়া কম্যাণ্ডের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে যাবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তাকে ভারতের ভাইসরয় পদ গ্রহণ করতে বলা হচ্ছে। ওয়েভেল ভাবলেন মন্দো কী।

এই হল লর্ড ওয়েভেলের ভারতে ভাইসরয় পদে নিয়োগ হবার পটভূমিকা।

*　　*　　*

ভারতবর্ষ, ১৯৭৩ সাল।

দেশের চারদিকে রয়েছে কঠিন সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতি। দেশের একদিকে বর্মা, প্রান্তে রয়েছে জাপানী শত্রুবাহিনী, তার সঙ্গে রয়েছে ত্রিশ হাজার ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। এরা যে কোনদিন আচমকা এই

দেশ আক্রমণ করতে পারে।

দেশের অভ্যন্তরেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর। গান্ধীজি, নেহরু এবং অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যরা সবাই জেলখানায় বন্দী হয়ে আছেন। জিন্না তৎপর। কংগ্রেস নেতাদের অবর্তমানে তিনি মুসলিম লীগকে আরও শক্তিশালী সংগঠন করে তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। জিন্না তার বক্তৃতায় সরকারকে বলেছেন, আমরা আপনাদের এই যুদ্ধে সাহায্য করতে রাজি আছি। কিন্তু জিন্না ব্রিটিশ সরকারকে কোনপ্রকার সাহায্য করেননি, কিংবা করবার ইচ্ছেও তার ছিল না।

অধিকাংশ প্রদেশ থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেনি

এই সময়ে বিভিন্ন প্রদেশগুলি ১৯৩৫ সালের এ্যাক্ট অনুযায়ী কাজ করছিল। কেন্দ্রে নির্বাচিত কোন মন্ত্রীসভা ছিল না, কারণ বিভিন্ন দলের আপত্তির এবং রাজকুমার মহারাজাদের আপত্তির বিরোধিতার দরুন কেন্দ্রে কোন সরকার গঠন করা হয়নি। এই সময়ে ভাইসরয় তার নিজের ইচ্ছামত সদস্য এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলে গ্রহণ করতে পারতেন। প্রদেশে ১৯৩৫ সালের সংবিধান কাজ করছিল। অবশ্যি সব প্রদেশের গভর্নরেরা সাংবিধানিক গভর্নর হলেও এদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল। কোন গোলমাল-হাঙ্গামার সম্ভাবনা দেখলে তারা মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে প্রদেশ ক্ষমতা নিজের হাতে নিতে পারতেন। সংবিধানের এই ক্ষমতা গ্রহণ করবার আইনকে 'সেকশন ৯৩' বলা হত।

ওয়েভেল যখন এদেশে এলেন, তখন এ দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ কোটি (প্রায় চারশো মিলিয়ন)। এর মধ্যে দশ কোটি (একশো মিলিয়ন) ছিল মুসলিম। এ ছাড়া ছোট বড রাজকুমার রাজা-মহারাজাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছশো। এদের মধ্যে পনেরটি রাজা-মহারাজার ষ্টেট বড ছিল। হায়দ্রাবাদ আয়তনে ছিল প্রায় ইতালির সমান। ১৯৩৪ সালে এই ষ্টেটের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ষোল মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি ষাট লাখ।

দেশ শাসন করবার জন্যে পাঁচশো ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (I. C. S.), দুশো ইণ্ডিয়ান পুলিশ (I. P.) এবং কিছু সংখ্যক ইংরেজ 'মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং' এবং অন্যান্য বিভাগে কাজ করত।

লর্ড ওয়েভেল যখন দেশের শাসনভার হাতে নিলেন, তখন দেশের আর্থিক এবং খাদ্যশস্যের পরিস্থিতি বিশেষ আশঙ্কাজনক ছিল। যদিও পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশে খাদ্যশস্য বাড়তি ছিল; কিন্তু অবিভক্ত বাংলায় খাদ্যশস্যের কিছু ঘাটতি ছিল। লর্ড লিনলিথগো এই দেশ থেকে বিদায় নেবার আগে আমেরীর

কাছে এক চিঠিতে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

পরে হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ খুব বেশি ছিল না; কিন্তু দেশের কিছু মুনাফাখোর ব্যবসায়ী কিছু অসৎ সরকারী কর্মচারীর চক্রান্তে ও কারসাজিতে অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হল। পরে এই দুর্ভিক্ষকে বলা হল **"Man made famine"**।

এই সময় থেকে অবিভক্ত বাংলায় নোংরা রাজনীতির ভিত পত্তন শুরু হল। কারণ, দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রথমে ফজলুল হক পরে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রদেশের মুখ্য-মন্ত্রী ছিলেন। লর্ড ওয়েভেলের মতানুযায়ী এঁরা ছিলেন অপদার্থ, অকর্মা, অপটু এবং অসৎ....['ভাইসরয় জার্নাল', সম্পাদনা পেনডেরেল মুন]।

ব্রিটিশ সরকার লর্ড ওয়েভেলকে এক নির্দেশ দিয়ে বলেছিল যে, যুদ্ধকালীন সময়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখাই হবে ভাইসরয়ের প্রধান কাজ। এ ছাড়া জাপানীদের আক্রমণের হাত থেকে দেশরক্ষা করাও তার আর একটি কাজ। তাকে নির্দেশে আরও বলা হল যে, চলতি বছরে মিত্রশক্তি বাহিনী শত্রু অধিকৃত বর্মা অঞ্চলগুলি পূর্ণ দখল করবার চেষ্টা করবে। এই সময়ে দেশে যেন কোন গোলমাল-হাঙ্গামা না হয়।

লর্ড ওয়েভেলকে নির্দেশে আরও বলা হয়েছিল যে, যুদ্ধের কারণবশত ভারতের কোন কোন প্রদেশে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে এবং এইসব এলাকায় দুর্ভিক্ষ হবার সম্ভাবনা আছে। এই দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দূর করবার জন্যে তাকে উপযুক্ত প্রতিষেধক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে সেই মতবিরোধ দূর করতে হবে। দেশের দুটি প্রধান সম্প্রদায় কী করে একসঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে পারে, তার পথও তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ওয়েভেল দিল্লীতে পৌঁছে বিদায়ী ভাইসরয়ের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। এই আলোচনা রাত প্রায় দুটো অবধি হল। লর্ড লিনলিথগো ওয়েভেলকে বললেন যে, গান্ধীজি জীবিত থাকাকালীন এই দেশে কোন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা যাবে না। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে, আগামী ত্রিশ বছর অবধি এই দেশে ইংরেজের শাসন কায়েম থাকবে। তবে লিনলিথগো স্বীকার করলেন: ইংরেজরা অসাধু এবং এই কারণবশত এই দেশে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। **In the problem of Indian political progress was the dishonesty of the British.** ['ভাইসরয় জার্নাল', সম্পাদনা পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা-৪৫২]।

লর্ড ওয়েভেলের দেশে পৌঁছুবার পর প্রথম কাজ হল, খাদ্য-সমস্যা বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ নিয়ে তদন্ত করা। আর সেই কারণ জানবার জন্যে নতুন ভাইসরয় কলকাতায় এলেন।

কলকাতা ১৯৪৩ সালে ছিল এক বিভীষিকার নগরী। সন্ধ্যার পর এই নগরী আরও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। রাস্তা অন্ধকার হত, কিংবা জোনাকির পোকার মত ঐ বাতি জলজল করত। যুদ্ধের কারণবশত প্রকাশ্যে কোন আলো-বাতি জ্বালান সম্ভব ছিল না।

এই অন্ধকারে কলকাতার রাস্তায় দুই শ্রেণীর জীবদেহ আহারের জন্যে ঘোরাফেরা করত। এক শ্রেণী, বিদেশী সৈন্যবাহিনী এয়ারবেডের দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বান্ধবীদের নিয়ে প্রেম করত। অপর এক শ্রেণী, নিশাচর ছিল, মেয়ের দালালী কিংবা কালো বাজারের দালালী করত।

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ একদিন দুর্ভিক্ষের ছায়া এসে কলকাতা শহরের উপর পড়ল। শুধু কলকাতায় নয়, অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র জেলা মহকুমায় এই মন্বন্তরের পদধ্বনি শোনা গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা, ঢাকা এবং অন্যান্য 'শহরে' আর এক নতুন আগন্তুক জীব দেখা দিল, যার নাম হল 'উদ্বাস্তু'। খাদ্যের সন্ধানে এরা কলকাতা এবং অন্য শহরে ভিক্ষে করতে এল। কারণ, এরা ছিল অনাহারী অভুক্ত। গ্রামে জেলায় সর্বত্রই চাল, খাদ্য, গম উধাও হয়েছিল। সেই খাদ্য কালোবাজারে বিক্রী হত।

এই সময়ে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি ছিল অতি নোংরা বিষাক্ত। কারণ, সরকারি মসনদে প্রথমে বসেছিলেন ফজলুল হক এবং পরে তাকে তাড়িয়ে ঐ তখ্‌তে বসলেন মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন। এদের পার্থক্য ছিল পয়সার এ-দিক আর ওদিক। আত্মীয়স্বজন পোষা, বন্ধু-পোষণ করা ছিল এই মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের নীতি। এই দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন রাদারফোর্ড। তিনি ভাইসরয়ের কাছে এই মুসলিম লীগের দুষ্কর্মের কাহিনীর কথা লিখে-ছিলেন। ফজলুল হকের এক নিকট আত্মীয় পারমিট জাল করে ধরা পড়েছিল; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দরুন তাকে কোন সাজা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তদানীন্তন দুর্নীতির রাজা ছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দী। এই সুরাবর্দীর ডান হাত ছিলেন ইস্পাহানী, জিন্নার বন্ধু। তাকে একমাত্র চাল ক্রয় করবার এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়। 'তিনি সরকারের গোপন খবর নিজের ব্যবসায়ে ব্যবহার করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন এবং ছয় বছর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পর দেশের লোকেরা অসাধু হয়েছিল' [রাদারফোর্ডের লর্ড লিনলিথগোকে লেখা চিঠি, 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার', চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৭]।

বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলাদলি, লীগের সদস্যদের অসাধুতা, দুর্বল সিভিল সার্ভিস এবং তাদের খাদ্য-সমস্যা সমাধানে অক্ষমতা; সব কারণ মিলিয়ে অবিভক্ত বাংলায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তখন বাংলায় জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি। বছরে আশি লাখ টন থেকে নব্বই লাখ টন চাউল উৎপাদন করা হত। কিন্তু ১৯৪১-৪২ সালে এক লাখ টন চাল উৎপাদন কম হয়েছিল। অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ঘাটতির সুযোগ নিয়ে চাল কালো-বাজারে বিক্রী করতে শুরু করল। কলকাতায় এবং বিভিন্ন স্থানে কিছু গুদামে হানা দিয়ে পুলিশ বেশ কিছু লুকনো চাল গুদাম থেকে বের করেছিল। পরে প্রতিদিনই পুলিশের অকর্মন্যতায় দুর্নীতি আরও স্পষ্ট হল। অস্থায়ী গভর্নর রাদারফোর্ড খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণী দিয়ে ভাইসরয়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, এই খাদ্য ঘাটতির প্রধান কারণ হল—বর্মা থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়েছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হয়েছে, কালোবাজারী এবং লীগ মন্ত্রী-সভার খাদ্য সরবরাহের কাজে ব্যর্থতা। এ ছাড়া চালের কিছু পরিমাণ সামরিক বাহিনীর জন্যে ব্যবহার করা হত। সামরিক বাহিনী বিভিন্ন গ্রাম থেকে নৌকো ইত্যাদি জোর করে কেড়ে নিয়েছিল। পাঞ্জাব থেকে চাল সরবরাহ খুব সন্তোষজনক ছিল না এবং সর্বশেষে মেদিনীপুর কাঁথি এলাকায় সাইক্লোনে খাদ্য শস্যের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল।

মুসলিম লীগ সরকার শহরে রেশনিং প্রথা চালু করেনি। ওয়েভেল এসে যখন রেশনিং চালু করলেন, তখন সুরাবর্দী ঠিক করলেন যে রেশনিং অফিসে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করা হবে।

খাদ্যশস্যের সমস্যা যখন গুরুতর হল এবং কলকাতায় ও অন্যান্য শহরে উদ্বাস্তুরা গ্রাম থেকে এসে জড়ো হতে লাগল এবং ঐ সময়ে প্রদেশের চতুর্দিকে বিভিন্ন অসুখ, কলেরা রোগ ইত্যাদি শুরু হল। অস্থায়ী গভর্নর রাদারফোর্ড অসুস্থতার দোহাই দিয়ে দার্জিলিং-এ গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সামরিক বাহিনীর কর্তা জেনারেল মেইন গিয়ে তাকে প্রদেশের দুর্নীতি ও অসাধুতার কথা বললেন। গভর্নর অবিশ্বাসের সুরে বললেন, আপনি এ-সব যা বলছেন আমি এর কিছুই বিশ্বাস করি না।

কলকাতায় এসে ওয়েভেল সরেজমিনে দুর্ভিক্ষের কারণ জানবার চেষ্টা করলেন। বিষয়টি যাচাই করবার পর তিনি বুঝতে পারলেন, অসাধু লীগ মন্ত্রীসভাই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তিনি এই দুর্ভিক্ষের জন্যে অস্থায়ী গভর্নরকেও আংশিক দায়ী করলেন। ওয়েভেল সেক্রেটারী অব স্টেটসকে লিখলেন: অবিলম্বে বাংলার জন্যে একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিকে গভর্নর করে পাঠান। আমেরী ওয়েভেলের তারবার্তা পাবার পর অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদ

রিচার্ড·কেসীকে বাংলার গভর্নর করে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। এই সময়ে কেসী ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন বিশেষ প্রতিনিধি। চার্চিল আমেরীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। পরে রিচার্ড কেসী বাংলায় এলেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষ ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্তরের মহলে, পার্লামেন্টে এবং সংবাদপত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা আমেরীকে এই মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমেরী মামুলি জবাব দিলেন, তবে তিনি স্বীকার করলেন যে, এই দুর্ভিক্ষের দরুন প্রতিদিন দু হাজার লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। পরে তদন্তে জানা গেল, মৃত্যুসংখ্যা আরও বেশি ছিল।

ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলে দুর্ভিক্ষের কারণ নিয়ে আলোচনা হল। কৌন্সিলের সদস্যরা স্বীকার করলেন ব্যাপারটি গুরুতর। তবে মুসলমান সদস্যরা বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের নিন্দা করতে চাইলেন না। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র বদ্রীদাস সম্রাটের কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তদন্তের দাবী করলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই দাবী অগ্রাহ্য করলেন।

ওয়াভেল ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে হটাতে না পারলে বাংলার খাদ্য সমস্যা এবং দুর্ভিক্ষের কোন সমাধান করা যাবে না। কিছু ইংরেজ সরকারি কর্মচারী আছে বটে, তবে বাকী অধিকাংশ সরকারি কর্মচারী অসাধু কিংবা অকর্মণ্য। রিলিফ এবং সরবরাহের কাজ ত্রুটিপূর্ণ। এ-ছাড়া প্রদেশ সরকারের চীফ সেক্রেটারী তাঁর কাজের জন্যে উপযুক্ত নন। দুর্নীতির একটা সীমা আছে। সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দী ছিলেন লীগ মন্ত্রীসভার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁকে ঐ মন্ত্রীসভা থেকে হটান সহজ কাজ নয়। মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সুরাবর্দীর হাতের মুঠোয়। আমি অবিলম্বে লীগ মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে চাই-ই। ওয়েভেল এক বিশেষ জরুরী তারবার্তা আমেরীর কাছে পাঠালেন।

কিন্তু আমেরী ওয়েভেলের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি ওয়েভেলের মতের বিরোধিতা করে বললেন, মুসলিম লীগ বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা যদি এই মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করি, তাহলে আমরা স্বায়ত্তশাসন নিয়ে খেলা করব। এখন মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করা ঠিক হবে না দু-একমাসের মধ্যে কেসী নতুন গভর্নরের পদ গ্রহণ করবেন। দেখা যাক, উনি কী সুপারিশ করেন।

স্যর জন এ্যাণ্ডারসন ছিলেন প্রাক্তন বাংলার গভর্নর এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে তিনি তার স্বদেশবাসীদের কাছে সুনাম অর্জন

করেছিলেন। এখন তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন গণ্যমান্য সদস্য। তিনি ওয়েভেলের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করবার সুপারিশের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, লীগ মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করলে হিন্দুরা খুশি হবে। মুসলমানরা আমাদের বিরোধিতা করবে এবং বাংলায় আমাদের কোন বন্ধু থাকবে না ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩১]।

দুর্ভিক্ষের সময় দিল্লীতে 'নিউজ ক্রনিকেলের' সংবাদদাতা ছিলেন এমনি ষ্টুয়ার্ট। তিনি বাংলার এই মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষের উপর এক ভয়াবহ রিপোর্ট পাঠালেন। বিলেতের পার্লামেন্টে এবং সাংবাদিক মহলে আলোড়ন শুরু হল।

লর্ড ওয়েভেল এমনি ষ্টুয়ার্টের রিপোর্টের উপর মন্তব্য করে বললেন, এমনি আমার মনের কথা বলেছে।

পরে সরকারি এক রিপোর্টে বলা হল, দুর্ভিক্ষের দরুন বাংলায় অনুমানিক মৃতের সংখ্যা ছিল ১৮,৭৩,৭৪৯।

ব্রিটিশ সরকার মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করে নি।

* * *

দুর্ভিক্ষের পর ওয়েভেল এক চিঠি লিখে আমেরীকে বললেন, জিন্না এবং মুসলিম লীগ কংগ্রেস নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন। অবশ্যি জিন্না পাকিস্থান দাবী করছেন বটে, তবে এই দাবী সম্বন্ধে তার কোন পরিষ্কার চিন্তাধারা নেই। তবে ওয়েভেল তার মন্তব্যে বললেন, আমি যা দেখেছি আমার মনে হয় জিন্না উচ্চাকাঙ্খী রাজনীতিবিদ, তবে তিনি কংগ্রেস নেতাদের চাইতে অনেক বেশি আন্তরিক [ভাইসরয় জার্নাল : সম্পাদনা পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা ৪৬১ এবং ৪৯৫]।

ইতিমধ্যে দেশব্যাপী গান্ধীজি এবং কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী করা হল। এই সময়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম, ঝানু আই সি-এস। তিনি ভাইসরয়ের কাছে রিপোর্ট করে বললেন, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখতে পাব যে তিনি প্রতি সত্যাগ্রহে ব্যর্থ হয়ে কিছুদিনের জন্যে চুপ করে বসে থাকেন এবং পরে সরকারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করেন। তিনি ১৯৩৪ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন তুলে নেবার সময় সরকারের কাছে গিয়ে অন্য বন্দীদের মুক্তি দাবী করেছিলেন। এবারও হয়ত তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাইবেন। তিনি নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে বাইরের শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করছেন।

স্যর রিচার্ড তাঁর রিপোর্টে আরও লিখলেন, ১৯৪২ সালের এই আন্দোলনকে এক সরকার বিরোধী বিদ্রোহ বলা যায়। জাপানীদের আক্রমণের

আশঙ্কা করেই তিনি এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এবার তার আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার কোন দরকার নেই। আমাদের নীতি হবে কংগ্রেস নেতাদের জেলখানায় বন্দী হিসাবে কর্মফল ভোগ করতে দেওয়া, যদি কখনও তারা আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করেন তবে তাদের ক্রীপসের প্রস্তাবের কাঠামোর ভিত্তিতে আলোচনা করতে হবে। এ ছাড়া তারা 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এই দাবীর প্রস্তাবকে বাতিল করলেই আমরা আলোচনা করব। গান্ধী হলেন কংগ্রেসের সব চাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তি। কংগ্রেসের সঙ্গে কোন আলোচনা করতে হলে গান্ধীজির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

স্যর রিচার্ড তাঁর এই রিপোর্টে স্বীকার করে নিলেন যে, ক্রীপসের প্রস্তাবে পরোক্ষভাবে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

পরে স্যর রিচার্ড বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লীগের সফলতার কথা উল্লেখ করে বললেন, মুসলিম লীগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে প্রধান এবং প্রভাবশালী সংস্থা বলে গণ্য হয়েছে। আমরা যদি মুসলিম লীগের দাবীতে কান দিই তাহলে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড আরও বিবেচকের মত কাজ করবে এবং আজকের অচল অবস্থার সমাপ্তি হবে।

স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম তার রিপোর্টে আরও প্রস্তাব করলেন, যদি রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি এবং সরকারের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে পারি; তাহলে আমরা অনেক কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে সমর্থন পাব।

*　　　*　　　*

গান্ধীজি জেলখানা থেকে ভাইসরয়কে চিঠি লিখলেন। তিনি ভারত সরকারের কংগ্রেস নীতির বিরোধী প্রচারপত্র বিতরণের প্রতিবাদ করলেন

তিনি ভাইসরয়কে স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, 'কুইট ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ইংরেজ ভারত ছাড় প্রস্তাবটি তুলে নেওয়া কিংবা প্রত্যাখ্যান করবার কোন ইচ্ছেই তার নেই। এই প্রস্তাব শুধু অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি তুলে নিতে পারে। এ ছাড়া গান্ধীজি ভারত সরকারের বিভিন্ন অভিযোগের এক নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করলেন। আমার ইচ্ছে ছিল যে, 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করবার আগে একবার ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু সরকার আমাকে সেই সুযোগ দেয়নি।

কিন্তু ভাইসরয় তাঁর সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন করলেন না।

ওয়েভেল ভাইসরয় হবার পর গান্ধীজি আবার তাকে চিঠি লিখলেন। তিনি

বললেন : ভারত সর্বপ্রকার বিদেশী বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। আমি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করিনে। এর কোন মূল্য নেই · । তিনি ইংরেজ সরকারকে আবার কংগ্রেসের দাবী স্বীকার করে নিতে বললেন।

এবার এই আগষ্ট আন্দোলন এবং গান্ধীজির ভূমিকা নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে সরকার 'এক বিভাগীয় তদন্ত কমিশন' গঠন করল। এই তদন্ত কমিশনের সভাপতি হলেন উইকেনডেন। তিনি ছিলেন আই-সি-এস। এই কমিশনেব কাছে সরকার কোন কাগজপত্র পেশ করল না। এমনকি গান্ধীজি ভাইসরয়ের কাছে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠিগুলিও পেশ করা হল না। শুধু ৮ই আগষ্টের ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট লেখা হল।

উইকেনডেন তার রিপোর্টে লিখলেন : গান্ধীজির জাপানীদের সাহায্য করবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তার রিপোর্টে আরও বলেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল গান্ধীজির এই সংগ্রাম শুরু করার প্রধান উদ্দেশ্য (The desire for Indepence was his dominating move. The Transfer of Power Vol. IV, Page 747)।

উইকেনডেনের এই রিপোর্ট পেশ করবার পর সরকার চিন্তিত হল। কারণ, গান্ধীজি দোষী এবং এই আন্দোলন তার অপরাধ প্রমাণ করেছে ; এইটে বলা ছিল সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু উইকেনডেনের রিপোর্ট গান্ধীজিকে নিরঙ্কুশ দোষী বলে প্রমাণ করল না।

গান্ধীজি জেলখানা থেকে কবে মুক্তি পাবেন কেউ সঠিক বলতে পারল না। এদিকে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হল। ডাক্তার এলেন বি-সি রায়। ডাক্তাররা তার স্বাস্থ্যের অবনতির আশঙ্কা করলেন। তারা আরও বললেন যে, গান্ধীজির হার্ট এ্যাটাক কিংবা সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হবার আশঙ্কা আছে। তারপর সরকারি ডাক্তার তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বললেন, তার স্বাস্থ্য এমন যে ভবিষ্যতে গান্ধীজি আর কখনও সক্রিয় রাজনীতি করতে পারবেন না।

এই সময়ে লর্ড ওয়েভেল সিকিম ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ডাক্তারের রিপোর্ট পাবার পরই ভাইসরয়ের সেক্রেটারী আবেল ওয়েভেলকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলেন : বলুন কী করব ? এরপর ওয়েভেল গান্ধীজিকে ছেড়ে দেবার সুপারিশ করে আমেরীকে এক তারবার্তা পাঠালেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গান্ধীজিকে মুক্তি দিলেন।

* * *

জেলখানা থেকে বেরিয়ে কিছুদিন পরে গান্ধীজি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এলেন। জেলখানা থাকাকালীন সরকারি ডাক্তার যখন ভবিষ্যবাণী

করেছিলেন গান্ধীজির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে, তিনি আর কখনও সক্রিয় রাজনীতি করতে পারবেন না। প্রথমে ওয়েভেল ডাক্তারের এই কথায় বিশ্বাস করেছিলেন; কিন্তু পরে গান্ধীজিকে সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ফিরে আসতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। গান্ধীজি যে এত তাড়াতাড়ি তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, ওয়েভেল বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এবার গান্ধীজির সঙ্গে রাজাগোপালাচারী দেখা করলেন। 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব গৃহীত হবার পর রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন; অতএব পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি। রাজাজী গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন: আপনি জিন্নার সঙ্গে দেখা করুন। আর তার সঙ্গে দেখা করবার প্রস্তাব হল, কংগ্রেস এবং লীগ একত্র হয়ে স্বাধীনতার জন্যে কাজ করবে এবং সাময়িককালের জন্যে এক জাতীয় সরকার গঠন করবে। যুদ্ধের পর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এক গণভোট অর্থাৎ প্লিবিসাইট আয়োজন করা হবে এবং মুসলমানদের মতামত যাচাই করা হবে—তারা ভারত থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হতে চায় কিনা? যদি এই গণভোটে জানা যায় যে, মুসলমানরা পৃথক হতে চায়; তাহলে এক স্বতন্ত্র, স্বশাসিত মুসলমান প্রদেশ গঠন করা হবে এবং ফেডারেল সরকারের সঙ্গে তাদের শুধু ডিফেন্স, বিদেশ, ব্যবসার সম্পর্ক থাকবে।

গান্ধীজি জিন্নাকে এক চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রস্তাব করলেন।

'আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।'

জিন্না গান্ধীজির এই চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন-বাসনা আজ বাস্তব হতে চলেছে। তিনি মিস্টার গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন। তার সহকর্মী লীগের সদস্যদের আশ্বাস দি বললেন: আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। আমি মিঃ গান্ধীর কোন প্রস্তাব স্বীকার করে নেব না। আমি আপনাদের আশা দিতে পারি, আল্লার ইচ্ছেয় পাকিস্তান হবেই ['জিন্না', ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-২৩১]।

৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজি ও জিন্নার মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। জিন্না কোনদিনই রাজাজীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না, বরং তার প্রতি ঘৃণা ছিল।

প্রথম দিন জিন্নার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর গান্ধীজি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরে তিনি রাজাজীকে বললেন: আমার নিজের ধৈর্য্য দেখে আমি নিজেই অবাক হয়েছি। জিন্না আপনার প্রস্তাবকে হেয় চোখে দেখে। আমি তাকে বলেছি যে, আমি রাজাজীর প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে রাজি আছি; যদি

ঐ প্রস্তাবে পাকিস্তানও হয় আমি আপত্তি করব না। কিন্তু জিন্না এখুনিই পাকিস্তান দাবী করছেন, স্বাধীনতার পরে নয়। উনি বলছেন, আমরা 'পাকিস্তান' এবং 'হিন্দুস্তানের' জন্যে একসঙ্গে স্বাধীনতার দাবী করব। পরে গান্ধীজি আরও বললেন: জিন্না আমাকে বলেছেন যে পাকিস্তান হবে এক গণতান্ত্রিক দেশ। সুতরাং গান্ধীজি-জিন্নার আলোচনা ব্যর্থ হল।

গান্ধীজি জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন: একবার পাকিস্তান দাবী স্বীকার করে নিলে দেশকে আরও বিভিন্ন অংশে টুকরো করবার প্রস্তাব করা হবে। জিন্না আন্তরিক, কিন্তু তার মতিভ্রম হয়েছে।

কিন্তু গান্ধীজি-জিন্নার আলোচনা দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঢেউ তুলল। কারণ অনেকে বললেন যে, গান্ধীজি জিন্নার সঙ্গে দেখা করে পরোক্ষে 'পাকিস্তানকে' স্বীকার করে নিয়েছেন। হিন্দু মহাসভার নেতারা তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন যে, ভারতবর্ষ গান্ধীজি কিংবা রাজাজীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; দেশ ভাগ করবার এবং এ ব্যাপারে আলোচনা করবার কোন অধিকার তাদের নেই।

*　　*　　*

গান্ধীজি ও জিন্না যখন তাদের আলোচনা করছিলেন তখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। একদিন শোনা গেল যে, জাপানী সৈন্যবাহিনী ভারতের সীমান্ত নগরী কোহিমা আক্রমণ করেছে এবং এই আক্রমণের প্রথম সারিতে আছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি যার আর এক নাম হল 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজ'।

রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে প্রথম 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠন ব্যর্থ হল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আবেদনে জাপান সরকার সুভাষ বোসকে এই এলাকায় এনে ভারতীয়দের একত্র করে 'আজাদ-হিন্দ' সরকার এবং 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজ' গঠন করবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

সুভাষচন্দ্র এবং তার সহকর্মী আবিদ হাসান প্রথমে সাবমেরিনে ও পরে প্লেনে করে ১৬ই মে ১৯৪৩ সালে টোকিওতে এসে পৌছুলেন এবং ইম্পিরিয়াল হোটেলে ঠাঁই নিলেন।

সাবমেরিনে একটানা ভ্রমণ করে সুভাষচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কিছুদিন বিশ্রাম করে চীফ অব দি আর্মি স্টাফ সুজিয়ামা এবং বিদেশমন্ত্রী সিগেমিৎসুর সঙ্গে দেখা করলেন।

প্রথম দিনের আলোচনায় সুভাষ বোস দুই বিস্মিত জাপানী নেতাকে

বললেন, আমরা সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে এগিয়ে যাব। যুদ্ধ না করলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না।

জাপানী নেতারা সুভাষ বোসের সাহসী, দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত ও অবাক হলেন। চীফ অব দি স্টাফ সুজিয়ামা সুভাষ বোসকে জাপানীদের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু সুভাষ বোস সুজিয়ামার মুখে তাদের আক্রমণের পরিকল্পনার বিবরণী শুনে আকৃষ্ট হলেন না। আপনারা প্রথমে চট্টগ্রাম আক্রমণ করুন। তারপর চট্টগ্রাম অধিকার করতে পারলে আমরা অনায়াসে বাংলার অভ্যন্তরে ঢুকতে পারব।

এবার সুভাষ বোস জাপানী প্রধানমন্ত্রী টজোর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ভারত আক্রমণ এবং ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে জাপানী প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে চান।

সুভাষ বোসের সঙ্গে তার পুরোনো জাপানী মিলিটারী এটাচী বন্ধু ইয়ামমাটো ছিলেন। তিনিই বড় বড় জাপানী নেতাদের সঙ্গে সুভাষ বোসের দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন করছিলেন।

টজো প্রথমে সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা করবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তার এই অনীহার নেপথ্য কাহিনী ছিল—

প্রথমত, বিভিন্ন সামরিক কাজকর্মে টজো নিজে ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, জাপানী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অনেকেই জাপানী সামরিক বাহিনীর ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা ও ধারণা পোষণ করতেন না। কারণ, ভারত-আক্রমণ জাপানী সৈন্যবাহিনীর সামরিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। টজোর সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার অনিচ্ছার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল—এই জাপানী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিশেষ 'পক্ষপাতমূলক' ব্যক্তি। সাধারণত তিনি কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার আগেই সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে ভাল কিংবা মন্দ এরকম একটি বিশেষ মত গ্রহণ করতেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের গৃহীত ব্যাংকক প্রস্তাবটিকে 'দাম্ভিক' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির আভ্যন্তরীণ ঝগড়া-বিবাদে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। টজো আরও একজন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সমস্যাকে জটিল করতে চাইলেন না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীফ অব দি আর্মি স্টাফ সুজিয়ামা এবং বিদেশমন্ত্রী সিগেমিৎসুর অনুরোধে পড়ে টজো সুভাষ বোসের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনেই তিনি মুগ্ধ হলেন। সুভাষ বোস ও নির্ভীক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনারা কি বিনা শর্তে

সাহায্য করবেন? তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কি ভারতের অভ্যন্তরে লড়াই করতে পারবেন?

কিন্তু ঐ সময়ে টজো সুভাষ বোসের এই প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব দিতে পারলেন না। কিন্তু ঐদিন আলোচনায় অন্য যারা ছিলেন, তারা বুঝতে পারলেন সুভাষ বোস জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে আকৃষ্ট করেছেন।

১৬ই জুন সুভাষ বোস সর্বপ্রথম এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-জাপানের মধ্যে অতীতের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে বললেন: ভারত শীগ্‌গিরই ব্রিটেনের হাত থেকে মুক্তি পাবে।

টোকিও থাকাকালীন সুভাষ বোস রাসবিহারী বোসের সঙ্গে দেখা করলেন।. পরে তিনি তয়োমা মিতসুরুর সঙ্গেও দেখা করলেন। তয়োমা মিতসুরু সুভাষ বোসকে অভিনন্দন জানালেন।

একমাস টোকিওতে থাকবার পর সুভাষ বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য রণাঙ্গন প্রান্তে রওনা দিলেন। ইতিমধ্যে কর্নেল ইয়াকরোর পরিবর্তে কর্নেল ইয়ামমাটো 'কিকান' (এজেন্সীর) প্রধান কর্তা হলেন।

* * *

সিঙ্গাপুর, ২রা জুলাই।

সুভাষ বোসকে স্থানীয় ভারতীয়রা বিপুল সম্বর্ধনা জানাল। প্রথমত, তিনি ভারতীয়দের মনের সন্দেহ ও চিন্তা দূর করবার চেষ্টা করলেন। তিনি সবাইকে বললেন, আজ এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীন হবার স্বর্ণ সুযোগ এসেছে। আজ দেশের মুক্তি সংগ্রামে আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই আমার।

তারপর দুই সপ্তাহ ধরে সুভাষ বোস সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন।

সকাল থেকে বিকেল অবধি একটানা অক্লান্তভাবে তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিলেন। মহিলা প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত 'মিছিল প্যারেড' পরিদর্শন করলেন। সবার সঙ্গে তার আলোচনার বিষয় ছিল 'ভারতের স্বাধীনতা'।

৪ঠা জুলাই ক্যাথে হলে এক জনসভা হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে বহু ভারতীয়রা এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করলেন ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের সভাপতি রাসবিহারী বোস। লীগের সভাপতি হিসাবে তিনি এই শেষ সভাপতিত্ব করেছিলেন।

রাসবিহারী বোস সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন: বন্ধুগণ, আজ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আজ আমি আপনাদের কাছে

আমার মাতৃভূমির এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। তিনিও আমাদের সংগ্রামে যোগ দেবেন। আজ আমি ইণ্ডিয়া ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করছি এবং আজ থেকে লীগের সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র বোস এবং তিনিই হবেন আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামের নেতা।

এরপর সুভাষ বোস এক বক্তৃতায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর পক্ষ থেকে এই নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা হয় বাঁচব, নয় মরব। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, সাময়িক কালের সরকারকে পুনর্গঠন করা হবে।

সাময়িক সরকার ভারতীয়দের ভারতের অভ্যন্তরে এবং বাইরে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের জন্যে তৈরি করবে।

সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তৃতার শেষে বাংলায় বললেন: আজ আমাদের সামনে রয়েছে কঠোর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের অনেক বিপদ, তৃষ্ণা, দুঃখ-দুর্দশা পার হতে হবে। আমরা যখন এই দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করতে পারব তখনই আমরা স্বাধীনতা পাব। উপস্থিত অসংখ্য জনগণ উত্তেজনায় ও উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

৫ই জুলাই জাপানী প্রধানমন্ত্রী টজো সিঙ্গাপুরে এলেন এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে পরিদর্শন করলেন।

সেইদিন সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে সুভাষচন্দ্র তার ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন। সুভাষচন্দ্র বললেন: কমরেড, আমার বীর সৈনিক ভাইরা, আজ থেকে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ডাক হবে—দিল্লী চলো, অন টু দিল্লী। এই মুক্তি-সংগ্রামে আমরা কে বাঁচব, কে মরব, আমি জানিনে, কিন্তু আমি জানি যে, জয় আমাদের হবেই। এবং যতদিন না আমাদের বীর সৈনিকেরা দিল্লীর লালকেল্লায় গিয়ে কুচকাওয়াজ করেন ততদিন আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে না। যদি আপনারা জীবনে-মরণে আমাকে অনুসরণ করতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি আপনাদের জয়ে এবং স্বাধীনতার দ্বারে পৌছে নিয়ে যাব। দেশের এই স্বাধীনতা দেখবার জন্যে আমাদের মধ্যে কে বেঁচে থাকব জানিনে; কিন্তু আমি জানি যে, দেশ স্বাধীন হবে এবং দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে আমরা আমাদের সর্বস্ব দেব। সুভাষচন্দ্রকে সবাই আশ্বাস দিয়ে বললেন, আজ আপনারা শুধু স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছেন না। আপনারা হলেন আগামীকালের স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনী।

টজো পরে আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করলেন এবং সৈন্যদের

উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দিলেন।

৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আর এক ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সমবেত জনগণকে উদ্দেশ্য করে সুভাষ বোস বললেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজিদের আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু দেশবাসীরাই বিপ্লব করবে না ; ব্রিটিশ পতাকার নিচে যে-সব ভারতীয় সৈন্যরা আছে তারাও বিদ্রোহ করবে।

সুভাষ বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের যুদ্ধের জন্যে সবাইকে প্রস্তুত হতে বললেন। তিনি মহিলাদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন এবং এর নাম হল : 'রাণী ঝাঁসি বাহিনী'। অসংখ্য মহিলা এই বাহিনীতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বাহিনীর অধিনায়িকা হলেন লছমী স্বামীনাথ। পেশায় তিনি ছিলেন ডাক্তার। এই মহিলা সৈন্যবাহিনীকে উপযুক্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। কিন্তু জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ এই বাহিনীর সপক্ষে ছিলেন না। কারণ, জাপান মহিলাদের সামরিক কাজকর্মে কোনপ্রকার সুযোগ দেওয়া হত না।

সুভাষচন্দ্র এবার ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এবং ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগের মধ্যে আমূল পরিবর্তন করলেন। দুইটি সংস্থাকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলা হল। প্রচার বিভাগের কর্তা হলেন এস. এ আয়ার। লেঃ কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জী হলেন লীগের হেড কোয়ার্টারের সেক্রেটারী। এই নতুন সরকার গঠনের সময় সুভাষ বোস তার সহকর্মীদের সঙ্গে সংগ্রামের নীতি নিয়ে আলোচনা করলেন। সুভাষ বোস সবাইকে বললেন, গান্ধীজী এবং নেহরু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম করবেন না। এঁরা সবাই মীমাংসার পথ খুঁজছেন ['জাঙ্গল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১২১]।

আবিদ হাসান সুভাষ বোসকে একটি নতুন পদবী দিলেন : নেতাজী। আবিদ হাসান বললেন, সুভাষচন্দ্রের জন্যে এই পদবী উপযুক্ত, কারণ তিনি হবেন সর্বময় কর্তা। এই নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত হতে চান ['জাঙ্গল এলায়েন্স', জয়েস লিব্রা, পৃষ্ঠা-১২২]। এরপর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবত্রই সুভাষচন্দ্র বোসকে 'নেতাজী বোস' বলে ডাকা হত।

সম্ভাষণ করবার জন্যে এক নতুন অভিনন্দন বিধান রচনা করা হল 'জয় হিন্দ'। যুদ্ধের পরে নেহরুও এই 'জয় হিন্দ' সম্ভাষণ তাঁর বক্তৃতার শেষে ব্যবহার করেছিলেন।

নেতাজী বোস ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির পুনর্গঠন করলেন। আই-এন-এর নতুন নাম হল 'আজাদ-হিন্দ-ফৌজ'। নেতাজী বোস হলেন এই সৈন্যবাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার। লেঃ কর্নেল জে. কে. ভোঁসলে হলেন আজাদ-হিন্দ-ফৌজ

বাহিনীর 'চীফ অব দি স্টাফ'।

সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টারকে নতুন করে গঠন করা হল। শাহ্ নওয়াজ খান হলেন 'প্ল্যানিং এ্যাণ্ড অপারেশন ইনটেলীজেন্স' ব্রাঞ্চের কর্তা, লেঃ কর্নেল এন. এস. ভগত হলেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের কর্তা। কে. পি. তিমাইয়া হলেন সাপ্লাই'র কর্তা। মেডিকেল শাখার কর্তা হলেন এ. ডি. লোকনাথন।

এর পর নেতাজী বোস এবং তার অন্যান্য সহকর্মীরা 'ককানের' কর্তা ইয়ামমাটোর সঙ্গে আই-এন-এর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনা অন্তে প্রথমে ঠিক হল যে, আই-এন-এ হল ছোট বাহিনী এবং বর্তমানে তারা গরিলা যুদ্ধ করবে।

গরিলা যুদ্ধ করবার জন্যে আই-এন-এ'কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। কুয়ালালামপুর এবং সিঙ্গাপুরের সেলেটার এলাকায় এই প্রশিক্ষণের জন্যে ক্যাম্প খোলা হল। সাংঘাই শহরে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্যে প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হল।

এইসব প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর জাপানী দক্ষিণ বাহিনীর কম্যাণ্ডার ইন চীফ ফিল্ড মার্শাল তেরুউচি নেতাজী বোসকে বললেন, যে, জাপানীরা শীগ্‌গিরই ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছেন। তিনি নেতাজীর কাছে সহযোগিতা কামনা করলেন। কিন্তু নেতাজী বোস বুঝতে পারলেন যে, জাপানীরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের প্রচার কাজের জন্যে ব্যবহার করতে চান। নেতাজী বোস তেরাউচির এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি তেরাউচিকে বললেন যে, ভারতের মাটিতে প্রথমেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর রক্ত বইবে, অন্য কারুর নয়। তিনি কোন দ্বিধা না করে তেরাউচিকে সহজ স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ভারত আক্রমণের সময় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থাকবে। এর জবাবে তেরাউচি শুধু বললেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তা করে দেখবেন। তেরাউচির নেতাজীর সঙ্গে মতের পার্থক্য ছিল এবং তিনি নেতাজীর প্রতি টোকিওর নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকার করে নিতে পারলেন না।

সিঙ্গাপুরে আসবার পর নেতাজীকে আর একটি জটিল সমস্যার সমাধান করতে হল। আই-এন-এর প্রতিষ্ঠাতা মোহন সিং জেলখানায় বন্দী ছিলেন। তাকে নিয়ে কী করা হবে? কয়েকজন নেতাজীর কাছে গিয়ে মোহন সিং-এর বিরুদ্ধে অনেক কাহিনী বলেছিলেন এবং নালিশ করেছিলেন। একদিন এক শিখ এসে নেতাজীকে অনুরোধ করলেন, আপনি মোহন সিং-এর মুক্তির আয়োজন করুন। তারপর মোহন সিং-এর পক্ষ হয়ে সুপারিশ করতে এলেন নেতাজী বোসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ রাজু। এর আগে রাজু মোহন সিংকে সাবধান

করে বলেছিলেন যে, অনেকেই তার বিরুদ্ধে নেতাজীর কাছে নালিশ করেছেন। নেতাজী নিজেও ডাঃ রাজুকে বললেন যে, মোহন সিং এর সঙ্গে দেখা করবার আগে তিনি তার কাছ থেকে এগারটি প্রশ্নের জবাব চান। এগারটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, মোহন সিং কি তার (নেতাজীর) নেতৃত্বকে শুধু দেশের বাইরে নয়, অভ্যন্তরেও গ্রহণ করতে রাজি আছেন। মোহন সিং এই প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলেন। পরে নেতাজী বোস মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করলেন।

মোহন সিং নেতাজীকে বললেন, তার রাজনীতির আদর্শ এবং গুরু হলেন নেহরু। তিনি সহজে নেহরুকে অস্বীকার করতে পারবেন না কিংবা ভুলতে পারবেন না।

নেতাজী এবার মোহন সিংকে বললেন জেলখানার বাইরে আপনার বিরোধী শত্রু আছে। আপনি জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলে এরা আপনার ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অতএব আপনার বর্তমানে জেলখানায় থাকা দরকার।

পরে দুজনে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন। মোহন সিং এই জাপানের যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি আরও বললেন, জাপানের আক্রমণ ব্যর্থ হবে। নেতাজী অবশ্যি মোহন সিং-এর এই মতামতকে স্বীকার করে নিলেন না। তার মত ছিল ভিন্ন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: আমার দেশের সর্বত্রই আমি পরিচিত। আমি বাংলায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা বিদ্রোহ করবে। এর পর হয়ত ওয়েভেলের সেনাবাহিনীও আমার সঙ্গে যোগ দেবে। (নেতাজীর বাঙালীদের উপর বিশেষ দুর্বলতা ছিল এবং তিনি প্রতিবারই জাপানী সেনাপতিদের বলেছিলেন, চট্টগ্রাম আক্রমণ করুন এবং ঐ আক্রমণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাংলায় বিদ্রোহ শুরু হবে।) মোহন সিং ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, সিঙ্গাপুরের দশহাজার বন্দী সেনা আই এন এ যোগ দেয়নি, যদিও আমরা তাদের খাবার এবং অন্যান্য দৈনিক জীবনযাত্রার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করেছি এবং ওরা সবাই আমার উপর সাহায্যর জন্যে নির্ভর করত। মোহন সিং আরও বললেন, ওয়েভেলের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সেনা হল ইংরেজ। কোন কারণেই তারা বৃটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করে আই এন এ-তে যোগ দেবে না।

নেতাজী এর কোন সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। তিনি হয়ত মোহন সিং-এর এই জবাবে যুক্তি খুঁজে পেলেন।

মোহন সিংকে মুক্তি দেওয়া হল না। তাকে অন্য একটি ভাল বাংলোতে সরান হল এবং থাকবার জন্যে অনেক সুখ-সুবিধা দেওয়া হল। যুদ্ধের শেষ অবধি মোহন সিং কারাগারে বন্দী ছিলেন। নেতাজী পরে শাহ্‌নওয়াজকে

বলেছিলেন যে, মোহন সিং কারুর অধীনে কাজ করতে চান না ['জাঙ্গল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা—১২৪-১২৫]।

নেতাজীর দ্বিতীয় কাজ হল, এন রাঘবনকে আবার ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্ট লীগের ভেতরে নিয়ে আসা। নেতাজী বোস যখন সিঙ্গাপুরে এসে পৌছুলেন তখন রাঘবন পেনাঙ্গ শহরে ছিলেন এবং তিনি নেতাজীর সঙ্গে দেখা করবার কোন চেষ্টাই করেননি। পরে নেতাজীর অনুরোধে রাঘবন সিঙ্গাপুরে এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হল। রাঘবন বললেন, তিনি এই আন্দোলনের বাইরে থেকে দেশের সেবা করবেন। এই বলে রাঘবন পেনাঙ্গ শহরে ফিরে গেলেন। দুমাস পরে নেতাজী আবার রাঘবনকে তাঁর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। রাঘবন পরে বলেছিলেন, 'নেতাজী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, রাঘবন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।' আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, রাঘবন বিস্মিত ও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নেতাজী এর জবাবে বললেন, 'আজ আপনার এবং জাপানীদের মধ্যে যদি কাউকে আমার বেছে নিতে হয় তাহলে আমি কাকে বেছে নেব জানেন? আপনাকে ' নেতাজীর এই কথা শুনবার পর আমি ভেঙে পড়লাম।

আমি আবার আই. এন. এ-তে যোগ দিলাম এবং আজাদ হিন্দ সরকারের একজন মন্ত্রী হলাম ['জাঙ্গাল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১২৪]।

নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আসবার পর এই অঞ্চলের ভারতীয়দের মধ্যে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হল। এতদিন এই এলাকার ভারতীয়রা নির্জীব হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু নেতাজী আসবার পর তারা নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে শুরু করল।

* * *

ইয়াকরো 'কিকানের' (এজেন্সী) প্রধান হবার পর ফুজিয়ারা তার ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার কোন অবকাশ পেতেন না। কিন্তু একদিন ঘটনাচক্রে ফুজিয়ারার নেতাজীর সঙ্গে দেখা হল। জেনারেল কুনমবো ভারত আক্রমণের প্ল্যান নিয়ে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

ঐদিন ফুজিয়ারা ছিলেন কুনমবোর দোভাষী। নেতাজী ফুজিয়ারার পরিচয় পেয়ে তার প্রশংসা করে বললেন : আপনার কথা অনেক শুনেছি এবং আপনি আই. এন. এ. গঠনে অনেক সাহায্য করেছেন। আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

কিছুদিন পরে নেতাজী এক সাময়িককালের আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন। এই 'সাময়িককালের সরকার' গঠন করবার প্রয়োজন ছিল। জাপান সরকার ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই এন. একে সরকারের পদমর্যাদা ও স্বীকৃতি দেননি। জাপান সরকারের বক্তব্য ছিল এই দুইটি—রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিষ্ঠান। এদের সরকার বলা ঠিক হবে না। তাই এই সাময়িককালের সরকার গঠন করবার পর এই অভাব পূরণ করা হল। নেতাজী বললেন : ভবিষ্যতে এই সরকার ব্রিটিশ-ভারত সরকারের স্থান নেবে। এ-ছাড়া সাময়িককালের সরকার অন্য সবার কাছ থেকে স্বীকৃতি পেলে এর সম্মান বাড়বে।

২১শে অক্টোবর ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে এই সাময়িককালের সরকার গঠন করা হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে অনেক ভারতীয়রা এই সরকার গঠনের উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। নেতাজী এক বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের বিবরণী দিলেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে 'মুক্তি যোদ্ধা' বলে বর্ণনা করলেন। পরে নেতাজী নিজে শপথ গ্রহণ করলেন এবং 'হিন্দ সরকারের' প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হলেন। এ ছাড়া তিনি হলেন যুদ্ধমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং আই. এন এ'র সুপ্রীম কম্যাণ্ডার। পরে নতুন সরকারের বাকী মন্ত্রীরাও শপথ গ্রহণ করলেন।

নতুন সাময়িককালের সরকার গঠনের খবর নেতাজী জাপান সরকারকে দিয়েছিলেন। ২৩শে অক্টোবর ১৯৪৩ সালে জাপান সরকার এই সরকারকে স্বীকৃতি দিল। কিছুদিন পরে জর্মানী, ইতালি, নানকিং, ফিলিপিন, থাইল্যাণ্ড এবং বর্মা থেকে স্বীকৃতি পাওয়া গেল। ২৫শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ঐ যুদ্ধ ঘোষণাকালীন দিবসে নেতাজী প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি এক ভারতীয়দের জনসভায় বললেন : আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা শপথ গ্রহণ করুন যে, এই যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিটি অক্ষর আপনারা অনুসরণ করবেন। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য হল, দেশ স্বাধীন না হওয়া অবধি আমরা আমরণ সংগ্রাম করে যাব। এই যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে সাহায্য করবে।—নেতাজীর এই বক্তৃতা জনতাকে উত্তেজিত করল এবং সবাই আনন্দে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। নেতাজী আবার বলতে শুরু করলেন : যদি আপনারা আপনাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজি থাকেন এবং মৃত্যু-ভয়কে তুচ্ছ করতে প্রস্তুত থাকেন, এবং আপনাদের ভয় কিংবা সংকোচ না থাকে তাহলে আপনারা বীর সৈনিকের মত উঠে দাঁড়ান এবং হাত তুলে আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করুন।—নেতাজীর বক্তৃতা শেষ হবার পর

উপস্থিত ভারতীয়রা হাত তুলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করল। এই সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত জনতা উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করতে শুরু করল : নেতাজী কি জয়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, দিল্লী চলো…['দি রোড টু দিল্লী', এম শিবরাম, পৃষ্ঠা-১১৭]।

* * *

নভেম্বর মাস……

টোকিওতে জাপান সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সরকারদের নিয়ে এক সম্মেলন করলেন। নেতাজী এই সম্মেলনে শুধু পর্যবেক্ষকের অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কিছুদিন পরে নেতাজী জাপান সরকারের কাছে দাবী জানালেন যে, আন্দামান ও নিকোবর, এই দুইটি দ্বীপকে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হোক। জাপান সরকার এই দুইটি দ্বীপের পুরো কর্তৃত্ব অর্থাৎ বাস্তবরূপে হস্তান্তরিত করতে গড়িমসী করতে লাগল। দখল করবার পর এই দুইটি দ্বীপ জাপানীদের অধীনে ছিল।

১০ই নভেম্বর ১৯৪৩ সালে জাপানী যোগাযোগ অফিস এক বৈঠকে ঠিক করল যে, এই দুইটি দ্বীপের শাসন হস্তান্তরিত করবার ব্যাপার নিয়ে আরও চিন্তা এবং আলোচনা করা দরকার।

প্রথমে দ্বীপের কয়েকটি জায়গায় আজাদ হিন্দ সরকারকে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া হল। বলা হল, ক্রমে ক্রমে এই সুযোগ-সুবিধা বাড়ান হবে। এ ছাড়া আরও বলা হল, দ্বীপগুলি এই আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেবার পরও দ্বীপের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব জাপানীদের হাতেই থাকবে। প্রশাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল না ['ফেমাস হিস্টোরিক ট্রায়ালস্', গোবা, পৃষ্ঠা—৩১৫-৩১৬]।

ডিসেম্বর মাসে নেতাজীর ইচ্ছানুযায়ী জাপান সরকার তাকে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপে নিয়ে গেল। কিন্তু ঐ দ্বীপে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীকে পাঠাবার কোন বন্দোবস্ত করা হল না।

নেতাজী এই দুইটি দ্বীপে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। একটি দ্বীপের নাম দেওয়া হল, 'শহীদ' এবং অপরটির নাম হল 'স্বরাজ'। পরে তিনি লে: কর্নেল লোকনাথনকে এই দুইটি দ্বীপের চীফ কমিশনারের পদে নিয়োগ করলেন। নেতাজী আবার জাপান সরকারের কাছে দ্বীপের হাত বদল করবার দাবী করলেন। এ ছাড়া আরও কিছু দাবী তিনি জাপান সরকারের কাছে করেছিলেন। তার একটি বড় দাবী ছিল, ভারত আক্রমণের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি বড় অংশ গ্রহণ করবে এবং আক্রমণের প্রথম সারিতে থাকবে।

তিনি এই ব্যাপারটি নিয়ে টোকিও'র সঙ্গে কথা বলবার জন্যে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে চেয়েছিলেন।

কোন 'কিকান' কিংবা এজেন্সীর মাধ্যমে তার আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল না। কারণ কিকানের বড়কর্তা ইয়ামমাটোর সঙ্গে তার মনোমালিন্য বাড়ছিল। নেতাজী সন্দেহ করছিলেন, ইয়ামমাটো টোকিওর কাছে পুরো সঠিক খবর পাঠাচ্ছেন না অর্থাৎ খবর বিকৃতি করে পাঠাচ্ছেন কিংবা খবর গোপন করছেন। নেতাজীর কাছ থেকে নালিশ পাবার পর জাপান সরকার ইয়ামমাটোকে বদাল করল এবং তার পরিবর্তে ইসাডো সবুরোকে এই এলাকায় পাঠান হল। এ ছাডা ঠিক হল, লেঃ জেনারেল সবুরো বর্মা এরিয়া আর্মি এবং আই. এন. এ'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। নেতাজীর জাপানী সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রা সটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় সবুরো উপস্থিত থাকতেন।

দুইটি বিষয় নিয়ে নেতাজীর 'কিকানের' সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল। 'আজাদ হিন্দ ন্যাশনাল' ব্যাঙ্ক গঠন করা নিয়ে নেতাজীকে বলা হয়েছিল যে, এই ব্যাঙ্ক গঠন করবার ব্যাপারে কোন অসুবিধে হবে না। কারণ ব্যাঙ্কের কাজ চালু করবার জন্যে মূলধন আছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক গঠন করা নিয়ে নানান অসুবিধা দেখা দিল। আর একটি গোলমালের কারণ হল যে, কিকান কর্তা ইন্দোওয়ার কাউন্সিলে একজন জাপানী কর্মচারীকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন; নেতাজী এই নিয়োগ নিয়ে আপত্তি করলেন। তিনি কিকানের প্রস্তাবটি জেনারেল টজো কিংবা সুজিয়ামার কাছে পেশ করবার প্রস্তাব করলেন। টজোর নাম শুনবার পর কিকান কর্মচারীরা ভয় পেল এবং সাময়িকভাবে ব্যাপারটি নিয়ে তারা কোন গোলমাল করল না। কিকান নেতাজীর নির্দেশানুযায়ী কাজ করে দিল।

১৯৪৪ সালে ইম্ফল আক্রমণ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আবার গোলমাল শুরু হল। কারণ, ইম্ফল আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর বেশ কিছু বড় বড় জেনারেলদের চাকুরী গেল এবং প্রচুর স্টাফ অফিসারদের সরান হল। টোকিও থেকে এক বড় জেনারেল আক্রমণের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে এলেন। মে মাসে নেতাজী ব্যাংককে এবং রেঙ্গুনে এলেন। ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে তাদের আক্রমণ আরও তীব্র হল। এই লড়াইতে যুদ্ধ করবার জন্যে তিনি জাপানী সামরিক বাহিনীর কাছে আরও অস্ত্র চাইলেন। কিন্তু রেঙ্গুনের উপর মিত্রশক্তির প্রবল বোমা বর্ষণের কারণ-বশত ইসাডো বিপদের আশঙ্কা করে নেতাজীকে অনুরোধ করলেন, আপনি রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যান; নইলে আপনার বিপদ হতে পারে। ইসাডো বুঝেছিলেন যে, ইম্ফলের আক্রমণ ব্যর্থ হবে। নেতাজী রেঙ্গুন থেকে চলে যাবার আগে আই-

এন-এর কয়েকটি বাহিনী বিশেষ করে ঝাঁসীর রানী বাহিনীকে রেঙ্গুন থেকে সরিয়ে নেবার দাবী করলেন। নেতাজীর শর্তগুলি জাপানীরা স্বীকার করে নেবার পর তিনি রেঙ্গুন থেকে চলে গেলেন। তবে জাপান এবং আই-এন-এর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আরও একটি কারণ ছিল। আজাদ হিন্দ সরকার গঠন হবার পরই জাপান এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু আই-এন-এ ছিল 'আজাদ হিন্দ সরকারের' সৈন্যবাহিনী। জাপান আই-এন-একে 'মিত্রশক্তি' সেনা হিসাবে স্বীকার করে নিতে রাজি হল না। কারণ হল, জাপানী সেনাবাহিনীর অনেকেই পরাজিত বন্দী সেনাদের সুনজরে দেখতে পারতেন না। কারণ, জাপানীরা আত্মসমর্পণে বিশ্বাস করত না। আই-এন-এর সৈন্যরা ছিল বন্দী সেনাদের নিয়ে গঠিত এক বাহিনী এবং তারা জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই জাপানী সামরিক বাহিনী আই-এন-এ'কে যোগ্যমর্যাদা দিতে অস্বীকার করল। পরে এস. এ. আয়ার তাঁর বইতে [Unto Him a Witness ; পৃষ্ঠা-১৮৬] এই ধরনের জাপানী সেনাদের তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এক দলের নাম দেওয়া হয়েছিল : মানচুরিয়ান। এরা মানচুরিয়ান অধিবাসীদের ক্রীতদাস হিসাবে গণ্য করত। এরা নেতাজীর "আজাদ হিন্দ ফৌজকে" কোন কিছুর বিনিময়ে সাহায্য করবার বিরোধী ছিলেন। এরা নিজেদের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতেন। আর একদল ছিলেন যাদের মনে-প্রাণে আজাদ হিন্দের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব ছিল ; তবে এরা ছিল দুর্বল প্রকৃতির লোক। আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্যে ইচ্ছে তাদের ছিল এবং কাজকর্মে সাহায্যও করতেন, কিন্তু এদের মনের কোন জোর ছিল না। আর একদলের নিজস্ব কোন 'মেরুদণ্ড' বলে কিছু ছিল না। এরা টোকিও'র নীতি এবং আদেশকে অন্ধের মত অনুসরণ করতেন। মানচুরিয়ান দল আই-এন-এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্যে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত লোকদের উৎসাহ দিত।

নেতাজী জাপানীদের ইম্ফল আক্রমণের পরিষ্কার সমালোচক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জাপানীরা যদি ইম্ফল আক্রমণের পরিবর্তে চট্টগ্রাম আক্রমণ করত তাহলে সারা বাংলায় বিপ্লব হবার সম্ভাবনা ছিল এবং সেই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

৩১শে মে নেতাজী, কর্নেল চ্যাটার্জি (যিনি পরে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন), লেঃ কর্নেল কিয়ানী এবং মেজর হবিবুর রহমান সদলবলে টোকিওতে গিয়ে জাপানী কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। এই সময়ে জাপানের চারদিকে সামরিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল। টজোর ক্যাবিনেটের পতন হয়েছিল

এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন জেনারেল কয়সো। বাজারে একটা গুজব রটেছিল যে, কয়সো আই-এন-এর প্রতি ভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারেন। নেতাজী জাপানের কর্তাদের সঙ্গে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবার বিরোধী ছিলেন। নেতাজী যখন বর্মায় ছিলেন তখন বর্মায় জাপানী নৌবাহিনীর এটাচী রিয়াল এডমিরাল নাকাডো নেতাজীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারত আক্রমণের জন্যে আপনাকে নতুন কোন প্ল্যান বা নীতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ, বর্তমানে সামরিক পরিস্থিতি জাপানের অনুকূলে নয়। আপনি সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে সেন্ট্রাল এশিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতকে আক্রমণ করুন। নেতাজী ঠিক করলেন, সোভিয়েত এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করবেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। সব কারণ মিলিয়ে নেতাজী শেষবারের মত অর্থাৎ তৃতীয়বার টোকিওতে গেলেন। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই ভাবলেন, নেতাজী হয়ত ভারত আক্রমণ করবার জন্যে নতুন কোন প্ল্যান করছেন। নেতাজী এই গুজব বন্ধ করবার কোন চেষ্টা করলেন না। বরং তিনি টোকিওর রেডিও থেকে এক বক্তৃতায় সবাইকে বললেন: জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যেই আমি টোকিওতে এসেছি।

প্রধানমন্ত্রী কয়সো নেতাজীর সম্মানে এক ডিনার-পার্টি দিলেন। তিনিও জোর আশ্বাসবাণীর পুনরাবৃত্তি করলেন।

হিবিয়া হলে ভারত-জাপানীদের এক সম্মিলিত জনসভা হল। নেতাজী দু'ঘন্টা ধরে একটানা বক্তৃতা দিলেন। ঐদিন সভায় এত লোক হয়েছিল যে হলঘরে দাঁড়াবার কোন জায়গা ছিল না।

বিদেশমন্ত্রী সিগেমিৎসুর নেতাজীর উপলক্ষে এক ডিনার-পার্টি দিয়েছিলেন। পরে নেতাজী জাপানী সামরিক বাহিনীর কর্তা এবং বিদেশমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। এদের কাছে তাঁর অনেক দাবী ছিল। তার প্রথম দাবী হল, আই-এন-এর সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। তিনি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনী গঠন করবার প্রস্তাব করলেন। কারণ ইম্ফলে যুদ্ধ করবার সময় সেনাবাহিনীর কিছু কিছু দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল। বোঝা গিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কম। জাপানীরা চল্লিশ হাজার নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করতে রাজি হল। এবার তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের একজন জাপানী রাষ্ট্রদূত পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। জাপান সরকার হাচিয়া তেরু নামে এক ডিপ্লোম্যাটকে ব্যাংককে আজাদ হিন্দ সরকারের কাছে পাঠাতে রাজি হল। কিন্তু পরে দেখা গেল জাপানী সরকারের এই রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ব্যাপার নিয়ে,

বেশ কিছু কারচুপি করেছিল। হাচিয়া তেককে পুরোপুরি রাষ্ট্রদূত করে পাঠান হল না। তাকে জাপানী সৈন্যবাহিনী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার কাজ দেওয়া হল। এ ছাড়া তিনি যখন ব্যাংককে পৌঁছুলেন তখন তাঁর কাছে ডিপ্লোম্যাটিক পরিচয়পত্র চাওয়া হল। দেখা গেল তাঁর কাছে কোন পরিচয়পত্র নেই। নেতাজী প্রতিবাদ করলেন। জাপান সরকার নেতাজীর প্রতিবাদের জবাবে বলল যে, সামরিক ডিপ্লোম্যাটিক শাস্ত্রে সরকারের কাছে পরিচয়পত্র দিয়ে কোন রাষ্ট্রদূত পাঠাবার রেওয়াজ নেই।

নেতাজী জাপান সরকারের কাছে আরও অস্ত্র এবং বিমান চাইলেন। ঐ সময়ে জাপানের কাছে দেবার মত অতিরিক্ত বোমারু বিমান কিংবা অস্ত্র ছিল না। কিন্তু নেতাজী বিশেষ দাবী করবার পর সুজিয়ামা একটি বিমান পাঠাতে রাজি হলেন। পরে নেতাজী আন্দামান দ্বীপ হস্তান্তরের দাবী করলেন। জাপান সরকার দ্বীপ হস্তান্তরিত করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন বটে, কিন্তু দ্বীপের শাসনভার হস্তান্তরিত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না ['জাঙ্গল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১৪৫]।

টোকিওতে থাকাকালীন নেতাজী বোস সোভিয়েত এম্বাসডার মালিকের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার সেই চেষ্টা সফল হল না। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মালিক নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন ['জাঙ্গল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১৪৪]। এই সময়ে জাপান সরকার নেতাজীকে 'অর্ডার অব দি ফার্স্ট মেরিট অব রাইজিং সান' দিতে চেয়েছিল। নেতাজী এই উপাধি গ্রহণ করেননি। নেতাজী টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন। এখানে ইণ্ডিয়া ইনডিপেনডেন্ট লীগ এবং আই-এন-এর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করবার পর তিনি বছরের শেষে (১৯৪৪) রেঙ্গুনে ফিরে এলেন।

২৩শে জানুয়ারী ১৯৪৫ সালে রেঙ্গুনে খুব ধুমধাম করে নেতাজীর জন্মদিবস পালন করা হল। এই উপলক্ষে নেতাজীকে ওজন করে তাঁর সমান সোনা সংগ্রহ করা হল। প্রচুর হীরে, মণি-মুক্তাও জড়ো করা হল। সেই সোনা এবং জহরৎ আজাদ-হিন্দ-সরকারের ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হল। (এ ছিল যুদ্ধের শেষ সময়। রেঙ্গুনের কোন ভারতীয়ের কাছে এই সোনা এবং জহরৎ জমা ছিল কিনা সঠিক খবর জানা যায়নি।) যদিও নেতাজী যুদ্ধের খারাপ সংবাদ পেয়ে কিছুটা দুঃখিত হয়েছিলেন তবু তার মনের জোর কিংবা বিশ্বাস শিথিল হয়নি। তিনি শেষদিন পর্যন্ত আই-এন-এ'র উপর পুরো বিশ্বাস রেখেছিলেন। রেঙ্গুনে আসবার পর তিনি খবর পেলেন যে, চারজন আই-এন-এ'র সৈন্য পালিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই সংবাদে তিনি দুঃখিত হলেন এবং

শাহ নওয়াজ খানকে নির্দেশ দিলেন, কেউ যদি পালাবার চেষ্টা করে তাহলে তাকে গুলি করে মারা হবে।

*　　　*　　　*

এবার ইম্ফলের আক্রমণের পরাজয়ের কাহিনী বলা যাক। ১৯৪২ সালে ইংরেজ সেনাবাহিনী আশা করেছিল যে, জাপানী সেনাবাহিনী চিন্দুইন নদী অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করবে। জাপানীরা চিন্দুইন নদীর এপারে বসেছিল, ইম্ফল আক্রমণের ব্যর্থতার পর চিন্দুইন নদী অতিক্রম করবার কোন চেষ্টা করেনি।

১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স সার্ভিস খবর দিল যে, হয়ত জাপানী সৈন্যবাহিনী ইম্ফল আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এই খবরের কোন ভিত্তি ছিল না। এর মধ্যে মিত্রশক্তি তার বাহিনীকে নতুন করে তৈরি করেছিল। ১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে 'সুপ্রীম এলায়েড কম্যাণ্ডার' হিসাবে নিয়োগ করে 'মিত্রশক্তি সাউথ ইষ্ট এশিয়া কম্যাণ্ড যার সংক্ষেপে নাম হল SEAC গঠন করল। মিত্রশক্তি প্রথমে বর্মা এবং পরে অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানের অধিকৃত দেশগুলিকে পূর্ণ দখল করবার জন্যে প্ল্যান তৈরি করতে আরম্ভ করল।

জাপানী সামরিক বাহিনীর কাছে ভারতবর্ষ ছিল তাদের বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধির পরিকল্পনার একটি অংশ। ১৯৪১ সাল থেকে জাপানী সামরিক বাহিনী কী করে ভারত আক্রমণ করা যায় এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কিছু কারণবশত তারা এই আক্রমণ আরম্ভ করেনি। প্রথম একটি কারণ ছিল যে, ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে হলে শুধু যুদ্ধ করেই তাদের হটান যাবে না, রাজনৈতিক আলোড়ন ও আন্দোলন শুরু করে ইংরেজ সরকারকে দুর্বল করা দরকার। এই কারণে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান ফুজিয়ারার সাহায্য নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি দল গঠন করতে চেয়েছিল। পরে তারা জার্মানী থেকে নেতাজী বোসকে আমন্ত্রণ করে আনল। জাপানের আর একটি সমস্যা ছিল ভারত আক্রমণের এবং বিজয়ের পর সাপ্লাই লাইন বড় হবে এবং এই সময়ে স্থানীয় ভারতীয়দের সাহায্যের দরকার হবে। এইসব কারণে তারা আই-এন-এ গঠনে বিশেষ উৎসাহী ছিল।

জাপানীরা আশা করেছিল যে, মিত্রশক্তি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে বর্ষার ঠিক পরেই বর্মা আক্রমণ করবে। অতএব তাদের প্ল্যান ছিল প্রথমে ইংরেজদের বিমান যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে। ১৯৪২ সালে জাপানী দক্ষিণ

সৈন্যবাহিনীর 'চীফ অব দি ষ্টাফ' জেনারেল টানাবে টোকিওর কর্তাদের বিমান যুদ্ধ করে শক্তি অপচয় করবার বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ, জাপানীরা ঠিক করেছিল বিমানবাহিনী ব্যবহার করে কলকাতার এবং তার নিকটবর্তী বিমান ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করবে। এ-ছাড়া শত্রুর হাত থেকে বর্মা রক্ষা করবার প্রয়োজন ছিল। অতএব দক্ষিণ আর্মি ঠিক করেছিল ইম্ফল এবং চট্টগ্রাম দখল করতে হবে। তাদের আক্রমণের প্ল্যানে ঠিক করা হয়েছিল যে, এই আক্রমণ অক্টোবর মাসে শুরু করতে হবে এবং এক মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। দক্ষিণ আর্মির ইনটেলিজেন্সের এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, ব্রিটিশদের অধীনে যে-সব ভারতীয় সেনারা আছে তাদের যুদ্ধ করবার মনোবল কিংবা ইচ্ছা নেই। তবে তাদের মনে প্রশ্ন ছিল যে, দেশের অভ্যন্তরে ভারতীয়রা জাপানী সেনাদের কোনপ্রকার সাহায্য করবে কিনা এবং এ-ছাড়া ভারতে সেনাবাহিনীর জন্যে উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাবে কিনা?

১৫ আর্মি কম্যাণ্ডার লেঃ জেনারেল আইডা সজিরোর এই প্ল্যানের বিরোধী ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে, এই প্ল্যান অনুযায়ী ভারত আক্রমণ করা অসম্ভব। দক্ষিণ আর্মির চীফ অব দি ষ্টাফ লেঃ জেনারেল কুরাডো সিগেতকু আইডা সজিরোর মত পরিবর্তন করবার চেষ্টা করলেন। পরে কুরাডো বলেছিলেন যে, ১৯৪২ সালে জাপান যদি ভারত আক্রমণ করত তাহলে ঐ যুদ্ধে জয় করা অতি সহজ হত। ১৯৬৫ সালে জেনারেল টজোও স্বীকার করেছিলেন, জাপানের ভারত জয়ের সবচাইতে ভাল সময় ছিল ১৯৪২ সাল। আক্রমণের এটাই ছিল সোনার যুগ এবং তারা সেই সুযোগ হারিয়েছে ['জাঙ্গল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১৫৮]।

এ ছাড়া ভারতীয় জনগণের মতামত যাচাই করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। কারণ জাপানীরা খবর পেয়েছিল যদি কোন প্রকারে দিল্লীর ইংরেজ সরকার এবং ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মীমাংসা হয়; তাহলে এই যুদ্ধের ফলাফল জাপানীদের বিরুদ্ধে যাবে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে জার্মানীর পরাজয়ের পর মিত্র-শক্তি সেনাবাহিনীর কিছু অংশ ভারতে এসেছিল। টোকিওর আর্মি হেড কোয়ার্টার এই যুদ্ধে আই-এন-এর কাছ থেকে সাহায্য নেবার সপক্ষে ছিল।

টোকিও'র আর্মি হেড-কোয়ার্টারের বক্তব্য ছিল, যদি ভারতের ভেতরে গিয়ে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আকাশ যুদ্ধে কিছু প্লেন হারাবার সম্ভাবনা আছে। প্রথমত উত্তর-পূর্ব আসাম অঞ্চলের বিমানবন্দর ঘাঁটিগুলি দখল করতে হবে; কিন্তু ভারতের খুব বেশি অভ্যন্তরে যাওয়া ঠিক হবে না। জাপানীরা আরও ঠিক করেছিল যে, বৃহত্তর যুদ্ধে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির গেরিলা বাহিনীকে বাংলা,

আসাম, নেপাল অঞ্চলে ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের স্পাই ইনটেলিজেন্স' এজেন্সী কিকানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

জাপানীরা এই নতুন আক্রমণের নামকরণ করল: অপারেশন একুশ (Operation 21)।

টোকিও'র আর্মি হেড-কোয়ার্টার তাদের সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আর্মির মাধ্যমে ১৫ আর্মির কম্যাণ্ডার লেঃ জেনারেল আইডাকে জানাল। আইডা প্রথমে এই আদেশকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু যখন তাকে বলা হল টোকিওর এই আদেশ তাকে পালন করতেই হবে তখন তিনি একটু চিন্তা-ভাবনায় পড়লেন। কী করবেন তিনি? তার চিন্তার কারণ ছিল, বর্মায় প্রবল বর্ষা হয় এবং গভীর বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাপ্লাই লাইন বজায় রাখবার অসুবিধে হয়।

এরপর কর্নেল কাটাকুব' টাডাসু ১৫ আর্মির অফিসার হিসাবে যোগ দিলেন। বিচক্ষণতা ও ধীরস্থির প্রকৃতির জন্যে তার সুনাম ছিল। এই কারণে তার নাম হয়েছিল 'টাইগার অব বর্মা'। আইডার মত কাটাকুরাও এই প্ল্যান অনুযায়ী আক্রমণ করবার কিছু অসুবিধার কথা উল্লেখ করলেন। প্রথমত সেনাবাহিনীর যাতায়াতের জন্যে কোন ভাল রাস্তা ছিল না এবং এই এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। ম্যালেরিয়া জাপানী সৈন্যবাহিনীকে বিশেষ কাবু করে তুলেছিল। ১৮ ডিভিশনের লেঃ জেনারেল মুতাগুচি রেনিয়া এই আক্রমণের বিরোধিতা করলেন। তিনি বিরোধিতার যুক্তি দিয়ে বললেন, সৈন্য-বাহিনীকে এগোতে হলে ভাল রাস্তার দরকার হবে। রাস্তাঘাট বানাতে হবে। অতএব অবিলম্বে আক্রমণ শুরু করা সম্ভব নয়। সমস্ত সমস্যাটি ভাল করে বুঝে নেবার জন্যে কাটাকুরা দক্ষিণ আর্মির কম্যাণ্ডার তেরাউচিকে বর্মার লড়াইক্ষেত্র পরিদর্শন করবার জন্যে অনুরোধ করলেন তেরাউচি বর্মা যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে দেখবার পর কাটাকুরা ও অন্যান্য জেনারেলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার পর ঠিক করলেন যে, বর্তমান সময়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

১৫ আর্মি এবার জাপান আর্মি হেড-কোয়ার্টার্সের কাছে তাদের প্রস্তাবে অপারেশন একুশের বিরোধিতা করে বললেন যে, বর্ষার পর হয়ত লড়াই শুরু করা সম্ভব হতে পারে যদি—(১) ভারতে জাপানীদের অনুকূলে এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায়, (২) নিয়মিত সাপ্লাই'র বন্দোবস্ত করতে হবে, (৩) জাপানী সৈন্য-বাহিনী ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে, (৪) ভারতের ভেতরে ইংরেজ-বিদ্বেষী মনোভাবকে আরও বাড়াতে হবে এবং দৃঢ় করতে হবে।

কাটাকুরা আর্মি হেড কোয়ার্টারের কাছে বললেন যে, বর্মার প্রতিরক্ষার জন্যে ঐ দেশে নিদেনপক্ষে দশ ডিভিশন সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করতে

হবে। উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী তার চাই।

আর্মি হেড-কোয়ার্টার আক্রমণ স্থগিত রাখলেন এবং লে: জেনারেল আইডাকে তার কম্যাণ্ড থেকে সরান হল। ঠিক হল, ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ আক্রমণ শুরু করা হবে।

পরে শোনা গেল, অপারেশন একুশ অনির্দিষ্টকালের জন্যে মুলতুবি রাখা হয়েছে। তবে বোঝা গেল যে, ভারত আক্রমণের প্ল্যান জাপানী আর্মি হেড-কোয়ার্টার একেবারে বাতিল করে দেয়নি। তবে কবে নাগাদ এই আক্রমণ শুরু করা হবে সেই দিন বা মাস ঠিক করা হল না।

কিন্তু ১৯৪৩ সালে আরও কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাপানী আর্মি হেড-কোয়ার্টারকে বিশেষ বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ তারা খবর পেয়েছিল যে, প্লেনে করে প্রচুর রসদ অস্ত্র ইত্যাদি ভারত থেকে চীনে পাঠানো হচ্ছে। এই মাল পাঠানো বন্ধ করতে হবে নইলে জাপানের বিপদ হবে। জাপানী সৈন্যবাহিনী আবার আই-এন-এ'র সাহায্য নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। তাই আই-এন-এ'কে এই আক্রমণে একটি বিশেষ অংশ দেওয়া হল। এই সময়ে জাপানের অভ্যন্তরের রাজনীতিতে টজোর মানের হ্রাস পেয়েছিল। টজো নতুন একটা কিছু করতে চাইলেন। অতএব তিনি আই এন-এ'কে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন।

জাপানের চারদিকে ছিল শত্রুবাহিনী এবং জাপানের বড় কর্তারা ভাবলেন, এই বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করলে জাপানী সেনাবাহিনীর সম্মান বাড়বে।

কী করা যায়? জেনারেল মুতাগুচি এবং বর্মা এরিয়া আর্মির কম্যাণ্ডার লে: জেনারেল কোযাবে তাদের মত পরিবর্তন করলেন। মত পরিবর্তন করবার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। কিছুদিন আগে চিন্দুইন নদী অতিক্রম করে মিত্রশক্তিবাহিনী জাপানীদের আক্রমণ করেছিল। মুতাগুচি বুঝতে পারলেন যে, মিত্রশক্তি এই ধরনের গেরিলা আক্রমণ করে জাপানীদের কাবু করবে। মুতাগুচি এবং কোয়াবে আক্রমণ নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনার পর আর একটি নতুন প্ল্যান করলেন, যার নাম দেওয়া হল 'অপারেশন ইউ'. অপারেশন ইউ এবং অপারেশন ২১র মধ্যে খুব কম পার্থক্য ছিল। নতুন প্ল্যানে বলা হল যে, সিতুংগ এবং প্যালেল রাস্তা অতিক্রম করে ইম্ফল শহরকে আক্রমণ করতে হবে। এই প্ল্যান টোকিও'র কর্তাদের কাছে অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হল।

জাপানের কাছে ইম্ফল আক্রমণের একটি বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। তারা এই আক্রমণের সঙ্গে আই-এন-এ'কে জড়িত করতে চাইল। কিন্তু দক্ষিণ

আর্মি, ১৫ আর্মি এবং বর্মা এরিয়া আই-এন-এ'কে তাঁদের সেনাবাহিনীর প্রথম সারিতে ব্যবহার করবার বিরোধিতা করল। তাদের বক্তব্য ছিল যে, আই-এন-এ এই যুদ্ধ করবার জন্যে আদৌ তৈরি কিনা প্রথমে সেইটে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই পরীক্ষা করবার জন্যে আই-এন-এর এই লড়াইতে যোগ দেওয়া দরকার তবে তারা আক্রমণের প্রথম লাইনে থাকবে না।

এই যুদ্ধে আই-এন-এ'কে কী ভূমিকা পালন করতে হবে সেইটে নিয়ে জাপানী কম্যাণ্ডারদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। জেনারেল আইডা আই-এন-এ'কে সৈন্যবাহিনী হিসাবে ব্যবহার করতে চান নি।

জেনারেল কাটাকুরা ও আরও কিছু জাপানী জেনারেলরা বললেন, যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে ভারতবাসীদের সদিচ্ছা থাকা দরকার। কারণ জাপানী সৈন্যবাহিনীকে ভারতীয় জনগণের কাছে প্রমাণ করতে হবে এই আক্রমণ কোন বিদেশীর সেনাবাহিনীর অভিযান কিংবা হানা নয়, এ হল ভারতীয় আই-এন-এর সৈন্যবাহিনীর বিদেশী শাসকের হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টা।

নেতাজী ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে রেঙ্গুনে এসে বর্মা এরিয়া আর্মির জেনারেলের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তিনি জেনারেল কোয়াবেকে বেশ স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, একমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীই প্রথমে ভারতে পা দিয়ে লড়াই শুরু করবে

জুলাই মাসের শেষ নাগাদ ১৫ আর্মিকে অপারেশন ইউ শুরু করবার অনুমতি দেওয়া হল। ঠিক হল, একদল জাপানী সেনাবাহিনী (১৮ ডিভিশন) সালুইন নদী অতিক্রম করে শত্রুকে আক্রমণ করবে এবং ঐ বাহিনীর আর একটি অংশ চীন আমেরিকান সেনাবাহিনীর উপর হামলা করবে। জাপানী ৩১ ডিভিশন কোহিমা দখল করবার এবং আসাম থেকে শত্রু আক্রমণকে রুখবার চেষ্টা করবে।

১৫ আর্মি এবং ১১ ডিভিশন চিন্দুইন নদী অতিক্রম করে ইম্ফলের দিকে এগিয়ে যাবে। এই তিনটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে আই-এন-এ থাকবে।

মিত্রবাহিনীর আকাশে যুদ্ধ করবার শক্তি ক্রমেই বাড়ছিল। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানী বিমান বাহিনী কলকাতা এবং চট্টগ্রামকে আক্রমণ করল এবং বোমা বর্ষণ করল। প্রায় ১৫০ জাপানী প্লেন এই হানায় অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও কলকাতায় ক্ষতির পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণে বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল।

ডিসেম্বরের শেষভাগে জেনারেল তেরুউচি তাঁর চীফ অব ষ্টাফ আয়াবের

মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী টজোর কাছে আক্রমণ করবার প্ল্যান পাঠালেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী টজোর বিনানুমতিতে এই আক্রমণ শুরু করা সম্ভব ছিল না।

আম্নাবে সন্ধ্যার পর টোকিওতে পৌছুলেন এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে সোজা প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেলেন। টজোর মিলিটারী সেক্রেটারী নিসুরা সুসুমু আম্নাবেকে বললেন যে, প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত আছেন এবং বাথরুমে গিয়েছেন। বাইরে গোলমাল শুনে টজো তার বাথরুমের জানলা থেকে মুখ বার করে শুধু পাচটি প্রশ্ন করলেন, (১) ইম্ফল আক্রমণ করা হলে ব্রিটিশ সৈন্য কি পাল্টা বর্মা আক্রমণ করতে পারবে? (২) ইম্ফল আক্রমণ করবার পর জাপানী সাপ্লাই লাইন বড় কিংবা দীর্ঘ হবে, এই অবস্থায় শত্রুর আক্রমণকে কি বন্ধ করা যাবে? (৩) জাপানী বিমান-বাহিনী শত্রুর বিমান-বাহিনীর চাইতে ছোট এবং দুর্বল; অতএব বিমান-বাহিনী ছাড়া শুধু পদাতিক বাহিনী দিয়ে আক্রমণ করা সম্ভব কিনা? (৪) সাপ্লাই লাইন দিয়ে কি ঠিকমত রসদ এবং অস্ত্র ইত্যাদি পাঠানো যাবে? (৫) ১৫ আর্মির 'অপারেশন ইউ' কি কার্যকরী হবে?

আম্নাবের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব পাবার পর টজো ইম্ফল আক্রমণের অনুমতি দিলেন ['জাঙ্গল এলায়েন্স', জয়েস লেব্রা, পৃষ্ঠা-১৭৩]।

ইম্ফল আক্রমণের প্ল্যান নিয়ে কর্নেল কাটাকুরো নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। এই সভায় শাহ নওয়াজ খানও ছিলেন। কাটাকুরা নেতাজীকে বললেন যে, জাপানী বিমান-বাহিনী কলকাতাকে প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ করেছে। নেতাজী কলকাতায় বোমাবর্ষণ করবার বিরোধিতা করলেন। আলোচনা অন্তে ঠিক করা হল যে, আই-এন-এ'র এক রেজিমেন্ট সৈন্য জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। ছাড়া এই আক্রমণে আই-এন-এ'র গেরিলা সৈন্যবাহিনী থাকবে। নেতাজী শাহ নওয়াজকে ডেকে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে বললেন। নেতাজী বললেন যে, আক্রমণের পুরো প্ল্যান আর্মি থেকে পাঠানো হবে। প্ল্যান পাবার পর শাহ নওয়াজ খান জেনারেল মুতাগুচির সঙ্গে প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলেন। মুতাগুচি শাহ নওয়াজ খানকে বললেন যে, তার (শাহ নওয়াজ খানের) বাহিনীর প্রধান কাজ হল শত্রুকে বিভ্রান্ত করা এবং মুতাগুচি ও শাহ নওয়াজ তার বাহিনী নিয়ে 'চীন হিলসের' কাছে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হামলা এবং বিভ্রান্ত করবে।

শাহ নওয়াজ খান প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন, আই-এন-এ এই আক্রমণে সৈন্যবাহিনীর প্রথম লাইনে থাকতে চায়।

মুতাগুচি এর জবাবে বললেন, তিনি আই-এন-এ'র যুদ্ধ-কৌশলী পরীক্ষা

করতে চান। এই 'চীনি হিলস' খুবই কঠিন বিপদসঙ্কুল স্থান ছিল এবং এখানে সাপ্লাই লাইন খুব সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পারবে না। পরে ফুজিয়ারা শাহ-নওয়াজ খানকে অনুরোধ করলেন, যেন এই বিষয় নিয়ে তিনি কোন আপত্তি না করেন। শাহ নওয়াজ খান আপত্তি করলেন না। ১৯৪৪ মেইমোর শিবিরে নেতাজী এবং মুতাগুচির মধ্যে প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হল। মুতাগুচি নেতাজীকে আশ্বাস দিলেন: আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ইম্ফল দখল হল আমাদের ভারত দখলের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু তারপরেই আমাদের প্রধান সমস্যা শুরু হবে। কারণ এর পর আমরা দিমাপুরের দিকে এগিয়ে যাব। তখন আমাদের যাত্রার পুরোভাগে আই-এন-এ এই সৈন্যবাহিনী থাকবে। এর জবাবে নেতাজী আশা প্রকাশ করে বললেন, যদি জাপানী সৈন্যবাহিনী ইম্ফল দখল করতে পারে এবং দিমাপুরের দিকে এগিয়ে যায়, তাহলে ভারতীয় জনগণ এবং বৃটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহ করবে। বিশেষ করে আমার প্রদেশ বাংলায় জনগণ বিপ্লব করবে।

সেদিন রাত্রি এগারটা পর্যন্ত নেতাজী এবং মুতাগুচি আক্রমণের প্ল্যান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। ডিনার খাবার পর আবার ভোর পর্যন্ত তাদের আলোচনা হল।

নেতাজী মুতাগুচির কাছে দাবী করলেন যে, অধিকৃত এলাকার শাসন ভার 'আজাদ হিন্দ সরকারে'র হাতে অবিলম্বে তুলে দিতে হবে। এ-ছাড়া বন্দী সেনাদেরও আই-এন-এ'র হাতে তুলে দিতে হবে।

এই আলাপ-আলোচনাকালীন নেতাজী তার অগাধ সামরিক জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। আলোচনার সময় ফুজিয়ারা ছিলেন দর্শক-শ্রোতা। নেতাজীর প্রতি তার শ্রদ্ধা বাড়ল।

* * *

চীনি পাহাড়ী এলাকায় শাহ নওয়াজ খানকে বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। শাহ নওয়াজ খান প্রথম থেকেই জাপানী সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। এই যুদ্ধে তার এই অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। এই যুদ্ধের সময় জাপানীদের সাপ্লাই লাইন বেশ দুর্বল ছিল।

লড়াই করবার জন্যে তিনি উপযুক্ত হাতিয়ার পেলেন না। এই সময়ে চীনি পাহাড়ী এলাকায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। লড়াই করা খুব সহজ কাজ ছিল না। লড়াই শুরু হবার পর শাহ নওয়াজ খান তার অসুবিধার কথা জানাবার পর ডিভিশন কম্যাণ্ডার তাকে 'উখরুল' এলাকায় হটে যেতে বললেন। শাহ

নওয়াজ খান আপত্তি করলেন। ঐ সময়ে তিনি ভারতের বুকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় পণ, ভারতের মাটি থেকে তিনি হটে যাবেন না। পরে সামরিক অবস্থার অবনতি হবার পর তাকে বলা হল যে, জাপানী সেনাবাহিনী তামু এবং সিতুংগ এলাকায় হটে যাবে। শাহ নওয়াজ খান বুঝতে পারলেন, জাপানী সামরিক বাহিনী তাকে মিথ্যে কথা বলে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। শাহ নওয়াজ খান বললেন, তাকে আই-এন-এ'র প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হোক। তাকে এই অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু তিনি যখন তামুতে এসে পৌঁছুলেন তখন তাকে বলা হল যে, আদেশের পরিবর্তন করা হয়েছে। শাহ নওয়াজ খান বুঝতে পারলেন যে, জাপানীরা আই-এন-এ'র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। শাহ নওয়াজ খান উপলব্ধি করলেন যে, এর পর জাপানীদের নির্দেশ পালন করা অপমানজনক হবে। তারা ঠিক করলেন, শত্রুকে আক্রমণ করবেন এবং লড়াই করে প্রাণ দেবেন। শাহ নওয়াজ খানের এই সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে এক জাপানী অফিসার নেতাজীর কাছে খবর পাঠালেন: শিগ্‌গির একটা কিছু করুন। নেতাজী শাহ নওয়াজ খানকে 'কালেয়াতে' ফিরে যেতে বললেন। আই-এন-এর প্রথম ডিভিশনের কর্তা ছিলেন জেনারেল কিয়ানী। তাকে ইয়ামমাটো রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হয়েছিল। তার অধীনস্থ কর্নেল কিয়ানী (জেনারেল কিয়ানীর ভাইপো) এবং কর্নেল ধীলন ৩মাস ধরে একটানা লড়াই করলেন।

কিয়ানী বাহিনী বৃষ্টি-ঝড়কে তুচ্ছ করে এই এলাকায় যুদ্ধ করেছিলেন। লড়াই যখন চলছিল তখন নেতাজী এবং কোয়াবে প্রতিদিন যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন।

৬ই মার্চ কোয়াবে যুদ্ধের সফলতা দেখে আশা প্রকাশ করলেন যে, শীঘ্রই তারা ভারতের ভেতর ঢুকতে পারবেন। তাহলে ঐখানেই আমাদের দেখা হবে, কোয়াবে নেতাজীকে বললেন। এই আশা পাবার পর নেতাজী বললেন, কোয়াবে আজাদ হিন্দ-সরকারের নামের প্রথম থেকে 'সাময়িককালের সরকার' নামটি বাদ দিতে হবে। এবার থেকে শুধু আজাদ হিন্দ-সরকার নামটি ব্যবহার করতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল 'অপারেশন ইউ' ব্যর্থ হয়েছে। মিত্রশক্তি এবার জাপানী এবং আই-এন-এর সৈন্যবাহিনীকে তুমুলভাবে আক্রমণ করল। এর পাল্টা জবাব দেবার মত জাপানী সৈন্যবাহিনীর কাছে উপযুক্ত অস্ত্র ছিল না। জাপানী বিমান-বাহিনী প্রায় অকেজো ছিল। তারা জেনারেল মুতাগুচিকে এই লড়াই বন্ধ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কারণ লড়াই করবার জন্যে

জাপানীদের কাছে কোন প্লেন ছিল না। ইতিমধ্যে জাপানী সামরিক বাহিনী বুঝতে পেরেছিল যে, এই যুদ্ধে তাদের জয়লাভের আশা কম।

মুতাগুচি ইম্ফল দখল করবার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু বোঝা গেল যে, ইম্ফল দখল করবার কোন সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধের এই ভাগ্য বিপর্যয়ের পর জাপানী সেনাবাহিনীর তিন কম্যাণ্ডিং অফিসারকে বরখাস্ত করা হল। টোকিওর হেড-কোয়ার্টার্স থেকে আর্মির সহকারী চীফ অব দি ষ্টাফ হাতা হিকাসবুরোকে এই যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে পাঠানো হল।

* * *

'অপারেশন ইউ'র এবং ইম্ফল আক্রমণের ব্যর্থতার পর আই-এন-এ সৈন্য-বাহিনী পেছু হটতে শুরু করল। পেছনে হটে আসাও খুব সহজ কাজ ছিল না। প্রথমত রাস্তাঘাট দুর্গম ছিল। এ-ছাড়া জঙ্গল এবং জলাভূমি অতিক্রম করা বেশ কষ্টকর কাজ ছিল।

নেতাজী জাপানী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণের সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আই-এন-এর সবাইকে ডেকে বললেন, যদিও জাপানী সেনাবাহিনী পেছু হটতে শুরু করেছে তবু আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব। দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে আমরা যদি হেরে যাই তাহলে আমাদের দুঃখের কোন কারণ থাকবে না। দুঃখ-কষ্ট আজ কোন কিছুই আমাদের এগিয়ে যাওয়াকে রুখতে পারবে না।

১লা মে নেতাজী এবং আই-এন-এ মৌলমেনে এসে পৌছুলেন। সেখান থেকে তারা ব্যাংককে যাবার আয়োজন করলেন। আই-এন এ সেনাবাহিনীর ফিরে যাবার আয়োজন শেষ হবার পর নেতাজী গাড়িতে করে ব্যাংককের দিকে রওনা দিলেন। ১২ই মে তিনি ব্যাংককে এসে পৌছুলেন।

নেতাজীর ইচ্ছে ছিল, তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করে রাশিয়াতে যাবেন এবং রাশিয়া থেকে এই লড়াই করবেন। জেনারেল তেরাউচি নেতাজীকে তার দক্ষিণ আর্মির সঙ্গে সায়গণে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। প্রথমে নেতাজী যেতে রাজি হননি, কিন্তু পরে তিনি রাজি হলেন। তার আগে নেতাজী সিঙ্গাপুরে গেলেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ এবং আই-এন-এর সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। সিঙ্গাপুরে গিয়ে নেতাজী খবর পেলেন যে, দিল্লীতে ভাইসরয় তার এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলকে নতুন করে গঠন করবার চেষ্টা করছেন এবং কংগ্রেস সদস্যরা হয়ত এই নবগঠিত কৌন্সিলে যোগ দেবেন। নেতাজী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে করে এক বেতার বক্তৃতায় বললেন যে, এই কৌন্সিলে যোগ দিলে চাকুরী পাওয়া ছাড়া ভারতীয়রা আর কিছুই পাবে

মূল্য দিতে হল। সেই মূল্য হল দেশভাগ।

কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

* * *

গান্ধীজিও কল্পনা করেননি যে, তার ভুল নীতির জন্যে কংগ্রেসকে জিন্নার পাকিস্তান দাবী স্বীকার করে নিতে হবে। চল্লিশ দশকের প্রথমভাগে এই 'পাকিস্তান' প্রস্তাবটি ছিল সবার কাছে এক স্বপ্ন। কিন্তু এই কল্পনার বিষয়টি যে একদিন বাস্তবে পরিণত হবে একথা কংগ্রেস নেতারাও কেউ ভাবতে পারেননি। কারণ লাহোরের মুসলিম লীগের অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পরও দীর্ঘকাল এই প্রস্তাব সবার কাছে কুয়াসায় আচ্ছন্ন শুধু এক সুদূরের মরীচিকা ছিল।

কিন্তু ইংরেজ সরকারি এবং বেসরকারি কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পাকিস্তান প্রস্তাবটি ক্রমে ক্রমে অবাস্তব থেকে এক স্পষ্ট রূপ নিল।

প্রথমে লর্ড ওয়েভেল এক চিঠিতে আমেরীকে বললেন: কলকাতা শহর ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান বাঁচতে পারবে না। হিন্দুরা কখনই কলকাতা শহর ছেড়ে দেবেন না। ওয়েভেল তার এই চিঠিতে আরও লিখলেন: জিন্না নিজে কী চান, নিজেই ভাল করে জানেন না। কিছুদিন পরে পাঞ্জাবের গভর্নর ওয়েভেলকে সাবধান করে লিখে জানালেন, যদি পাঞ্জাবকে নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা হয় তাহলে শিখরা বিদ্রোহ করবে এবং পাঞ্জাবে রক্তপাত হবে।

১৯৪৪ সালে ডিসেম্বর মাসে জিন্না ওয়েভেলের মধ্যে এক বৈঠক হল। জিন্না ওয়েভেলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন ভারত কখনই এক দেশ ছিল না। শুধু ইংরেজ শাসকেরাই ভারতকে এক দেশ হিসাবে তৈরি করবার চেষ্টা করছে কিন্তু তাদের সেই চেষ্টাও সফল হয়নি।

ওয়েভেল জিন্নাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এই দেশকে অভিন্ন করে রাখবার বিভিন্ন কারণ আছে। এই কারণ শুধু রাজনৈতিক কারণ নয়, দেশের আর্থিক এবং স্বার্থের জন্যে দেশের একত্ব একান্ত আবশ্যক। ইতিমধ্যে বাংলার গভর্নর কেসী ভাইসরয়কে এক চিঠি লিখে জানালেন, যদি বাঙালী মুসলমানেরা জানতে পারে যে তারা কলকাতা শহর পাবে না তাহলে হয়ত তারা পাকিস্তান প্রস্তাবটি গ্রহণ করবে না। কেসী আরও লিখলেন (১লা মার্চ, ১৯৪৫), দেড়শ বছর ধরে আমরা বাংলায় শাসন করছে, কিন্তু এই শাসনের দরুন বাংলার কোন পরিবর্তন আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হয় ইংরেজরা খুব কম খরচে এই প্রদেশকে শাসন করেছে। করের হার কম এবং সংগৃহীত খুব অল্প টাকাই প্রদেশের হিতের জন্যে ব্যয় করা হয়। এ-ছাড়া রয়েছে আমলাতন্ত্রের

গড়িমসি · এবং সর্বপ্রকারের চেষ্টাও উদ্যমকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। এইসব কারণের দরুন বাঙালী চাকুরিজীবীদের মনে হতাশা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের কাজ করবার উৎসাহ ও ক্ষমতাকে দাবিয়ে রেখেছে।

ওয়েভেল কেসীর চিঠির কোন জবাব দেননি। কারণ ওয়েভেল বাঙালীদের অপছন্দ করতেন, কেসী এদিকে বাঙালীদের পছন্দ করতেন।

কিছুদিন পরে বাংলায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন হল। কেসী এই প্রদেশে সেকশন ৯৩ জারি করলেন। কিন্তু এর পরে যখন নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে মন্ত্রীসভার পতন হল তখন গভর্নর কংগ্রেস দলের নেতা খান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি প্রদেশে কোন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবেন কিনা ? গান্ধীজি খান সাহেবকে মন্ত্রীসভা গঠন করবার নির্দেশ দিলেন। জিন্না এই সংবাদ পেয়ে রাগ করলেন। কিন্তু নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে তার করবার মত কোন ক্ষমতা ছিল না। কারণ পেশোয়ারে মুসলিম লীগের সদস্যরা আত্মকলহে, ঝগড়া-বিবাদে ব্যস্ত ছিলেন এবং লীগের পক্ষে ঐ প্রদেশে কোন মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব ছিল না।

এরপর ব্রিটিশ সরকারের কাছে আরও কয়েকটি কঠিন সমস্যা সামনে এসে উপস্থিত হল। য়ুরোপের যুদ্ধ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। দূর প্রাচ্যের লড়াই শেষ হবার আলো দেখা দিচ্ছিল। অতএব লড়াই'র পর ভারতের রাজনৈতিক অচল পরিস্থিতি সমাধান করা আবশ্যক ছিল। এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জট কী করে খোলা যায় সেই প্রস্তাবকে ওয়েভেল ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করলেন। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ওয়েভেল লণ্ডনে গেলেন এবং প্রায় দশ সপ্তাহ লণ্ডনে ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে এই সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করবার পর তিনি দিল্লীতে ফিরে এলেন।

তিনি দিল্লীতে এসে ১৯৩৫ সালের সংবিধানের কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করলেন। নতুন প্রস্তাবে বলা হল যে, ভাইসরয় তার এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলকে নতুন করে গঠন করবেন। এই নতুন কৌন্সিলে ভাইসরয় এবং কম্যাণ্ডার ইন চীফ ছাড়া আর সব সদস্যরা হবেন ভারতীয়। কংগ্রেসকে বলা হল যে, ভাইসরয়ের হাতে বিশেষ নামঞ্জুর অর্থাৎ vetoর ক্ষমতা থাকবে বটে; তবে খুব প্রয়োজন না হলে তিনি ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন না। লীগকে বলা হল, নতুন কৌন্সিলে সমান সংখ্যক হিন্দু এবং মুসলমান সদস্য থাকবে। এ ছাড়া নেতারা দেশের জন্যে এক নতুন সংবিধান রচনা করবেন। এই সাম্প্রদায়িক সমমূল্যতার প্রস্তাবটি ব্রিটিশ সরকার খুবই কৌশল এবং চালাকির সঙ্গে করেছিলেন। কারণ প্রথমে শুধু রাজনৈতিক সমমূল্যতার (কংগ্রেস কখন ঐ সমমূল্যতা প্রশ্নটিকে স্বীকার

করে নেয়নি) কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে এই সাম্প্রদায়িক সমমূল্যতা কথাটি জুড়ে দেওয়া হল। নতুন প্রস্তাবে বলা হল, সদস্যদের আসনগুলি দুইটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হচ্ছে না, দুইটি ধর্মীয় দলের মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে। অর্থাৎ পরোক্ষে বলা হল, কংগ্রেস হিন্দু এবং লীগ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান ; অর্থাৎ যে দাবী জিন্না করেছিলেন। কিংবা বলা যায় তির্যকে পাকিস্তান এবং দুই জাতি এই দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া হল যদিও ব্রিটিশ সরকার জানত যে, পাকিস্তান এক অযৌক্তিককর অবাস্তব প্রস্তাব। ভাইসরয় ২৫শে জুন সিমলাতে তার এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে এক সম্মেলন ডাকলেন। মোট একুশজন রাজনৈতিক নেতাকে এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করা হল। এই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের এগারজন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী (বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আগেই পদত্যাগ করেছিল), কেন্দ্রের সংসদে এবং কৌন্সিল অব ষ্টেটসের কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দ, সংসদে য়ুরোপীয়ান এবং কয়েকটি ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী দলের নেতা এবং একজন করে তপশীলি ও শিখ দলের নেতা ছাড়া গান্ধীজি ও জিন্নাকে দুইটি বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতা হিসাবে আমন্ত্রণ করা হল।

কংগ্রেস সিমলাতে এই সম্মেলনে যোগ দিতে রাজি হল। গান্ধীজি ভাইসরয়ের এই ঘোষণার মধ্যে 'বর্ণ হিন্দু' শব্দটিকে আপত্তিকর, অসত্য এবং আধুনিক হিন্দু মতবাদের বিরোধী বলে বর্ণনা করলেন। অতএব প্রথমে গান্ধীজি এই সম্মেলনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, কিন্তু পরে ভাইসরয়ের বিশেষ অনুরোধে সিমলাতে এক বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবে গেলেন। এই সময়ে মৌলানা আজাদ ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। খুব সম্ভবত, মুসলমান বলে তাকে আমন্ত্রণ করা হল না। কিন্তু পরে যখন গান্ধীজি ভাইসরয়কে বললেন যে, মৌলানা হলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, তখন ভাইসরয় তার ভুল সংশোধন করলেন।

জিন্না ও মুসলিম লীগ ভাইসরয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। প্রথমে তিনি বললেন যে মূল বৈঠক দু-সপ্তাহের জন্যে মুলতুবী রাখা হোক। অবশ্যি জিন্নার এই প্রস্তাব করবার আর একটি কারণ ছিল। কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে, ভাইসরয়ের কাছ থেকে যে-প্রস্তাব পাবেন সেই প্রস্তাবগুলিকে নিয়ে লীগের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কিন্তু ভাইসরয় তার এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন না।

সম্মেলনের আলোচনার প্রারম্ভেই আশা নিরাশায় পরিণত হল। সম্মেলন ব্যর্থ হবার বিভিন্ন কারণ ছিল। জিন্না দাবী করলেন যে, ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলে মুসলমান সদস্যদের নিয়োগ করবার ক্ষমতা শুধু লীগের হাতেই

থাকবে। মৌলানা আজাদ ভাইসরয়কে বললেন যে, কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। এর পাল্টা জবাবে জিন্না বললেন: কংগ্রেস হল এক হিন্দু-প্রতিষ্ঠান।

নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জিন্নার মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। জিন্না আবার বললেন যে, পাকিস্তান দাবীকে স্বীকার না করে নিলে মুসলিম লীগ দেশের নতুন সংবিধান রচনায় কোন অংশগ্রহণ করবে না। এ ছাড়া জিন্না বললেন যে, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলে যে পাঁচজন মুসলমান সদস্য থাকবে তাদের জিন্না নিজে নির্বাচিত করবেন এবং তিনি যাদের মনোনীত করবেন তাদের বাদ দেওয়া চলবে না। আবার ওয়েভেল জিন্নার এই প্রস্তাবকে এড়িয়ে গেলেন। কোন জবাব দিলেন না।

এইভাবে কিছুদিন আলোচনা হবার পর মীমাংসার কোন সম্ভাবনাও দেখা গেল না। ভাইসরয় এবার তার প্রস্তাব নেতাদের কাছে রাখলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব নেতাদের মনঃপূত হল না। এদিকে ওয়েভেল নিজেই এক্সিকিউটিভ সদস্যর একটি তালিকা তৈরি করলেন। ভাইসরয় এই তালিকা নিয়ে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করলেন, কিন্তু এই আলোচনা ফলপ্রসূ হল না। কারণ জিন্না তার মত-পরিবর্তন করতে রাজি হলেন না। সম্মেলন ভেঙে গেল।

অনেকে বললেন যে, সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হবার বহু কারণ ছিল। এক চার্চিল সরকার জিন্নাকে এই সম্মেলন ভেঙেদেবার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন। এ-ছাড়া কিছু ইংরেজ সরকারি কর্মচারী এই সম্মেলনকে ব্যর্থ করবার পেছনে ছিলেন।

কোন এক প্রদেশের ইংরেজ গভর্ণর জিন্নাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি যেন ভাইসরয়ের প্রস্তাবকে গ্রহণ না করেন, এবং তিনিও গভর্ণরকে (ভাইসরয়কে) বলেছিলেন, যেন তিনি (ভাইসরয়) জিন্নার কথায় কান না দেন ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিউনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১৫]। সম্মেলনের পরে আমেরী ভাইসরয়ের কাছে এক চিঠি লিখে বললেন: এবার কংগ্রেস নেতাদের বোঝা উচিত যে, সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ হল মুসলিম লীগ। ব্রিটিশ সরকার, আপনিও আমি কেউ কংগ্রেসের আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক নই। অতএব কংগ্রেসের প্রধান কাজ হওয়া উচিত পাকিস্তান দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া এবং মুসলিম লীগের এই দাবীকে সমর্থন করা।

আমেরী আরও লিখলেন: আগামী শীতের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কয়টি আসন পাবে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে কিনা জানিনে। তবে নির্বাচনে যদি লীগের জয়লাভ হয় তাহলে আমরা লীগের দাবীকে অবহেলা করতে পারবো না।

তাহলে লীগের ইচ্ছানুযায়ী ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলে সমস্ত মুসলিম সদস্য মনোনীত করবার অধিকার লীগেরই থাকবে ['জিন্না', ষ্টানলি ওআপোর্ট, পৃষ্ঠা—২৪৫-২৬৬]।

এর পর ঘটনাগুলি দ্রুতলয়ে ঘটে গেল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করল। নতুন ব্রিটিশ সরকার ভারতের সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে ইংল্যাণ্ডে ডেকে পাঠালেন। এই সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সরকার আরও ঘোষণা করলেন যে, দেশে কেন্দ্রের এবং বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন হবে।

পরে ওয়েভেল দেশে ফিরে এসে ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচনের পর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ণবহাল করা হবে এবং সংবিধান রচনা করবার জন্যে এক কমিটি গঠন এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিল গঠন করা হবে।

কংগ্রেস এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হল। কংগ্রেস পার্টির সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনী এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে বললেন: চার্চিলের রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলের মধ্যে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। শুধু সময়কে কিনব জন্যে এই নির্বাচন করা হচ্ছে।

এর পর কংগ্রেস এই নির্বাচন উপলক্ষে দুটি নির্বাচন ইস্তাহার প্রকাশ করল। এই নির্বাচনী পত্রে বলা হল, দেশের সবাইকে সমান অধিকার এবং সুযোগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া স্বাধীন গণতান্ত্রিক সংবিধানে সবার সমান মৌলিক অধিকার থাকবে। কিন্তু জমি সংস্কার সাধনে দেশের কিষাণ এবং জমিদারদের দুই পক্ষকে সন্তুষ্ট করা হল। মুসলমানদের মনের আশঙ্কা দূর করবার জন্যে বলা হল যে, যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেল) সংবিধান ভিত্তিতে গঠন করা হবে এবং দেশের কিছু অংশকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। এ ছাড়া 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবটির উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা হল।

মুসলিম লীগের এই নির্বাচনে মূল বক্তব্য ছিল হিন্দুর প্রভুত্ব এবং এই কারণে তারা এক পৃথক দেশ 'পাকিস্তান' দাবী করল।

নির্বাচনের ফলাফল সবাইকে অবাক করল। কেন্দ্রের সংসদে মুসলিম লীগ ত্রিশটি আসন দখল করল (এখানে লীগের ভোটসংখ্যা ছিল ৮৮ পার্সেণ্ট মুসলিম ভোট) এবং প্রদেশগুলিতে ৫০৭ মুসলমান আসনের মধ্যে ৪২৭টি মুসলমান আসন লীগ পেল (এখানে লীগের ভোটসংখ্যা ছিল ৪৭ পার্সেণ্ট)। শুধু নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রণ্টিয়ার প্রদেশে যেখানে খান আবদুল গফফর খানের রেড সার্টের প্রাধান্য বেশি ছিল সেইখানে লীগের পরাজয় হল। বাকী সব আসন কংগ্রেস

দখল করল (সাধারণ ভোটের সংখ্যা ছিল ৯১ পার্সেন্ট)।

* * *

ঠিক নির্বাচনের সময়কালে ভারতীয় রাজনীতির আকাশে ঘনিয়ে এল এক দুর্যোগ, এল কালবৈশাখী—এল ঝড়···। এবার সেই ঝড়ের পুরো কাহিনী বলতে হবে। সেদিন যদি এই ঝড় না আসত তাহলে দেশ স্বাধীন হত কিনা সন্দেহ ; কারণ এরপর থেকে দেশের রাজনীতিতে এক 'ঘূর্ণিপাক' শুরু হল।

নভেম্বর ১৯৪৫ সাল, কলকাতা। একদিন কলকাতার রাস্তায় গুরু গুরু শব্দ শোনা গেল। এ শব্দ মেঘের গর্জন নয়, এ ছিল আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর পদধ্বনি। বন্দী আই·এন·এ সেনারা দেশে ফিরে এসেছে। শোনা গেল তাদের কণ্ঠস্বর··· তাদের গান, কদম্ কদম্ বাঢায়ে যা····তাদের মুখে ধ্বনি—নেতাজী জয়, আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, চল দিল্লী····। তাদের এই গান, কণ্ঠস্বর, দেশের সহস্র সহস্র জনগণকে বিচলিত ও উন্মাদ করে তুলল। ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস নেতারা এবং মুসলিম লীগ সবাই বিস্মিত এবং হকচকিয়ে গেলেন। তারা দেশের জনগণের কাছ থেকে এই উন্মাদনা, এই আবেগ, উচ্ছ্বাস আশা করেননি।

এইসব আজাদ-হিন্দ সৈন্যবাহিনীর বিচার করবার জন্যে তাদের দিল্লীর লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হল। ব্রিটিশ সরকার, ভাইসরয় ও সেনাবাহিনীর প্রধান ক্লড অকিনলেকের পরামর্শে সুপরিবেশে এদের বিচার করবার জন্যে লালকেল্লায় এক বিচার কমিশন বসালেন।

এই হল সেই ঐতিহাসিক লালকেল্লা যেখানে গিয়ে নেতাজী স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবার প্রতিশ্রুতি তাঁর আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীকে দিয়েছিলেন। তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর সবাইকে বলেছিলেন, আমাদের জয় সুনিশ্চিত—কিন্তু যতদিন আমরা ঐ লালকেল্লায় গিয়ে কুচকাওয়াজ না করতে পারব ততদিন আমাদের সংগ্রাম শেষ হবে না। বন্ধুগণ আপনারা যদি আমার জীবন-মরণের সঙ্গী হন, তাহলে আমি আপনাদের জয়ের পথে অর্থাৎ স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাব। এই স্বাধীনতা দেখবার সুযোগ কার হবে জানিনে। এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবে, দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে আমরা সর্বস্ব দেব····

এই সেই লালকেল্লা যেখানে প্রায় নব্বই বছর আগে প্রজা করেছিল রাজার বিচার। বণিক ইংরেজ ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা'র বিচার করেছিল এবং পরে তাঁকে সুদূর বর্মায় নির্বাসন দিয়েছিল। এই লালকেল্লা থেকেই ইংরেজ সেনা হডসন বেরিয়ে গিয়ে সম্রাট বাহাদুর শা'র তিন সন্তানকে

বিনা বিচারে বিনা অপরাধে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করেছিলেন।

এদের অপরাধ ছিল রাজবিদ্রোহ · আজ ভাগ্যের পরিহাসে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীরও একই অপরাধে এই ঐতিহাসিক লালকেল্লায় বিচার শুরু হল।

প্রথমে তিনজন আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর সেনাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। এদের নাম ছিল লেঃ গুরবক্স সিং ধীলন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি এই যুদ্ধে চারজনকে হত্যা করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় আসামী হলেন ক্যাপ্টেন পি. কে. সায়গল, তার বিরুদ্ধেও হত্যার অভিযোগ ছিল এবং তৃতীয় আসামী ছিলেন শাহ নওয়াজ খান। বলা হল, তিনি মাত্র দুজনকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনজনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ করা হল। বলা হল, এরা ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অর্থাৎ সংক্ষেপে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 'দেশদ্রোহিতা'।

কিন্তু এই তিন আজাদ-হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সৈন্যদের বিচারের কাহিনী বলবার আগে আমাদের আরও কয়েকমাস পিছিয়ে যেতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ-হিন্দ ফৌজ বাহিনী এবং আজাদ-হিন্দ সরকারের সদস্যদের ভারতবর্ষে বন্দী করে পাঠানো হল। এইসব বন্দী সেনাদের জেরা করবার জন্যে এক কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটির নাম হল 'ব্রিটিশ কম্বাইণ্ড সার্ভিসেস' এবং এর মধ্যে সামরিক ও ব্রিটিশ সরকারের বে-সামরিক কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এরা বিভিন্ন বন্দীদের জেরা করে জানবার চেষ্টা করলেন, কোন কোন সৈন্য রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং কোন কোন সৈন্য রাজার অনুগত ছিল। ইম্ফলে প্রায় পনেরশ' আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাংকক এবং মালেশিয়াতে প্রায় সাত হাজার আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর সেনারা মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এর পর মে এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রায় দশ হাজার সৈন্যকে রেঙ্গুন থেকে দেশে ফেরৎ পাঠানো হল।

এইসব বন্দীদের জেরা করে ব্রিটিশ সামরিক কর্তারা আজাদ-হিন্দ-ফৌজ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করলেন। তাদের এক রিপোর্টে বলা হল, (ইণ্ডিয়া বর্মা কমিটি, সেক্রেটারী অব ষ্টেটসের এক স্মারকলিপি, তারিখ ১৯৪৫, ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৬৮-৩৬৯) যে সব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান জাপান এবং চীনদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, এদের মধ্যে প্রধান হল :—

১। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। এছাড়া

বেসামরিক জনগণের সংখ্যা হল প্রায় তেইশ হাজার। এর মধ্যে কুড়ি হাজার ছিল সাধারণ পরদেশী ভারতীয় নাগরিক।

২। ৯৫০ রেজিমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ফরেইন লিজন।

এর মধ্যে আই-এন-এর প্রথম দলটি জাপানী সৈন্যবাহিনীর 'এক অংশ' ছিল। যদিও বলা প্রয়োজন আই-এন-এ কিংবা আজাদ-হিন্দ-ফৌজ নিজেদের এক স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী বলে দাবী করত। দ্বিতীয় দলটি ইণ্ডিয়ান ফরেইন লিজনকে জর্মান গঠিত এক বাহিনী, এই দলের নেতার নাম ছিল সুভাষচন্দ্র বোস।

এই সৈন্যবাহিনীও বেসামরিক নাগরিকদের তিন অংশে ভাগ করা সম্ভব—

(ক) প্রথম ভাগকে বলা যায় 'শ্বেত' অর্থাৎ 'হোয়াইট'। এরা নির্দোষ, এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিংবা বলবার কিছু নেই। এদের সাধারণ বন্দীর মত ব্যবহার করা হবে এবং সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(খ) দ্বিতীয় ভাগকে বলা যায় ধূসর অর্থাৎ 'গ্রে'। বলা হল এই সৈন্যদের জোর করে বিপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কারণ, এদের উপর শত্রুর প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং প্রচার প্রবল হয়েছিল। এদের বরখাস্ত করা দরকার।

(গ) তৃতীয়ত, কালো (ব্ল্যাক)। এদের জেরা করবার পর জানা গেছে যে, এরা বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী এবং এদের উপস্থিতি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিয়ম-শাসনের জন্যে একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। এইসব 'কালোরা' বহু অপরাধজনক কাজ করেছে। এদের বিচার করা দরকার।

এবার বেসামরিক বন্দীদের নিয়ে কী করা উচিত সেইটে আলোচনা করে দেখা দরকার। এই বেসামরিক বন্দীদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদল যারা জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। আর একদল যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। প্রথম দলকে য়ুরোপে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এরা সংখ্যায় খুব কম ছিল এবং মাত্র আঠার জনের বিচার করা সম্ভব ছিল। এদের মোট বন্দীর সংখ্যা ছিল আঠাশ জন।

এইসব বন্দীদের জেরা করা হচ্ছে—এই দলের মধ্যে ছিলেন এ. সি. নাম্বিয়ার। তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর ইণ্ডিয়ান লিজনের মন্ত্রী (মিনিষ্টার) ছিলেন এবং সুভাষ বোস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে চলে যাবার পর তিনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর 'ইণ্ডিয়ান লিজনের' প্রধান কর্তা হয়েছিলেন। এদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ হবে, 'রাজার বিরুদ্ধে লড়াই'।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেসামরিক বন্দীর সংখ্যা হল ২৩,০০০। এঁরা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং রাজার বিরুদ্ধে লড়াই

করেছিলেন। ভারত সরকারের তালিকা অনুযায়ী ৮৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করা হয়েছে।

এর মধ্যে মাত্র ১২ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা যায়....সুভাষ বোস এদের মধ্যে একজন (খুব সম্ভবত তিনি মারা গেছেন)।

'এইসব বন্দীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।'

কমিটির কাছ থেকে এই রিপোর্ট পাবার পর লর্ড ওয়েভেল নতুন সেক্রেটারী অব ষ্টেটস পেথিক লরেন্সের কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন, আমরা এই বন্দী আই-এন-এ সৈন্যদের প্রতি যে নীতিই গ্রহণ করি না কেন এদের প্রশ্ন নিয়ে ভারতের প্রতি জেলা-মহকুমায় তুমুল আন্দোলন শুরু হতে পারে। প্রতিটি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সেনারা সুভাষচন্দ্র বোসকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর এক জাতির নেতা (National Hero) হবার সম্ভাবনা আছে। সর্বপ্রথম এই একজন ইংরেজ-বিদ্বেষী নেতা যিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছেন।

পরে আর একটি চিঠিতে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল লর্ড পেথিক লরেন্সকে জানালেন, নেহরু এবং গান্ধী ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। এঁরা দেখছেন আমরা কী নীতি গ্রহণ করি। যদি আমরা ওদের প্রতি কঠোর মনোভাব অবলম্বন করি তাহলে হয়ত দেশের জনগণ বিশেষ উত্তেজিত হবে। সুতরাং আমি একটি 'মধ্যম' পথ অনুসরণ করতে চাই ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১১]।

এবার ব্রিটিশ এবং ভারত সরকার নেতাজী সুভাষ বোসকে নিয়ে কী করা যায় সেই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন।

ভাইসরয়, ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকার প্র য জানবার চেষ্টা করলেন, সুভাষ বোসের আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের উপর কী প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

ভাইসরয় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সদস্য স্যর ফ্রান্সিস মোদীর কাছে সুভাষ বোস সম্বন্ধে এক ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন। এর জবাবে স্যর ফ্রান্সিস এক "টপ সিক্রেট" চিঠিতে ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স দপ্তরের তথ্য এবং তাদের মতামত ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ সরকারকে জানালেন। এই চিঠি লেখার তারিখ ছিল ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৫ সাল ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড]।

স্যর ফ্রান্সিস তার স্মারকলিপিতে ভাইসরয়কে জানালেন, আই-এন-এ সৈন্যদের বিচার করা হলে দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হবে। এ-ছাড়া বোসকে

'ওয়ার ক্রিমিন্যাল' অর্থাৎ (যুদ্ধপরাধী) বলতে পারি কিনা এই নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখছি। না, সাধারণ ভাষা অনুযায়ী বোসকে 'ওয়ার ক্রিমিন্যাল' বলা উচিত হবে না। এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাঁকে 'ওয়ার ক্রিমিন্যাল' বলা ঠিক হবে না।

সুভাষ বোসকে গ্রেপ্তার করলে তার প্রতি কী মনোভাব অবলম্বন করা উচিত হবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে স্যর ফ্রান্সিস এক বড় নোট ভাইসরয়কে পাঠালেন।

এই রিপোর্টটি তৈরি করেছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব স্যর রিচার্ড টটেনহ্যাম এবং ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর পার্সিভাল স্মিথ [এই রিপোর্ট 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে]।

এই নোটে বলা হয়েছিল :—(১) বোসের আই-এন-এ'র উপর বিশেষ প্রভাব ছিল। যাঁরা এখনও আমাদের কাছে হাজতে বন্দী হয়ে আছেন (প্রায় বারো হাজার আই-এন-এ'র সৈন্যবাহিনী) এবং সাধারণ নাগরিকদের উপর, ভবিষ্যৎ-এ যাদের উদ্ধার করা হবে, সর্ব জাতি ও সর্ব সম্প্রদায়ের উপর তাঁর প্রভাব গভীরভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের কাছে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়ের এবং অতি শ্রদ্ধার ব্যক্তি।

তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, বিদেশী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুলনাহীন সুযোগ্য সুদক্ষ নেতা; ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম সংগঠক এবং জাপানী অধিকৃত দেশগুলির মধ্যে ভারতীয় নাগরিকদের অভিভাবক। তিনি জাপানীদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে অতি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আচার-ব্যবহার করতেন এবং তাঁর সমকক্ষ নেতার চাইতে তাঁকে অনেক বেশি ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

(২) বোসের বাংলার রাজনীতির উপর প্রভাব :—বোস বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। বাঙালীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে খুব সম্ভবত গান্ধীর পরেই তাঁকে সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে গণ্য করা হত। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে তার অনিষ্টসাধন করবার প্রচুর ক্ষমতা ছিল। বাঙালী যুবকদের কাছে, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে তিনি ছিলেন এক প্রেরণার উৎস।

(৩) এবার বোসের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে, তার কিছু সম্ভাবনা বলা হল—

(ক) তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং যুদ্ধ করবার অপরাধে শত্রুর এজেন্টস আইন অনুযায়ী তাঁর বিচার করা সম্ভব কিনা এইটে যাচাই করা।

(খ) বর্মা কিংবা মালেশিয়াতে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধে তাঁর বিচার করা সম্ভব কিনা।

(গ) ভারতের বাইরে সামরিক কোর্টে তাঁর বিচার করবার সম্ভাবনা।

(ঘ) তাঁকে ভারতে বন্দী করে রাখা যায় কিনা।

(চ) তাঁকে অন্য কোন ব্রিটিশ দ্বীপে রাখা যায় কিনা।

(ছ) তিনি যে-অবস্থায় যেখানে আছেন সেইখানেই তাঁকে থাকতে দেওয়া।

(জ) আমি বিশ্বাস করি না যে, ভারতে বোসের বিচারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হবে। তাঁর মুক্তির জন্যে প্রচণ্ড দাবী উঠবে এবং বিচারের সময় তাঁর কাজকর্ম এবং তাঁর উদ্দেশ্যর কথা প্রচারিত হবে। অবশ্যি ভারতে বিচার হলে এ কাজ অতি সহজেই করা যেত এবং এই নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারত না। যদি তাঁকে শেষ অবধি প্রাণদণ্ড দেওয়া না হয়, তাহলে আন্দোলন,... ইত্যাদি বন্ধ করবার জন্যে তাঁর সাজা মকুব করে দেওয়াই হবে সহজ উপায়।

(৪) বর্মা সরকার বর্তমানে বর্মা ন্যাশনাল আর্মিকে খুশি করবার চেষ্টা করছে। তারা যদি বোসের বিচার করতে রাজিও হয়, তাহলে তাঁরা বোসকে ফাঁসি দেবে না। মালেশিয়া সরকার হয়ত তাঁর বিচার করতে সঙ্কোচ বোধ করবে না। এবং আমরা ওখান থেকে ফাঁসির হুকুম আদায় করতে পারব, যদি ব্রিটিশ সরকার গণ-আন্দোলন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তীব্র আন্দোলনকে তুচ্ছ ও অবহেলা করতে পারে। তবে সিঙ্গাপুরে বিচার করা যেতে পারে।

ওখানে গোপনে বিচার করা হলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে—আমরা বিচারতন্ত্র এবং বিচার পদ্ধতিকে হত্যা করেছি। এবং তাঁর (বোসের) বন্ধু ও সমর্থকদের তাঁর জীবন বাঁচাবার কোন সুযোগ সুবিধে দিইনি। এ ছাড়া আমরা কী কারণে বোসের বিচার বাইরে করব? কারণ একই সময়ে তো আমরা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অন্য নেতাদের বিচার এই দেশেই প্রকাশ্যে করব। সুতরাং ভবিষ্যৎ-এর রাজনৈতিক পরিণাম আরও গুরুতর হতে পারে।

(৫) ভারতের বাইরে যদি কোন মিলিটারী কোর্ট তাঁর (বোসের) বিচার করে এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়; তাহলে আপত্তি করা হবে। তবে ঐ আপত্তি অত তীব্র হবে না, কারণ বিচারের মেয়াদ খুব স্বল্পকালের জন্যে হবে। কিন্তু সামরিক বিচারের রায় সাধারণ দেওয়ানী আদালতের রায়ের চাইতে আরও কঠোর হবে।

যদি সামরিক কোর্টে বিচার করা হয় তাহলে আমাদের সপক্ষে কেস হবে যে, তিনি আমাদের সৈন্যদের হত্যা করবার জন্যে দায়ী ছিলেন। কিন্তু দেওয়ানী

আদালতে বিচার করা হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ-ছাড়া এইভাবে বিচার করলে আমরা আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাব এবং মিলিটারি কোর্ট এই কৌশলকে স্বীকার করে নেবে না।

(৬) বোসকে ভারতে বন্দী করে রাখা হলে দেশে আন্দোলন হবে এবং পরে তাঁকে মুক্তি দিতেই হবে।

(৭) দেশের বাইরে কোথাও তাঁকে বন্দী করে রাখা হলে এবং কিছুদিনের জন্যে মানুষের চোখের আড়ালে থাকলে লোকে হয়ত তাঁকে ভুলে যাবে এবং তাঁর মুক্তির জন্যে আন্দোলন দাবী আরও কম হবে। এ-ছাড়া তাঁর রাশিয়াতে পালিয়ে যাওয়া কঠিন হবে।

(৮) তবে সবচাইতে সহজ উপায় হল, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁকে সেইখানেই থাকতে দেওয়া হোক। যেন তাঁর মুক্তির দাবী না করা হয়। যে-কোন প্রকারে তিনি রাশিয়াতে পালিয়ে যেতে পারেন এবং রাশিয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পারে। কারণ রাজনৈতিক সমস্যা কম এবং তাতে জটিলতা কম হবে। কিন্তু সরক্ষা-দপ্তরের অভিমত হল, রাশিয়াতে তাঁর উপস্থিতি আরও বিপজ্জনক হবে এবং সহজে তা তুচ্ছ বলে মনে করা যায় না।

(৯) আমাদের কাছে দুটো পথ খোলা আছে। একটি পথ হল, বোসকে বের করে দেওয়া কিংবা তাঁকে আটক করে রাখা অর্থাৎ তার মৃত্যুদণ্ডকে মকুব করে দেওয়া। এ অবশ্যি দুটি দণ্ডকে এক করে বিচারের পর তাঁকে বের করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁর দণ্ডকে স্থগিত রাখলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সব সামরিক কর্মচারিরা তার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন; তাঁদের কেন ফাঁসি দেওয়া হল?

কিন্তু লড়াই শেষ হবার পর খবর পাওয়া গেল নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। এই খবর সত্যি না মিথ্যে এই নিয়ে দেশে তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। মিত্র সৈন্যবাহিনীর সাউথ-ইষ্ট এশিয়া কম্যাণ্ডের এক গোপনীয় পাক্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা গেল [NO : 10005/3/ GSI—(b) 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬২] যে, নেতাজী বোস মারা গেছেন। এই রিপোর্টে বলা হল : বোসের মৃত্যু-সংবাদ শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সুরক্ষার দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আরও বলা হল : যতদিন নেতাজীর স্মৃতি জীবিত থাকবে ততোদিন সবাই বিশ্বাস করবে যে, নেতাজী কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং তাঁর বন্ধুদের, বিশেষ করে তাঁর সমর্থক ও সহকর্মীদের উপর, যাদের উপর তিনি প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন এবং আত্মমন্ত্রে আকৃষ্ট করেছিলেন তাদের উৎসাহে ও আশায় কোন

তাঁটা পড়বে না।

বোসের মৃত্যু-সংবাদ দেশের সর্বত্র সহানুভূতি এবং শোক সৃষ্টি করেছে। লোকে হরতাল পালন করে তাদের দুঃখপ্রকাশ করেছে। কিন্তু অনেকেই এই মৃত্যু-সংবাদে অবিশ্বাস করেছেন।

বাংলার প্রতিক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, জাপানীদের সাহায্য নিয়ে এই সংবাদ (মৃত্যুর খবর) প্রচার করা হয়েছে এবং বোস গোপনে কোথাও লুকিয়ে আছেন এবং উপযুক্ত সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। ঐ সময়ে এক জাতীয় সরকার গঠন করা হবে। কিংবা বর্তমান সরকার বোসকে এবং আই-এন-এ সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমার চোখে দেখবে।

প্লেনের এ্যাকৃসিডেণ্টের পর বোসকে সায়গনে দেখা গিয়েছে এই সংবাদ সাংবাদিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

যে-সব মহলে বোসের মৃত্যু-সংবাদকে সত্যি বলে গ্রহণ করা হয়েছে তারা দুঃখিত যে, বোস স্বদেশে ফিরে এসে তাঁর যোগ্য স্থান অধিকার করতে পারবে না। সবাই বিশ্বাস করেন যে, বোস ফিরে এলে তাকে ক্ষমা করা হত। অবশ্যি বোসের কেস অন্যান্য আই-এন-এ'র সৈন্যদের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত; অনেক সংবাদ-পত্রের সুর থেকে এক গভীর অন্তর্লীন বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের রেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এই বিষয়ে জওহরলাল নেহরু অবাধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি এই প্রশ্নের ব্যাপারে ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গীকে বজায় রেখে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপর গুরুত্ব দেবার আশা প্রকাশ করেছেন।

বোসের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে যে-সব সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা দিয়েছিল সেইসব সমস্যার সমাধান হয়েছে। তাঁর কর্মকর্ম এবং দেশপ্রেম দেশবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করবে, বিশেষ করে তরুণ বাঙালীদের মনে। এই প্রসঙ্গে এক রাজনীতিবিদ মন্তব্য করেছেন: তাঁর কাহিনী সবাইকে অনুপ্রেরণা দেবে এবং সবাইকে শক্ত করবে; ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যে ও এশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করবার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করবে ("Legend will continue to inspire the people and steel them in their determination to free Asia and asia froum Imperialism") ;

নেতাজী সুভাষ বোস এবং আই-এ- এর বীরত্বের কথা দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের প্রতি শহরে ও গ্রামে আই-এন-এ'র সুভাষ বোসের বীরত্ব এবং তাঁর দেশপ্রেমের কাহিনী উদ্দীপনার সৃষ্টি করল।

আই-এন-এ'কে নিয়ে দেশে এমন তুমুল আন্দোলন শুরু হল যে, ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স বিভাগ ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক বিশেষ গোপনীয় বার্তা পাঠিয়ে সরকারকে সাবধান করলেন। তারা বললেন যে, দেশের বিপদ ঘনিয়ে আসছে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১২]। রিপোর্টে বলা হল : এর আগে কোন ঘটনাই জনসাধারণের এত দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সবাই খবরের কাগজের রিপোর্ট এবং নেতাদের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে এই ঘটনায় আগ্রহ দেখাচ্ছে। এই চিৎকার-হল্লায় কংগ্রেস প্রথম সারিতে আছে। একমাত্র মধ্যপ্রদেশে এ পর্যন্ত ১৬০টি জনসভা করা হয়েছে। প্রতিটি সভায় দাবী করা হয়েছে যে, আই-এন-এ সৈন্যদের মুক্তি দাও। অন্যান্য রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করছে। বিশেষ করে সৈন্য রিক্রুটিং এলাকায় শিখদের প্রভাব খুব বেশি এবং সেখানে সভা-সমিতিতে আই-এন-এদের মুক্তি দাবি করা হচ্ছে। হিন্দু-মহাসভা আই-এন-এ দিবস পালন করে সবাইকে আকৃষ্ট করেছে। এ সব কারণে দেশের সর্বত্রই ইংরেজ-বিদ্বেষ তীব্র হচ্ছে।

ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড পেথিক লরেন্সকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে, কংগ্রেস নেতারা সুভাষ বোসের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির' বীরত্বের কাহিনীর সুযোগ নিচ্ছে ⋯ [ওয়েভেল টু পেথিক লরেন্স, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৭৪-৩৭৫]। এমন কি কংগ্রেসের আই-এন-এ সৈন্যদের সপক্ষে বিবৃতি ও সমর্থন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে ⋯ [ক্লড অকিনলেক টু ভাইসরয়, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫৭৬-৫৭৭]।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার প্রথমে তিনজন আই-এন-এ সৈন্যের বিচার শুরু করলেন। এরা ছিলেন লেঃ গুরুবক্স সিং ধীলন ; তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল তিনি চারজন লোককে হত্যা করেছেন। ক্যাপ্টেন পি. কে. সেহ্‌গলের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ করা হল। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল যে, তিনি দুজন লোককে হত্যা করেছেন।

৫ই নভেম্বর এই লালকেল্লায় এদের বিচার শুরু হল। আর বিচার আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় গোলমাল শুরু হল।

* * *

আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হবে।

২১শে নভেম্বর (লেখকের নিজস্ব ডায়েরী থেকে—ঐদিন ধর্মতলায় হাঙ্গামার প্রত্যক্ষদর্শী লেখক রয়টার্স, এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া, বর্তমান প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্টার ছিলেন।) এক মিছিলে কলকাতার সব

ছাত্ররাই যোগ দিয়েছিল। এরা অধিকাংশই ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য।

একদিন পরে ১৯৪৫ সালের ২২শে নভেম্বর রাস্তার লোকেরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল; এর মধ্যে কিছু শিখও ছিল। পরে এই বিক্ষোভ দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। এই মিছিলের একটি নতুনত্ব ছিল যে, পুলিশকে গুলি চালাতে দেখে বিক্ষোভকারীরা একেবারেই ভয় পেল না। বরং তারা পুলিশের দিকে এগিয়ে গেল এবং তাদের উদ্দেশ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল। উত্তর কলকাতার ছাত্ররা এই ধর্মঘটের এবং মিছিল ও বিক্ষোভের ব্যাপারে (মনে রাখতে হবে যে, ঐ সময়ে সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীরা খুব বেশি ধর্মঘট কিংবা মিছিল করতে পারত না) দক্ষিণ কলকাতার ছাত্রদের মত অত পটু ছিল না।

২১শে এবং ২২শে নভেম্বর ধর্মতলা রাস্তার একদিকে ছিল ছাত্র ধর্মঘটিরা এবং অপরদিকে ছিল পুলিশ। এই পুলিশ বাহিনীর কর্তা ছিলেন মিঃ দোহা (পরে তিনি পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন)। তখন শহরের ট্রাম-বাস বন্ধ ছিল; কারণ গোলমাল তীব্র হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ পুলিশ ট্রাম-বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

২১শে নভেম্বর ধর্মতলা রাস্তায় ছাত্ররা বসে রইল একদিকে শোনা গেল ছাত্রদের চিৎকার: নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ।

রাত বারোটার পর ধর্মঘটিরা গাইতে শুরু করল কদম কদম বাড়ায়ে যা ..। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। অপরদিকে পুলিশ তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। কোন ধর্মঘটিদের তারা এগোতে দেবে না। ধর্মঘটিরা একবার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই পুলিশ গুলি চালায়। এমনি করে ২১শে নভেম্বর সারাদিন কলকাতা শহরে সাপ আর বেজির খেলা চলল।

প্রথমে কিছু কংগ্রেস নেতা এই ধর্মঘটে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা চিৎকার করে তাদের তাড়িয়ে দিল।

তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন কেসী। তিনি ভাইসরয় ওয়েভেলকে এক চিঠি লিখে বললেন: এ ধরনের ছাত্র-বিক্ষোভ এর আগে কখনও হয়নি।

পুলিশ যখন এদের উপর গুলি চালাল তখন এরা একবার পেছনে হটে গেল এবং ঠিক পরের মুহূর্তেই তারা আবার ফিরে এল।

২৩শে নভেম্বর কংগ্রেস সদস্যরা ছাত্রদের কাছে অনুরোধ করল, তারা যেন এই হাঙ্গামা বন্ধ করে।

এই হাঙ্গামায় মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭ জন এবং আহতের সংখ্যা ছিল ১৭৯ জন।

কেসী পরে আর এক চিঠিতে ভাইসরয়কে জানালেন যে, কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর এবং আই-এন-এ'র সমর্থনে কলকাতার এই ছাত্র-বিক্ষোভ ইংরেজ সরকার কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বিচলিত করল।

গান্ধীজি বোম্বাই থেকে ভাইসরয়ের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখে জানালেন, আমি এইসব সৈন্যদের (আই-এন-এর) বীরত্বে এবং দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়েছি।

'আজ বিচারের কাঠগড়ায় যারা দাঁড়িয়েছে ভারত তাদের শ্রদ্ধা এবং পুজো করে। এদের নিয়ে কী করা হবে সেই নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না; কিন্তু যা করা হচ্ছে সেইটে আমি অনুমোদন করি না....'

* * *

অথচ নেহরু এবং কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধকালীন সময়ে নেতাজী কিংবা আই-এন-এর নীতিকে কখনই সমর্থন করেননি; বরং বিরোধিতা করেছিলেন।

বিয়াল্লিশ সালে এবং পরে প্রথম যখন আই-এন-এ ও নেতাজীর কাহিনী নেহরু শুনতে পেয়েছিলেন তখন এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন: তিনি সমস্ত শক্তি দিয়ে সুভাষ বোস এবং আই-এন-এ'দের বিরোধিতা করবেন; কারণ আই-এন-এ জাপানীদের হাতে কলের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়·· (নেহরুর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক প্রেস-কনফারেন্স, ১৩ই এপ্রিল ১৯৪২ সাল, ন্যাশনাল হেরাল্ড)।

আর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালে নেহরু কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে বর্মা মালেশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সব দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐসব দেশে যাবার আগে তিনি ভাইসরয়কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ওখানে গিয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন না, কিংবা কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবেন না। যদিও নেহরুর সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করবার প্রবল ইচ্ছে ছিল।

ঐ সময়ে সিঙ্গাপুরে মিত্রশক্তির সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ছিলেন লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। নেহরু সিঙ্গাপুরে লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেনের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরেই নেহরুর লেডি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সর্বপ্রথম আলাপ-পরিচয় হল। এয়ারপোর্টে লর্ড লেডি মাউন্টব্যাটেন এসে নেহরুকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সিঙ্গাপুরে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সমাধিস্তম্ভ। কথা ছিল, নেহরু ঐ সমাধিস্তম্ভে ফুল দেবেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন।

তাঁর ইচ্ছে নয় নেহরু আই-এন-এর ঐ সমাধিস্তম্ভে গিয়ে কোন ফুল দেন।

কারণ তাহলে আই-এন-এ'কে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছানুযায়ী নেহরু প্রকাশ্যে ঐ সমাধিস্তম্ভের কাছে গেলেন না; কিন্তু পরে তিনি লুকিয়ে গিয়ে সমাধিস্তম্ভে ফুলের মালা দিলেন ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-৩১০]।

কিন্তু এই আই-এন-এ'কে কেন্দ্র করে যে-দেশে জনমত গড়ে উঠেছিল নেহরু কিংবা কংগ্রেস সেই জনমতকে অবজ্ঞা করতে পারলেন না।

ব্রিটিশ সরকার যখন প্রথম তিনজন আই-এন-এ সৈন্যকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তখন তাঁদের সমর্থন করবার জন্যে কংগ্রেস দেশের বিখ্যাত কয়েকজন আইনজীবীদের নিয়ে এক কমিটি গঠন করল। এই কমিটির সদস্য ছিলেন স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাশনাথ কাটজু, জওহরলাল নেহরু এবং আসফ আলি।

৫ই নভেম্বর ১৯৪৫ সালে বিচার শুরু হল। ব্রিটিশ সরকার এই তিনজন আই-এন-এর সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং হত্যাকাণ্ড করেছেন।

বাদীপক্ষ তিরিশজন সাক্ষী তলব করলেন। বিবাদীপক্ষ বারোজন সাক্ষী ডাকলেন। বিবাদীপক্ষ এই বিচারের বিরোধিতা করে বললেন যে, আইনের দিক থেকে ইংরেজ সরকারের বিচার করবার কোন অধিকার নেই। এছাড়া আই-এন-এ'র সৈন্যরা অন্তর্বর্তীকালীন আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বাহিনীর সদস্য হিসাবে তাঁরা এই যুদ্ধ করেছেন এবং এই কারণে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এ্যাক্ট অনুযায়ী এদের বিচার করা যায় না। বিবাদীপক্ষ আরও বললেন যে, আই-এন-এ সৈন্যবাহিনী জাপানীদের কলের পুতুল ছিল না। এর প্রমাণস্বরূপ বলা হল যে, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপের কর্তৃত্ব আই-এন-এ'র হাতে ছিল। এ-ছাড়া আজাদ-হিন্দ-সরকার একটি চলতি সরকার ছিল এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এদের যুদ্ধ করবার অধিকার ছিল। সাক্ষী দেবার জন্যে বাদীপক্ষ পাঁচজন জাপানী সাক্ষী পেশ করল। এদের মধ্যে ফুজিয়ারা জেনারেল কাটাকুরা এবং তাদাসুও ছিলেন।

আই-এন-এ'কে নিয়ে যখন দেশে তুমুল হাঙ্গামা চলছিল তখন ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন হরি সিং ভাদোয়ার জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি পরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জেনারেল হয়েছিলেন। তিনি গিয়ে বিবাদীপক্ষের ব্যারিস্টার এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্য আসফ আলির সঙ্গে দেখা করলেন এবং অনুরোধ করলেন, কংগ্রেস যেন আই-এন-এ'র পক্ষ হয়ে কোন ওকালতি না করেন। এর জবাবে আসফ আলি

বললেন: নেহরু বলছেন আই-এন-এ'র সৈন্যরা একেবারে নির্দোষ ছিলেন না। আই-এন এর পক্ষ নিয়ে কোর্টে লড়বার আগে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি তাঁকে (আসফ আলিকে) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন দেশ ঘুরে জনমতকে যাচাই করেন। আসফ আলি ভারতের সর্বত্র দাক্ষিণ থেকে উত্তর ভারতের সব এলাকা ঘুরে জনগণের মত জানবার চেষ্টা করেছেন এবং সবাই একবাক্যে বলেছে, আই-এন-এ সৈন্যদের যেন কোন শাস্তি না দেওয়া হয়, তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। জনগণের এই উত্তেজিত মনভাবকে যাচাই করে কংগ্রেস বর্তমান এই নীতি অর্থাৎ আই-এন-এ'কে সমর্থন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আসফ আলি ক্যাপ্টেন ভাদোয়ারকে বললেন, কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় থাকত তাহলে তারা অবিলম্বে আই-এন-এর সৈন্যদের সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত করত, দরকার হলে কোন কোন আই-এন-এ সৈন্যের বিচারও করা হত। এবং ভবিষ্যতে যদি তারা (কংগ্রেস) ক্ষমতা পায় তাহলে তাদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। শুধু তাই নয় আসফ আলি আরও বললেন, বর্তমান সরকার আই-এন-এ সৈন্যদের বিচার স্থগিত রাখলেও কংগ্রেস নেতারা ভবিষ্যতে এদের বিচার করবে।

আসফ আলি ক্যাপ্টেন ভাদোয়ারকে আরও বললেন যে, কংগ্রেসের আই-এন-এর প্রতি এই মনোভাব যেন কমাণ্ডার ইন চীফ ক্লড আকিনলেককে জানান হয়। ভাদোয়ারের কাছে আসফ আলি স্বীকার করলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার দরুন কংগ্রেস আই-এন-এর প্রতি কোন বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করতে সাহস করবে না। শুধু রাজনীতির সুবিধের কথা চিন্তা করেই কংগ্রেস আই-এন-এর সপক্ষে এই নীতি গ্রহণ করেছে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৭]।

কিছুদিন পরে ভাইসরয় ওয়েভেল পেথিক লরেন্সকে এক চিঠি লিখে জানালেন, নেহরুর আই-এন-এর জয়ধ্বনি দেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে বিশ্বাস করেন, নেহরু আই-এন-এ'কে তাঁর নিজের প্রচার কাজের জন্যে ব্যবহার করবেন [তারিখ ১৫ই অক্টোবর, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড]।

* * *

লালকেল্লার বিচার শুরু হবার পর ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলের সদস্য জে. পি. শ্রীবাস্তব ভাইসরয়কে অনুরোধ করলেন, আই-এন-এ'র সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে-বিচার শুরু করা হয়েছে সেই বিচার যেন স্থগিত রাখা হয়।

লালকেল্লার বিচার শুরু হবার পর সর্বপ্রথম নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের

ব্রিটিশ গভর্নর স্যর জর্জ ক্যানিংহ্যাম ভাইসরয়কে এক চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানালেন, অবিলম্বে এই বিচার যেন স্থগিত রাখা হয়। আপনি কম্যাণ্ডার ইন চীফকে এই বিচার বন্ধ করতে বলুন এবং তাঁকে অনুরোধ করুন, ভবিষ্যতে যেন আর কোন আই এন-এর বন্দীদের বিচার না করা হয়। প্রতিদিন এই ঘটনা ভারতীয় বনাম ইংরেজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা প্রতিদিনই ভারতীয় বন্ধুদের হারাচ্ছি, অতএব সময় থাকতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কমানো দরকার।

স্যর জর্জের এই চিঠির জবাবে লর্ড ওয়েভেল লিখলেন যে, ভবিষ্যতে আর কোন আই-এন-এ সৈন্যের বিচার করা হবে না। তবে বর্তমানে তিনজন আই-এন-এ'র সৈন্যদের বিচার করা হবে ['ভাইসরয় জার্নাল', সম্পাদনা : পেনরেল মুন ছে, পৃষ্ঠা—১৮৮-১৮৯]।

* * *

লালকেল্লার এই বিচারে সর্বপ্রথম নেতাজী বোসের দেশপ্রেমের, তাঁর স্বার্থত্যাগের কাহিনী প্রকাশিত হল। এর কিছুদিন পরে চীনের প্রাক্তন রাজধানী নানকিং থেকে তদানীন্তন ভারতীয় রাজদূত কে. পি. এস. মেনন নেহরুকে এক চিঠি লিখে জানালেন:—

সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বত্র সুভাষ বোসের নাম ছড়িয়ে আছে। তিনি এই এলাকার লোকদের মাটি থেকে মানুষ করেছেন [Twilight in China K P. S Menon, page 179]।

বিচারের রায় কী হবে কারুর অজানা ছিল না। বিচারের রায়ে তিনজন আই-এন-এ সৈন্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হল।

কম্যাণ্ডার ইন চীফ ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক তাঁর সামরিক ও বেসামরিক পরামর্শ দাতাদের নিয়ে এক বৈঠক করলেন এবং আলোচনা শুরু করলেন, অন্যান্য আই এন-এ সৈন্যদের বিচার করা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা।

এই আলোচনা থেকে জানা গেল যে, অধিকাংশ ভারতীয় সেনাবাহিনীরা আই-এন-এদের প্রতি দয়া দেখাবার পক্ষপাতি এবং তারা ভবিষ্যতে এই ধরনের কোন বিচার করবার বিরোধী।

অতএব বৈঠকে ঠিক করা হল যে, একমাত্র খুনের অপরাধ ছাড়া আর কোন বিচার করা হবে না ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৭৩০-৭৩১]।

প্রথমে ওয়েভেল ও অকিনলেক তিনজন আই-এন-এ বন্দী শাহ নওয়াজ খান, ধীলন এবং সেগলের মুক্তি দেবার সপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু পরে দেশের বিভিন্ন নেতাদের এবং জনগণের চাপে পড়ে তাদের মুক্তি দেওয়া হল।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, নেহরু কি আই-এন-এ'দের প্রতি সদয় ছিলেন। সুভাষ বোস এবং আই-এন এর প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। নেহরু মন্ত্রী হবার পর কেন্দ্রীয় সংসদে মুসলিম লীগের সদস্যরা সবাই আই-এন-এ সদস্যদের মুক্তির দাবী করলেন। নেহরু এই দাবীর প্রতিবাদ করে বললেন যে, আই-এন-এর মধ্যে ভাল খারাপ এবং উদাসীন সব চরিত্রের লোকই আছে ['মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন', এ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন, পৃষ্ঠা-৫৩]।

এই ব্রিটিশ সময়ের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, দমদমে রয়াল এয়ারফোর্সের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের বিদ্রোহ। রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার-ফোর্সের কিছু কর্মচারির অনশন এবং সর্বশেষে যে-ঘটনা ব্রিটিশ সরকারকে বিশেষ বিচলিত করে তুলল সেইটি হল, বোম্বাইতে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ।

রয়াল এয়ারফোর্সের কিছু ইঞ্জিনিয়ার তাদের সেনাবাহিনী থেকে মুক্তির দাবী করল। পরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কিছু সদস্যের মধ্যস্থতায় তারা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করল। কিন্তু বোম্বাইতে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ভারত সরকারকে বিশেষ বিচলিত করে তুলল। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড থেকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন এসে পৌছেছিল। বিদ্রোহের এই ঘটনা তাদের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

কতগুলি বিশেষ গুরুতর অভিযোগের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে 'তলোয়ার' নৌবাহিনীর সিগন্যাল স্কুলের কিছু ভারতীয় নৌ-সেনারা বিদ্রোহ শুরু করল।

তাদের নালিশের মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল—ইংরেজ কম্যাণ্ডারের আচরণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ এবং মাইনে ও অন্যান্য সুখ-সুবিধের দাবী করা হল।

বিদ্রোহের প্রথম দিনে 'তলোয়ারের' নৌসেনারা ক্যাসেল ব্যারাক থেকে বাইরে চলে গিয়ে বোম্বাই'র ফোর্ট ব্যারাকে আশ্রয় গ্রহণ করল। পরে এই দুই ব্যারাকের নৌসেনারা তলোয়ারের নৌসেনাদের প্রতি তাদের সহানুভূতি জানাল। ইতিমধ্যে পুলিশ এই বিদ্রোহের সমাধান করবার জন্যে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হল এবং ব্যাপার আরও গুরুতর হল। নৌবাহিনীর বিদ্রোহী সেনারা এক ট্রাকে করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। বলা দরকার, নৌবাহিনীর সেনারা কোন শক্তি প্রয়োগ কিংবা অপ্রিয় কিছু করেনি। শুধু তারা কম্যাণ্ডার এবং নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষের যে-কোন আদেশ স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করে। নৌবাহিনীর সেনারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা নিয়ে রাস্তায় ঘুরেছিল। বলা যায়, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এই বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল না।

ভারত সরকার নৌবাহিনীর এই বিদ্রোহকে এক বড় রকমের 'বিদ্রোহ' বলে বর্ণনা করল। [It was a mutiny of a considerable scale.....স্টার কোনভিল গর্ভনর অব বোম্বে টু লর্ড ওয়েভেল, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬, ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৮১]।

অতএব এই বিদ্রোহকে দমন করবার জন্যে সরকার ইংরেজ নৌবাহিনীর সেনাদের তলব করল। ইতিমধ্যে বোম্বাই এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর সেনারা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি জানাল।

নৌবাহিনীর কর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, বিদ্রোহী সেনারা ফোর্ট এবং ক্যাসেল ব্যারাক ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। অতএব সরকার ঠিক করল যে, এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে সমস্ত বল প্রয়োগ করবে এবং বিদ্রোহীদের দরকার হলে জোর করে গ্রেপ্তার করা হবে। প্রথমে সরকার লাউড স্পীকার মারফৎ বিদ্রোহী নৌসেনাদের বিকেল সাড়ে তিনটের মধ্যে ব্যারাকে ফিরে আসবার আদেশ দিল। বলা হল, কেউ যদি এই আদেশ অমান্য করে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। এই সময়ে ক্যাসেল ব্যারাকের কিছু ভারতীয় নৌসেনারা বেড়িয়ে আসবার চেষ্টা করলে ইংরেজ সামরিক বাহিনী তাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করল।

ক্যাসাল ব্যারাকের বিদ্রোহী সেনারা এর পাল্টা জবাব দিল। পরে আর একটি ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছ থেকে এক প্রাপ্ত খবরে জানা গেল, যদি সরকার ক্যাসেল ব্যারাকের চারপাশ থেকে তাদের প্রহরী তুলে না নেয় তাহলে গোলমাল আরও বাড়বে। এরপর ক্যাসেল ব্যারাক থেকে ইংরেজ সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেওয়া হল এবং মীমাংসার আলোচনা শুরু হল। ভাইসরয় এবং অকিনলেক সর্বপ্রকার মীমাংসার বিরোধী ছিলেন ['ভাইসরয় জার্নাল', পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা-২১৬]। ইতিমধ্যে ভারত সরকার ঠিক করেছিল যদি কোন মীমাংসা না হয় তাহলে রয়াল এয়ারফোর্সের বোমারু বিমান বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহীদের উপর বোমা বর্ষণ করা হবে। এই কাজের জন্যে কিছু বোমারু বিমান বাহিনী সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে মজুত রাখা হল।

এ ছাড়া দুই ব্যাটেলিয়ান বৃটিশ সৈন্যবাহিনী মজুত রাখা হল।

নৌবাহিনীর এই বিদ্রোহ প্রথমে বোম্বাই শহরের রাজনীতির উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করেনি। কংগ্রেস নেতারা নেহরু ও প্যাটেল দুজনেই এই নৌ-বিদ্রোহের বিরোধী ছিলেন।

তবে কিছু বামপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে অরুণা আসফ আলি

সরকারের নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে বিদ্রোহীদের সমর্থন জানাল।

নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ অব্যবহিত পরে বোম্বাই-এর জনগণের উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ২১শে-২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এর শহরবাসীরা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে শহরে হরতাল পালন করল। এই হরতাল ও আন্দোলনে ছাত্ররাও যোগ দিয়েছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এর সাহেব পাড়ায় গোলমাল শুরু হল। দুপুর নাগাদ হাঙ্গামা সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ২৩শে নৌবাহিনীর বিদ্রোহ শেষ হবার কোন চিহ্ন দেখা দিল না। শহরের অবস্থার কোন উন্নতি হল না। বরং হরতাল-গোলমাল ছিল এবং তা' বাজার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। ২৫ তারিখে অবস্থার উন্নতি হল।

হিসেব করে জানা গিয়েছিল, এই গোলমাল-হাঙ্গামায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ২২৮ এবং আহতদের সংখ্যা ১০৪৬এর বেশি।

নেহরু ও প্যাটেল দুজনেই গোলমাল বন্ধ করতে বোম্বাই গিয়েছিলেন, কারণ ঐ মুহূর্তে গোলমাল-হাঙ্গামা করে তারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন ঝগড়া-বিবাদ করতে চাননি। সরকার প্রথমে ঠিক করেছিল যে, নৌ-বিদ্রোহের সেনাদের বিচার করা হবে, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন গুরুতর ছিল যে, কোন সামরিক বিচার করা সম্ভব হল না। আই-এন-এর সেনাবাহিনীর বিচার করতে গিয়ে যে 'কেলেঙ্কারী' হয়েছিল সেই কথা স্মরণ রেখে ভাইসরয় সমস্ত ব্যাপারটি ধামাচাপা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন ['ভাইসরয় জার্নাল', সম্পাদনা: পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা—২৮১ ও ২৯৬, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠ-১০৮১]।

দেশের চারদিকে আই-এন-এর সৈন্যদের নিয়ে যে আন্দোলন ও মিছিল হচ্ছিল তার জনপ্রিয়তা দেখে ভাইসরয় ও কম্যাণ্ডার ইন-চীফ তাদের মনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। তারা বুঝতে পারলেন কংগ্রেস আই-এন-এ'র সৈন্যদের এবং আই-এন-এ'র জনপ্রিয়তাকে তাদের নিজের কাজে ব্যবহার করছে। তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারলেন যে, আই-এন-এ'র 'দেশপ্রেম' সংক্রামক ব্যাধির মত সৈন্য এবং পুলিশবাহিনীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। একদিন ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলের কাছে ইনটেলিজেন্স দপ্তরের কর্তা ক্র্যাকনেল এক বিশেষ গোপনীয় স্মারকলিপি পাঠালেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫১২-৫১৬]। এই স্মারকলিপিতে তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক 'ভয়াবহ' এবং 'আশঙ্কাজনক' ছবি এঁকেছিলেন।

ক্র্যাকনেলের এই গোপনীয় স্মারকলিপিতে বলা হল যে, আই-এন-এ'র সৈন্যদের বিচার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী বন্দীদের মুক্তির দাবী করে

এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু হয়েছে। এর চাইতে বড় রাজনৈতিক আন্দোলন এর আগে কখনও হয়নি……এই আন্দোলন সব ধর্মের লোকেদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছে…। এই আন্দোলনের নেতারা তাদের দাবীতে বলেছিল যে, আই-এন-এ'র সৈন্যরা ছিল 'দেশপ্রেমিক' এবং দেশের স্বাধীনতার জন্যেই তারা আই-এন-এ'তে যোগ দিয়েছিল। এদের কোনপ্রকার শাস্তি দেওয়া অনুচিত হবে। স্মারকলিপিতে আরও বলা হল, আই-এন-এ'র সৈন্যদের উপস্থিতির দরুন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে পারে।…অতএব আই-এন-এ'র কাজকর্মের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যেন আন্দোলনের বীজ দেশের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে না পড়তে পারে।

ক্র্যাকনেলের এই রিপোর্ট পাবার পর ভারত সরকার এবং ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ সরকার বিশেষ চিন্তিত হল। অতএব ইংল্যাণ্ড-এর নতুন শ্রমিক সরকার চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করল ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কী করে করা যায়?

এই সময়ে একদিন লণ্ডনে গান্ধীজি-র ভক্ত শ্রীমতী রাজকুমারী অমৃত কাউর গিয়ে ব্রিটিশমন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করলেন। দেশের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে অবিলম্বে ভারতে এক পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন পাঠান হক, অমৃত কাউর বললেন। রাজকুমারী অমৃত কাউরের এই প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে নিল এবং ভারতে এক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

এই পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশনের আগমন দেশে কোন চাঞ্চল্য কিংবা আলোড়ন সৃষ্টি করল না। দেশ ঘুরে বেড়াবার পর পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশনের সদস্যদের মধ্যে কিছু সদস্য প্রেসের কাছে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে এক বিবৃতি দিলেন: যে দেশের যেখানেই তারা গিয়েছেন সেখানেই তারা শুনেছেন যে, দেশের মুসলমানেরা পৃথক এক স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র চায়। তাদের এই 'দাবীকে' অগ্রাহ্য করা যায় না ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪]।

পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশনের ব্যর্থতার পর ব্রিটিশ সরকার ঠিক করল যে, তারা ক্যাবিনেটের তিনজন গণ্যমান্য সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, ভি. আলেকজাণ্ডার এবং পেথিক লরেন্সকে ভারতে পাঠাবেন। তাদের এই 'ডেলিগেশন'কে 'ক্যাবিনেট মিশন' বলা হল। এই ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী এক বক্তৃতায় বললেন যে: ভারত তার ভবিষ্যৎ সংবিধান নিজে রচনা করবে……যদি তারা

কমনওয়েলথে থাকে তাহলে তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ীই থাকবে।... যদি স্বাধীন হতে চায় তাহলে আপত্তি করবার কিছু থাকবে না।

এই ক্যাবিনেট মিশন দুইটি প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীতে এসেছিল। একটি ছিল যে, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলকে অন্তর্বর্তীকালের জন্যে এক সম্মিলিত সরকার হিসাবে গঠন করা হবে। দ্বিতীয়ত, সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান রচনা করবার জন্যে এক কমিটি গঠন করা হবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্রথমে তিন স্তরের এক প্রস্তাব করল। বলা হল, প্রথম স্তরে থাকবে কেন্দ্রে এক সরকার। এই কেন্দ্রের সরকারের কাছে বিদেশ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কম্যুনিকেশন মন্ত্রণালয় থাকবে। তার জন্যে সংসদ এবং এক্সিকিউটিভ থাকবে।

আর এক প্রস্তাবে প্রদেশগুলিকে দুই শাখায় (গ্রুপ) ভাগ করা হল। প্রথম শাখায়, যেখানে হিন্দুরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর এক শাখা যেখানে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা (দুই শাখা) যে বাকি প্রাদেশিক বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসন করতে চায় সেই প্রশাসনের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হবে। নৃপতিশাসিত প্রদেশগুলি অর্থাৎ রাজা-মহারাজাদের রাজ্যগুলিকে সংবিধানে কী স্থান দেওয়া হবে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই ছিল ক্যাবিনেট মিশনের তিন স্তরের প্ল্যান।

লণ্ডন থেকে রওনা হবার আগে ক্যাবিনেট মিশন 'পাকিস্তান' প্রস্তাবটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। যদিও তারা প্রকাশ্যে 'পাকিস্তান' গঠন নিয়ে কোন প্রস্তাব করল না তবে তাদের প্রস্তাবে 'পাকিস্তানের' কিছু চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল। আমরা 'সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুদের' দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং আমরা চাই সংখ্যালঘুরা যেন নিরাপদে বসবাস করতে পারে। কিন্তু আমরা চাইনে যে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হোক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তার এক বেতার বক্তৃতায় এই কথাই বলেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাবে কংগ্রেস খুশি হল এবং মুসলিম লীগ ক্রুদ্ধ হল।

১৫ই মার্চ ক্যাবিনেট মিশন এক প্রস্তাবে বলল: **We are therefore unable to advice the British Government that the power which at present resides in British hands should be handed over to two entire separate sovereign States.** ['ভাইসরয় জার্নাল', সম্পাদনা : পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা- ৪৭৪]।

এই প্রস্তাব করবার পর ক্যাবিনেট মিশন দিল্লীর গ্রীষ্মের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কাশ্মীরে চলে গেল। কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে সিমলাতে

ক্যাবিনেট মিশন, লীগ, কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

নেহরু, আজাদ, প্যাটেল, আবদুল গফর খান ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং লীগের প্রতিনিধি ছিলেন জিন্না, লিয়াকৎ আলি, আবদুর রব নিষতার। আলোচনার পর প্রস্তাবের দু'চারটে ছোটখাটো অদল-বদল করা হল। কিন্তু মৌলিক প্রস্তাবের কোন অদল-বদল করা হল না। কংগ্রেস দাবী করল, প্রথমে কেন্দ্রের সংবিধান রচনা করা হোক; কিন্তু লীগ বলল গ্রুপের সংবিধান আগে তৈরি করা হোক। কংগ্রেস গ্রুপের স্বেচ্ছামূলক বিষয়গুলির উপর জোর দিল, কিন্তু লীগ বলল ঐ বিষয়গুলি হল 'বাধ্যতামূলক'। কংগ্রেস বলল কেন্দ্রের কর আদায় করবার অধিকার থাকবে, কিন্তু লীগ আপত্তি করল। এই আপত্তির কারণবশত কোন মীমাংসা সম্ভব হল না।

এরপর ক্যাবিনেট মিশন তার নিজের সুপারিশ দুইটি অংশে বিভিন্ন দলের কাছে পেশ করল এবং ১৬ই জুন সাময়িককালের জন্যে সরকার গঠনের প্রস্তাব করল। প্রথম প্রস্তাবে বলা হল যে, ভারতের জন্যে সংবিধানকে তিন অংশে ভাগ করা হবে। এক, (ক) এক অংশ হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বেলুচিস্থান। দুই, (খ) বাংলা এবং আসাম এবং তিন (গ) ভারতের বাকি অংশ। এই বিভিন্ন অংশ এক হয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করবে। পরে প্রদেশ এবং গ্রুপ তাদের সংবিধান রচনা করবে। এছাড়া যে কোন প্রদেশ নতুন সংবিধান কার্যকরী হবার ছয়মাস পরে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্যত 'পাকিস্তান' পরোক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হল।

অপরদিকে কংগ্রেসকে কিছুটা বিভক্ত, কিছুটা অখণ্ড ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দেওয়া হল। নৃপাত শাসিত রাজ্যে অর্থাৎ রাজা-মহারাজাদের বলা হল যে, নতুন সংবিধান কার্যকরী হবার পর 'প্যারামাউন্টসি' অর্থাৎ ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে তাদের যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তির অবসান হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই রাজা-মহারাজাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করা হল।

মুসলিম লীগ ক্যাবিনেটের এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিল। কারণ ক্যাবিনেট মিশনের এই প্রস্তাবে পাকিস্তানের রূপরেখা ছিল। (এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসার আগে সেক্রেটারী অব ষ্টেটস পেথিক লরেন্সের সেক্রেটারী মিঃ টার্নবুল পাকিস্তানের উপর একটি স্মারকলিপি তৈরী করেছিলেন)।

টার্নবুল ভারতে আসবার পর এই স্মারকলিপির খসড়া করে ক্যাবিনেট মিশনের দুই সদস্য, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস এবং এ. ভি. আলেকজাণ্ডারকে দিয়েছিলেন। এই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল যে, দুইটি পাকিস্তান গঠন করা হবে। প্রথম অংশে থাকবে পাঞ্জাব এবং ঐ অঞ্চলের অংশগুলি, দ্বিতীয় অংশে থাকবে বাংলা এবং আসামের যে-অংশ পাকিস্তান হবার উপযুক্ত। অর্থাৎ স্মারকলিপিতে আরও বলা হল যে, এই পাকিস্তান গঠন করা চলে যে নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অসুবিধে দেখা দেবে এবং সরকারের খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া কলকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, এ হল জটিল এবং বিতর্কের বিষয়। যদি পূর্ব পাকিস্তানকে কলকাতা না দেওয়া হয়; তাহলে পূর্ব পাকিস্তান খুব গরীব দেশ হবে।

টার্নবুল তার স্মারকলিপিতে বলেছিলেন যে, সুরক্ষার দিক থেকে দেখলে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিশেষ দুর্বল হবে। রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করা খুব কঠিন কাজ হবে অতএব এই আক্রমণের (রাশিয়ার) হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পাকিস্তানকে এক শক্তিশালী মিত্র কিংবা ভারতের সাহায্য নিতে হবে। ভারতের নিজের স্বার্থের দিক থেকে চিন্ত করেই পাকিস্তানকে সাহায্য করা আবশ্যক,.. যদি পাকিস্তানকে অন্য কোন শক্তি দখল করে নেয় কিংবা সাহায্য করে তাহলে ভারত বিপদগ্রস্ত হবে।

টার্নবুলের এই স্মারকলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, পাকিস্তান সম্বন্ধে টার্নবুল যে মন্তব্য করেছিলেন তার প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫১]।

এবার মুসলিম লীগ দাবী করল যে, গ্রুপিংকে বাধ্যতামূলক করা হোক। কিন্তু কংগ্রেস বলল যে, কোন প্রদেশ তার ইচ্ছানুযায়ী গ্রুপে যোগ দিতে পারবে। এ ছাড়া কংগ্রেস সংবিধান সভা গঠনের উপর বিশেষ জোর দিল।

এরপর অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্যে এক সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

নেহরু ভাইসরয়ের কাছ থেকে দাবী করলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্যাবিনেট 'ডোমিনিয়ন' সরকারের মত কাজ করবে। ওয়েভেল এই ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হলেন না। তবে তিনি এই নতুন সরকারকে অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা দিতে রাজি হলেন। জিন্না মন্তব্য করলেন যে, ভাইসরয়ের এই নতুন ক্যাবিনেট পুরাতন কৌন্সিলের আর একটি রূপ হবে; অর্থাৎ কোন পরিবর্তন হবে না।

এই অচল অবস্থার সমাধান করবার জন্যে ক্যাবিনেট মিশন আর এক প্রস্তাব করল। ১৬ই জুন এক প্রস্তাবে বলা হল যে, ভাইসরয়ের নতুন এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলে ছয়জন হিন্দু সদস্য ও পাঁচজন মুসলিম সদস্য থাকবে। এ ছাড়া একজন হবেন তপশীলি জাতের অন্তর্ভুক্ত, এবং তিনজন হবেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, একজন শিখ, একজন ক্রিশ্চিয়ান এবং আর একজন হবেন পার্শী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে জিন্নার জয় হল। যদিও ভাইসরয় কংগ্রেসকে কথা দিয়েছিলেন কংগ্রেসের একজন 'জাতীয়তাবাদী' মুসলমান 'নয়োগ করবার ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু পরে কংগ্রেসকে 'জাতীয়তাবাদী' মুসলমানকে নিয়োগ করবার কোন ক্ষমতা দেওয়া হল না। লীগকে মনোনীত পাঁচজন মুসলমান সদস্য নিয়োগ করবার ক্ষমতা দেওয়া হল।

এরপর প্রশ্ন শুরু হল, কংগ্রেস কি এই অবস্থায় ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে? গান্ধীজি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তার আপত্তির কারণ ছিল যে, তপশীলিদের হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হয়নি। তবে কংগ্রেসের সদস্যরা গান্ধীজির এই মতের সঙ্গে একমত হলেন না। এইসব ✓ মিলিয়ে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালের সরকার গঠনের বিরোধিতা করল। এছাড়া সংবিধান রচনা সমিতি গঠনের কিছু আপত্তিকর ধারার বিরোধিতা করা ছাড়া কংগ্রেস প্রস্তাবটি গ্রহণ করল।

* * * * *

কিন্তু এই ক্যাবিনেট মিশনের এই দেশে আসবার ঠিক কিছু আগে এবং ১৯৪৫ সালের শেষভাগে পরের কিছু ঘটনা ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ ইনটেলিজেন্স দপ্তরের কর্নেলের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গঠিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' এবং নেতাজীর দেশপ্রেমের কাহিনী দেশের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ভাইসরয় এবং কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ক্লড অকিনলেক এই প্রভাবের কথা স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের রিপোর্টে বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন (বহু ইংরেজ ঐতিহাসিক আই-এন-এ এবং বোম্বাই'র নৌবাহিনীর বিদ্রোহের পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর যে-প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার উপর গুরুত্ব দেননি)। কিন্তু ভাইসরয় এবং কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ তাদের রিপোর্টে স্বীকার করেছিলেন যে, আই-এন-এ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং এর দরুন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দ্বারা দেশে কোন বিদ্রোহ কিংবা হাঙ্গামা হলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দ্বারা দমন করা যাবে না। কয়েকজন মুষ্টিমেয় ইংরেজ সরকারী

কর্মচারীদের নিয়ে ইংরেজ সরকার এই দেশ শাসন করত। কিন্তু তাদের এই দেশশাসন করবার পেছনে প্রধান বল ছিল, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশ-বাহিনী। অতএব সৈন্যবাহিনী দুর্বল হলে ঐ সৈন্যবাহিনী হয়ত ঠিক বিপরীত কাজ করবে। এছাড়া লালকেল্লায় তিন আই-এন-এ'র বিচার শুরু হবার পর দেশের সর্বত্র এক আই-এন-এ'র আবহাওয়া বইতে শুরু করেছিল। কারণ আই-এন-এ'র আবহাওয়া প্রথমে এক টুকরো কালো মেঘের মত কলকাতার আকাশে দেখা দিয়েছিল এবং পরে সেই আবহাওয়া ঝড় ঘূর্ণিপাক হয়ে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পরতে লাগল। প্রথমে ভাইসরয়ের কাছে নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের গভর্নর লর্ড কানিংহ্যাম এক চিঠি লিখে আই-এন-এ'র বিচারের প্রতিবাদ করলেন। তিনি দাবী করলেন যে, আই-এন-এ'র বিচার বন্ধ করা হোক।

আই-এন-এ'র প্রভাব এবং এর দরুন দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলও নজর করেছিলেন। ৬ই নভেম্বর ১৯৪৫ সালে লর্ড ওয়েভেল সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড পেথিক লরেন্সের কাছে এক বিশেষ গোপনীয় চিঠি লিখে তার মনের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ['ভাইসরয় জার্নাল', সম্পাদনা: পেন্ডেরেল মুন, পৃষ্ঠা-১৮১ ও 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৭]।

পরে লর্ড ওয়েভেল তাঁর চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে লিখলেন যে, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর (২১-২৩শে সেপ্টেম্বর) বল্লভভাই বোম্বাইতে এবং নেহরু উত্তরপ্রদেশে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই বক্তৃতার পরিণামে গোলমাল-হাঙ্গামা সৃষ্টি হতে পারে। নেহরু এবং প্যাটেল বলেছেন, কংগ্রেস ১৯৪২ সালের হাঙ্গামার জন্যে কৃতিত্ব দাবি করছেন এবং আরও বলছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ইংরেজদের দেশ থেকে বের করে দিতে পারেন মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন আপোষ মীমাংসা করতে অনিচ্ছুক এবং আই-এন-এ'র গুণ গাইছে এবং যে সব কর্মচারীরা ১৯৪২ সালের আন্দোলন দমন করতে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের বিচার করবার জন্যে এবং তাদের যুদ্ধের অপরাধী বলে শাস্তি দেবার ভয় দেখাচ্ছে।

এইসব শাসানি ও হুমকি দেবার পর তারা (কংগ্রেস নেতারা) তাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছে, তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, ব্রিটিশ সরকারকে এক চরমপত্র দেবে এবং যদি চরমপত্র গ্রহণ না করা হয় তাহলে ১৯৪২ সালের অনুকরণে কিন্তু আরও বড় রকমের এক সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করবে।

কংগ্রেস এই আন্দোলনে আই-এন-এ'কে তাদের 'শিখণ্ডী' হিসাবে ব্যবহার

করবে। তারা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে হাত করবার চেষ্টা করবে এবং তারা আশা করছে, তাদের ভয় এবং ধমকানি পুলিশের কর্মদক্ষতা ও আনুগত্যকে দুর্বল করবে। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ সরকারকে তাড়িয়ে দেওয়া। কংগ্রেস নেতারা মুখে যাই বলুক না কেন, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে সরকারি দালান, কোষাগার আক্রমণ ও লুট করবে এবং কাগজপত্র ধ্বংস করবে....

কংগ্রেস নেতারা ১৯৪২ সালের মত শাসনযন্ত্রকে পঙ্গু করবে। কিন্তু আমার মনে হয় না, কংগ্রেস নেতারা প্রাদেশিক নির্বাচন হবার আগে শাসনযন্ত্রকে জোর করে পরিবর্তন করবার কোন চেষ্টা করবে।

আমার মনে হয় না, তারা নির্বাচনে আদৌ ইচ্ছুক, তারা এই নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে তাদের দলকে নতুন করে সংগঠিত এবং পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা করবে।

আমি ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে বলতে চাই যে, আগামী বসন্তকালের মধ্যে কিংবা তারও আগে তাদের কংগ্রেসের বর্তমান শাসনতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করবার প্রচেষ্টার মোকাবিলা করতে হতে পারে। দোমনা হয়ে এই ধরনের আন্দোলনের কোন মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না এবং আমাদের কাছে দুটি পথ খোলা আছে, হয় কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করা এবং তাদের দাবীকে মেনে নেওয়া, সে দাবী যাই হোক না কেন, নতুবা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করা।....কংগ্রেসের প্রধান দাবী হবে অবিলম্বে দেশের জন্যে তাদের গঠিত এক সরকারের অধীনে স্বাধীনতা দাবী করা....দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস এই দাবী করে এসেছে....এর কোনকিছু কম হলে নেহরু কিংবা প্যাটেল সন্তুষ্ট হবেন না।

আমার মনে হয় না ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের এই ·· কি কিংবা শক্তি ব্যবহারের ধমকের কাছে নতি স্বীকার করবে, কারণ আমরা এত সহজে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে দায়িত্ব আছে সেইটে অস্বীকার করতে পারব।

অতএব আমি আশা করি না যে, আমরা কংগ্রেসের চরমপত্রকে গ্রহণ করব। আমার এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে এই আন্দোলন দমন করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই দমনের কাজ অতি নিপুণভাবে করতে হবে। আমি জানি যে এই কাজে অনেক অসুবিধে আছে। এই কাজের জন্যে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করতে হতে পারে· দেশের সর্বত্র সামরিক আইন জারী করতে হবে....এবং বহুলোককে হয় বিশেষ কোর্ট দ্বারা বিচার করে কিংবা বিনা বিচারে আটক করে রাখতে হবে....সব কিছুই অপ্রিয় কাজ ; কিন্তু এর বিকল্প হল দেশকে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দেওয়া। এখনই আমাদের

কাছে যে খবর আছে তার ভিত্তিতে আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি ব্যবহার করতে পারি। কংগ্রেস দল এখনও পুনর্গঠিত হয়নি এবং অবিলম্বে দমন করা অতি সহজ কাজ হবে। তবে আমি এখনও কোন কিছু করতে বলব না, অবশ্যি যদি নির্বাচনের গোলমালের দরুন এই কাজ করবার প্রয়োজন না হয়।

অতএব বর্তমানে আমাদের আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা করতে হবে। নিষ্ক্রিয়তার পরিণাম হল গুরুতর।

আমি বিশ্বাস করি, ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে স্পষ্ট করে বলবেন যে (১) তাঁরা ভারতের এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। (২) তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলকে শক্তি ব্যবহার করতে দেবেন না। (৩) কোন সরকারি কর্মচারী তাঁর কাজে বাধা কিংবা আক্রমণ করলে তাকে সাহায্য করবেন। এবং (৪) তাঁরা আমাকে এই নীতি অবলম্বন করবার জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ভাইসরয়ের এই চিঠি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং তাঁরা এই পরিস্থিতির বিচার করবার দায়িত্ব ব্রিটিশ চীফ অব দি স্টাফকে দিলেন। চীফ অব দি স্টাফ সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে বিবেচনা করবার আগে ভারতের সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ক্লড অকিনলেকের কাছে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন

ক্লড অকিনলেক এক টপ-সিক্রেট নোটে ভারতের সামরিক পরিস্থিতির কথা ব্রিটিশ চীফ অব দি স্টাফকে জানালেন। কিন্তু অকিনলেকের বক্তব্য ভাইসরয়ের মতামতের চাইতে আরও ভয়াবহ ছিল। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', সপ্ত খণ্ড, পৃষ্ঠা—৫০৬-৫৭৭]।

ক্লড অকিনলেক তাঁর এই টপ সিক্রেট নোটে লিখলেন: আই এন-এ'র আগমনের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়েছে, কারণ দেশের চারদিকে বিবিধ ধরনের অস্ত্র ছড়িয়ে আছে এবং আই এন-এ'র সৈন্যরা এই অস্ত্রের সাহায্য নিতে পারে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এদের সুযোগ নিতে পারে।

ক্লড অকিনলেক লিখলেন, আজকের পরিস্থিতি ১৯৪২ সালের আগস্ট ঘটনার চাইতেও গুরুতর (It on a greater scale than August 1942)।

আমরা আগামী বসন্তকালের মধ্যে দেশে এক সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লবের আগামী করতে পারি এবং এই আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ না হলেও আগামী শীতকালের মধ্যে (শীত ১৯৪৬) দেশে গুরুতর গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মোকাবিলাও করতে হতে পারে। এইসব ঘটনা বিশেষ করে সামরিক এবং পুলিশবাহিনীকে যদি তাদের সহকর্মীদের বিরোধী

কিছু করতে বলা হয় তাহলে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

অকিনলেক লিখলেন ভারতীয় সৈন্য এবং পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে বিশ্বস্ততার সাহায্য পাওয়া সম্ভব, যদি ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ঘোষণা করে যে সংবিধানের কাঠামোর ভেতর দিয়ে তারা এই দেশকে স্বায়ত্বশাসন করবার সুযোগ দেবে। এছাড়া আরও ঘোষণা করা প্রয়োজন যে, সরকার কোন সামরিক উত্থানকে সমস্ত শক্তি দিয়ে দমন করবে এবং দোষীদের সাজা দেবে।

আমরা সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে এই কাজ করবার সাহায্য পাব যদি তারা আমাদের প্রতি অনুগত থাকে। কিন্তু যদি তারা অনুগত না থাকে তাহলে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে হবে।

...(আমার মনে হয়) যদি সরকার সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীর প্রতি আস্থা না দেখাতে পারে তাহলে এদের বিশ্বস্ততা হ্রাস পাবে। অতএব ঐ সময়ে আমাদের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আছে ঐ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে কোন গোলমাল দমন করা কিংবা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। এই ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর সমস্ত পদক্ষেপ অর্থাৎ লুকিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসায় গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে) গোপন উপায়ে করতে হতে পারে।

* * *

ভাইসরয় এবং অকিনলেকের রিপোর্ট নিয়ে ব্রিটিশ চীফ অব দি স্টাফ আলোচনা করেছিলেন। পরে ঠিক করেছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে লুকিয়ে কোন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আনা খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে না। তবে তাঁরা প্রয়োজনমত দুই ব্রিগেড সেনাবাহিনী ভারতে নিকটবর্তী কোন দেশে মজুত এবং প্রস্তুত রাখবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

* * *

ভাইসরয় আইনজীবীদের একেবারে বিশ্বাস করতেন না। গান্ধীজি, নেহরু-জিন্না এরা সবাই ছিলেন আইনজীবী। এঁদের মধ্যে ভাইসরয়ের কাছে সবচাইতে অপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন গান্ধীজি, কারণ ভাইসরয়ের বক্তব্য ছিল গান্ধীজি সব বিষয়ে তার কাজে বাধা সৃষ্টি করতেন।

পরে দেখা যাবে যে, পরবর্তী ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনও গান্ধীজিকে এড়িয়ে চলতেন। লর্ড ওয়েভেল গান্ধীজির শক্তি এবং গান্ধীজি যে দেশের কোন মঙ্গল করতে চান একথায় বিশ্বাস করতেন না। এ ছাড়া তিনি (ভাইসরয়) গান্ধীজির সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত আলোচনা করা বিরক্তিজনক বলে মনে করতেন

এবং তিনি (ওয়েভেল) বহুবার অনুযোগের কণ্ঠে বলেছিলেন যে, তিনি গান্ধীজির কাছ থেকে কোন ঘটনায় কিংবা তার ইচ্ছায় স্পষ্ট জবাব পাননি।

তিনি আমার সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথা বলেছেন। কিন্তু তারপরেও আমি বুঝতে পারিনি, তিনি কী বলতে চান। তার প্রতিটি কথার দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা যায় এবং আমি যদি জানতাম, উনি কী বলতে চান তাহলে আমি নিশ্চয় খুশি হতাম।

তারপর এমন একটি সময় এল ['দি লাস্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা—১৮-১৯] যখন গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার কথা মনে হলে ভাইসরয়ের আগের রাত্রে ভাল ঘুম হত না।

তিনি আলোচনার সময় তার চেয়ারে বসে থাকতেন। ওয়েভেলের এক সেক্রেটারী লিওনার্ড মোসলেকে বলেছিলেন,····বুড়ো (গান্ধীজি) যখন একটানা কথা বলে যেতেন তখন ওয়েভেলের চোখে-মুখে অস্বস্তির হাব-ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠত। তিনি পেন্সিল দিয়ে কাগজে লিখতেন এবং মাঝে মাঝে বলতেন, তাই নাকি ?

* * *

ইতিমধ্যে দেশে পাকিস্তান প্রস্তাবটি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। ১৯৪০ সালে লাহোর মুসলিম লীগের অধিবেশনে ফজলুল হক যে-প্রস্তাবটি লীগের অধিবেশনের সামনে রেখেছিলেন সেই প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটির সঙ্গে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থাৎ ফজলুল হকের এই প্রস্তাবে দুইটি পাকিস্তান, একটি পশ্চিম ভারতের এলাকায় এবং আর একটি পূর্বে গঠন করবার দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু যখন এই পাকিস্তান প্রস্তাবটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের তর্কবিতর্ক হচ্ছিল তখন কংগ্রেস নেতারা এই বিষয়টি নিয়ে কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা কিংবা পাকিস্তান গঠন হলে দেশে রাজনৈতিক সুবিধের কথা নিয়ে কেউ কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা গবেষণা করেননি। কংগ্রেসের মধ্যে একমাত্র মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই বিষয়টি নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : আমি পাকিস্তান প্রশ্নটির বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করে দেখেছি। মৌলানা আজাদ ভাইসরয়ের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে বলেছিলেন, (পুরো স্মারকলিপি মৌলানা আজাদের লেখা 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' বইতে পাওয়া যাবে)। ভারতীয় হিসাবে ভবিষ্যৎ ভারতের উপর পাকিস্তান গঠনের কী প্রভাব এবং অর্থ হতে পারে সেইটে নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করেছি। মুসলমান হিসাবে পাকিস্তান গঠিত হলে ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যকে কীভাবে

নিয়ন্ত্রিত করবে সেই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছি। পাকিস্তান আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধু সমস্ত ভারতের জন্যে ক্ষতিকর নয়, মুসলমানদের বিশেষ অনিষ্ট করবে। পাকিস্তান কোন সমস্যা সমাধান করবার চাইতে আরও বেশি সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আমাকে বলতে হবে এই প্রশ্নটি (পাকিস্তান) আমার রুচি-বিরোধী, এই পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয় দুনিয়ার কিছু অংশ পবিত্র এবং বাকী অংশ নোংরা। এইভাবে দুনিয়াকে পবিত্র এবং নোংরা করে ভাগ করা ঐস্লামিক শিক্ষা নয় এবং এই নীতি ইসলাম ধর্মের আদর্শ-বিরোধী। ইসলাম এই ধরনের ভাগ-বাটোয়ারার বিরোধী এবং মুহম্মদ বলেছেন: আল্লা এই দুনিয়াকে আমার জন্যে এক মসজিদ হিসাবে তৈরি করেছেন। এ ছাড়া পাকিস্তান প্রস্তাবটি হল—পরাজিত মনোভাবের পরিচয়। এই থেকে প্রমাণিত হয়, মুসলমানরা ভারতে থাকতে পারে না এবং তারা একটি সংরক্ষিত জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে চায়। ইহুদিদের 'এক জাতীয় দেশের' কল্পনা সম্বন্ধে লোকের সহানুভূতি থাকতে পারে, কারণ তারা পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে আছে এবং এ ছাড়া কোন দেশের শাসন-প্রশাসনে তাদের কোন কণ্ঠস্বর নেই। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা স্বতন্ত্র, সংখ্যায় নয় কোটি, সহজাত এবং বৈশিষ্ট্যমূলক, গুণে এবং সংখ্যায় এরা ভারতীয় জীবনযাত্রার এবং প্রশাসনে এক অপরিহার্য অংশ। প্রকৃতির কোন কোন স্থানে আল্লা এদের একত্র করে বিশেষ সাহায্য করেছে।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দাবী দুর্বল এবং শক্তিহীন। মুসলমান হিসাবে ভারত আমার দেশ, তার রাজনৈতিক এবং আর্থিক জীবন রচনায় আমার যে ভূমিকা আছে সেই ভূমিকা আমি পরিত্যাগ করতে পারি না আমার কাছে পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করে সম্পত্তির এক ছোট অংশ নিয়ে থাকা 'ভীরুতার পরিচয়'।

মৌলানা আজাদ পাকিস্তানের পরিবর্তে আর একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী উন্নয়নের কাজ করবার ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

মৌলানা আজাদ বলেছিলেন, দেশে কেন্দ্রের শাসনাধীন একটি সরকার গঠন করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং এ ছাড়া ভারতকে দুভাগ করলেও সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমি এই প্রশ্নের সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখেছি যে, কংগ্রেসের ফরমূলানুযায়ী প্রদেশ এবং কেন্দ্রকে উন্নতিসাধন করবার সুযোগ দিতে হবে। আমি মনে করি, দেশে বর্তমান সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সাময়িককালের এক

অধ্যায়।…আমি বলতে চাই, ভারতের এই নয় কোটি মুসলমান হল ভারতের এক বিশেষ অংশ এবং কোন-প্রকারেই এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি উপেক্ষা করা যায় না।

* * * *

পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা এক মন-প্রাণ দিয়ে একমনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদই করেছিলেন।

১৯৪৬ সালের কংগ্রেস রাজনীতির আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে, এই বছরে কংগ্রেস নতুন সভাপতি নির্বাচন করল। এই বছর সভাপতি নির্বাচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কারণ ১৯৪০-৪১ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে কংগ্রেস নেতাদের কারাজীবনের দরুন এবং পরে দেশে নির্বাচন হবার কারণবশত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির পদটির গুরুত্ব কম ছিল; কারণ ১৯৪৭ সালে গান্ধীজিই বলতে গেলে কংগ্রেসের প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁর জীবিতকালে কংগ্রেসের সভাপতির পদটি ছিল এক 'অলঙ্কার'। গান্ধীজির পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা সভাপতির চাইতে অনেক বেশি ছিল। বলা যায় তিনি ছিলেন সুপার প্রেসিডেন্ট। এই সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।'

১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্যে তিনজন প্রার্থী ছিলেন, প্যাটেল, নেহরু এবং কৃপালিনী।' কৃপালিনী ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া সুভাষ বোস ও জয়প্রকাশের নামও প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু পরে দুটি নামই নাকচ করা হল। সুভাষ বোস কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। বস্তুত এই সময়ে তিনি মারা গিয়েছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন রাজবন্দী। ['কংগ্রেস বুলেটিন', পাঁচ নম্বর, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৬ পৃষ্ঠা-২৮]।

১৬ই মে নির্বাচনের দিন ঠিক করা হল। ঐ দিনই 'ক্যাবিনেট মিশন' তাদের 'দীর্ঘকাল মেয়াদী' প্রস্তাবটি প্রকাশ করল। এদিকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে প্যাটেল এবং কৃপালিনী তাদের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। নেহরু রইলেন একমাত্র প্রার্থী।

কিন্তু পর্দার আড়ালে আর একটি ঘটনা ঘটল। ঐ বছর প্যাটেলের সভাপতি হবার কথা ছিল। পনের বছর আগে তিনি করাচি কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং ১৯৩৬-১৯৩৭ সালে নেহরু লখনউ ও ফৈজপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এ ছাড়া পনেরটি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি সর্দার প্যাটেলের নাম প্রস্তাব করেছিল। মাত্র তিনটি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি নেহরুর নাম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এবারও গান্ধীজি এই

সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং এর দরুন প্যাটেল তার নাম নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে প্রত্যাহার করলেন। অতএব নেহরু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং বলা যায় তাঁকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হল। পরে গান্ধীজি ৬ই জুলাই ১৯৪৬ সালে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কাছে এক বক্তৃতায় স্বীকার করলেন যে, তাঁর প্রভাবে এবং নির্দেশেই নেহরুকে সভাপতি করা হয়েছিল। গান্ধীজি বললেন: আমি জওহরলালকে বলেছি যে, জাতির স্বার্থে তাঁকে কাঁটার রাজমুকুট পরতে হবে এবং তিনি রাজি হয়েছেন ['মহাত্মা', টেণ্ডুলকার, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬]। পরের দিন আজাদের কাছ থেকে কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করবার পর নেহরু বললেন, দীর্ঘ সময়ের জন্যে মনস্থির করতে পারিনি। কিন্তু গত পরশুদিন আমি গান্ধীজির এবং আমার সহকর্মীদের পরামর্শে আমি এই পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছি।

অনেকে বলতেন যে, গান্ধীজি নেহরুকে তাঁর আন্তর্জাতিক সম্মানের জন্যে বিশেষ পছন্দ করতেন। এ ছাড়া গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঐ বছরের কংগ্রেস সভাপতিই হবেন আগামীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস গোপাল, পৃষ্ঠা-৩২৬]। গান্ধীজি নিজে তাঁর এক প্রার্থনাসভায় বলেছিলেন: আজ জওহরলালের স্থান অধিকার করবার মত যোগ্য আর কেউ নেই। বিশেষ করে ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার সময়ে তিনি হলেন 'হ্যারোর' ছেলে ('হ্যারো' হল ব্রিটিশ পাবলিক স্কুল, যেখানে নেহরু বাল্যজীবনে পড়াশুনা করেছিলেন)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ও ব্যারিস্টার, যা ইংরেজের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে প্রয়োজনীয় ['মহাত্মা', টেণ্ডুলকার, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩]।

প্যাটেলের বন্ধুরা গান্ধীজির এই মতামতের উপর বেশি গুরুত্ব দেননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল নেহরুই একমাত্র সম্মিলিত যুক্ত কংগ্রেসের পক্ষ হয়ে কথা বলতে পারতেন, কারণ প্যাটেল আজাদকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। এ ছাড়া প্যাটেল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। একবার প্যাটেল নেহরু সম্বন্ধে কটাক্ষ করে বলেছিলেন: ভারতে শুধু একজন জাতীয়বাদী মুসলমান আছেন এবং তিনি হলেন নেহরু (There is only one geniunely nationlist muslim in India, Jawaherlal)।

নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবার ঠিক একমাস পরে ভাইসরয় নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে অনুরোধ করলেন। এই সময়ে নেহরুর বয়স ছিল ছাপান্ন এবং প্যাটেলের একাত্তর। প্যাটেল বয়স্ক ছিলেন এবং

['ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম', মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পৃষ্ঠা—১৪৩-১৪৪]।

সর্দার প্যাটেল নেহরুর ভুলের সমালোচনা করে বললেন: তিনি (নেহরু) নিঃসঙ্গী এবং কখনও কখনও তিনি আবেগের মধ্যেই কাজ করে থাকেন। অতএব এই ভুলকে সহ্য করে নিতে হবে, কোন বিরোধিতা করে তাকে উত্তেজিত করা উচিত হবে না, কারণ তিনি অধৈর্য [সর্দার প্যাটেল ও ভি. পি. মিশ্রের করেসপণ্ডেন্স, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৫৩-১৫৪]।

এর পরে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান ব্যর্থ হল। জিন্না লীগের কৌন্সিলে ঘোষণা করলেন: আজ থেকে আমরা 'সংবিধান অনুযায়ী' সংগ্রাম করাকে বিসর্জন দিলাম। আমরা হাতে পিস্তল নিয়েছি এবং এবার থেকে পিস্তল ব্যবহার করব। [জিন্না: ওলপোর্ট পৃষ্ঠা—২৮২-২৮৩]।

জিন্না পাকিস্তান আদায় করার জন্যে ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সাল 'ডিরেক্ট এ্যাকশন' দিবস বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন: ভারতের মুসলমানগণ ঐ দিবসকে, ডিরেক্ট এ্যাকশন দিবস পালন করে পাকিস্তান আদায় করবার চেষ্টা করবে।

এর পর শুরু হল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আলোচনা। ভাইসরয় নেহরু এবং জিন্নাকে বললেন যে, তিনি নতুন ক্যাবিনেটকে 'ডোমিনিয়ন ক্যাবিনেট' হিসাবে স্বীকার করে নিতে রাজি আছেন। নেহরু প্রথমে ভাইসরয়ের এই প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি দাবী করলেন যে, এই ডোমিনিয়ন ক্যাবিনেটর পদমর্যাদা এবং কী কী ক্ষমতা দেওয়া হবে তার ব্যাখ্যা করা হোক জিন্না কোন জবাব দেবার পরিবর্তে 'ডিরেক্ট এ্যাকশন' দিবস ঘোষণা করলেন। ভাইসরয় নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্যে কৌন্সিলের সদস্যদের নাম পেশ করতে বললেন।

১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সালে নেহরু মালাবার হিলের বাড়িতে গিয়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের মধ্যে যে মতানৈক্য ছিল নেহরু সেইটে দূর করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুই নেতার মধ্যে মতের কোনো মিল হল না। নেহরুর প্রেস সম্মেলনের বিবৃতি যে-ক্ষতি করেছিল সেই ক্ষতিকে পূরণ করবার জন্যে ওয়ার্ধাতে ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকে বলা হল যে, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সংবিধান স্কীমের পুরোটি গ্রহণ করেছে, কিন্তু লীগ এতে সন্তুষ্ট হল না। মতের মিল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ দুজনেই দুজনকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। অনেক আগে নেহরু জিন্নাকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন: জিন্নার কোন উপযুক্ত শিক্ষা নেই, অর্থাৎ তাকে শিক্ষিত বলা ঠিক হবে না। তিনি আইনের বই পড়েছেন বটে এবং এ-ছাড়া দু-চারটে গল্প-

উপন্যাসের বই পড়েছেন ; কিন্তু কোনো ভাল বই তিনি পড়েননি। জিন্নারও অসম্ভব গর্ব এবং অহংকার ছিল। তিনি নেহরুর এই উক্তির জবাবে বলেছিলেন : এক উদ্ধত ব্রাহ্মণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলে কী হবে ? আসলে তিনি হলেন এক ধূর্ত ব্রাহ্মণ। তিনি যখন কোন প্রতিশ্রুতি দেন তখন তার মধ্যে ফাঁক থেকে যায় এবং যখন তিনি তার ফাঁক ঢাকতে পারেন না তখন তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেন ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশরাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠ-৩০]।

১৬ই আগষ্ট বোম্বাইতে জিন্না-নেহরুর আলোচনা ব্যর্থ হল, কিন্তু ঐদিনই কলকাতায় শুরু হল এক তুলনাহীন নারকীয় ঘটনা।

এই সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শহীদ সুরাবর্দী। সুরাবর্দী 'শহীদ' ছদ্মনাম দিয়ে মুসলমানদের পক্ষ হয়ে কলকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় নিয়মিত-ভাবে প্রতি সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ লিখতেন। তি ন ছিলেন 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের' কার্যকরী সমিতির সদস্য। তিনি ঠিক জিন্নার ভক্ত ছিলেন না, তবে তিনি তা' নিজের স্বার্থের খাতিরে সব কিছুই করতে পারতেন।

* * * * *

. ই আগষ্ট ১৯৪৬ সাল, কলকাতা…

ঐদিন কলকাতা শহরে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, সেই কাহিনী প্রাক্তন বাংলার গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজের ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত করা হল। কলকাতার ঘটনার এই বিবরণী গভর্নর বারোজ এক ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন এবং এই ডায়েরীর কয়েক পাতা ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল এবং সেক্রেটারী অব স্টেটসকে পাঠিয়েছিলেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৯৪-২৯২-এর পুরো বিবরণী পাওয়া যাবে]।

বারোজ লিখেছিলেন, 'আমার মন্ত্রীসভা ১৬ই আগষ্ট সরকারী ছুটি বলে ঘোষণা করেছিল। সরকারের এই সিদ্ধান্ত পরে বহু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল এই ব্যাপারে আমার সম্মতি নিয়েই এই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। অনেকে এখনও বলেন বিশেষ করে এই ঘটনার পর যে, ঐদিন ছুটি ঘোষণা না করলে হয়ত এই হাঙ্গামা হত না। কিন্তু আমি এই যুক্তিকে স্বীকার করে নিতে পারিনি। কারণ ঐদিন যদি দোকানপাট খোলা রাখা হত তাহলে ক্ষতির পরিমাণ, লুটতরাজ এবং খুন-জখম আরও বেশি হত। অধিকাংশ লোক ছুটির কারণ-বশত বাড়িতে ছিল। হিন্দু দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করতে অস্বীকার করায় তাদের দোকান লুট করা হয়েছিল। আমি দোকান লুট করাকে কোনপ্রকারেই সমর্থন করতে পারিনি… পিকেট ইত্যাদি করে হরতাল পালন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল।… আমি প্রধানমন্ত্রী (শহীদ সুরাবর্দীকে) এবং তার সহকর্মীদের

বলেছিলাম যে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন।....শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সংগঠনের মনোভাব জানা সম্ভব হয়নি।....'

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা সব কিছুই নিরাপদে কেটে যাবে আশা করে সমস্ত প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। সকাল থেকে পুলিশবাহিনী শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং জরুরী কাজ হিসাবে সব পুলিশবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছিল। আড়াইশো সশস্ত্রবাহিনী এবং আড়াইশো সাধারণ পুলিশকে গোলমাল-হাঙ্গামার মোকাবিলা করবার জন্যে তৈরি থাকতে বলা হয়েছিল; সৈন্যবাহিনীকে প্রয়োজন ও দরকারের জন্যে ফোর্ট উইলিয়ামে তৈরি হয়ে থাকতে বলা হয়েছিল।

শুক্রবার ১৬ই আগস্ট দশটার আগে থেকে পুলিশ হেড-কোয়ার্টার খবর পেয়েছিল, কলকাতার চারিদিকে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এবং জোর করে দোকান-পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি ছোরা দিয়ে আঘাত করবার চেষ্টা এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করবার খবর পাওয়া গিয়েছিল। গোলমাল যে সাম্প্রদায়িক, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। সকালের দিকে মুসলমানেরাই বেশিরভাগ আক্রমণ করেছিল। তারা লাঠি এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করেছিল। তারাই হিন্দুদের দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের মিছিল যখন এইসব হিন্দুর দোকানপাটের কাছে এল, তখন তাদের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হল।

দুপুরের পর অবস্থার আরও অবনতি হল। দুপুর দুটো চল্লিশ মিনিটের পর চীফ সেক্রেটারী আমার সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে বললেন যে, অবস্থা গুরুতর এবং পুলিশ কমিশনার সৈন্যবাহিনীকে অবিলম্বে তলব করবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। চীফ সেক্রেটারী পুলিশ কমিশনারের এই অনুরোধকে সমর্থন করলেন। আমি চীফ সেক্রেটারীকে বললাম, তিনি যেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন; কিন্তু আমি নিজেও সৈন্যবাহিনীকে ডাকবার নির্দেশ দিলাম। এ-ছাড়া পুলিশ কমিশনারকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলাম। দশ মিনিট পরে পুলিশ কমিশনার আমাকে বললেন যে, প্রধানমন্ত্রী সৈন্যবাহিনীকে তলব করতে রাজি হয়েছেন।

এর পর আমি ঠিক করলাম যে, শহর ঘুরে দেখব। আমার সঙ্গে ছিলেন পুলিশ কমিশনার, সৈন্যবাহিনীর এরিয়া কম্যাণ্ডার এবং ফোর্ট উইলিয়ামের কম্যাণ্ডার। এই সময়ে ময়দানে মুসলিম লীগের এক সভা হচ্ছিল। এই সভা শুরু হয় বিকেল চারটের সময়। 'জুম্মার নামাজ' শেষ হবার পর শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল, প্রসেশান মনুমেন্টের কাছে এসে জড়ো হতে

থাকে। শোভাযাত্রীকারীদের মধ্যেই অনেকের হাতে লাঠি এবং ধারাল অস্ত্র ছিল। ভারত সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের হিসাব অনুযায়ী এই সভায় লোকই হয়েছিল ত্রিশ হাজার; কিন্তু প্রাদেশিক সরকার নিযুক্ত এক মুসলমান রিপোর্টারের হিসেবানুযায়ী সভায় প্রায় পাঁচ লাখ লোক জড়ো হয়েছিল। 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার' পত্রিকার হিসেবমত জনসংখ্যা হয়েছিল এক লাখ।

সেদিনকার সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন নাজিমুদ্দিন এবং সুরাবর্দী। নাজিমুদ্দিন তার বক্তৃতায় সংযত ভাষায় উপস্থিত সবাইকে ধীর ও শান্ত হয়ে থাকতে বললেন। কিন্তু তিনি সভায় ঘোষণা করলেন যে, সকাল এগারটা পর্যন্ত শুধুমাত্র মুসলমানেরা আক্রান্ত ও আহত হয়েছেন এবং মুসলিম নাগরিকেরা নিজেদের বাঁচাবার জন্যেই এই আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়েছেন।

'প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী খুব গরম বক্তৃতা দিলেন।' এখানে গভর্নর বারোজ বলেছেন: সুরাবর্দীর ইংরাজী বক্তৃতা টুকে নেবার জন্যে প্রাদেশিক পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ যে লোক পাঠিয়েছিল, তার শুধু উর্দুতে বক্তৃতা টুকে নেবার দক্ষতা ছিল। অতএব তার (প্রধানমন্ত্রীর) ইংরাজী বক্তৃতার কোন নকল প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব হল না। কিন্তু কেন্দ্রের ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট থেকে জানতে পারি যে, প্রধানমন্ত্রী বেশ ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং হানিকর বক্তৃতা দিয়েছিলেন (এই হানিকর বক্তৃতার কিছুই কলকাতার পুলিশের রিপোর্টে পাওয়া যাবে না)। কেন্দ্রের এবং সামরিক রিপোর্ট অনুযায়ী সুরাবর্দী বলেছিলেন, আজকের ঘটনায় পুলিশ ও সামরিক বাহিনী যেন হস্তক্ষেপ না করে সেই সতর্কতা অবলম্বন করে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাদের সংযত করেছেন।—তার এই উক্তি মিথ্যা ছিল। এ ছাড়া তার উত্তেজনামূলক বিবৃতির উদ্দেশ্য অশিক্ষিত জন কে উত্তেজিত করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ এই সভা থেকে বাড়ি ফিরবার সময় অনেক শ্রোতা এবং শোভাযাত্রাকারীরা হিন্দুর দোকানপাট লুট করতে শুরু করে।

বিকেল ছ'টার সময় আমার সেক্রেটারী লালবাজারের কন্ট্রোলরুমে টেলিফোন করে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। বিশেষ করে ভবানীপুর এলাকার (হিন্দু পাড়া) অবস্থা গুরুতর এবং প্রধানমন্ত্রী মুসলিম লীগের শোভাযাত্রীকারীদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন। (এখানে বলা দরকার যে, প্রধানমন্ত্রী তার সমর্থকদের নিয়ে বেশির-ভাগ সময়ই পুলিশ কন্ট্রোলরুমে কাটিয়েছিলেন। এর দরুণ পুলিশ কমিশনার, যার উপর আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল তার নিয়মানুযায়ী চিন্তাভাবনা করে আদেশ জারী করতে অসুবিধে বোধ করছিলেন।) সাধারণত প্রধানমন্ত্রী যদিও আইন-

শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্যে দায়ী তবু সোজাসুজি প্রতিটি ঘটনায় তিনি নিজে কোন হুকুমজারী করতে পারেন না। একমাত্র আমার হুকুম ছাড়া পুলিশ কমিশনার আইন-শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর আদেশও লঙ্ঘন করতে পারেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কন্ট্রোল কমে যাওয়া এবং কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করবার বিরোধী নির্দেশ একমাত্র আমিই দিতে পারতাম; কিন্তু আমি ঐ রকমের কোন নির্দেশ দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। যদি ঐ রকম নির্দেশ দিতাম, তাহলে অনেকটা তার উপর অনাস্থা প্রকাশ করা হত। আমি রাত সাড়ে আটটার সময় থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত কার্ফু জারী করবার নির্দেশ দিলাম। আমি বেশ অনিচ্ছার সঙ্গেই এই আদেশ দিলাম; কারণ আমি ভয় করছিলাম বিদেশে এর খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

শনিবার ১৭ই আগস্ট, ভোর দুটোর সময় পুলিশ কমিশনার আমাকে বললেন যে, অল্পক্ষণের জন্যে কার্ফু কার্যকরী হয়েছিল। গুণ্ডারা রাস্তায় সবাইকে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে এবং কিছু খুনের খবরও পেলাম। রাত বারোটা থেকে বেলা দুটোর মধ্যে অবস্থার আরও অবনতি হল। পুলিশ কমিশনার কিছু সৈন্যবাহিনী শিয়ালদহ এবং বিবেকানন্দ রোডে টহল দেবার জন্য পাঠালেন। হাওড়াতে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ষোল/সতেরো আগস্ট রাত্রে আমরা বহুস্থান থেকে সাহায্যর জন্যে টেলিফোন পেলাম। অনেকে বিপদের আশঙ্কা করে টেলিফোন করেছিলেন। আমি আবার শহর ঘুরে দেখব ঠিক করলাম এবং বৌবাজার, শিয়ালদহ, হ্যারিসন রোড এবং চিৎপুর রোড ঘুরে দেখলাম। এই শহর পরিক্রমার পর আমি বুঝতে পারলাম, শহরের গুরুত্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কম আন্দাজ করেছিলাম। শহরের অনেক স্থানে ক্ষতির চিহ্ন দেখতে পেলাম। কলকাতার অনেক স্থান দেখে আমার প্রথম মহাযুদ্ধের ফ্রান্সের কিছু এলাকার ('সোম' এলাকার) কথা মনে পড়ল। সবখানেই সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবের পরিচয় পেলাম। কেউ সরকার কিংবা পুলিশের বিরোধী নয়।

রবিবার ১৮ই আগস্ট, সকালে আমি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর চার সহকর্মী ও চীফ সেক্রেটারী, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে এক বৈঠকে শহরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম। পরে আর্মি কম্যাণ্ডার এবং এরিয়া কম্যাণ্ডার এই আলোচনায় যোগ দিলেন। সোমবার ১৯শে আগস্ট, গতরাত্রে শহর অনেক শান্ত ছিল। পরে সকালে শরৎ বোস, জি. ডি. বিড়লা এবং বিধান রায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের আলোচনা বেশ গঠনমূলক ছিল। পরে আমি ও প্রধানমন্ত্রী পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলাম। (গভর্নর বারোজের

ডায়েরীতে প্রধানমন্ত্রীর নীতি কিংবা তার অসাধু আচরণের খুব বেশি উল্লেখ কিংবা সমালোচনা নেই)। এই ঘটনার তদন্তের জন্য অনেকে দাবী করেছিলেন— শরৎ বোস প্রমুখ নেতারা। তারা আরও দাবী করলেন, সুরাবর্দী এবং লীগ মন্ত্রীসভাকে ডিসমিস করা হোক ; কিন্তু বারোজ এই আবেদনে কান দেননি। এছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দুজ্জা সম্রাটের কাছে এক তার পাঠিয়ে তদন্তের দাবী করলেন। গভর্নর পরে এই দাঙ্গার কারণ তদন্ত করবার জন্যে ফেডারেল হাইকোর্টের (বর্তমান সুপ্রীম কোর্ট) প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে এক কমিশন নিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে এই কমিশন গঠন করা হল। কলকাতার হাঙ্গামায় সরকারের হিসেবানুযায়ী সংখ্যা ছিল নিহত ৩ হাজার এবং ১৭ হাজার আহত ছিল।

১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট কলকাতার এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবার আগে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। এই রিপোর্ট বারোজের রিপোর্টের আর একটি অংশ ছিল।

এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের উত্তেজিত করবার জন্যে গরম গরম হিন্দু-বিদ্বেষী শ্লোগান মুসলমান সংবাদপত্রে বিষোদ্গার করছিল। মুসলমান সংবাদপত্রের মধ্যে যে কয়েকটি সংবাদপত্র এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছিল তার মধ্যে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া (সান্ধ্য পত্রিকা) মর্নিং নিউজ, আজাদ, ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [লেখকের ঐ দিনকার অভিজ্ঞতা ছিল যে বাঙালী মুসলমানেরা অবাঙালী মুসলমানদের চাইতে অনেক কম সাম্প্রদায়িক ছিল]।

১৩ই আগস্ট ১৯৪৬ সালে (দাঙ্গা শুরু হবার আগে) 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় কলকাতা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী এক ইস্তাহার জারী করে সবাইকে ১৬ই আগস্ট 'ডিরেক্ট এ্যাকশন' দিবস পালন করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বলা হল, ঐদিন হরতাল পালন করা হবে।

দ্বিতীয়ত, মিছিল আখরা ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকা থেকে বের করা হবে।

তৃতীয়ত, ময়দানে এক জনসভা হবে। (এই জনসভার বিবরণী আগেই দেওয়া হয়েছে।) এই সভায় প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী বক্তৃতা দেবেন।

চতুর্থ, প্রতি মহল্লা কমিটি তাদের এলাকায় মসজিদের একটি পুরো তালিকা তৈরি করবেন। এইসব মসজিদ থেকে তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে জুম্মার নমাজে পাঠাতে হবে এবং জুম্মার নামাজে 'মুসলিম ভারতের জন্যে স্বাধীনতা' দাবী করা হবে।

সেক্রেটারী তার ইস্তাহারে সব মুসলমানদের এই 'ডিরেক্ট এ্যাকশন' দিবসকে সার্থক করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি আরও বললেন, মুসলমানেরা

যেন মনে রাখেন এ হল রমজানের মাস…এই মাসে আল্লা জিহাদ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই রমজান মাসেই বদরের যুদ্ধে মুসলমানেরা জয়লাভ করেছিল। মুসলিম লীগের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যে তারা এই পবিত্র মাসে তাদের সংগ্রাম শুরু করেছে।

পরে হোরেস আলেকজাণ্ডার এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্যে মুসলিম লীগকে দায়ী করেছিলেন। তিনি সেক্রেটারী অব ষ্টেটসকে বললেন, যদিও এই গোলমাল মুসলিম লীগ শুরু করেছিল তবু এই চক্রান্ত ইংরেজদের সাজানো প্ল্যান অনুযায়ী করা হয়েছিল। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৮৭]।

লর্ড ওয়েভেল পরে নিজে কলকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে দেখলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, যদি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন মীমাংসা না হয় তাহলে কলকাতার দাঙ্গার বীজ দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পরতে পারে। ['ভাইসরয় জার্নাল', সম্পাদনা : পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা ৩৪১]

কলকাতার দাঙ্গার পর অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু হল।

প্রথমে এই দাঙ্গার কথা শরৎ বোস লর্ড ওয়েভেলকে টেলিগ্রাম করে জানালেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড ৭২৫]। তিনি নোয়াখালি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ক্ষিতিশ রায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত টেলিগ্রামের কথা উল্লেখ করে লিখলেন যে, গুণ্ডারা নোয়াখালির রামগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত জেলায় অবাধে খুন, ধর্ষণ, লোকদের ধর্মান্তরিত করছে, কোন পুলিশ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। পরে নেহরু ওয়েভেলকে এক চিঠি লিখে জানালেন [পৃষ্ঠা ৭২৪, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড] যে, তিনি প্রতিদিন নোয়াখালি থেকে ভয়াবহ খবর পাচ্ছেন। তিনি ভাইসরয়কে সমস্ত ঘটনা নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। পরে লর্ড ওয়েভেল বাংলার গভর্নর বারোজকে এক টেলিগ্রাম করে সমস্ত ঘটনা জানাবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

গভর্নর বারোজ ওয়েভেলের কাছে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির এক রিপোর্ট পাঠালেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৪৩]। ১৬ই অক্টোবর ১৯৪৬ সালে গভর্নর বারোজ লর্ড ওয়েভেলকে লিখলেন, সম্প্রতি নোয়াখালি জেলায় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে মুসলমান নেতারা উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিয়েছে এবং কোনো কোনো স্থানে হিন্দুদের সঙ্গে মারপিট হয়েছে।

প্রথমত, ফেনী সাবডিভিশনে গোলমাল আরম্ভ হয়। হাঙ্গামা দমন করবার জন্যে চট্টগ্রাম থেকে (৯ই অক্টোবর) সেনাবাহিনী নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ১০ই অক্টোবর নোয়াখালির রামগঞ্জ থানায় গোলমাল শুরু হয়। বহু সংখ্যক

মুসলমানেরা হিন্দুদের ভয় দেখায় এবং বাড়ি-ঘর লুটতরাজ করতে শুরু করে।

এই গোলমাল-হাঙ্গামা বিভিন্ন থানায় রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, বেগমগঞ্জ এবং ত্রিপুরার দক্ষিণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এইসব এলাকায় লুট, অগ্নিকাণ্ড হয়। কিছুদিনের মধ্যে কুমিল্লা শহরে প্রায় দুই হাজারের বেশি শরণার্থী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

গভর্নর বারোজ আর একটি টেলিগ্রাম করে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে জানালেন :

'এই গোলমালের নায়ক ছিলেন গোলাম সারোয়ার। তিনি প্রাক্তন এম-এল-এ ছিলেন। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করছে। তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬৫]।

আর এক টেলিগ্রাম করে বারোজ ভাইসরয়কে জানালেন পূর্ব বাংলার এই দাঙ্গা মুসলমানদের 'উত্থান কিংবা বিদ্রোহ' নয়। কিছু গুণ্ডারা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে গোলমাল শুরু করবার চেষ্টা করছে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড পৃষ্ঠা-৭৫৩]।

পরে গভর্নর বারোজ এবং প্রধানমন্ত্রী প্লেনে করে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করলেন

সর্দার প্যাটেল স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে এক টেলিগ্রাম করে জানালেন : গভর্নর বারোজ নোয়াখালিতে গোলমাল-হাঙ্গামা বন্ধ করবার চেষ্টা করেননি। বাংলায় সেকশন ৯৩ প্রয়োগ করা উচিত ছিল। লর্ড পেথিক লরেন্স স্যর স্টাফোর্ড ক্রীপসকে বললেন, আমি মনে করি না গভর্নর বারোজ তার দায়িত্ব সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার কাজ বেশ কঠিন। সেকশন ৯৩ সর্দার প্যাটেল আপনাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সরকারকে কোন বিশেষ জরুরী পরিস্থিতি না হলে ডিসমিস করা অনুচিত হবে। এই প্রসঙ্গে পেথিক লরেন্স আরও জানালেন যে, গান্ধীজি-প্যাটেলের দূত সুধীর ঘোষ যেন তার কাছে আর না আসেন। 'তিনি (সুধীর ঘোষ) নিজেকে খুব বড বলে মনে করেন। ক্রীপসকে এই খবর দেবার পর পেথিক লরেন্স ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলকে চিঠি লিখলেন [তারিখ ১লা নভেম্বর, ১৯৪৬, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৫৮]। 'আমি প্রতিদিন বারোজের কাজের ব্যর্থতার অভিযোগ করে চিঠি পাচ্ছি।'

নেহরু ক্রীপসের কাছে নালিশ করলেন যে, ভাইসরয় তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

*   *   *

কলকাতার দাঙ্গার পর ভাইসরয় ওয়েভেলের নীতির পরিবর্তন হল। তিনি সেক্রেটারি অব স্টেটসকে লিখলেন (২৭শে আগস্ট ১৯৪৬ সালে):

যদি হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটির সমাধান না করা হয় তাহলে আমি আশঙ্কা করি যে, কলকাতার দাঙ্গার মত আরও দাঙ্গা দেশের অন্যত্র হবে··

লর্ড ওয়েভেলের পরামর্শদাতা ভি. পি. মেনন বলেছিলেন যে কলকাতা থেকে ফিরে আসবার পর আমি ওয়েভেলের ভাবভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ করলাম। তিনি (ওয়েভেল) উপলব্ধি করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের একতা না হলে দেশের সমস্যা সমাধান করা যাবে না।

অক্টোবরের প্রথম দিকে ওয়েভেল জিন্নার সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লীগের যোগ দেয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। জিন্না সরকারে যোগ দেবার জন্যে 'নয় দফার' এক দাবী পেশ করলেন। জিন্না প্রস্তাব করলেন যে, ভাইসরয়ের এক্সাকিউটিভ কৌন্সিলে মোট সদস্য সংখ্যা হবে চোদ্দজন। এর মধ্যে ছয়জন হবেন বর্ণ হিন্দু এবং এর মধ্যে একজন হবেন তপশীলি; পাঁচজন হবেন মুসলিম লীগের সদস্য এবং তিনজন হবেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কংগ্রেস কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কৌন্সিলে গ্রহণ করতে পারবেন না। এবং কোন শূন্যস্থান পূরণ করতে হলে দুই দলের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে হবে। কৌন্সিলের সহ সভাপতি পালা বদল করে নিয়োগ করতে হবে।

*   *   *

কলকাতার দাঙ্গার জন্যে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে দায়ী করল, কিন্তু ভাইসরয় কংগ্রেসের এই অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন না। বরং তিনি বললেন যে, এই দাঙ্গায় হিন্দুর চাইতে মুসলমানেরা বেশি নিহত হয়েছে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৭]।

জিন্না সাংবাদিকদের বললেন "আমরা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু এবং যারা মুসলমান নন তারা যেন নিরাপদে থাকতে পারে তার গ্যারান্টি দিতে পারি। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুর সংখ্যা হবে প্রায় আড়াই কোটি; এইভাবে দেশভাগ করেই আমরা দেশের স্বাধীনতা আনতে পারি ['জিন্নার বক্তৃতা', জমিলুদ্দিন আহমেদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৩]।

২৪শে আগস্ট ওয়েভেল ঘোষণা করলেন যে, নেহরু এবং তার তেরোজন সহযোগী সেপ্টেম্বর মাসে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবেন।

ওয়েভেলের এই ঘোষণার পর জিন্না এক বিবৃতিতে বললেন যে, ভাইসরয় মুসলিম লীগ এবং 'মুসলিম ভারতের' যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন—তিনি ভুল পদক্ষেপ

গ্রহণ করেছেন··

নেহরুর বোম্বাইর প্রেস সম্মেলনের পর লীগ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়। নাজিমুদ্দিন বললেন, কংগ্রেসকে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব বিনা শর্তে অর্থাৎ যেভাবে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করেছেন সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে। যদি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বিনা শর্তে গ্রহণ করা হয় তাহলে লীগ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেবে।

ওয়েভেল এই বিষয়টি নিয়ে গান্ধীজি ও নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। এই আলোচনা ছিল বিশেষ জটিল ও কঠিন।

ওয়েভেল গান্ধীজিকে বললেন, আপনি আমাকে বলুন যে আপনারা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছেন

'আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন যেভাবে তাদের প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই ব্যাখ্যার অভিপ্রায় অনুযায়ী আমরা প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিতে রাজি নই। ঐ প্ল্যান সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের ব্যাখ্যা আছে,' গান্ধীজি জবাব দিলেন

লর্ড ওয়েভেল বললেন : ধরুন আপনাদের ব্যাখ্যা যদি ক্যাবিনেট মিশনের ব্যাখ্যার থেকে পৃথক হয়?

গান্ধীজি : নিশ্চয়, ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান যা বলেছে বিষয়টি তা নয়। 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' এই প্ল্যানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে সেইটে ভেবে দেখতে হবে।

ওয়েভেল এর জবাবে বললেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হল কংগ্রেসের সপক্ষে এবং মুসলিম লীগ বিরোধী কারণ লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বয়কট করেছে। এই সরকারকে 'নিরপেক্ষ' বলা যায় না

গান্ধীজি বললেন যে, তিনি পক্ষনিরপেক্ষতা নিয়ে আলোচনা করতে চান না। তিনি এই প্রশ্নটিকে আইনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে চান। আইনত এই প্রশ্নটির সমাধান করবার দায়িত্ব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবার পর তারা এই বিষয়টি নিয়ে বিচার করবেন।

'কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন না' ওয়েভেল রাগের সুরে জবাব দিলেন, 'এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে 'কংগ্রেস সরকার' বলা যায়। তারা কখনই 'নিরপেক্ষ' হতে পারে না।'

এবার নেহরু এই আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি বললেন, আপনার

কংগ্রেস পার্টির গঠন সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে। কংগ্রেস হিন্দুর সপক্ষে কিংবা মুসলমানদের বিপক্ষে নয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভারতের সব জাতির জনসাধারণের জন্যে। এই প্রতিষ্ঠান মুসলমান স্বার্থের বিরোধী কোন আইন রচনা করবে না।

ওয়েভেল বললেন : আপনারা কোন্ 'মুসলিমদের' কথা বলছেন? 'কংগ্রেস মুসলিম', যারা আপনাদের হাতে কলের পুতুল। না, আপনারা মুসলিম লীগের কথা বলছেন? আমাদের বর্তমান প্রয়োজন হল, মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করা এবং তাদের দেখান যে, আপনারা তাদের দমন করবার কোন চেষ্টা করছেন না। এ হল কংগ্রেস এবং লীগকে একত্র করবার সময়। আমি শুধু আপনাদের কাছ থেকে গ্যারান্টি চাইছি যে, কংগ্রেস কি কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা করে লীগকে সন্তুষ্ট করবে এবং এক শক্তিশালী সরকার গঠন করতে সাহায্য করবে? এই বলে ওয়েভেল ড্রয়ার খুলে একটি কাগজ বের করলেন। আমি এই ধরনের একটি ঘোষণা চাইছি, এই বলে তিনি গান্ধীজির হাতে একটি কাগজ তুলে দিলেন।

এই কাগজে লেখা ছিল : কংগ্রেস দেশে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব রাখবার জন্যে ১৬ই মে তারিখের ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়েছিল সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী মিশনের প্ল্যানকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। প্রস্তাবের এই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রদেশগুলি এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, যা শ্রেণী কিংবা গ্রুপের উপর প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং যতদিন না ১৬ই মে তারিখের বিবৃতির প্যারাগ্রাফ ১৯(৭) অংশকে প্রথম নির্বাচনের পর নতুন সংসদ এই বিষয়টি নিয়ে বিচার করে এবং কার্যকরী না করে।

কাগজটি গান্ধীজি পড়ে নেহরুকে পড়বার জন্যে দিলেন।

আমরা যদি এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করি তবে আমরা নিজেদের পায়ে শেকল বাঁধব, গান্ধীজি বললেন।

এর জবাবে ওয়েভেল বললেন, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী আপনাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। আপনারা যখন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, তখন আপনারা নিশ্চয় এই প্রস্তাবের তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা কী হবে সেই কথা জেনেশুনেই করেছিলেন। যদি না জানতেন, তাহলে আপনারা এই প্রস্তাবকে আদৌ গ্রহণ করলেন কেন? দেশকে গ্রুপ হিসাবে ভাগ করা হবে প্ল্যানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল। আপনি এখন বলতে পারেন না যে, আপনি ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানে কী বলা হয়েছিল তার তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝতে পারেননি।

'ক্যাবিনেট মিশনের অভিপ্রায় কী ছিল এবং আমরা কীভাবে এর ব্যাখ্যা করি, দুটি জিনিস এক নাও হতে পারে' গান্ধীজি জবাব দিলেন।

দেখুন আপনি আইনজীবীর ভাষায় কথা বলছেন। আমার সঙ্গে সহজ ইংরাজি ভাষায় কথা বলুন। আমি সাধারণ সৈনিক এবং আইনের তর্কবিতর্ক বুঝি না, ওয়েভেল জবাব দিলেন। এর জবাবে নেহরু বললেন, আমরা যদি আইনজীবী হই তাহলে অপরাধের কিছু নয়।

না, আপনারা আমার সঙ্গে সহজ পরিষ্কার ভাষায় কথা বলতে পারেন। আপনারা দেশের মঙ্গল এবং হিত চান সেই কথা পরিষ্কার করে বলুন। ক্যাবিনেট মিশন তাদের অভিপ্রায়কে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেছে। এই অভিপ্রায়কে আইন দিয়ে বিচার করা যায় না। একজন সহজ সরল মানুষ হিসাবে আমার কাছে সমস্ত ছবিটি স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। যদি কংগ্রেস আমাকে ঐ প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে আমি জিন্না এবং লীগকে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যোগদানের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে বলব। তাদের সরকারে প্রয়োজন আছে এবং অখণ্ড ভারত সংগঠনে এদের যোগ দেবার দরকার হবে। শুধু মাত্র যদি কংগ্রেসকে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় তাহলে অন্যায় হবে। এর জবাবে গান্ধীজি বললেন, কিন্তু আপনি ঘোষণা করেছেন যে সরকার গঠন করা হবে। আপনি প্রতিশ্রুতির খেলাপ করতে পারেন না।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষ করে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের পর ভারত আজ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে, ওয়েভেল বললেন। এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা আমার কর্তব্য। যদি কংগ্রেস মুসলমানদের বাদ দিয়ে সরকার গঠন করে তাহলে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না। তাহলে তারা আবার 'ডিরেক্ট এ্যাকশন' শুরু করবে এবং বাংলায় যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। নেহরু বললেন, আপনি মুসলিম লীগের ব্ল্যাকমেলের কাছে মাথা নত করছেন।

আপনি 'ব্ল্যাকমেল' সম্বন্ধে বলবার কে? বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ওয়েভেল নেহরুকে বেশ কড়া মেজাজেই জবাব দিলেন।

এবার গান্ধীজি টেবিল চাপড়ে বললেন, যদি ভারতে এর জন্যে রক্তপাতের প্রয়োজন হয় তাহলে এ দেশে অহিংস নীতি থাকা সত্ত্বেও দেশে রক্তপাত হবে। [এই ঘটনার পুরো বিবরণী 'দি লাস্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা—৪২-৭৬ এবং 'ভাইসরয় জার্নাল', পেনাডেরেল মুন, পৃষ্ঠা-৩৪২, ফুটনোটে এবং ট্রান্সফার অব পাওয়ার, অষ্টম খণ্ডে গান্ধীজির শেষ উক্তি পাওয়া যাবে]।

এই ঘটনার পর নেহরু এবং গান্ধীজি ওয়েভেলের সঙ্গে আর কোন কথাবার্তা করতে চাইলেন না। গান্ধীজি সেই রাত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর কাছে এক টেলিগ্রাম করে ভাইসরয়ের নীতি এবং তাঁর কার্যকলাপের সমালোচনা করলেন।

তিনি বললেন, বাংলার এই দুর্ঘটনার দরুন ভাইসরয় তাঁর মনোবল এবং আস্থা হারিয়েছেন। তাঁর একজন কর্মঠ আইনজ্ঞ সহকারী প্রয়োজন। এর পরে গান্ধীজি ওয়েভেলের কাছে এক চিঠি লিখলেন :

২৮শে আগস্ট

প্রিয় বন্ধু,

একজন বন্ধু হিসাবে এবং অনেক গভীর চিন্তার পর আমি এই চিঠি লিখছি। গত সন্ধ্যায় আপনি বহুবার বলেছেন যে, আপনি অতি সাধারণ মানুষ ও সৈন্য এবং আপনার আইন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। আমরা সবাই অতি সাধারণ ব্যক্তি, যদিও আমরা সৈন্য নই এবং আমরা কয়েকজন আইন জানি। আমাদের উদ্দেশ্য আমরা ধরে নিতে পারি, কলকাতার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে কোন পদ্ধতি খুঁজে বার করতে হবে। আমাদের সামনে প্রশ্ন হল কী করে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে এই কাজ করা যায়।

গত সন্ধ্যায় আপনি ভীতিপ্রদ ভাষা ব্যবহার করেছেন। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে আপনি শুধুমাত্র সামরিক ব্যক্তি নন। আপনি আইনকে (যে-আইন আপনারাই তৈরি করেছেন) উপেক্ষা করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে আপনার বিশ্বাসযোগ্য কোন আইনজীবীর সাহায্য নেওয়া উচিৎ।

আপনি ভয় দেখিয়েছেন যে ফরমূলা আপনি আমাকে এবং পণ্ডিত নেহরুকে দিয়েছেন সেই অনুযায়ী যদি কংগ্রেস কাজ না করে তাহলে আপনি সংবিধান সংসদকে আহ্বান করবেন না। তাই যদি হয় তাহলে আপনার বারোই আগস্ট কোন ঘোষণা করা উচিত হয়নি এরপর আপনি আগের সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করে আপনার বিশ্বাসভাজন এক মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারেন। যদি ব্রিটিশ অস্ত্র দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যেই ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শুধুমাত্র হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই হবে না। কংগ্রেস ব্রিটিশ অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের উপর তাদের ইচ্ছা-শক্তিকে চাপাতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস সেইজন্যে নতি স্বীকার করতে পারে না এবং অন্যায় পন্থা অবলম্বন করতে পারে না, কারণ [কলকাতায়] এক বর্বরোচিত ঘটনা হয়েছে। এই নতি স্বীকার করলে এই ধরনের দুর্ঘটনাকে উৎসাহ দেয়া হবে এবং এইরকম দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবার জন্যে সাহায্য করবে। দুপক্ষের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি আরও তীব্র হবে এবং সুযোগ সুবিধেমত এই ইচ্ছা আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে। এইসব কিছুর প্রধান কারণ হল, এ দেশে বিদেশী শক্তির উপস্থিতি যারা নিজের অস্ত্র ও হাতিয়ার সম্বন্ধে সচেতন।

আমি আপনার কাছে হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে কিছু বলছি না।

আমি ভারতীয় হিসাবে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। যতদূর আমি জানি কংগ্রেস আপনার এবং ব্রিটিশদের চাইতে হিন্দু এবং মুসলমানের চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষ সুপরিচিত। যদি না পুরোপুরি কংগ্রেস সরকারকে বিশ্বাস করতে পারেন, যা আপনি ঘোষণা করেছেন, তাহলে আমার পূর্ব উল্লেখিত অনুরোধ অনুযায়ী সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন।

আপনি দয়া করে এই চিঠির সম্পূর্ণ অংশ ব্রিটিশ সরকারের গোচরে আনবেন।

ইতি—

এম. কে. গান্ধী।

নেহরু তার চিঠিতে ভাইসরয়কে জানালেন যে, কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি ওয়েভেলের কথামত গ্রুপিং সম্বন্ধে কোন দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি দিতে রাজি নয়। কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে; কিন্তু এর ভেতরে যে অসঙ্গতি আছে সেইটের সমাধান করবে।.... [এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা—৪৭-৪৫, 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার' অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩১২ ; 'ভাইসরয় জার্নাল' সম্পাদনা, পেনডেরেল মুন পৃষ্ঠা-৩৪২-৩৪৩ তে পাওয়া যাবে।]

ভাইসরয়ের কাছ থেকে রিপোর্ট এবং গান্ধীজির ও নেহরুর চিঠি পাবার পর সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড পেথিক লরেন্স ভাইসরয়কে নির্দেশ দিলেন, কোন প্রকারেই যেন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ না করা হয়। লর্ড ওয়েভেল পেথিক লরেন্সকে জানালেন যে, কংগ্রেস ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দিন গান্ধীজি তাঁর দিল্লীর প্রার্থনাসভায় বললেন: পূর্ণ স্বরাজের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। দীর্ঘকাল ভারতীয়রা এই দিনের জন্যে লাঞ্ছনা কষ্ট স্বীকার করেছে। অতীতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাদের যতই ঝগড়া-বিবাদ থাক না কেন, আজ ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে মীমাংসার জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন।

গান্ধীজি জনতাকে বললেন, পূর্ণ স্বাধীনতা এখনও আসেনি। ঐ স্বাধীনতা সেইদিনই আসবে যেদিন তাদের 'মুকুটহীন রাজা' (Uncrowned King) জওহরলাল নেহরু, এবং তাঁর সহকর্মীরা যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিয়েছেন দেশের সত্যিকারের সেবা করবেন.... ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৩]।

এই বক্তৃতার পর গান্ধীজি নোয়াখালির দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন

করতে গেলেন। নোয়াখালিতে থাকাকালীন গান্ধীজি বিভিন্ন গ্রামে যারা দাঙ্গায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তাদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

নেহরু এক রেডিও বক্তৃতায় তার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করলেন। অক্টোবর মাসে ভাইসরয় জিন্নার নয়টি দাবী নিয়ে পৃথক আলোচনা শুরু করলেন। জিন্নার দাবীর ভেতর কোন নতুনত্ব ছিল না। বিস্তৃত আলোচনার পর জিন্না নেহরুর দাবী স্বীকার করে নিলেন এবং ১৫ই অক্টোবর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুসলিম লীগের সদস্যদের নিয়ে নতুন করে গঠন করা হল। এবার থেকে সরকারের মধ্যে কংগ্রেস এবং লীগের মন্ত্রীদের মধ্যে অন্তর্কলহ শুরু হল।

* * *

অন্তর্কলহ শুধু দিল্লীর মন্ত্রীসভায় হল না।

ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাও কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং গান্ধীজি ও নেহরুর কাছ থেকে ভাইসরয়-বিরোধী চিঠি পাবার পর বিশেষ বিচলিত হয়েছিল।

মন্ত্রীদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলতে লাগল ওয়েভেলকে নিয়ে কী করা যায়? কারণ ওয়েভেল কংগ্রেস নেতাদের আস্থা হারিয়েছেন। ঘরোয়া বৈঠকে ও বন্ধুদের কাছে প্রধানমন্ত্রী এটলী বলতে লাগলেন—যদি ওয়েভেলের চাইতে আরও কোন যোগ্য ব্যক্তিকে ভাইসরয়ের পদের জন্যে পেতাম তাহলে আমি তাকে স্থলাভিষিক্ত করতাম। বন্ধুরা এটলীর এই উক্তি কংগ্রেস নেতাদের জানালেন। লর্ড পেথিক লরেন্স কিন্তু ভাইসরয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখলেন এবং সর্বপ্রকার সহানুভূতি জানালেন। তিনি নিয়মিতভাবে ওয়েভেলকে পরামর্শ দিতেন এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা করতেন। লর্ড পেথিক লরেন্সের বক্তব্য ছিল যে, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে কোনপ্রকার মীমাংসা না হলে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের সবাই জানতে পারল যে, ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার বিশ্বাস হারিয়েছেন ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা—৪৭-৪৯]।

ওয়েভেলের এই বিশ্বাস হারাবার আর একটি কারণ ছিল। কারণ, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে লর্ড ওয়েভেল তার বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারী জর্জ এবেলকে নিয়ে একটি প্ল্যান তৈরি করলেন।

এই প্ল্যানটি হল—'ব্রেকডাউন প্ল্যান'। অনেকে এই প্ল্যানের নাম দিলেন 'অপারেশন এবটাইড'। এই প্ল্যানে ভাইসরয় স্বীকার করলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের মেয়াদ ঘনিয়ে এসেছে। অতএব ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং

ইংরেজদের শাসনযন্ত্রকে এদেশ থেকে তুলে নিতে হবে।

লর্ড ওয়েভেল এই প্ল্যান ভয় পেয়ে তৈরি করেননি

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ ভাইসরয় ওয়েভেল এই ব্রেকডাউন প্ল্যান ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠালেন। এই প্ল্যানের প্রথম একটি অংশ তিনি ১লা নভেম্বর ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এই প্ল্যানে বলা হল—প্রথমত, চারটি প্রদেশ মাদ্রাজ, বোম্বাই, সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং উড়িষ্যা থেকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং ব্রিটিশ প্রশাসন সরিয়ে নেয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, তারপর দক্ষিণ ভারত থেকে ইংরেজ সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন সরিয়ে নেবার পর সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে ৩১শে মার্চ ১৯৪৮ সালের মধ্যে ইংরেজ তার সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন-ব্যবস্থা তুলে নেবে। বলা হল, ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনী এবং প্রশাসন-ব্যবস্থাকে এই দেশ থেকে নিয়ে যাবার পর হয়ত দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে আপোস মীমাংসা হবে।

পরে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে লর্ড ওয়েভেল 'ব্রেকডাউন' প্ল্যানের আরও একটি পুরো বিস্তারিত খসড়া ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিলেন। (দেবার তারিখ ৩, ডিসেম্বর ১৯৪৬)।

তিনি তার স্বল্প মেয়াদকালীন প্রস্তাবের খসড়ায় বললেন যদিও ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান কার্যকরী কিন্তু মিশন কিংবা ব্রিটিশ সরকার তাদের মূল প্ল্যান অনুযায়ী কোন পরিবর্তন করতে পারবেন না।

মিশন জিন্নাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষা করতে পারেনি। কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে এই প্ল্যান তারা কার্যকরী করবে না। এই ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

যদি ব্রিটিশ সরকার তাদের মূল প্ল্যান কার্যকরী করবার চেষ্টা করত তাহলে লীগ নিশ্চয় এই প্ল্যানকে সফল করবার চেষ্টা করত।

দুই : কংগ্রেস মনে করে যদি তারা সংঘাতিক কিছু না করে তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে না। কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র থেকে দেশকে মুক্ত করা। তারা মনে করে একবার ক্ষমতা পাবার পর তারা মুসলমান এবং মহারাজা, রাজকুমারদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে। তারা প্রথম দলকে ঘুষ, ব্ল্যাকমেল, প্রোপাগাণ্ডা এবং প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করে বশ করবার চেষ্টা করবে এবং দ্বিতীয় দলকে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে এবং অন্যান্য পন্থায় দুর্বল করবে।

....কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী সংবিধান সংসদ গঠনে

ইচ্ছুক নয়। শুধু মাত্র ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্যে এবং ক্ষমতা ও সম্মান পাওয়ার জন্যে হয়ত এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারে। অনেক বিচক্ষণ এবং উদারপন্থী ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে মুসলমানদের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা ছাড়া অখণ্ড ভারত অর্জন করা সম্ভব নয়। কংগ্রেস কখনই মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন প্রকার মীমাংসা করবে না, কারণ তারা জানে যে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সব কিছু আদায় করা সম্ভব হবে।

তিন: মুসলমানেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা ইংরেজদের কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবার আশা করেছিল। কিন্তু তারা হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে ব্রিটিশ সরকারের দুর্বলতা এবং কপটতার জন্যে তারা কিছু পাবে না।

চার: যদি ক্যাবিনেট মিশনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের দাবী পূরণ না করা হয় তাহলে তারা সংবিধান সংসদে যোগ দেবে না।

পাঁচ: শিখরা, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে কিন্তু বর্তমান কিছু ঘটনার পর তারা কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি সহযোগিতা করছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে কংগ্রেস শক্তিশালী এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের বিরোধিতা করতে সাহস করবে না।

ছয়: কংগ্রেস, লীগ এবং শিখ দলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চাপ, দলাদলি সৃষ্টি হয়েছে।

কংগ্রেস দলে এক শক্তিশালী বামপন্থী শাখা আছে। এই শাখার নেতা হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি এদের গঠনমূলক কোন কর্মপদ্ধতি নেই এবং তারা দেশে অনেক ক্ষতিকর কাজ করছেন। তারা প্রচার করছেন যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করা আবশ্যক। দক্ষিণপন্থীরা, একদিন যারা বামপন্থীদের দেশে অশান্তি, অরাজকতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, আজকাল তারা বামপন্থীদের শাসন করতে পারছে না। নেহরু হলেন ডান এবং বামপন্থীদের মধ্যে অদৃঢ় সূত্র এবং দোভাষী।

গান্ধী মনে করেন যে তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে এই দেশ থেকে তাড়ান—এই সংকল্প সমাপ্ত হয়েছে। তার এই অহিংসা নীতি হল এক অস্ত্র, বেদ বাক্য নয় এবং বর্তমানে অকার্যকরী। এ হল দুর্বলের শক্তিশালীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার অস্ত্র। কিন্তু বর্তমানে শক্তিশালী দুর্বল হয়েছে, এবং অনেকে অস্ত্র সোজাসুজি ব্যবহার করবেন যাদের উপর গান্ধীর কোন হাত নেই।

গান্ধী সমস্ত ঘটনার পেছনে থাকবেন, ঘটনার নিন্দা করবেন কিন্তু প্রতিকার করবার কোন চেষ্টা করবেন না··· কারণ তার প্রতিকার করবার কোন ক্ষমতা নেই।

সাত : মুসলিম লীগ পাকিস্তান এবং ইসলাম দাবী তাদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে শুরু করেছিল। তাদের এই দাবী করবার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের মূল্য বৃদ্ধি করা।

লীগ তাদের অশিক্ষিত, সমর্থকদের এমন উত্তেজিত করেছে এবং তাদের বলা হয়েছে যে পাকিস্তান হবার পর তাদের জন্যে নবীর 'স্বর্গ' পৃথিবীতে তৈরি করা হবে এবং তাদের 'হিন্দুর প্রভুত্বের' হাত থেকে রক্ষা করবে। এর পর তাদের এই দাবীর চাইতে কম কিছু দিলে তাঁরা সন্তুষ্ট হবে না।

আমি জিন্নাকে বিশ্বাস করি যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব তাঁর সমর্থকদের কাছে 'বিক্রী' করতে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান হল মীমাংসার সহজ উপায়।

তিনি বলছেন ক্যাবিনেট মিশন লীগের সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং জিন্না ও লীগ তার ফলে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আট. শিখদের ভেতর অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি অনেকটা পৃথক ধরনের হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী ক্ষমতা পাবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু শিখরা যে দল সবচাইতে শক্তিশালী এবং যাদের কাছ থেকে বেশি পাবে তাদের সমর্থন করবে। আগে তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে সবকিছু পেত, কিন্তু বর্তমানে তারা কংগ্রেসের কাছ থেকে বেশি পাবার আশা রাখে।

নয় : 'স্বল্পকালীন মেয়াদের' জন্যে মুসলিম লীগকে সংবিধান সংসদে যোগ দেবার জন্যে রাজি করান সম্ভব কিনা? সম্ভব, যদি ব্রিটিশ সরকার স্পষ্ট, পরিষ্কার দৃঢ় ভাবে বলেন যে প্ল্যানের গ্রুপিং এবং প্রাদেশিক সংবিধান গঠন মিশনের ঘোষণা অনুযায়ী করা হবে এবং অন্য কোন উপায়ে করা হবে না, তাহলে লীগ সংসদে যোগ দিতে রাজি হবে। অন্য কোন শর্তে নয় এবং অন্য কারু অনুরোধে, ফরমুলা, সাংবিধানিক তর্কবিতর্ক কিছুই তাদের আকৃষ্ট করবে না।

এর পর হয়ত কংগ্রেস রাগ করবে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস ঝগড়া বিবাদ করবে। কিন্তু বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা আছে। অতএব আমাদের ঐ গুরুতর পরিস্থিতির জন্যে একটি বিশেষ 'ব্রেকডাউন প্ল্যান' তৈরি করা দরকার।

ঐ প্ল্যান হবে স্বল্পকালীন মেয়াদের জন্যে দ্বিতীয় ভাগ হবে দীর্ঘকালীন মেয়াদের প্ল্যান।

দশ. যদি আমরা কংগ্রেস এবং লীগকে মিশনের ঘোষিত প্ল্যান গ্রহণ করতে রাজি করাতে না পারি (কংগ্রেসের ইচ্ছানুযায়ী প্ল্যান নয়) তাহলে

আমাদের ধরে নিতে হবে যে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অকার্যকরী এবং ব্যর্থ হয়েছে। তাদের আরও বোঝা উচিৎ যে আমাদের হাতে নতুন কিছু করবার সময় এবং ক্ষমতা সীমিত।

এগার: মিশনের প্ল্যান যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদের (ব্রিটিশ সরকারের কাছে) এই কয়েকটি পথ খোলা আছে:—

(ক) তাদের ক্ষমতা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতবর্ষকে শাসন করা। কিন্তু সরকার স্বীকার করেছেন রাজনৈতিক কারণবশত এই কাজ করা সম্ভব নয়।

(খ) নতুন মীমাংসার শর্ত নিয়ে আলোচনা করা। এর জন্যে দেশ ভাগ করবার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। হয়ত দেশভাগের কাজের তত্ত্বাবধান করবার জন্যে আমাদের বেশ কয়েকবছর এই দেশে থাকতে হতে পারে।

কিন্তু আমি মনে করি না যে এই পন্থা কার্যকরী।

(গ) কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করা এবং কংগ্রেস যা বলে সেইটে স্বীকার করে নেওয়া, এবং আমাদের কাছে সামান্য যে অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে সেইটে সংখ্যালঘু, নৃপতিদের এবং সৈন্য বাহিনীর উন্নতির জন্যে ব্যবহার করা।

কিন্তু আমি মনে করি না যে এই নীতি সম্মানজনক কিংবা বিচক্ষণের নীতি হবে এবং এর পরিণতি হবে অসম্মানের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের অবসান, কংগ্রেসের মনে উদারতা কিংবা রাষ্ট্রশাসন কার্যে দক্ষতা নেই।

(ঘ) ঘোষণা করা যে আমরা কোন প্রকার মীমাংসার বন্দোবস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছি এবং এই কারণে আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এবং নিজেদের স্বার্থের উপর দৃষ্টি রেখে সময়মত ভারত থেকে চলে যাব।

আমাদের এই কর্মপরিকল্পনার কোন বাধা দেওয়াকে যুদ্ধের সামিল বলে গণ্য করব এবং আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করবার চেষ্টা করব। কিন্তু যতদিন আমরা ঐ দেশে থাকব ততোদিন আমরা মীমাংসার চেষ্টা করব এবং দেশের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারের হাতে তুলে দেব।

এই হল ব্রেকডাউন প্ল্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এই প্ল্যান দেশে শুধু অরাজকতা শুরু হলেই নয়, কিংবা দেশে রাজনৈতিক অচল অবস্থা সৃষ্টি হলে এবং তার দরুণ অরাজকতা আরম্ভ হলেও ব্যবহার করা হবে। এই ধরনের প্ল্যান তৈরি থাকলে আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে আরও দৃঢ় ভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারব।

কারণ আমাদের জানা থাকবে আমাদের বিকল্প প্ল্যান কী এবং এর দরুণ আমরা রাজনৈতিক অচল অবস্থার যেন সৃষ্টি না হয় তা'র চেষ্টা করতে পারব।

(ঙ) ব্রিটিশ সরকারের অসুবিধার কথা আমি উপলব্ধি করি। কিন্তু ভারতের বর্তমান বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি পার্লামেন্টের গোচরে আনা দরকার। আমি মনে করি না পার্লামেন্ট (যার উপর চূড়ান্ত দায়িত্ব রয়েছে) বিশ্বাস করে যে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে চলতে পারবে। কিংবা ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীরা কোন নির্দিষ্ট নীতির অভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে।

(চ) অতএব আমি ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ করছি যেন তারা এই বিষয় নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করে এবং ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব যে ভাবে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল সেই প্ল্যানকে পুনর্বহাল করে।

যদি তারা এই নীতি গ্রহণ না করতে পারে তাহলে তারা যেন উল্লিখিত সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত যেন আরও সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হয়। আমি কিংবা কোন গভর্নর কিংবা দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী এমন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন কাজ করতে পারি না। আমরা ব্রিটিশ সরকারের নীতি কী সুস্পষ্ট ভাবে জানতে চাই।

এ ছাড়া বর্তমানে ব্রিটিশ সরকারের নীতি না জানা থাকলে কোন রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চালান অসম্ভব। [ব্রেক ডাউন প্ল্যানের বিস্তৃত বিবরণী 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা—৫০-৫৩, ভাইসরয়স জার্নাল, সম্পাদন, পেনডেরেল মুন, পৃষ্ঠা—৩৭৪-৩৭৫, এবং পৃষ্ঠা—৩০৬-৩০৭ এবং 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৫৪-৬৫৫ পাওয়া যাবে]।

ভারত থেকে চলে যাবার প্ল্যান নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে ওয়েভেল এক কমিটিও তৈরি করেছিলেন। বলা প্রয়োজন যে এর আগের বছরে ভাইসরয় ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ অকিনলেক ভারত থেকে চলে যাবার বিষয়টি নিয়ে তাদের রিপোর্ট ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন কিন্তু ঐ সময়ে প্রধানমন্ত্রী এটলী এই বিষয় নিয়ে কোন গভীর চিন্তাভাবনা করেন নি।

এবার ভাইসরয়ের 'ব্রেকডাউন প্ল্যান' যখন সেক্রেটারী অব স্টেটস পেথিক লরেন্সের কাছে পৌছল তখন তিনি ঐ চিঠির উপর মন্তব্য করলেন 'আমি মনে করি না যে এই চিঠি ক্যাবিনেটের সব সদস্যদের দেখান উচিৎ। প্রাইম মিনিস্টার অনতিবিলম্বে এই চিঠি দেখতে পারেন এবং তিনি ঠিক করবেন কোন্ কোন্ মন্ত্রী এই চিঠি দেখতে পারবেন। ইণ্ডিয়া অফিসে এই চিঠি শুধু মাত্র

কয়েকজনকে দেখান হবে' ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৫৪-৪৫৫]।

পরে সেক্রেটারী অব স্টেটস পেথিক লরেন্স এক নোটে লিখলেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫০] 'ভাইসরয় তার প্ল্যানে এক পৃথক ধরনের উপায়ে আমাদের ভারত থেকে চলে আসবার কথা বলেছেন। এই নীতি আমাদের বিনা উত্তেজনায়, নির্মম, নিষ্ঠুর ভাবে পালন করতে হবে এবং কোন কঠিন চাপে পড়ে নয়। ভাইসরয়ের এই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করলে এর গুরুতর পরিণাম হবে।'

* * *

সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখ, ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি।

আজ প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কী করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন গুটিয়ে নেওয়া যায়।

আজকের আলোচনা-বৈঠকে ক্যাবিনেটের বড় বড় গণ্যমান্য সদস্যরা উপস্থিত হয়েছেন। কারণ ভারত থেকে ব্রিটিশ সরকারের পাততাড়ি গোটান হল এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যরা কল্পনাই করতে পারেন না যে ভারত থেকে ইংরেজকে চলে আসতে হবে।

প্রথমে মন্ত্রী এ. ভি. আলেকজাণ্ডার বললেন যতদিন কোন সংবিধান রচনা না করা হয় ততোদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতে শাসন করে যাবে। সংবিধান রচনার পর দেশের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। যদি এর আগে ভারত থেকে চলে আসা হয় তবে সবাই বলবে ব্রিটিশ সরকার দুর্বল হয়েছে এবং বিদেশে ব্রিটিশ সরকারের সম্মানের হানি হবে।

প্রধানমন্ত্রী এটলী বললেন যে ভাইসরয়ের প্রস্তাবে অনেক খুঁৎ, দোষ, ত্রুটি আছে। এই প্রস্তাবে পার্লামেন্টের মতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কোন আইন তৈরি না করে তাঁরা ভারত শাসনের দায়িত্বকে অন্যর হাতে তুলে দিতে পারেন না। আমাদের যদি ভারত থেকে সত্যি সত্যিই চলে আসতে হয় তাহলে এক সঙ্গে লম্বা একটানা ১৮ মাস ধরে এই কাজ করা উচিৎ হবে না।

এ ছাড়া ভাইসরয় যে 'কেয়ারটেকার' সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছেন সেই সরকার খুব দায়িত্বশীল সরকার হবে না।

সেক্রেটারী অব স্টেটস বললেন যে ভাইসরয় জানিয়েছেন যে, দেশের শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ছে।

পরে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করলেন যে ভাইসরয় দুইটি উৎকৃষ্ট স্থান, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ, থেকে চলে আসবার প্রস্তাব করেছেন। এই দুইটি শহর থেকে চলে

আসবার পর আমাদের হাতে দেশের কয়েকটি কঠিন, দুর্গম স্থান থাকবে। যদি আমরা চলে আসি তাহলে পাকিস্তান এবং পরে গৃহযুদ্ধ হবে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭]।

লর্ড ওয়েভেলের 'ব্রেকডাউন প্ল্যানের' জবাবে সেক্রেটারী অব স্টেটস পেথিক লরেন্স ভাইসরয়কে লিখলেন : আপনি আমাদের কাছে শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়বার পর সমাধানের যে প্রস্তাব করেছেন তার সুবিধের চাইতে অসুবিধে বেশি। এর দরুণ পার্লামেন্টের অনুমোদন পেতে অনেক অসুবিধে হবে। আমাদের (ক্যাবিনেটের) সিদ্ধান্ত হল যদি ভারত থেকে চলে আসা একান্ত আবশ্যক হয় তাহলে সমস্ত কাজটি খুব তাড়াতাড়ি, বিনা নোটিশে করতে হবে। আর চলে আসবার সময় আমাদের ইংরেজ নাগরিকদের নিরাপত্তার উপর নজর রাখতে হবে। এবং যে মিলিটারী প্ল্যান প্রস্তাব করেছেন সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২০]।

পরে আর একটি চিঠিতে সেক্রেটারী অব স্টেটস লর্ড পেথিক লরেন্স ভাইসরয়কে লিখলেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০] আপনার 'ব্রেকডাউন প্ল্যান' তখনই চালু করা হবে যখন স্পষ্ট প্রমাণ হবে যে আমাদের নীতি ব্যর্থ হয়েছে, এবং প্ল্যান চালু করবার আগে আপনি ক্যাবিনেটের অনুমতি নেবেন এবং পার্লামেন্টে ঘোষণা করবার পর এই কাজ করবেন।

কিন্তু এইখানে ঘটনার শেষ হল না। এরপর সমস্ত ঘটনা খুবই দ্রুতলয়ে ঘটে গেল। কারণ ক্যাবিনেটে ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করবার পর বিদেশ মন্ত্রী বেভিন প্রধানমন্ত্রী এটলীকে এক চিঠি লিখে জানালেন, 'আমি গতকাল ক্যাবিনেটে আলোচনা শুনবার পর হতাশ হয়েছি এবং সমস্ত ঘটনা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, নি[illegible] হবার কোন কারণ নেই। আমি চলে আসবার কোন নির্দিষ্ট দিন [illegible] করবার বিরোধী। আমি ঘোষণা করতে রাজি আছি, যেমন আগে করেছি যে, আমরা ভারতবর্ষকে চলতি সংস্থার মত কোন প্রতিষ্ঠিত সরকার কিংবা সরকারদের হাতে তুলে দিতে রাজি আছি। আমি সরকার বলতে বহুবচন ব্যবহার করেছি' ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২১]।

যদি নেহরু কিংবা জিন্না রাজি থাকেন, এবং তারা যদি আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন তাহলেই এ কাজ করা যাবে। আমি বুঝতে পারি ওয়েভেল আত্মবিশ্বাসহীন, এবং এর দরুণ সা[illegible]ক এবং পুলিশ বাহিনীর মধ্যে মনোবল দুর্বল হওয়া অতি স্বাভাবিক।

আমি সুপারিশ করছি যে ওয়েভেলকে ডেকে পাঠান হক এবং তার পরিবর্তে

এমন কোন সাহসী ব্যক্তিকে পাঠান হক যিনি মান-সম্মানের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পাততাড়ি গুটিয়ে আনতে পারবেন।

এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী এটলী বেভিনকে লিখলেন : আমি আপনার সঙ্গে একমত যে ওয়েভেল হলেন 'পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন' ব্যক্তি। আমি তাকে বদলি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

এটলী আরও লিখলেন, আমি 'পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন' ব্যক্তি নই। আমি বাস্তববাদী, যদি ব্রিটিশ সরকারকে চলে আসতে হয় তাহলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর আনুগত্য ও এক সর্বভারতীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।

* * *

১৯৪৭ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভাইসরয় ওয়েভেল সকালে তার সেক্রেটারী জর্জ আবেলের সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন। এমনি সময় এক গুচ্ছ চিঠি এবং টেলিগ্রাম তার টেবিলের উপর রাখা হল। একটি টেলিগ্রামে লেখা ছিল 'ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়'। ওয়েভেল নিজে টেলিগ্রামটি খুললেন এবং পড়বার পর আবার ব্রেকফাস্ট খেতে লাগলেন। তার মুখের রং কিংবা ভাবের কোন পরিবর্তন হল না। আবেল তার কর্তার মুখের রং দেখে বুঝতে পারলেন যে নিশ্চয় কোন গুরুতর কিছু ঘটেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবেল সোজা জিজ্ঞেস করলেন, কোন গুরুতর কিছু ঘটেছে স্যর ?

জর্জ, (আবেলের প্রথম নাম) আমাকে ওরা বরখাস্ত করেছে তারপর একটু চুপ করে থেকে ওয়েভেল আবার বললেন হয়ত তাঁরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিউনার্ড মোস্‌লে, পৃষ্ঠা-৫২]।

* * *

ওয়েভেলের বরখাস্ত নিয়ে পরে ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন হয়েছিল। এই আলোড়ন হবার কারণও ছিল। কারণ ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ বরখাস্ত হবার দুমাস আগে সেক্রেটারী অব স্টেটস, লর্ড পেথিক লরেন্স ওয়েভেলকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন কংগ্রেসের দুইজন প্রতিনিধি, লীগের দুইজন প্রতিনিধিকে নিয়ে লণ্ডনে আসেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কী করে এই জটিল সমস্যার সমাধান করা যায় তার আর একবার চেষ্টা করা হবে। ভাইসরয় একজন শিখ প্রতিনিধি বলদেব সিংকে এই ডেলিগেশনে যোগ দেবার প্রস্তাব করলেন। এই সময়ে বলদেব সিং অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারে 'ডিফেন্স মিনিস্টার' ছিলেন। প্রথমে নেহরু লণ্ডনে যেতে অস্বীকার করলেন কিন্তু পরে এটলী তাকে এক টেলিগ্রাম করে লণ্ডনে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

এটলী তার টেলিগ্রামে জানালেন আপনি যদি ভারতের স্বাধীনতা সমস্যার সমাধান ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন তাহলে খুশি হব, ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭]। নেহরু বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে আলোচনা করলেন এবং পরে তিনি এটলীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এর পর বলদেব সিং ও লণ্ডনে যেতে রাজি হলেন।

জিন্না প্রথমে যেতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু যেই তিনি খবর পেলেন নেহরু এবং বলদেব এটলীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন অমনি তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন তিনি যাবেন না। বেগতিক দেখে ভাইসরয় জিন্নার কাছে তার বিশেষ দূত পাঠালেন। এটলী জিন্নাকে এক টেলিগ্রাম করে তাকে লণ্ডনে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। পরে লিয়াকৎ আলি নিজে গিয়ে জিন্নাকে লণ্ডনে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। এরপর জিন্না লণ্ডনে যেতে রাজি হলেন। করাচির বিমান বন্দরে জিন্নাকে তুলে দেবার জন্যে এক বিরাট জনতা হাজির হয়েছিল।

জিন্না যখন ভাইসরয়ের বিশেষ প্লেনে উঠলেন তখন ঐ জনতা চিৎকার করে বলতে শুরু করল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।

* * *

লণ্ডন, ডিসেম্বর ১৯৪৬।

সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। শহরে আলো বাতির অভাব... লণ্ডনে পৌঁছে লর্ড ওয়েভেল প্রথমে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে তাঁর টপসিক্রেট নোট 'ব্রেকডাউন প্ল্যান' দিলেন।

৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে কনফারেন্স শুরু হল। পরে ৬ই ডিসেম্বর, ব্রিটিশ সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এই বিবৃতিতে বলা হল যে, শ্রেণী কিংবা শাখা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত (অন্য কোন চুক্তি না থাকবার দরুণ) অতি সাধারণ ভোট দ্বারা ঠিক করা হবে (ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্তানুযায়ী)।

এই সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগ গ্রহণ করেছে কিন্তু কংগ্রেস করেনি। ব্রিটিশ সরকারের আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল, এবং তাদের বক্তব্য হল যে, ১৬ই মে বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে ঐটে বলাই ছিল মিশনের উদ্দেশ্য। বিবৃতির এই অংশকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই ভাবে দুপক্ষকেই গ্রহণ করতে হবে।

এই যুক্তি দেবার পর যদি এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ফেডারেল কোর্টের (বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট) মতামতের জন্যে পাঠান দরকার বলে মনে করা হয় তাহলে সেই কাজটি অবিলম্বে করতে হবে।

জিন্না এই বিবৃতি গ্রহণ করতে রাজি হলেন তবে এক শর্তে যে, ফেডারেল

কোর্টের কাছে এই ব্যাপারটি পাঠাবার ব্যাপারে লীগ উৎসাহী নয় এবং যদি ফেডারেল কোর্টের কাছে এই ব্যাপারটি সিদ্ধান্তর জন্তে পাঠান হয় তবে এর মধ্যে লীগের নাম যেন না থাকে।

নেহরু বললেন যে, এই বিবৃতি হল ১৬ই মে'র আর একটি অংশ এবং এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

অতএব লণ্ডনের আলোচনা ব্যর্থ হল।

নেহরু ৬ই ডিসেম্বর দিল্লী ফিরে গেলেন। জিন্না 'ক্লারিজ হোটেলে' আরও দু-একদিন থাকলেন। কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

এই সময়ে জিন্নার বন্ধু কানজী দ্বারকাদাস গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে কানজী দ্বারকাদাস বললেন যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবর শুনে তিনি বিশেষ বিচলিত হয়েছেন।

দেশ! এই দুটি অক্ষর শুনে জিন্না প্রায় চিৎকার করে বললেন, দেশ বলতে কিছু নেই। আছে শুধু হিন্দু এবং মুসলমান। পরে তিনি কানজী দ্বারকাদাসকে বললেন যে 'পাকিস্তানের' ভিত্তিতে তিনি দেশের স্বাধীনতার সমস্যা সমাধান করতে চান। কানজী দ্বারকাদাসের আর একটি প্রশ্নের জবাবে জিন্না বললেন: লীগ এবং কংগ্রেসের একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। এর পর কানজী দ্বারকাদাস তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন, যদি কংগ্রেস নেতারা তার (জিন্নার) সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিন্ন না করতেন তাহলে হয়ত জিন্না এত তিক্ত, বিরক্ত হতেন না। তার আত্মভিমান, অহঙ্কার, গর্ব সব কিছু চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল। তিনি (জিন্না) এই সময়ে সবাইকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং কাউকে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি তার বুদ্ধি বিবেচনা হারান নি। কী করে বিরোধীর সঙ্গে লড়াই করতে হয় জানতেন এই ব্যাপারে অহঙ্কারী নেহরু হলেন তার সহজ এবং প্রধান শিকার ['টেন ইয়ার্স টু ফ্রীডম', কানজী দ্বারকাদাস, পৃষ্ঠা—১৯০-১৯১]।

ক্লারিজ হোটেলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই হোটেলে শিখ প্রতিনিধি বলদেব সিং-এর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না বলদেব সিংকে একটি দেয়াশলাইর বাক্স দেখিয়ে বললেন, বলদেব এই যে দেয়াশলাই'র বাক্স দেখছ, তুমি যদি এইটুকু ছোট পাকিস্তান আমাকে দিতে রাজি থাক তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে ঐ পাকিস্তান গ্রহণ করব। এই ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই··· যদি শিখরা এসে মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে আমরা এক গৌরবময় পাকিস্তান তৈরি করতে পারব। এই পাকিস্তানের সীমানা দিল্লীর দ্বারপ্রান্ত অবধি হবে ['নেহরু', প্রথম খণ্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা-৩৩৮]।

*   *   *

লণ্ডন কনফারেন্স শেষ হবার তিন দিন পরে সংবিধান সংসদের বৈঠক শুরু হল। শিখেরা প্রথমে এই সংসদে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু পরে নেহরু এবং প্যাটেলের অনুরোধে তারা সংসদে যোগ দিল।

নেহরু ৬ই ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, ভারত অন্য কারুর কাছ থেকে কোন পরামর্শ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। কারণ, নতুন ভারত জন্মগ্রহণ করছে।

এই সময় থেকে নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে অন্তর্কলহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হল। গান্ধীজি প্যাটেলকে এক চিঠি লিখে জানালেন... তুমি উত্তেজনা-মূলক বক্তৃতা দিচ্ছ। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মধ্যে একতা নেই।

এর জবাবে প্যাটেল বললেন, আমি মন্ত্রীসভার গদী আকড়ে ধরে থাকতে চাই, এ হল মিথ্যা অপবাদ।

প্যাটেল আরও বললেন, আমি শুধু জওহরলালের মিথ্যে হুমকি যে, সে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে পদত্যাগ করতে চায় তার সমালোচনা করছিলাম। এই হুমকি কংগ্রেসের সম্মানকে ম্লান করবে, এবং চাকুরিজীবীদের মনোবলের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। পদত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে ফাঁকা হুমকি দেবার দরুণ আমরা ভাইসরয়ের কাছে আমাদের সম্মান হারিয়েছি এবং তিনি আমাদের পদত্যাগের হুমকি শুনলে মনে করেন আমরা শুধু ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছি। আজ যদি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির মধ্যে কোন বিভেদ থাকে তবে সেই বিভেদ দীর্ঘকালের এবং পুরাতন ['নেহরু', মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা-৩৩১ এবং 'মহাত্মা গান্ধী দি লাষ্ট ফেজ', প্রথম খণ্ড, প্যারেলাল, পৃষ্ঠা—০ --৫৮৯]।

দীর্ঘকাল ধরে নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের ঝগড়া বিবাদ চলছিল। পরে এই কলহ তীব্র হল। গান্ধীজি তার মৃত্যুর দিন এই ঝগড়া বিবাদের সমাধান করবার জন্যে দুই নেতাকে তার কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক হল এবং গান্ধীজির নির্দেশে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব নামমাত্র গ্রহণ করা হল এবং শিখদের ইচ্ছেমত তাদের এক Carte Blanche দেওয়া হল। কংগ্রেসের এই অনুমোদন প্রস্তাব ৯৯-৫২ ভোটে গ্রহণ করা হল এবং ৮০ জন কোন অংশ গ্রহণ করলেন না।

২০শে জানুয়ারী সংবিধান সংসদের বৈঠকে লীগ যোগ দিল না। পরে লীগ কংগ্রেসের প্রস্তাবকে 'শঠতা' বলে বর্ণনা করল।

*　　　*　　　*

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের জন্যে নতুন ভাইসরয়ের অনুসন্ধানে ছিলেন। ১৯৪২ সালে চার্চিল যখন লর্ড লিনলিথগোর বদলি ভাইসরয়ের সন্ধানে ছিলেন তখন প্রাক্তন সেক্রেটারী অব স্টেটস আমেরী চার্চিলের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে ভাইসরয় করে পাঠান হ'ক। (মাউন্টব্যাটেন : জিগলাব, পৃষ্ঠা-৩৫৪] কিন্তু চার্চিল এই প্রস্তাবে কোন কান দেননি। নয়মাস পরে আবার তার নাম প্রস্তাব করা হল। অতএব ১৯৪৬ সালে এটলী যখন নতুন ভাইসরয়ের সন্ধানে ছিলেন তখন সর্বপ্রথম মাউন্ট-ব্যাটেনের কথাই শ্রমিক প্রধানমন্ত্রীর মনে হল। বিভিন্ন কারণে মাউন্টব্যাটেনের নাম তাঁর মনোঃপূত হল। প্রথমে মাউন্টব্যাটেন হলেন রাজার জ্ঞাতি ভাই। তিনি দূরপ্রাচ্যে বেশ সাফল্যর সঙ্গে লড়াই করে মিত্র শক্তির অন্য দেশগুলির কাছে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন তার নেহরুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং কৃষ্ণমেনন ক্রীপসকে বলেছিলেন যে কংগ্রেস নেতারা মাউন্টব্যাটেনকে 'কর্মতৎপর এবং সক্রিয় ব্যক্তি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এবং তিনি সর্বধরনের লোকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারেন· এবং তার স্ত্রী ছিলেন 'অসাধারণ মহিলা' ['মাউন্টব্যাটেন', জিগলার, পৃষ্ঠা-৩৫৪]।

প্রথমে মাউন্টব্যাটেন ভারতে ভাইসরয় হয়ে যেতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৯৪৬ সালে ১৮ই ডিসেম্বর এটলী যখন মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয়ের পদটি গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করলেন তখন মাউন্টব্যাটেন এক শর্ত আরোপ করলেন। 'যদি ভারতের বিভিন্ন নেতারা তাকে ভাইসরয় হবার জন্যে আমন্ত্রণ করেন তাহলেই তিনি ভারতে ভাইসরয় হয়ে যাবেন'। কিন্তু যখন তাকে বলা হল বিভিন্ন নেতাদের কাছ থেকে এই ধরনের সাদর আমন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব নয় তখন তিনি এই প্রস্তাব নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করলেন না। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৬ এবং ৪৫১]।

আবার মাউন্টব্যাটেন দাবী করলেন ভারতের নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার জন্যে একটি নির্দিষ্ট মাস, দিন ঠিক করা হক। যদি কোন দিন ঠিক না করা হয় তাহলে ভারতীয় নেতারা বিশ্বাস করবেন না যে, মাউন্টব্যাটেন এই দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র গুটিয়ে নেবার জন্যে এসেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, লর্ড ওয়েভেল তার 'ব্রেকডাউন প্ল্যানে' ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ৩১শে মার্চ ১৯৪৮-এর মধ্যে গুটিয়ে নেবার প্রস্তাব করেছিলেন এবং তার এই প্রস্তাব শ্রমিক দলের মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

এর জবাবে এটলী বললেন কোন এক নির্ধারিত দিনে ভারত থেকে চলে

আসবার দিন ঘোষণা এখন করা বিবেচকের কাজ হবে না। আমরা কোন্ সময়ে চলে আসব সেইটা পরে ঘোষণা করব ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৫]।

পরে এটলী মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরিতের দিন হল, ১৯৪৮ সালে ১লা জুন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭৩]।

অনেকে বলেন যে, ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার ভাইসরয় হিসাবে মাউন্টব্যাটেনকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন কিন্তু, ব্রিটিশ সরকারের কোন কাগজপত্রে মাউন্টব্যাটেনকে বিশেষ ক্ষমতা দেবার কোন উল্লেখ নেই। বরং যখন তার প্রস্তাবের অদল-বদল করবার প্রয়োজন হয়েছিল তখন তিনি ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পাবার জন্যে লণ্ডনে গিয়েছিলেন ['মাউন্টব্যাটেন', জিগলার, পৃষ্ঠা—৩৫৫-৩১৬]।

এ ছাড়া মাউন্টব্যাটেন দাবী করলেন যে, লর্ড পেথিক লরেন্সকে সেক্রেটারী অব স্টেটসের পদ থেকে সরান হক। এর পরিবর্তে তিনি অনুরোধ করলেন এমন কাউকে সেক্রেটারী অব স্টেটস হিসাবে নিয়োগ করা হক যার সঙ্গে তিনি সহজে কাজ করতে পারেন। এ ব্যাপারে এটলী সহজে রাজি হলেন। কারণ তিনি পেথিক লরেন্সকে 'বিরক্তিকর' বলে মনে করতেন। মাউন্টব্যাটেন পেথিক লরেন্সের স্থানে লর্ড লিস্টওয়েলের নাম প্রস্তাব করলেন। এটলী রাজি হলেন ['মাউন্টব্যাটেন', জিগলার, পৃষ্ঠা-৩৫৬]।

কারণ লর্ড মাউন্টব্যাটেন বললেন যে লিস্টওয়েলের ভারত প্রীতি এবং জ্ঞান আছে এবং আমি তার সঙ্গে সহজেই কাজ করতে পারব। ইতিমধ্যে ক্রীপস বললেন যে, তিনি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ভারতে যেতে রাজি আছেন এবং ওখানে গিয়ে তিনি মাউন্টব্যাটেনের অধীনে কাজ করবেন।

ক্রীপসের এই প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেনকে আত ঙ্ক করল। তিনি সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে ক্রীপসকে ভারতে নিয়ে গিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে তার কাজ করবার ব্যাপারে কোন অসুবিধে সৃষ্টি করতে চান না। বরং তিনি যেন ক্রীপসকে ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেটসের পদটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন এবং 'তাহলে তিনি তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন' ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫২]।

মাউন্টব্যাটেন এটলীকে বললেন: যদি ক্রীপসের মত অভিজ্ঞ এবং সম্মানীয় লোক আমার সঙ্গে যায় তাহলে আমি হব ঠুটো জগন্নাথ ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫১]।

পরে ক্রীপস যে পদে ছিলেন সেই পদেই রয়ে গেলেন। লর্ড লিস্টওয়েল

হলেন নতুন সেক্রেটারী অব স্টেটস।

ফিল্ড মার্শাল লর্ড ইসমে হলেন মাউনব্যাটেনের 'চীফ অব দি স্টাফ'। এর আগে 'চীফ অব স্টাফ' বলে কোন পদ ছিল না। কিন্তু এটলী মাউণ্টব্যাটেনকে বলেছিলেন তিনি তার ইচ্ছামত লোক তার সঙ্গে নিতে পারবেন। অতএব তিনি যখন লর্ড ইসমের নাম চীফ অব স্টাফের পদের জন্যে প্রস্তাব করলেন, এটলী কোন আপত্তি করলেন না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, যৌবনে লর্ড ইসমে ভারতের সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। এ-ছাড়া মাউণ্টব্যাটেন আর চারজন নিজস্ব লোক তার সঙ্গে আনলেন। এর মধ্যে তার প্রেস সেক্রেটারী, এ্যালান-ক্যাম্পবেল জনসনের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা সবাই মাউণ্টব্যাটেনকে প্রথম নাম ধরে ডাকতেন। ভাইসরয়ের নিজস্ব কর্মচারিদের মধ্যে তিনি 'ডিকি বাও' নামে পরিচিত ছিলেন। বিদায় নেবার আগে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ মাউন্টব্যাটনকেএক চিঠি লিখে জানালেন—Edwina will of course do wonders with all her knowledge and experience gained during war years. ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫৪]।

* * *

ডিসেম্বরে ওয়েভেল যখন লণ্ডনে গিয়েছিলেন তখন তিনি এটলী এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ঐ সময়েই এটলী মাউণ্টব্যাটেনকে ভাইসরয়কে পদটি গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। লণ্ডনে থাকাকালীন ওয়েভেল এই নিয়োগের খবর কিছুই জানতে পারেন নি। কিন্তু, তাকে যে একমাসের নোটিশে ছাঁটাই করা হবে তিনি আশা করেননি। কারণ ভাইসরয়ের পদের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছরের। তবু পাকা ইংরেজ সেনার মত তিনি প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ কিংবা হৈ-হল্লা করলেন না। কিন্তু এটলীর কাছে এক চিঠি লিখে বললেন যে, এই ভাবে 'সম্রাটের প্রতিনিধিকে' বরখাস্ত করা এই পদের মানমর্যাদার দিক থেকে খুব সম্মানজনক নয়।

এরপর ২০শে ফেব্রুয়ারী, এটলী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক ঘোষণায় বললেন ব্রিটিশ সরকার তাদের ক্ষমতা সর্বদলের স্বীকৃত এক সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের হাতে তুলে দিতে চান। ব্রিটিশ সরকার আরও স্পষ্ট ভাবে বলতে চান যে, তাদের ইচ্ছা জুন ১৯৪৮-এর আগে এই ক্ষমতা দায়িত্বশীল ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তরিত করা হবে।

অতএব সব দল যেন তাদের বিভেদকে ভুলে যাবার চেষ্টা করে কারণ আগামী বছর তাদের এই ক্ষমতা হাতে নিতে হবে।

কংগ্রেস এবং লীগ এই বিবৃতিতে আনন্দ প্রকাশ করল। পরে ৫ই মার্চ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত নিয়ে আলোচনা শুরু হল। সরকারের পক্ষে বক্তৃতা দিলেন স্যর স্টাফোর্ড ক্রীপস। বিরোধী দলের বক্তৃতা দিলেন উইনষ্টন চার্চিল। তিনি বললেন যে, শ্রমিক সরকার শুধু দেশভাগ করছেন না তারা দেশকে টুকরো টুকরো করছেন। তিনি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। ['জিন্না', ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩১০]।

এটলী পার্লামেন্টে তার বক্তৃতায় আরও স্বীকার করলেন যে, ভারতে 'ধনী দরিদ্রের বৈষম্য' এবং ধনসম্পদের অসমতা আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইংরেজ শাসনের সব সময়েই এই সমতার অভাব ছিল। 'দেশের জমিদারদের হটাবার জন্যে আমরা কোন চেষ্টাই করিনি। কিন্তু যারা টাকা ধার দেয় তাদের হটাবার কিছু চেষ্টা করেছি। আমরা ভারতের আর্থিক এবং সামাজিক নিয়মকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ ইংরেজ শাসনের শেষভাগে এই নিয়ম পরিবর্তন করা সম্ভব নয় ['জিন্না', ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩১১]।

পরে শ্রমিক সরকারের প্রস্তাব ৩৩৭ ভোট পক্ষে এবং বিপক্ষে ১৮৫ ভোট গ্রহণ করা হল।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে গোলমাল হাঙ্গামা শুরু হল। খিজির হায়াৎ খান পাঞ্জাবের পুলিশ দ্বারা মুসলীম লীগের ন্যাশনাল গার্ডদের মিছিল সভা বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। লীগের এই সব ন্যাশনাল গার্ড ছিল জার্মানীর 'গেষ্টাপো' বাহিনীর মত। পরে বাধ্য হয়ে ২রা মার্চ খিজির হায়াৎ খান পদত্যাগ করলেন।

পাঞ্জাবের মুলতান শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় অনেক লোকজন মারা গেল, কিন্তু মৃতের চাইতে আহতের সংখ্যা হল আরও বেশি। পাঞ্জাবে মামদোতের নবাব লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। একমাত্র তপশীলি এবং ক্রিশ্চিয়ানদের সমর্থন ছাড়া আর কোন সদস্যরা অর্থাৎ হিন্দু, শিখ তাকে সাহায্যর কোন প্রতিশ্রুতি দিল না।

তারপর অমৃতশহরে হাঙ্গামা শুরু হল। শুরু হল লুটতরাজ এবং অনেক বাড়িতে দালানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। পরে রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোটে, জলন্ধরে হাঙ্গামা শুরু হল।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এক বিশেষ অধিবেশনে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরিত সুষ্ঠু এবং বিনা হাঙ্গামায় হওয়া আবশ্যক। এ ছাড়া বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের মর্যাদা দিতে হবে।

* * *

১৯৪৭ সালে কংগ্রেস লীগ এবং ব্রিটিশ সরকার ছাড়া আরও কিছু উল্লেখ-

যোগ্য রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মহারাজা রাজকুমারদের নাম বলা দরকার। প্রথমত শিখ সম্প্রদায়ের কথা বলা প্রয়োজন। এরা সংখ্যায় খুব বেশি বড় না হলেও, ১৯৪৭ সালের এরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাখ ছিল এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রান্তে এরা ছড়িয়ে ছিল। সাধারণত শিখরা ইংরেজের সৈন্য-বাহিনীতে কাজ করত। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই দেশে আসবার আগে শিখ সম্প্রদায় বিশেষ চিন্তিত ছিল। কারণ পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তারা মুসলিম লীগের শাসনে পাকিস্তানে কিংবা বিভক্ত পাঞ্জাবে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে থাকতে অস্বীকার করল। কারণ ক্যাবিনেটের মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাব গ্রুপ অর্থাৎ মুসলিম শাসিত অংশের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা ছিল।

এই সময়ে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে বলদেব সিংকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ডিফেন্স মিনিস্টার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ছিল মাষ্টার তারা সিং। তিনি পাঞ্জাবী শিখদের দ্বারা গঠিত 'খালিস্তানের' প্রধান নেতা হবার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৪৭ সালে মাষ্টার তারা সিং-এর বয়স হয়েছিল ৭১ বৎসর।

আর একজন উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ছিল ডাঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকার। তার বয়স ছিল ৫৪। এবং তিনি ছিলেন তপশীলি দলের নেতা। পরে ভারতের সংবিধান রচনায় ডাঃ আম্বেদকর ছিলেন প্রধান।

আম্বেদকর তপশীলিদের নেতা হিসাবে একটি পৃথক সংস্থা গঠন এবং বিশেষ সুবিধা দাবী করেছিলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। ব্রিটিশ সরকার এদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে গান্ধীজি তার ঐতিহাসিক অনশন শুরু করলেন। এর দরুণ তপশীলিদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হল না। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে তপশীলিদের আরও বেশি আসন দেওয়া হল।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগে দুটি ভারতবর্ষ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ, অর্থাৎ যে সব প্রদেশের উপর ইংরেজের সোজাসুজি শাসন বলবৎ ছিল, এবং যে সব প্রদেশে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইংরেজদের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবং সংগ্রাম করছিল। দ্বিতীয়ত, নৃপতি শাসিত ভারতবর্ষ অর্থাৎ রাজা-মহারাজাদের রাজ্য। ১৯৪৭ সালে দেশে ৬০১টি বড় নৃপতি শাসিত রাজ্য ছিল এবং এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় আট কোটি অর্থাৎ ঐ সময়কালে ভারতের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ ছিল। এদের মধ্যে সবচাইতে বড় নৃপতি শাসিত রাজ্য ছিল হায়দ্রাবাদ। যার শাসক ছিলেন

নিজাম। এছাড়া অন্যান্য বড় রাজা-মহারাজাদের মধ্যে গায়কোয়ার (বরোদা), নওনগরের জামসাহেব, জয়পুর, কাশ্মীরের মহারাজার নাম উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ রাজা-মহারাজাদের সুনামের চাইতে দুর্নামই বেশি ছিল। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু রাজা উদারপন্থী ছিলেন, যেমন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা। তিনি অস্পৃশ্যদের জন্যে তার রাজ্যে মন্দিরের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। আবার কাশ্মীরের মহারাজার এত ধনদৌলত ছিল যে তিনি টাকা দিয়ে (কুড়ি পাউণ্ড থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড) ইংল্যাণ্ডে, প্যারিসে, মহিলা গণিকাদের ক্রয় করতেন এবং আমোদ-আহ্লাদ করতেন। এ ছাড়া তিনি ব্ল্যাকমেলের টাকা দেবার জন্যে প্রায় দেড লাখ পাউণ্ড খরচ করেছিলেন। জুনাগড়ের নবাব হাসপাতালের চাইতে তার কুকুরের পেছনে বেশি টাকা খরচ করতেন। একবার আলোয়ারের মহারাজা তার ঘোডদৌডের ঘোড়াকে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করেছিলেন। কারণ, তার ঘোড়া রেসে বাজি জিততে পারেনি।

এই সব নৃপতিরা ইংরেজ শাসককে প্রধান কর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। বিদেশী কাজ-কারবারে এরা ইংরেজের নির্দেশানুযায়ী কাজ করত। এবং ব্রিটিশ সম্রাটকে তাদের অধিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রয়োজন বোধে এই সব নৃপতি শাসিত প্রদেশে তাদের আভ্যন্তরীণ কাজ কারবারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের ছিল।

সাধারণত রাজ-মহারাজারা কোন কেলেঙ্কারী না করলে ব্রিটিশ সরকার তাদের রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। বড় বড় সব রাজাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র, প্রধানমন্ত্রী এবং সৈন্যবাহিনী কাষ্টমস, ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ ছিল। এরা ইচ্ছেমত ট্যাক্স বসাত এবং আদায় করত।

যুদ্ধের কিছু আগে এই সব নৃপতিরা এক হয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন যার নাম ছিল 'চেম্বার অব প্রিন্সেস'

মাউন্টব্যাটেন যখন ভারতে ভাইসরয় হয়ে এলেন তখন এই চেম্বার অব প্রিন্সেসের অধিকর্তা অর্থাৎ চ্যান্সেলর ছিলেন একজন মুসলমান, ভূপালের নবাব। সাধারণত নৃপতি শাসিত দেশগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা ভূপালের নবাবের সঙ্গে করা হত।

ভূপালের নবাব বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন। এবং ইংরেজ শাসনের অবসান হবে অতএব স্বাধীন ভারতে এই সব নৃপতিদের স্থান কী হবে এই নিয়ে ভূপালের নবাব ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন। ক্রীপস মিশনে এবং ক্যাবিনেট মিশনের

সময় 'চেম্বার অব প্রিন্সেসের' প্রতিনিধিরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

ভূপালের নবাবের ইচ্ছা ছিল যে দেশের এই রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় এবং সমাধানের সময় ভারতের নৃপতি শাসিত দেশগুলি এবং তাদের রাজা-মহারাজারা হবেন এক তৃতীয় শক্তি। (ভূপালের নবাব চিন্তা করেননি যে তপশীলিদেরই তৃতীয় শক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে) তাদের (নৃপতিদের) উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লীগের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করবে এবং পাকিস্তান গঠন হলে এই সব নৃপতি শাসিত প্রদেশগুলি এক সংযুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে দুই দেশ থেকে তাদের অনেক সুখ-সুবিধা আদায় করবে।

ভূপালের নবাব নিজে ছিলেন কংগ্রেস বিরোধী এবং মুসলিম লীগের সপক্ষ। কিন্তু ভূপালের নবাবের এই হিসাবে কিছু ভুল এবং দুর্বলতা ছিল। প্রথমত নৃপতি শাসিত দেশগুলির মধ্যে অর্থাৎ রাজা-মহারাজাদের একের অন্যের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না।

অতএব এক শক্তিশালী সংগঠিত শক্তি হিসাবে এদের কংগ্রেসের বিরোধিতা করবার মত কোন ক্ষমতা কিংবা সাহস ছিল না। ভূপালের নবাব ভুলে গিয়েছিলেন যে অধিকাংশ রাজা-মহারাজারা ছিলেন 'অপদার্থ'। তিনি কল্পনা করেননি যে কংগ্রেস ছিল এক শক্তিশালী জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া এই সব নৃপতি শাসিত প্রদেশগুলিতে বহু কংগ্রেস আন্দোলনকারীরা বিশেষ তৎপর ছিল। বিভিন্ন নৃপতি শাসিত প্রদেশে কংগ্রেসের সমর্থিত কিছু কিছু রাজনৈতিক দল রাজা-মহারাজাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করছিল। এদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দল ছিল কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লা পরিচালিত 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রদেশ ছিল হায়দ্রাবাদ। তার কেন্দ্রে ইংরেজ পরামর্শদাতার নাম ছিল স্যর ওয়াল্টার মনকটন। মাউন্টব্যাটেন এই দেশে আসবার আগেই হায়দ্রাবাদের নিজাম ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন তিনি স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের রাজত্বে কোন অংশ গ্রহণ করবেন না। এই বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করবার জন্য তার প্রধানমন্ত্রী ছত্র রীর নবাব এবং পরামর্শদাতা স্যর ওয়াল্টার মনকটনকে লর্ড ওয়েভেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এদের মারফৎ ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে ছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার এ দেশ থেকে চলে গেলে তিনি হায়দ্রাবাদকে 'স্বাধীন' বলে ঘোষণা করবেন।

নৃপতি শাসিত দেশগুলিতে আর একজন ইংরেজ সরকারি কর্মচারি বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার নাম ছিল স্যর কনরাড করফিল্ড।

যদিও তিনি ভাইসরয়ের অধীনে কাজ করতেন তবু তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং বিভিন্ন নৃপতিশাসিত প্রদেশে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি যাকে 'রেসিডেন্ট' বলা হত—নিয়োগ করতেন। এই কারণে স্যর কনরাড খুবই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন।

স্যর কনরাডও কংগ্রেস দলকে সুচোখে দেখতে পারতেন না।

* * * *

লর্ড ওয়েভেল এই দেশ থেকে বিদায় নেবার আগে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব করেছিলেন: এক ৩১শে মার্চ ১৯৪৮ এর মধ্যে ইংরেজ সরকার এই দেশ থেকে চলে যাবে। দুই, যাবার সময় দেশকে ভাগ করতে হবে। এই প্রস্তাব করবার জন্যে এটলী সরকার ওয়েভেলকে ভাইসরয়ের পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন দেশ ভাগ করা এবং ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭'র মধ্যে দেশ থেকে চলে যাবার প্রস্তাব করলেন তখন তারা সানন্দে এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিলেন। এই দেশ ভাগের শেষের অঙ্ক এবং ১৫ই আগষ্টের ১৯৪৭'র ইংরেজ সরকারের দেশ থেকে চলে যাবার এই কাহিনী এবার বলা দরকার।

* * * *

মাউন্টব্যাটেন ভেবেছিলেন এই ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবার আগে তিনি একবার বিদায়ী ভাইসরয়ের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু সময়ের অভাবে তা ওয়েভেলের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

২২শে মার্চ, ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন দম্পতি দিল্লীতে এসে পৌঁছুলেন। ওয়েভেল মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে (বিদায়ী ওয়েভেল) ডিসেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন এটলী মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় হবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। এই খবর শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন সিঙ্গাপুরে প্রথমে নেহরুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'পণ্ডিত নেহরু আন্তরিক' মাউন্টব্যাটেন পরে বলেছিলেন।

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই মাউন্টব্যাটেন নেহরুর চরিত্রের দুর্বলতা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন। সুযোগ পেলেই নেহরু তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মজার বৈঠকী গল্প করতে ভালবাসতেন। নেহরুর কাছ থেকে মাউন্টব্যাটেন অন্য নেতাদের জীবনের অনেক গোপন কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। এ ছাড়া নেহরু তোষামোদও ভালবাসতেন।

মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে বলেছিলেন, 'মিষ্টার নেহরু' আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ভাইসরয় নই, আমি হলাম নতুন ভারতের প্রথম পথপ্রদর্শক [দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ, লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১৪]।

পরে মাউন্টব্যাটেন ইচ্ছে করে নেহরুকে জিন্না সম্বন্ধে তার কী মত জানতে চাইলেন।

নেহরু এর জবাবে বললেন : একটা কথা জানা উচিৎ যে তিনি (জিন্না) খুব পরিণত বয়েসে সফল হয়েছেন মানে ষাট বছর বয়েসে। এর আগে তিনি ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন না। আইনজীবী হিসাবে তিনি সফল হয়েছিলেন, তবে তাকে খুব বড় এবং ভাল আইনজীবী বলা যায় না। তার জীবনের সফলতার গোপন কারণ হল তার মনের অত্যাধিক 'তীব্র আবেগ' এবং তার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি জানতেন যে পাকিস্তান নিয়ে সংগঠনমূলক সমালোচনা করা সম্ভব নয় এবং তিনি এই প্রশ্নটির কোন সমালোচনাও করেননি।" [মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন : এ্যালান-ক্যাম্পবেল জনসন, পৃষ্ঠা-৪১]।

নেহরুর এই বিবৃতি থেকে তার, জিন্না বিরোধী চিন্তাধারা এবং মতামত স্পষ্ট জানা যায়।

নেহরু এবং কংগ্রেস নেতারা প্রথম থেকেই মাউন্টব্যাটেনকে তাদের বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত করলেন। এবং নেহরু হলেন মাউন্টব্যাটেনের দরবারে কংগ্রেস মুখপাত্র।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এবং তার স্ত্রী এডউইনা গান্ধীজি অথবা জিন্নার উপর অত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারলেন না যদিও গান্ধীজি এবং মাউন্টব্যাটেন একে অন্যকে অপছন্দ করতেন না। [মাউন্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা-৩৬৮]।

জিন্না মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন : 'গান্ধীজির হাতে রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা কিন্তু তার কোন দায়িত্ব নেই। তিনি যে কোন চুক্তিকে অসুবিধাজনক করে তুলতে পারেন এবং নিজে কোন কিছুর দায়িত্ব নিতে চান না'। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজির ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজিকে দিল্লীতে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। গান্ধীজি ৩১শে মার্চ মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এসে দেখা করলেন এবং তারপর ৩১শে মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল পাঁচবার মাউন্টব্যাটেন-গান্ধীজি প্রায় দশঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করলেন।

মাউন্টব্যাটেন সাধারণত কোন বৈঠকে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা একেবারেই পছন্দ করতেন না। কারণ তিনি বলতেন যে ব্যক্তি এক ঘণ্টার মধ্যে

তার কথা গুছিয়ে না বলতে পারে তার কথায় শোনবার মত কিছু থাকে না ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-৯৫]। এবং মাউন্টব্যাটেন জানতেন যে, গান্ধীজি হলেন ভারতের রাজনৈতিক খেলায় সবচাইতে দক্ষ এবং চতুর খেলোয়াড়। অতএব তিনি বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে বিবিধ বিষয় নিয়ে, গান্ধীজির প্রথম জীবন, তার সংগ্রাম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলেন। [মাউন্টব্যাটেন, জিগলার, পৃষ্ঠা-৩৬৯]।

প্রথম দিন গান্ধীজি প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। এই আলাপ আলোচনার পর গান্ধীজি প্রস্তাব করলেন যে, কংগ্রেস লীগের মধ্যে ঝগড়ার জন্যে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করবার সব চাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা হল যে ভাইসরয় জিন্নাকে তার নিজস্ব লোকদের নিয়ে এক সরকার গঠন করবার সুযোগ দেবেন। ইচ্ছে করলে জিন্না এই সরকারে সব মুসলমান কিংবা মুসলমান হিন্দু মিলিয়ে গঠন করতে পারেন। কংগ্রেস এই সরকারকে সমর্থন করবেন অবশ্যি যদি জিন্না প্রতিশ্রুতি দেন দেশবাসীদের স্বার্থকে তিনি রক্ষা করবেন। কোন বিষয়টি দেশবাসীর স্বার্থের হিতে কিংবা স্বার্থ বিরোধী হতে পারে তার বিচার করবার পুরো দায়িত্ব মাউন্টব্যাটেনের উপর থাকবে। কোন 'ন্যাশনাল গার্ড কিংবা প্রাইভেট আর্মি রাখা চলবে না'।

'এই কাঠামোর ভেতর জিন্না 'পাকিস্থান' স্কীমটি গ্রহণ করতে পারবেন, এমন কী ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই… অবশ্যি যদি তিনি ভিন্ন অস্ত্র প্রয়োগ না করেন এবং দেশবাসীর কাছে আবেদন করে সফল পান। যদি জিন্না এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে ভাইসরয়কে এরই অনুকরণে একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের কাছে পেশ করতে হবে [জিন্না, ওলপোর্ট', পৃষ্ঠা-৩১৬ এবং 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৪]।'

গান্ধীজি প্রথম যেদিন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সেই দিন তার দৌহিত্রী মানুগান্ধী তার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

গান্ধীজি মাউন্টব্যাটেনকে জিজ্ঞেস করলেন মানু ভাইসরয়ের বাগানটি ঘুরে দেখতে পারেন কিনা? নিশ্চয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন জবাব দিলেন। তিনি ছিলেন অতি চতুর ব্যক্তি। কী করে তার অতিথিকে আপ্যায়ন এবং আকর্ষণ করতে হয় তিনি জানতেন।

তিনি মানুকে বললেন, নিশ্চয় তুমি এই বাগান ঘুরে দেখতে পার। এ বাগান তোমাদেরই। আমরা শুধু রক্ষক আমরা এই সব তোমাদের হাতে তুলে দিতে এসেছি [গান্ধী, দি লাষ্ট ফেজ, প্যারেলাল পৃষ্ঠা-৭৮]।

মাউন্টব্যাটেনের এই জবাব শুনে গান্ধীজি খুশি হলেন। কিন্তু তবু তিনি

ব্রিটিশ সরকারের গূঢ় ইচ্ছা যেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজির এই প্রস্তাব নিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন। তারা সবাই একসঙ্গে মন্তব্য করলেন পাগল হয়েছেন। এই প্ল্যান কখনই কাজ করতে পারবে না। অবশ্যি মাউন্টব্যাটেন এই প্ল্যানের মধ্যে কিছু নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতারাও গান্ধীজির এই প্রস্তাব শুনে আতঙ্কিত হলেন এবং সবাই এই প্ল্যানকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

গান্ধীজি যখন এই প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেনের কাছে করেছিলেন তখন ভাইসরয় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার এই প্রস্তাব শুনে জিন্নার মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে বলতে পারেন ?

গান্ধীজি হাসলেন। বললেন, যদি আপনি তাকে বলেন যে, এই প্রস্তাব আমি করেছি তাহলে উনি বলবেন, আমি শুধু ছলনা করছি।

তাহলে কী জিন্না সত্যি কথা বলবেন ? মাউন্টব্যাটেন জিজ্ঞেস করলেন ?

না, এই প্রস্তাব আমি আন্তরিক ভাবেই করেছি, গান্ধীজি এর জবাব দিলেন। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯]।

গান্ধীজি প্রথমে ভেবেছিলেন যে তার এই প্রস্তাব নিয়ে সরকারিভাবে আলাপ-আলোচনা করা হবে। কিন্তু যখন তার এই প্রস্তাব নিয়ে কোন আলোচনা করা হল না তখন তিনি মনে ব্যথা পেলেন। এদিকে নেহরু কল্পনাই করতে পারলেন না যে, গান্ধীজি 'তার' নেহরুর পরিবর্তে জিন্নাকে প্রধানমন্ত্রী করবার প্রস্তাব করেছেন। পরে তিনি এই প্রস্তাবকে 'অবাস্তব' বলে বর্ণনা করলেন।

নেহরু মন্তব্য করলেন যে 'গান্ধীজি সমস্যা সমাধান করবার যে প্রস্তাব করেছেন এই প্রস্তাব অকার্যকরী। গান্ধীজির কিছুদিনের জন্যে দিল্লীতে থাকা দরকার। তিনি চারমাস ধরে দিল্লীর বাইরে আছেন এবং কেন্দ্রের ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 'প্যাটেল ও অনুরূপ মত প্রকাশ করলেন। বললেন বুড়োকে আবার পুরো ঘটনার সঙ্গে পরিচিত করা দরকার'। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭০]।

গান্ধীজি নিরাশ হয়ে আবার বিহার চলে গেলেন। দেশের এই সংকটক্ষণে গান্ধীজির দিল্লী থেকে চলে যাওয়া উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। গান্ধীজি ভাইসরয়কে তার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করবার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করলেন না, তবু গান্ধীজি বুঝতে পারলেন যে, ভাইসরয়ের কর্মচারীরা তার প্রস্তাবকে বানচাল করেছে।

গান্ধীজির বিহারে চলে যাবার পর দেশের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের

ব্যাপার নিয়ে তিনি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আর কোন আলোচনা করেননি। গান্ধীজি দেশভাগের বিরোধী ছিলেন একথা মাউন্টব্যাটেন জানতেন। তিনি আরও জানতেন যদি গান্ধীজি প্রকাশ্যে দেশভাগের বিরোধিতা করেন তাহলে তিনি যে সব প্রস্তাবে কংগ্রেস এবং ভারতীয় নেতাদের কাছে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

অতএব 'সুচতুর' মাউন্টব্যাটেনে দেশে পৌঁছুবার পনের দিনের মধ্যে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সর্ব প্রধান সংগ্রামীকে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রধান বাধা এবং বিঘ্নকে সুকৌশল করে এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে সরিয়ে দিলেন।

এখানে বলা প্রয়োজন গান্ধীজি কী ইচ্ছে করে এই আলোচনা থেকে দূরে সরে এসেছিলেন? হয়ত তিনি নেহরুর প্রধানমন্ত্রীর হবার পথের বাধা হতে চাননি। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশ স্বাধীন হবার এই শেষ সুযোগ। হয়ত ঐ সময়ে কংগ্রেস যদি ক্ষমতা না গ্রহণ করত তাহলে দেশের ক্ষমতা বামপন্থীদের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিংবা তিনি হয়ত আই-এন-এর এবং বোম্বাই'র নৌবিদ্রোহে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যদি তিনি দিল্লীতে সবসময়ে উপস্থিত থাকেন তাহলে কংগ্রেসের দেশভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা তাকে আরও জোরালোভাবে করতে হবে। হয়ত তিনি এই বিরোধিতা করতে চাননি। গান্ধীজি এই সংকট মুহূর্তে দিল্লীর বাইরে ছিলেন বলে ইংরেজ শাসনকর্তৃবিদেরা এবং বিদেশী সংবাদপত্র গান্ধীজির দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা পরিভ্রমণকে প্রশংসা করলেন এবং বললেন গান্ধীজির এই ভ্রমণ হল 'One Man's Peace Misson'. উক্তি থেকে বোঝা গেল ব্রিটিশ সরকারের পথের কাঁটা দূর হল। গান্ধীজি দিল্লী থেকে দূরে থাকবার দরুণ দেশভাগ খুব সহজেই হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দিল্লী ... ভাবে, সহস্র লোক প্রাণ হারিয়েছিল। হয়ত গান্ধীজি চেষ্টা করলে এই বিপর্যয় রোধ করতে পারতেন? যদিও আজ দীর্ঘকাল বাদে এ নিয়ে আলোচনা করবার কোন সার্থকতা নেই।

এরপর মাউন্টব্যাটেন সর্দার প্যাটেলকে বশ করবার চেষ্টা করলেন। তাদের প্রথম আলোচনা খুব শুভ হল না। প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনের কাছে স্মারক লিপি পাঠিয়ে তার (ভাইসরয়ের) ইংরেজ কর্মচারীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন এই স্মারকলিপির ভাষায় প্রতিবাদ করলেন এবং প্যাটেলকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন এই স্মারকলিপি প্রত্যাহার করেন। প্যাটেল প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করলেন। শুধু তাই নয় প্যাটেল বেশ রেগেই ভাইসরয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন।

ভাইসরয় আরও রেগে প্যাটেলের কথার পাল্টা জবাব দিলেন এবং বললেন

যে, প্যাটেল অবিলম্বে যেন এই স্মারকলিপি তুলে নেন। হয় আপনি সরকার থেকে ইস্তাফা দিন, নইলে আমি ভাইসরয়ের পদ থেকে পদত্যাগ করব। প্যাটেল বুঝতে পারলেন যে ভাইসরয়ের কথার নড়চড় হবে না। এবার প্যাটেল নতি স্বীকার করলেন।

এর পর থেকে প্যাটেল অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথা বলতেন [মাউন্টব্যাটেন জিগলার পৃষ্ঠা-৩৭০]।

নেহরু এবং প্যাটেল ইতিমধ্যে ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছিলেন এবং তারা কোন প্রকারেই সেই ক্ষমতার লাগাম ছাড়তে চাইলেন না।

তারপর মাউন্টব্যাটেন জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন। প্রথম দর্শনেই তার মনে হল জিন্না হলেন নীরস, উদ্ধত এবং গর্বিত ব্যক্তি তখন জিন্নার বয়স ছিল সত্তর এবং এই বয়েসে তিনি কারু কাছে মাথা নিচু করে কিছু বলতে চাইলেন না। [জিন্না : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩৭০ এবং "দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-৯৬]।

জিন্না তার আলোচনা শুরু করবার জন্যে একটি শর্ত আরোপ করতে চাইলেন।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এর জবাবে বললেন : আমি আপনার সঙ্গে কোন শর্ত কিংবা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবার আগে আপনাকে আরও ভাল করে জানতে চাই।

পরে জিন্না সংবাদদাতাদের বললেন 'ভাইসরয় কিছুই বোঝেন না'। "কিন্তু ভাইসরয় সম্বন্ধে জিন্নার এই ধারণা ভুল ছিল কারণ তিনি কী করতে চাইছেন মাউন্টব্যাটেন জানতেন। তিনি ছিলেন সৈনিক এবং যুদ্ধ শুরু করবার আগে তিনি তার প্রতিটি বাধা বিপত্তিকে (গান্ধীজি, প্যাটেল ইত্যাদি) হটাবার চেষ্টা করলেন। তার সঙ্গে তিনি শুধু নেহরুকে রাখলেন এবং ইতিমধ্যে নেহরুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গভীর হয়েছিল।

জিন্না ভাইসরয়কে বললেন : (মাউন্টব্যাটেনের নোট) দেশের সমস্যা সমাধানের মাত্র একটি পথ খোলা আছে। আর সেই পথ হল দেশকে অস্ত্রোপচার করে ভাগ করা নইলে ভারত ধ্বংস হবে। এ ছাড়া জিন্না বললেন যে, তিনি হলেন মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি। না, কংগ্রেসের সংস্থার একমাত্র একজন প্রতিনিধিবলে কিছু নেই। গান্ধীজি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নন· যদিও তার হাতে অনেক ক্ষমতা আছে কিন্তু তার কোন দায়িত্ব নেই। নেহরু ও প্যাটেল কংগ্রেসের মধ্যে দুটি বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করে থাকেন। তারা দুজনে কেউই কংগ্রেসের অন্য সবার পক্ষ হয়ে কোন জবাব দিতে পারেন না।

এ ছাড়া তিনি (জিন্না) নালিশ করলেন, যে কংগ্রেস প্রতিমুহূর্তে তাদের নীতি পরিবর্তন করছে। আমাদের এই আলোচনার পর জিন্না মুসলমানদের উপর "কী ধরণের অত্যাচার, অবিচার করা হয়েছে" তার বিবরণী দিলেন। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার,' দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৮ ১৩৯]।

ভি পি. মেনন ছিলেন মাউন্টব্যাটেনের রিফর্মস কমিশনার এবং পরামর্শ-দাতা। তিনি তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন :

'মাউন্টব্যাটেন আসবার চারদিন পরেই আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি কী করতে চান, এবং সমস্যা সমাধান করবার জন্যে তিনি কী পন্থা অবলম্বন করবেন। জিন্না এবং মুসলিম লীগ খণ্ডিত পাকিস্তান গ্রহণ করতে রাজি আছেন এবং কেন্দ্রের সরকারে যোগ দেবার তাদের কোন ইচ্ছাই নেই। মাউন্টব্যাটেন এই ব্যাপারটি অতি সহজেই বুঝে নিলেন'।

'আমি তাকে বললাম যে তিনি ভারতে বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন এবং উভয়পক্ষ যদি মীমাংসা করতে রাজি না হয় তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভাইসরয়কে নিতে হবে, অবশ্য ঐ সিদ্ধান্ত দুই দলের কারু পক্ষেই সন্তোষজনক হবে না [ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ভি পি মেনন]।

মাউন্টব্যাটেনও বিভিন্ন দলের কাছে এটলীর একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'ব্রিটিশ সরকার' কমনওয়েলথ এরকারের মাধ্য এক 'অখণ্ড ভারত' সরকার গঠন চায়। এর জন্যে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান অনুযায়ী এক সংসদ পরিষদ গঠন করতে হবে। এবং আপনার মাউন্টব্যাটেনের প্রধান কাজ হবে বিভিন্ন দলকে নিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা এবং আপনি এই ব্যাপারে কী করা দরকার সেই পরামর্শ আমাদের [ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে] দেবেন।

বিভিন্ন প্রধান দলের সম্মতি নিয়ে এই প্ল্যান কার্যকর করা হবে এবং এই প্ল্যান কাউকে জোর করে গছিয়ে দেয়া হবে না, যদি পয়লা অক্টোবরের মধ্যে বোঝা যায় অখণ্ড ভারত সরকার গঠন করা সম্ভব নয়, [সম্ভব হলে নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির সহযোগিতা নিয়ে কিংবা তাদের সহযোগিতা বিনা] তাহলে আপনি ব্রিটিশ সরকারকে জানাবেন মেয়াদী তারিখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার জন্যে কী করা দরকার ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিউনার্ড মোস্‌লে পৃষ্ঠা-৯৭]।

এ ছাড়া এটলীর নির্দেশে আরও অনেক কিছু বলা হয়েছিল। তবে মাউন্টব্যাটেনকে প্রচুর ক্ষমতা এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবার সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। তবে কিছুদিন দিল্লীতে কাটাবার পর মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে, এই কাজ হবে দীর্ঘদিনের অনিশ্চিত এবং কঠিন কাজ।

এটলীর নির্দেশে আরও বলা হয়েছিল যে, ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানের কাঠামোর ভিত্তিতে সর্বদলের সম্মতি নিয়ে এক 'অখণ্ড ভারত' গঠন করতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে এবং জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার পর মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানের কাঠামোর ভেতর সব দলের সম্মতি নিয়ে সমস্যা-সমাধান করা সম্ভব নয়। অতএব সমস্যা-সমাধান করবার জন্যে অন্য পথ অবিলম্বে অবলম্বন করতে হবে। আর অন্য পথ হল দেশ ভাগ এবং পাকিস্তান গঠন করা। কিন্তু কী করে তিনি এই দেশ ভাগ এবং 'পাকিস্তান' প্ল্যানটি কংগ্রেস নেতাদের কাছে গছিয়ে দিতে পারবেন সেইটে হল তার প্রধান চিন্তা এবং সমস্যা।

কারণ গান্ধীজি এবং নেহরু সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করে মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পেরেছিলেন তারা দুজনেই পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। এ ছাড়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কী দেশভাগ প্রস্তাব গ্রহণ করবে?

অবশ্যি গান্ধীজিকে অতি কৌশলের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হল। কংগ্রেস নেতাদের কাছে মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য ছিল যে গান্ধীজির জিন্নার হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার প্রস্তাবটি অকার্যকরী তিনি বললেন এই ব্যাপারে গান্ধীজিকে কর্মদক্ষ লোক বলা যায় না। গান্ধীজি জিন্নার হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার যে প্রস্তাব করেছেন তা' সম্ভব নয়। বর্তমানে এই ধরণের আদর্শবাদী আলোচনা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'এখন আমাদের সক্রিয় কাজ করতে হবে।'

মাউন্টব্যাটেন এই কথা বলবার পর কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজিকে দিল্লীর গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা থেকে বাদ দিলেন।

গান্ধীজি দীর্ঘ বত্রিশ বছর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন। তার নেতৃত্বে সহস্র ভারতীয় কারাগার বরণ করেছিল, প্রাণ দিয়েছিল কিন্তু যখন কংগ্রেস নেতারা তাকে বাদ দিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেশ ভাগ নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন তখন গান্ধীজি নোয়াখালি এবং বিহারে বসে রইলেন।

৮ই মার্চ কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হয়েছিল। এই বৈঠকে সর্দার প্যাটেল এক প্রস্তাব করেছিলেন এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে, পাঞ্জাবকে দুই অংশে ভাগ করে দিতে হবে। পরোক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হল, যদি একটি প্রদেশকে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হয় তাহলে দেশভাগ নীতি গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না ['নেহরু', মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা-৩৪৭, 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-৯৮ এবং জিন্না, ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩১১]।

প্যাটেল এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এই প্রস্তাবে স্পষ্ট বলেছিলেন যে, মুসলমানেরা যদি এই দেশ থেকে চলে যেতে চায় তাহলে কংগ্রেস এবং প্যাটেল কোন আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভারতের যে-সব প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দিতে চায় না তাদের যোগ দিতে বাধ্য করা হবে না।

পরে প্যাটেল তার নীতিকে সুস্পষ্ট করে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের কাছে লিখেছিলেন যদি লীগ পাকিস্তান চায় তাহলে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল দেশ ভাগ করা। পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করা। আমি মনে করি না, ব্রিটিশ সরকার এই নীতি অনুযায়ী দেশভাগ করতে রাজি হবে। হয়ত তারা পরে বুঝতে পারবে দেশের শাসনের ক্ষমতা দেশের সব চাইতে শক্তিশালী দলের কাছে তুলে দেওয়াই হল বিবেচকের কাজ। যদি তারা বুঝতে না পারে ক্ষতি নেই। কারণ সমস্ত ভারতকে নিয়ে এক শক্তিশালী সরকার (পূর্ব-বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু বেলুচিস্থানকে বাদ দিয়ে) কেন্দ্রের অধীনে গঠন করা হবে ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ,' লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা—১৮-১৯]।

নেহরু নিজেও এই যুক্তির সঙ্গে একমত হলেন। তার বক্তব্য ছিল যে তিনি ...ক তাদের মত পরিবর্তন করাতে পারবেন না। পরে এই প্রস্তাব (প্যাটেলের প্রস্তাব) গ্রহণ করবার দিন ঠিক করা হল। এই সময়ে গান্ধীজি বিহারে ছিলেন।

প্যাটেলের প্রস্তাব যখন কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির কাছে এল তখন মৌলানা আজাদ অসুস্থ ছিলেন।

প্যাটেল এবং নেহরু জানতেন যে মৌলানা আজাদ এই দেশভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার পরও বেশ কিছু দিন এই প্রস্তাব গোপন রাখা হল এবং গান্ধীজির কাছে কোন খবর প... হল না।

গান্ধীজি তিন সপ্তাহ পরে নেহরুর কাছে এক চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করলেন: পাঞ্জাব ভাগ করবার প্রস্তাবটি সম্বন্ধে পুরো খবর এবং যুক্তি জানতে চাইলেন। 'এই সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। পুরো খবরের অভাবে আমি বেশ সতর্ক হয়ে এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছি কারণ, কৃপালিনী এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে পাঞ্জাবের মত বাংলার উপর এই দেশ ভাগ নীতি কার্যকরী করা হবে। আমাকে মুসলিম লীগের এক সমর্থক চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছেন যে এই প্রস্তাব যদি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে কার্যকরী করা হয় তাহলে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, বিহারে কেন প্রযোজ্য হবে না। কংগ্রেসের প্রস্তাবের পেছনে কী যুক্তি আছে আমি জানিনে।'

আমাকে এই বিষয়ে কোন কিছু বলবার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। আমি

শুধু মাত্র নিজের মত ব্যক্ত করতে পারি। আমি সাম্প্রদায়িক এবং দুই জাতির ভিত্তিতে দেশভাগের বিরোধী। জোর করে সব কিছুই সম্ভব কিন্তু বুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে সবাইকে রাজি করান যায় ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১০০]।

পরে গান্ধীজি সর্দার প্যাটেলের কাছে অনুরূপ এক চিঠি লিখলেন। এর জবাবে প্যাটেল লিখলেন আপনার কাছে পাঞ্জাব প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করা কঠিন কাজ। বহু চিন্তা এবং আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কোন কিছুই তাড়াহুড়ো কিংবা বিনা চিন্তায় করা হয়নি।

'আমরা শুধু সংবাদপত্র মারফৎ জানতে পারলাম যে আপনি এর (দেশ ভাগের) বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি বিহারের চাইতে গুরুতর। সৈন্যবাহিনী এখন কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় প্রদেশের পরিস্থিতি শান্ত, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আবার গোলমাল শুরু হতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে হয়ত দিল্লীও আক্রান্ত হবে।'

পরে নেহরুও গান্ধীজিকে এক অনুরূপ বার্তা পাঠালেন। পাঞ্জাবের সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত আগের সিদ্ধান্তানুযায়ী করা হয়েছে। এর আগের সব সিদ্ধান্তই নেতিবাচক ছিল কিন্তু এখন এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার বাস্তবরূপ দেবার আবশ্যকতা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এবং আমার সহকর্মীরাও বিশ্বাস করেন যে, আমরা অবিলম্বে দেশ ভাগের দাবী করব। তাহলে বাস্তব পরিস্থিতিকে কার্যকরী করা হবে। আমার আরও মনে হয় জিন্নার দেশভাগের দাবীকে গ্রহণ করা হল একমাত্র পথ [এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণী 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১০০ পাওয়া যাবে]।

[এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৪ ও ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ স্বাধীনতার রাত্রে কলকাতার বেলেঘাটা শিবিরে গান্ধীজি নির্মল বসুর মাধ্যমে লেখকের কাছে দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন This is not my freedom। এই সময়ে লেখক ছিলেন রয়টারস এবং এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টার।]

এরপর মাউন্টব্যাটেন দেশনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলেন কংগ্রেস নেতারা দেশভাগে আর কোন আপত্তি করবে না। তার দুই পরামর্শদাতা, জর্জ আবেল, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ভি. পি. মেনন, রিফর্মস কমিশনার ভাইসরয়ের কাছে কংগ্রেসের দেশভাগের প্রস্তাবটি পেশ করলেন।

এর পর মাউন্টব্যাটেন সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন। দীর্ঘ আলোচনা করবার পরে প্যাটেল এবং মাউন্টব্যাটেন

যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেলেন। জিন্নার কল্পনার পাকিস্তান গঠন না করলেও এক টুকরো বিভক্ত পাকিস্তান পাঞ্জাব এবং বাংলাকে নিয়ে গঠন করা সম্ভব। এই সময়ে প্রতিদিন মাউন্টব্যাটেন তার বিভিন্ন পরামর্শদাতা, ইসমে, মিয়েভিল, আবেল, ইয়ান স্কট, ক্রিষ্টি এবং এরসক্রীন ক্রামলকে নিয়ে প্রতিদিন আলোচনার বৈঠক করতেন। প্রথমে এই আলোচনায় ভি. পি. মেননকে কোন স্থান দেওয়া হত না কিন্তু পরে দেখা গেল যে মাউন্টব্যাটেনের রিফর্মস কমিশনার শুধু ভাইসরয়ের পরামর্শদাতা নন তিনি হলেন সর্দার প্যাটেলের ডান হাত। অতএব ভি. পি. মেননও এই বৈঠকে যোগ দিতে শুরু করলেন। এবং মেননের সাহায্য নিয়ে মাউন্টব্যাটেন সর্দার প্যাটেলকে হাত করলেন এরপর মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে বশ করবার চেষ্টা করলেন এই কাজ করতে তার কোন অসুবিধে হল না। প্রথমে জওহরলাল নেহরুর মনে এই প্রস্তাব তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিনি বললেন দেশ ভাগ অসম্ভব! কিন্তু মাউন্টব্যাটেন জওহরলাকে ধীরে ধীরে বশ করলেন এবং নেহরু যিনি একদিন দেশ ভাগের বিরোধী ছিলেন তিনি এই দেশভাগ প্রস্তাবের সমর্থক হলেন [ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম, মোলানা আবুল কালাম আজাদ]।

মোলানা আজাদ পরে মন্তব্য করেছিলেন আমি অনেক সময় বেশ অবাক হয়ে ভেবেছি কী করে মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে বশ করেছিলেন।

প্রথম থেকে মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে বশ করবার জন্যে এক অভিনব জনসংযোগ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এই কাজে তাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন লেডী মাউন্টব্যাটেন। লর্ড এবং লেডী মাউন্টব্যাটেন এ দেশে আসবার আগে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন. ঐ সময়ে ষষ্ঠ জর্জ লেডী মাউন্টব্যাটেনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন Edwina will of course do wonders with all her knowledge and experience gained during war years. [ট্রান্সফার অব পাওয়ার, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৪, ফুটনোট]। পরে নেহরু এবং লেডী মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা হয়েছিল।

এ ছাড়া মাউন্টব্যাটেনের প্রেস সেক্রেটারী এ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন ছিলেন নেহরুর বিশেষ বন্ধু এবং আলোচনার সময়কালে তিনি প্রায়ই নেহরু এবং তার কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট খেতেন। এ ছাড়া ক্যাম্পবেল জনসন অন্যান্য ভারতীয় নেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। এই সব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্দার পানিকরের নাম উল্লেখযোগ্য।

লর্ড ইসমের কাজ ছিল মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

তার এই কাজে সাহায্য রাখতেন, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী আবেল যার লীগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি ছিল। এই কারণে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে আবেলের আর একটি নাম ছিল 'ইংলিশ মোল্লা'।

যদিও লর্ড ইসমে জিন্নার সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি, তবু জিন্নার সহকারী লিয়াকৎ আলি খানের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছিল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে তার পরিবারের, স্ত্রী এবং কন্যা পামেলাকে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এর আগে কোন ইংরেজ ভাইসরয় তাঁর স্ত্রী এবং পরিবারকে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে ব্যবহার করেন নি।

লেডী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর প্রথম পরিচয় হয়েছিল সিঙ্গাপুরে। পরে দিল্লীতে লর্ড এবং লেডী মাউন্টব্যাটেন আসবার পর তাদের দুজনের মধ্যে এই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হল। প্রথমত নেহরু স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ পুরুষ ছিলেন। এ ছাড়া লেডী মাউন্টব্যাটেন তার কাজকর্মে হৃদয়কে মাথার চাইতে বেশি ব্যবহার করতেন। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে ঘোর ইংরেজ বিদ্বেষী ভারতীয়রা ইংরেজ 'লেডীকে' ভালবাসে এবং রাজপরিবারের নামে তাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগে এবং তিনি (লেডী মাউন্টব্যাটেন) তার বংশের নাম, পটভূমিকা, সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিত্ব ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১০৩]।

এই লেডী মাউন্টব্যাটেনের বন্ধু ছিলেন নেহরু। এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের (ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ) ভাষায় 'নেহরুর উপর লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিংবা প্যাটেলের প্রভাবের চাইতে লেডী মাউন্টব্যাটেনের প্রভাব বেশি ছিল ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১০৩]।

নেহরুর সঙ্গে লেডী মাউন্টব্যাটেনের এই বন্ধুত্ব দেশের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত ব্যাপারে কতটা প্রভাব সৃষ্টি করেছিল তার কিছু উদাহরণ আমরা মাউন্টব্যাটেনের জীবনীর লেখক ফিলিপ জিগলারের লেখা বই থেকে জানতে পারব। এখানে ঐ বই থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল [মাউন্টব্যাটেন, ফিলিপ জিগলার, পৃষ্ঠা—৪৭২-৪৭৪]। জিগলার লিখেছেন—

"লেডী মাউন্টব্যাটেনের নেহরুর সঙ্গে এই বন্ধুত্ব দীর্ঘকালের জন্যে বাদানুবাদ, সমালোচনা সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীর মৃত্যুর পর মাউন্টব্যাটেন প্রধানমন্ত্রীকে অর্থাৎ

(নেহরুকে) তাদের বাড়িতে এসে থাকবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কারণ ওখানে সুরক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। নেহরু এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। কিন্তু গান্ধীজির মৃত্যুর পর [যে মানুষটি নেহরুকে বিশেষ প্রভাম্বিত করেছিল] তিনি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আরও ঘনঘন দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। মাউন্টব্যাটেনদের নেহরুর উপর প্রভাব ছিল সূক্ষ্ম কিন্তু পরিব্যাপক। **This effect on him was subtle but pervasive**

নেহরু লেডী মাউন্টব্যাটেনকে [জুন ১৯৪৮] লিখেছিলেন :—

"আমার মনে হয়, দিল্লী, বিশেষ করে তুমি এবং ডিকি আমাকে অত্যধিক সভ্য করেছ। তুমি আমাকে কিছুটা মানুষও করেছ। এই মানুষ করাকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করি। কিন্তু সভ্য করবার ব্যাপারটিকে আমি সুনজরে, যতই ভাল হক না কেন, দেখতে পারিনে। আমার মনের ভেতর এক বন্য পশু প্রবৃত্তি আছে, যদিও এই মনোভাব সময়ের সঙ্গে অনেকটা শান্ত হয়েছে। এর বিরোধিতা করে এবং আমি এর হাত থেকে এড়িয়ে যেতে চাই। আমার মনে আছে আমি যখন ততটা শান্ত ছিলাম না এবং আমার সীমিত ভাবে স্বাধীন কাজ করবার অনেক ক্ষমতা ... তখন আমি অনেক জলন্ত অগ্নিশিখার মত ছিলাম। নিজেকে দহন করতাম এবং অন্যকে দগ্ধ করতাম কিন্তু তবু এই দুটি ব্যাপারেই আমি খুব সচেতন ছিলাম না। এই অগ্নিশিখা ক্রমে ক্রমে নিভে আসছে এবং ... যে উজ্জ্বল তারকা আমার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করত সেই তারকা যেন আর নেই।"

জিগলার লিখছেন, মাউন্টব্যাটেনদের সঙ্গে নেহরুর সম্পর্ক শুধু সহজ ছিল না, নিরাপদও ছিল। দুজনেরই এই দেশে কারুর কাছ থেকে কিছু পাবার ছিল না।

"এই সম্পর্কের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কোন সুবিধা চাইবার কারণ ছিল না এবং ক্ষমতার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একে অন্যের প্রতি প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাবার কোন কারণ ছিল না। যদিও তারা বিভিন্ন জিনিসকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতেন, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিষয়মুখী এবং বাস্তব যে দৃষ্টিভঙ্গী [নেহরু পছন্দ করতেন প্রধানমন্ত্রী তাঁদের [মাউন্টব্যাটেনদের] বিচার-বিবেচনাকে সম্মান করতেন। এবং তাঁদের সদিচ্ছার প্রতি তার পূর্ণ আস্থা ছিল তাদের সাহায্য এবং সমর্থন থেকে তিনি আনন্দ পেতেন।"

পরে এপ্রিল মাসে তিনি [নেহরু লেডী মাউন্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন 'আমি চাই কেউ আমার সঙ্গে বিশ্বাসের এবং বিবেক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করুক। তুমি এ কাজ ভালভাবেই করতে পার। আমি নিজের প্রতি এবং যে কাজ করছি তার উপর বিশ্বাস হারাচ্ছি।' নেহরুর এই চিঠি মাউন্টব্যাটেন দম্পত্তির

দুজনের প্রতি প্রযোজ্য ছিল।

"পরে ১৩ই মে ১৯৪৮ সালে নেহরু মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির সঙ্গে সিমলাতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ দশবছর পবে নেহরু এই ভ্রমণ সম্বন্ধে চিঠি লিখে [লেডী মাউণ্টব্যাটেনকে] জানিয়েছিলেন, সহসা আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমাদেব মধ্যে এক গভীর অনুরাগ আছে। কোন এক অজানা অনিয়ন্ত্রিত শক্তি, [যার অনুভূতি আমি উপলব্ধি করি না] একে অন্যর প্রতি আকর্ষণ করছে। আমি অভিভূত হয়েছিলাম এবং এই নতুন আবিষ্কাবে আনন্দিত হয়েছিলাম।"

"আমরা অনেক ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনা করেছি। যেন সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে এবং আমবা একে অন্যের প্রতি কোন ভয় কিংবা হতবুদ্ধি না হয়ে তাকাবার সাহস পেয়েছি।"

হিগলার আরও লিখছেন : এইভাবে এক সম্পর্ক শুরু হল, যে সম্পর্ক লেডী মাউণ্টব্যাটেনের মৃত্যু অবাধ ছিল। একের অন্যর প্রতি অনুরাগ, রোমাণ্টিক, বিশ্বাসী, উদার মনোবৃত্তি, আদর্শবাদী এবং বলা যায় আধ্যাত্মিক।

যদি এর মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্কের সম্ভবনা থাকত তাহলে তা ছিল অনুল্লেখযোগ্য।

মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিক্রিয়া ছিল আনন্দের। পরে তিনি তার আর এক কন্যা পাট্রিসিয়াকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। কাউকে বল না যে, তার (লেডী মাউণ্টবাটেনের) এবং জওহবলালের সম্পর্ক হল মধুর। এরা একে অন্যর প্রতি গভীর অনুরাগী।

"প্যামি এবং আমি (মাউণ্টব্যাটেনের কনিষ্ঠা কন্যা যিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে দিল্লীতে ছিলেন) এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক এবং এদের সাহায্য করছি।"

তোমার মা সম্প্রতি বিশেষ মিষ্টি ব্যবহার করছেন। এবং আমরা সবাই হলাম এক সুখী পরিবার।

মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে পছন্দ এবং শ্রদ্ধা করতেন। এবং তাব পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল যে, গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে তাঁর (নেহরুব) যেন বিশেষ কোন আকর্ষণ থাকে। এবং এ-ছাড়া এড্উইনা মাউণ্টব্যাটেনের মেজাজ খুব ভাল ছিল। এই সম্পর্ক দুপক্ষের জন্যে সুবিধাজনক ছিল। নেহরুর এড্উইনা মাউণ্টব্যাটেনের প্রতি এই অনুরাগ কোন প্রকারেই তার স্বামীর প্রতি তার সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেনি।

নেহরু এবং এড্উইনা মাউণ্টব্যাটেন এমন চক্রান্ত করতেন যেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন জীবনে যা চাইতেন তাই পেতেন এবং তাকে বুঝতে দেওয়া হত না যে এই সম্পর্ক থেকে তাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। পরে নেহরু একটি সিগারেটের

বাক্সে তার নাম খোদাই করাকে উদ্দেশ্য করে এডুইনা মাউন্টব্যাটেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন : তোমাকে বলা দরকার অবশ্যি তুমি যদি একথা ডিকিকে না বল যে আমার নাম ভুল করে বানান করা হয়েছে। এ নিয়ে আমি কোন প্রতিবাদ করছিনে। বরং বলতে পারি আমি ভুল বানান পছন্দ করি. কারণ এই রকম খোদাই করে লেখা হল ডিকির বিশেষত্ব।'

যদিও লর্ড মাউন্টব্যাটেন এডুইনা এবং নেহরুর মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল এ কথা জানতেন তবু তিনি এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করা ছাড়া আর কোন উল্লেখ করেন নি। পরে ১৯৫০ সালে এডুইনা এক চিঠি লিখে মাউন্টব্যাটেনকে অনুরোধ করলেন যেন তার চিঠিগুলিকে গুছিয়ে রাখা হয়। এডুইনা তার স্বামীকে জানিয়ে ছিলেন, 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবেএ হল জওহরলালের এক গুচ্ছ আকর্ষণীয় চিঠি পত্রাদি। এতে অনেক কৌতুহলদ্দীপক খবর আছে। এবং বলা যায় এগুলো হল ঐতিহাসিক দলিল। কতগুলি চিঠিতে 'ব্যক্তিগত' শব্দটি লেখা নেই।'

'বলতে পার অন্যগুলি প্রেমপত্র এবং তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে এ হল এক অস্বাভাবিক, কৌতুহলদ্দীপক সম্পর্ক, অধিকাংশই আধাত্মিক যা, আমাদের মধ্যে ছিল। আমার জীবনে 'জে'র (জওহরলাল) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে আমার শেষ কয়েক বছরে এবং আমার মনে হয় আমিও তার জীবনে এক 'গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকা পালন করেছি। আমরা খুব কমই একে অন্যর সঙ্গে দেখা করেছি এবং অনেক সময়ে ক্ষণিকের জন্যে কিন্তু আমার মনে হয় আমি তাকে বুঝতে পারি এবং তিনিও পারেন।'

মাউন্টব্যাটেন নেহরু এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে এই সম্পর্ক কী ধরনের ছিল বুঝতে পেরেছিলেন এবং কোন ক্ষোভ করেন নি।

মাউন্টব্যাটেন এই সম্পর্কের কথা জানবার পরও কোন হিংসা প্রকাশ করেন নি।

অনেক সময় (জিগলার লিখছেন) এডউইনার অন্য পুরুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার মাউন্টব্যাটেনের মনে গভীর দুঃখ দিয়েছে। দুঃখ, যাকে হিংসা বলা যায়। এডউইনার নেহরুর সঙ্গে সম্পর্ক, তার ভাবাবেগে তাকে বিচলিত করেনি এমন নয়। এডউইনার মৃত্যুর পর তিনি তার কন্যা পামেলাকে প্রথমে এই চিঠিগুলি পরীক্ষা করে দেখতে বলেন। কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে এই চিঠিগুলির মধ্যে এমন কিছু প্রমাণ পাবেন যার থেকে প্রমানিত হবে যে তাদের দুজনের মধ্যে 'নিষ্কাম ভালবাসা' (প্লাটোনিক) ছিল না যা তিনি সর্বদাই ভাবতেন। কিন্তু তবু তারমনে কোন অনুতাপের রেশ ছিল না। ['এই কাহিনীর পুরো অংশ

ফিলিপ জিগলারের মাউন্টব্যাটেন বই থেকে নেওয়া হয়েছে' পৃষ্ঠা—৪৭২-৪৭৪]।

* * *

নেহরু এবং এডউইনা মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে এই সম্পর্ক নিয়ে এত বিস্তৃত করে বলবার আবশ্যকতা ছিল কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এক সন্ধিক্ষণে যে নেতার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, তিনি কী করে এক ইংরেজ মহিলার প্রতি অনুরাগী হয়েছিলেন এবং তাঁর এই 'আসক্তির' দরুণ দেশভাগ ত্বরান্বিত হয়েছিল কিনা এবং এর দরুণ নেহরুর উপর দেশভাগের প্রস্তাব কোন প্রভাব সৃষ্টি করেছিল কিনা, এবার সেইটে বিচার করে দেখতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় ইংরেজ মহিলার এই ভূমিকা নিয়ে পরবর্তীকালে যে বাগবিতণ্ডার ঝড় উঠেছিল সেই কারণটি যে একেবারে অমূলক নয় এ কথা মাউন্টব্যাটেন এবং কংগ্রেস নেতাদের পরবর্তী আলোচনা এবং পদক্ষেপ থেকে প্রমাণিত হবে।

আমরা প্রথমেই দেখেছি যে, গান্ধীজির প্রস্তাব যে জিন্নাকে সরকার গঠন করবার সুযোগ দে'য়া হক, 'পাগলের প্রস্তাব' বলে মাউন্টব্যাটেন বর্ণনা করে ছিলেন এবং পরে গান্ধীজি বিহার, নোয়াখালিতে চলে যাবার পর ভাইসরয় নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। কারণ দেশভাগ করবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবার ক্ষমতা একমাত্র গান্ধীজির ছিল। পরে মাউন্টব্যাটেন কিছুটা হুমকি দিয়ে এবং তার রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেননের সাহায্য নিয়ে তিনি সর্দার প্যাটেলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নেহরুকেও বশ করা হল। শেষ পর্যন্ত দেশ-ভাগের প্রস্তাবের একমাত্র বাধা হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল। লেডী মাউন্টব্যাটেন আহতদের সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে দিল্লীতে ফিরে এসে তিনি (লেডী মাউন্টব্যাটেন) তার স্বামীকে এবং তার পরামর্শদাতাদের বললেন দেশ ভাগ হল ভারতের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। এবার লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার স্ত্রীকে নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন। তারা দুজনে ভারতের ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা চিন্তা করে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এর কিছু দিন পরে নেহরু মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। পরে মৌলানা আজাদ লিখেছিলেন :

'জওহরলাল হতাশ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন দেশভাগের বিকল্প পরিকল্পনা, কী? তিনি স্বীকার করলেন দেশভাগ ক্ষতিকর কিন্তু বর্তমান ঘটনা ও পরিস্থিতি দেশভাগের অনুকূলে। এবং তিনি আমাকে দেশভাগের বিরোধিতার সংকল্পকে পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন।

তিনি (নেহরু) বললেন, দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী এবং যা হবে, ঘটবে তার বিরোধিতা করা অনুচিত, অবিবেচকের কাজ হবে। এবং তিনি আমাকে বললেন যেন আমি এই ব্যাপারে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের বিরোধিতা না করি [ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১৯৫]।

এর পর মৌলানা আজাদ আর কোন বাধা দিলেন না। দীর্ঘকাল তিনি 'অখণ্ড স্বাধীন ভারতে'র জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। জিন্না এবং মুসলিম লীগ তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি নতি স্বীকার করেন নি তবে তিনি লেডী মাউন্টব্যাটেনের আকর্ষণশক্তির এবং তার বেদনার, দুর্দশার কাহিনীর কাছে হার স্বীকার করলেন। এছাড়া আরও কয়েকটি আনুষাঙ্গিক কারণে মৌলানা আজাদ নেহরুর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

একটি কারণ ছিল যে, সর্দার প্যাটেল এই দেশ থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করবার সংকল্প করেছিলেন। ভাইসরয় আর একটি বিষয় বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, নেহরুর সম্মতি ছাড়া কংগ্রেস দেশ ভাগকে স্বীকার করে নেবে না। তাই তিনিলেডী মাউন্টব্যাটেনের সাহায্য নিয়েছিলেন।

১১ই এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে লর্ড ইসমে ভাইসরয়ের রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেননকে এক চিঠি লিখলেন: চিঠিখানা ছিল এই প্রকার—

মাই ডিয়ার মেনন :— আমি এই সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার প্ল্যানের একটি নক্‌শা পাঠাচ্ছি। ভাইসরয় চাইছেন যে আপনি এই প্রস্তাবকে আপনার ইচ্ছেমত সংশোধন করে একটি পুরো প্ল্যান তৈরি করে দেন। দ্বিতীয়ত, আপনার প্রস্তাবে আরও বলবেন ব্রিটিশ সরকার এই প্ল্যান ঘোষণা করবার পর কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন? যেমন ধরুন, সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবার জন্যে কী করা দরকার হবে? পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামকে কী করে ভাগ করা যাবে? হয়ত এর সিদ্ধান্ত 'হিজ এক্সলেন্সীর' (ভাইসরয়) হাতের উপর ছেড়ে দে'য়া হবে এবং এই নিয়ে কোন বাদানুবাদ করা হবে না। যে সব গ্রুপ এক হয়ে সংবিধান রচনা করবে তাদের জন্যে কী প্রশাসনিক পন্থা অবলম্বন করা দরকার হবে?

একটা সময়সূচীর খসড়া তৈরি করুন। আমি আপনাকে বলতে চাই সঠিক কিছু করবার দরকার নেই। শুধু আপনি 'হিজ এক্সলেন্সীকে' বলুন কী করে এই প্ল্যান কার্যকরী করা সম্ভব হবে এবং এইটে কার্যকরী করতে কত সময় নেবে? ইতি—ইসমে।

এরপর মেননের খসড়া প্ল্যান ভারতের এগারটি প্রদেশের সরকারের কাছে

বিতরণ করা হল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা পরে বলেছিলেন যে মাউন্টব্যাটেন দেশ ভাগ করবার জন্যে কোন চতুরতা অবলম্বন করেন নি। কারণ মাউন্টব্যাটেন স্বীকার করেছিলেন তার ঐ পরিস্থিতিতে দেশভাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, লর্ড ওয়েভেলও দেশভাগের প্রস্তাব করেছিলেন। তার প্রস্তাব ছিল সহজ এবং সরল কিন্তু তার ঐ প্রস্তাব ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গ্রহণ করেনি। মাউন্টব্যাটেন যখন দেশভাগের প্রস্তাব করলেন তখন সবাই এই প্রস্তাবকে প্রায় বিনা প্রশ্নে স্বীকার করে নিল।

ভি. পি. মেননের খসড়া প্ল্যান পাবার পর এগারটি প্রদেশের গভর্নরদের দিল্লীতে এক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে ডেকে পাঠান হল। গভর্নরেরা মেননের খসড়া প্ল্যান পড়ে বুঝতে পারলেন যে এদেশ থেকে কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারকে চলে যেতে হবে।

একমাত্র বাংলার গর্ভনর ফ্রেডরিক বারোজ অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিলেন না। তিনি ভাইসরয়কে খবর পাঠালেন যে তিনি বাংলার নেতাদের সঙ্গে একত্র হয়ে 'স্বাধীন বাংলা' গঠন করবার চেষ্টা করছেন। পরে এই মিটিংএ সব গর্ভর্নরেরা ভাইসরয়কে তার ইচ্ছানুযায়ী তার এই প্ল্যানকে কার্যকরী করবার জন্যে 'সবুজ সংকেত' দিলেন।

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ পাঞ্জাবের বিধান সভায় মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। লীগের নেতা নবাব অব মামদোত গভর্নরকে অনুরোধ করলেন যে প্রদেশে সেকশন ৯৩ শাসনের অবসান করা হ'ক এবং লীগকে পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা গঠন করবার সুযোগ দে'য়া হক। কিন্তু পাঞ্জাবের গভর্নর লীগের এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না।

জিন্না মাউন্টব্যাটেনের কাছে অনুরোধ করলেন যে লীগের হাতে পাঞ্জাবের শাসনভার তুলে দেওয়া হক। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন জিন্নার এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে বললেন, যে সুরাবর্দী এবং তার বন্ধুরা 'স্বাধীন বাংলা' গঠন করবার চেষ্টা করছে। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা' সম্বন্ধে আপনার কী মত? অবশ্যি স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানের বাইরে থাকবে।

এর জবাবে জিন্না কোন সংকোচ না করে বললেন যে 'বাংলা স্বাধীন' হলে আমি খুশি হব'। কলকাতা ছাড়া বাংলার কোন মূল্য নেই। তারা (বাঙালীরা) যদি একত্র থাকে এবং অখণ্ড বাংলা গঠন করে তাহলে তারা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে।

মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে বললেন : সুরাবর্দী বলেছেন যে বাংলা স্বাধীন এবং অখণ্ড পৃথক দেশ হিসাবে কমনওয়েলথের ভেতর থাকতে চায়।

: নিশ্চয়, আমিও পাকিস্তানকে কমনওয়েলথের ভেতর রাখতে চাই জিন্না জবাব দিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন তাকে সংশোধন করে বললেন : না আপনি আমাকে বলেছেন পাকিস্তান স্বাধীন হলে তারা কমনওয়েলেথের সদস্য হবার জন্যে আবেদন করবে।

জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে সংশোধন করে বললেন আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা সদস্য হবার প্রশ্ন তুলছিনে আমরা জানতে চাই আপনারা কী আমাদের কমনওয়েলথ থেকে বের করে দেবেন? চার্চিল আমাকে বলেছেন এই ব্যাপারে আমি যেন শক্ত হই এবং দাবী করি আমাদের কমনওয়েলথ থেকে যেন তাড়ান না হয়। আমরা যদি তাই করি তাহলে আমাদের কেউ তাড়াতে পারবে না। ব্রিটেন রাজভক্ত সদস্যদের তাড়াতে সাহস করবে না। ['জিন্না', ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩২৩]।

বাংলা অবিভক্ত, 'অখণ্ড' দেশ হিসাবে থাকবে এ কথা জিন্না বিশ্বাস করেছিলেন। এই ব্যাপারে তার সহকর্মী লিয়াকৎ আলিও জিন্নার সঙ্গে একমত ছিলেন। পরে লিয়াকৎ আলি ভাইসরয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী এরিক মিয়াভিলকে বলেছিলেন যে তিনি বাংলা ভাগ নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করেন না। কারণ তিনি জানেন বাংলাকে ভাগ করা হবে না। হয়ত বাংলা এক পৃথক দেশ হবে, এবং পাকিস্তান কিংবা ভারতের সঙ্গে যোগ দেবে না।'

লিয়াকৎ আলি মিয়াভিলকে আরও বললেন খুব সম্ভবত: শিখ সম্প্রদায় পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবে এবং মুসলিম লীগ তাদের পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্যে বেশ প্রলোভনীয় শর্ত দেবে ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৩৭ ৪৩৮]।

জিন্না এই সময়ে গোপনে কয়েকজন শিখ নেতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তাদের পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই সব নেতাদের মধ্যে ছিলেন বলদেব সিং, মহারাজা অব পাতিয়ালা। কিন্তু তারা জানতেন যে নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে তারা আরও অনেক বেশি সুবিধা পাবেন।

জিন্না শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন যে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে অখণ্ড রাখতে পারবেন। তার ইচ্ছা ছিল যে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অংশকেও তিনি 'অখণ্ড পাঞ্জাব' হিসাবে পাবেন এবং বাংলা হবে ক 'স্বাধীন অখণ্ড দেশ'। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বলেন মাউণ্টব্যাটেন নিজেও দেশভাগের কথা চিন্তাভাবনা করে দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন দেশভাগ নেহাৎ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই

নয়। কারণ দেশভাগ করা হলে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি গুরুতর শোচনীয় হবে? মাউন্টব্যাটেন তার এক রিপোর্টে লিখেছিলেন এই দেশ ভাগ করতে কেউ আমাকে বাধ্য করতে পারত না যদি না সবাই এই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নিয়ে 'তাণ্ডব নৃত্য' করতেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪০]।

ইতিমধ্যে লিয়াকৎ আলি দেশ ভাগ নীতি অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাগ করবার এক প্ল্যান তৈরি করলেন। কিন্তু সৈন্য বাহিনীর চীফ ক্লড অকিনলেক সেনাবাহিনীকে দুই ভাগ করবার বিরোধিতা করলেন। এই সময়ে সমস্ত দেশে দেশভাগের হাওয়া ছড়িয়ে পড়ল। পাঞ্জাব এবং বাংলা থেকে শরনার্থীরা দিল্লী এবং কলকাতায় আসতে শুরু করল। গান্ধীজি বিহার এবং নোয়াখালী থেকে দেশভাগের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিলেন কিন্তু কংগ্রেস এবং ভাইসরয় কেউ তার কথায় কোন কান দিল না।

১৭ই এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন সেক্রেটারী অব ষ্টেটসকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে গৃহযুদ্ধ এবং শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়বার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদেব অবিলম্বে স্থির করতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য কী? দেরী করা চলবে না। তিনি সেক্রেটারী অব ষ্টেটসকে আরও জানালেন যে দশ দিনের মধ্যে তিনি একটি প্ল্যান তৈরি করে লর্ড ইসমের সঙ্গে ঐ প্ল্যান লণ্ডনে পাঠাবেন। এবং পরে এই প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তিনি ভারতীয় নেতাদের নিয়ে ২৫ই মে এক বৈঠক করবেন।

এই সময়ে লর্ড ইসমে তার স্ত্রী'র কাছে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন: 'আমরা সমস্যা সমাধান করবার জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান তৈরি করেছি।'

প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে মাউন্টব্যাটেন এক বিশেষ কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটিতে ছিলেন মাউন্টব্যাটেন নিজে, লর্ড ইসমে, মিয়াভিল এবং আবেল। ঠিক হল যে এই বিশেষ কমিটি এমন এক নকশা তৈরি করবেন যেন দেশের সব দলের নেতারা এই প্ল্যান গ্রহণ করেন।

কিন্তু ভাইসরয় এই কমিটি গঠন করতে এক মারাত্মক ভুল করলেন। তিনি এই কমিটি থেকে তার রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেননকে বাদ দিয়েছিলেন। কারণ কংগ্রেসের দাবী কী এই কথা শুধু মেননই জানতেন।

২রা মে লর্ড ইসমে এবং অ্যাবেল একটি প্ল্যান নিয়ে লণ্ডনে গেলেন। এই এই প্ল্যানে বলা হল বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করে ভারত এবং পাকিস্তানে যোগ দেবার সুযোগ দে'য়া হবে কিংবা অখণ্ড অবস্থায় তারা ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবার সুযোগ পাবে, কিংবা স্বাধীন দেশ হিসাবে থাকতে পারবে।

কিন্তু নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলি সম্বন্ধে প্ল্যানে কোন কিছু স্পষ্ট করে বলা হল না। শুধু বলা হল রাজারা তাদের ইচ্ছেনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। প্ল্যানের এই নকশানুযায়ী ভারত এবং পাকিস্তান হবে দুটি বড় পৃথক অংশ।

মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে অনুরোধ করলেন যেন দশদিনের মধ্যে এই প্ল্যান সম্বন্ধে তাদের মতামত তাকে জানান হয়। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সাত-দিনের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানালেন। তারা প্ল্যানের মধ্যে শুধু একটি সংশোধন করলেন। বলা হল নর্থওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ ইচ্ছে করলে স্বাধীন হতে পারবে। মাউন্টব্যাটেন জানতেন লীগ কিংবা কংগ্রেস কেউ এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।

১০ই মে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সংশোধিত প্ল্যান ফেরৎ পাঠালেন। মাউন্টব্যাটেন এবার সপরিবারে সিমলাতে বেড়াতে গেলেন। তিনি নেহরু এবং কৃষ্ণ মেননকে তার সিমলার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন।

নেহরু এবং কৃষ্ণ মেনন মাউন্টব্যাটেনের এই অমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। নেহরুর এই সিমলা ভ্রমণ হল দেশভাগের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেন পরে বলা হবে।

কিন্তু তার আগে বলা প্রয়োজন যে মাউন্টব্যাটেনের এই খসড়া প্ল্যানে একটি মস্তো বড় "কিন্তু" ছিল। এই "কিন্তু" কী ব্যাখ্যা করে বলা দরকার।

দেশ কী পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে না ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণ করবে এই ছিল নেতাদের কাছে এক বড় প্রশ্ন। ১৯৩০ লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস এক প্রস্তাবে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং ঐ সময়ে কংগ্রেস নেতারা এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের মে মাসে প্ল্যান তৈরি করবার সময় মাউন্টব্যাটেনর কিংবা তার ইংরেজ সহকর্মীরা এই প্রশ্নটির উপর কোন গুরুত্ব দিলেন না এবং এই বিষয়টি তাদের প্রস্তাবের খসড়া থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেনের বিশেষ কমিটি থেকে ভি. পি. মেননকে বাদ দে'য়া হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের এই বিশেষ কমিটির আর একটি নাম ছিল, 'ডিকি বার্ডস সার্কেল' (ডিকি ছিল মাউন্টব্যাটেনের ডাক নাম)। এই কমিটি গঠিত হবার আগে পর্যন্ত সবাই মেননের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ গ্রহণ করতেন কিন্তু 'ডিকি বার্ডস সার্কেল' গঠিত হবার পর মেনন এদের সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। অবশ্যি পরে বলা হয়েছিল যে, মেনন ছিলেন 'হিন্দু' এবং এই কমিটিতে তার উপস্থিতি হয়ত লীগ আপত্তি করবে।

কিন্তু মেনন জানতেন যে ভাইসরয় এবং তার সহকর্মীদের কাছে একটি বড়

সমস্যা ছিল যে ভারত এবং পাকিস্তানের কমনওয়েলথের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকবে এবং তাদের স্বাধীনতা দেবার সময় কী মর্যাদা দেওয়া হবে ?

ভারত এবং পাকিস্তানকে কী পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে না তাদের কমনওয়েলথের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে। অর্থাৎ ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস ? কংগ্রেস এতদিন পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে এসেছিল। অধিকাংশ ভারতবাসীরা কমনওয়েলথের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা কিংবা ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস মর্যাদা গ্রহণ করাকে কিংবা ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখাকে হেয় বলে গণ্য করতেন। ব্রিটিশ সম্রাটের কাছে আনুগত্য স্বীকার করা ছিল প্রায় সব ভারতবাসীদের চিন্তা শক্তির বাইরে।

কিন্তু পাকিস্তান এবং জিন্না কমনওয়েলথের ভেতর থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ভাইসরয়ের বললেন যে, একটি দেশকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়া এবং অপরটিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস মর্যাদা দেওয়া সম্ভবপর নয়। এই ভাবে দেশভাগ করলে গোড়াতেই ভুল করা হবে। কী করা যায় ?

পরামর্শদাতা ইসমে বললেন যে পাকিস্তানকে কমনওয়েলথকে থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব নয় যেহেতু কংগ্রেস কমনওয়েলথের ভেতরে থাকবার বিরোধী। আলোচনা প্রসঙ্গে ভাইসরয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী মিয়াভিল বললেন যে, কিছুদিন আগে তিনি এই সমস্যাটি নিয়ে ভি. পি. মেননের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং মেনন এই সমস্যাটি নিয়ে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। কংগ্রেস ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের বিরোধী নয় এবং তারা এই প্রস্তাবটি নিয়ে পুনরায় বিবেচনা করতে রাজি আছেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ভি. পি. মেনন এবং 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা ১১২]।

মিয়াভিল কথাচ্ছলেই মেননের এই উক্তি সবার কাছে বলেছিলেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে কেউ মেননের এই জবাবে গুরুত্ব দেয়নি। হাজার হোক মেনন ছিলেন ভারতীয় সরকারি কর্মচারি। অতএব তার এই মন্তব্যে নিয়ে কেউ কোন চিন্তা ভাবনা করতে চাননি।

'ডিকি বার্ডস সার্কেল' যখন প্ল্যানের খসড়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন এই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস কিংবা 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রশ্নটি নিয়েও কেউ বড়ো মাথা ঘামান নি। এই বিষয় নিয়ে কেউ মেননের কাছ থেকে তার কোন মতামত জানতে চাননি।

এ ছাড়া প্ল্যান নিয়ে 'ডিকি বার্ডস সার্কেল' যখন আলোচনা করছিলেন তখন ভি. পি. মেনন ভাইসরয়ের সেক্রেটারী আবেলকে এক চিঠি লিখে জানালেন যে 'রিফর্মস এবং সংবিধানের পরামর্শদাতা হিসাবে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ

দায়িত্ব আছে।'

তিনি আরও বললেন ১৯৪৭ সালের মধ্যে যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়, তাহলে ঐ প্ল্যানকে কার্যকরী করবার জন্যে এক সংস্থা গঠন করা দরকার—যার প্রধান কাজ হবে ঐ প্ল্যানকে কার্যকরী করা। আমার বিশ্বাস ছিল ভাইসরয়ের অধীনে রিফর্মস কমিশনারের দপ্তর এই কাজ করবে… রিফর্মস কমিশনারকে যদি এই কাজ করতে হয় তাহলে সমস্ত ঘটনার সঙ্গে আমার ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

আমি সমস্ত ঘটনা যদি পুরো পরিপ্রেক্ষিতে না দেখতে পারি তাহলে আমি ভাইসরয়কে যথাযোগ্য এবং উপযুক্ত ভাবে কোন পরামর্শ দিতে পারব না।

অতএব এই ব্যাপারটি নিয়ে আপনারা কী করবেন সেইটে প্রথমে বিচার করা দরকার। আমাদের হাতে সময় নেই এবং অনেক সমস্যার সমাধান করতে হবে। যদি বিভিন্ন দপ্তর যে যার কাজ করে তাহলে সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাব হবে না। অতএব আপনারা এই বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আমাকে জানাবেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ভি পি মেনন]।

কী কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকে ভি. পি. মেননকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানা যায় নি।

পরে মাউন্টব্যাটেন মেননের এই খসড়া প্ল্যানের কথা মনে রেখে তার খসড়া প্ল্যানের কাঠামোর অদল বদল করলেন।

মেনন বলেছিলেন আমি ঐ প্ল্যানের অর্থাৎ লর্ড ইসমে এবং আবেল যে প্ল্যান নিয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলেন তার বিরোধী ছিলাম। ঐ প্ল্যানে বলা হয়েছিল যে প্রদেশগুলি প্রথমে স্বাধীন হবে। এই প্রস্তাবটি আমার চিন্তাশক্তির বাইরে ছিল। কিন্তু আমার প্রস্তাবে কিংবা আমি ভাইসরয়ের পরামর্শদাতাদের আলাপ-আলোচনাকালীন যে মতামত ব্যক্ত করেছিলাম সেই মতামতে কেউ কোন কান দিলেন না।

লর্ড ইসমে এবং আবেল এই প্ল্যানের প্রতিটি ধারা নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট প্ল্যানকে অনুমোদন করলেন। ঠিক ঐ সময়ে লর্ড ইসমে এবং আবেল যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন তারা ভাইসরয়ের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম পেলেন। ঐ টেলিগ্রামে লেখা ছিল: সম্প্রতি মিথাভিল এবং আমার জিন্নার সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেই আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়েছে 'খণ্ডিত পাকিস্তান' গ্রহণ করতে তার (জিন্নার) কোন আপত্তি নেই ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১১৪]।

ইসমে এবং আবেল লণ্ডনে চলে যাবার পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কিছুদিন খুব নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, ব্রিটিশ সরকার তার এই প্ল্যানকে অনুমোদন করবে।

তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে, গান্ধীজিও তার এই চেষ্টায় বাধা দিতে পারবেন না। কারণ এই সময়ে গান্ধীজি বিহারে ছিলেন।

কংগ্রেসের একজন শক্তিশালী নেতা ছিলেন সর্দার প্যাটেল। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে, এবং মাউণ্টব্যাটেন জানতেন প্যাটেল মন স্থির করলে সহজে কেউ তার মত পরিবর্তন করতে পারবে না। এদিকে নেহরুও দেশভাগ করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পন্থা খুঁজে পেলেন না। যদিও তিনি গান্ধীজির কাছে স্বীকার করেছিলেন দেশভাগের এই প্রস্তাবটি হল 'মর্মান্তিক এবং পীড়াদায়ক'।

গান্ধীজি নিজে ভাইসরয়ের কাছে 'অখণ্ড ভারতের' দাবী করেছিলেন এবং ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবকে সংশোধন করে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করতে বলেছিলেন। বলা যায় যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ছিল ব্রিটিশ সরকারের 'অখণ্ড ভারত' গঠনের শেষ প্রচেষ্টা। গান্ধীজির ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণ করতে কোন আপত্তি ছিল না।

১৯৪৭ সালে ৬ই মে গান্ধীজি জিন্নার সঙ্গে দেশভাগের প্রস্তাব নিয়ে তিনঘণ্টা আলোচনা করলেন।

আলোচনার পরে এক ইস্তাহার প্রকাশ করে বলা হল, আমরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। গান্ধীজি ভারতকে 'হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান' হিসাবে দেশভাগ করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন না। তিনি মনে করেন দেশভাগ অপরিহার্য নয়, কিন্তু আমার (জিন্নার) বক্তব্য হল পাকিস্তান গঠন অবশ্যম্ভাবী এবং এর বিরোধিতা করা হল বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার মূল কারণ।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল যে আমি এবং উনি দেশবাসীর কাছে শান্তি বজায় রাখতে যৌথ আবেদন করেছি। আমরা দেখতে চাই যে দেশের সর্বত্র আমাদের এই আবেদন অনুযায়ী কাজ করা হয়।

জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনা ব্যর্থ হল।

এই সময়ে মাউণ্টব্যাটেন পরিবার এবং তার দুই অতিথি, জওহরলাল নেহরু এবং কৃষ্ণ মেনন, সিমলাতে ছিলেন।

ইতিমধ্যে বলা হয়েছিল যে ১৭ই মে সিমলাতে মাউণ্টবাটেনের প্ল্যান নিয়ে দেশ নেতাদের এক বৈঠক করা হবে। কিন্তু সম্মেলন শুরু হবার আগেই মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে প্রস্তাব করেছিলেন সেই প্রস্তাবের

খসড়া নেহরুকে দেখালেন। কারণ তার মনে সন্দেহ হয়েছিল নেহরু হয়ত এই প্রস্তাবকে সহজে স্বীকার করে নেবেন না।

মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শদাতারা আপত্তির সুর তুলে বলেছিলেন যে এক-পক্ষকে এই প্ল্যানের খসড়া দেখান এবং অপরপক্ষকে না দেখান খুব যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে না।

মাউন্টব্যাটেন এর জবাবে বলেছিলেন যে বিষয়টি গুরুতর। এ নিয়ে এত নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করা সম্ভব নয়।

একদিন রাত্রে নেহরু ঘুমুতে যাবার আগে মাউন্টব্যাটেন তার প্রস্তাবের খসড়া তাকে পড়বার জন্যে দিলেন। রাত বারোটার সময় নেহরু কৃষ্ণ মেননকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন।

কৃষ্ণ মেননের প্রশ্নের জবাবে নেহরু বললেন যে, ভাইসরয় এই রকম প্রস্তাব করবেন তিনি কখনই আশা করেননি এবং এই প্ল্যান কোন প্রকারেই গ্রহণযোগ্য নয়। [মাউন্টব্যাটেন, জিগলার : পৃষ্ঠা-৩৭৯]।

তারপর দুজনে ভোর চারটে অবধি মাউন্টব্যাটেনের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন। পরের দিন, মাউন্টব্যাটেনের ডায়েরীর ভাষানুযায়ী, 'নেহরু এক বোমা নিক্ষেপ করলেন'। নেহরু তাকে এক চিঠি লিখে জানালেন : 'আপনার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর চাইতে পৃথক কারণ আপনার প্রস্তাব পড়বার পর আমার চোখের সামনে যে ছবি ভেসে উঠছে সেই ছবি দেখে আমি ভয় পাচ্ছি।'

'সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা এতদিন যে কাজ করেছি সেই কাজকে এই প্ল্যান ধ্বংস করবে। আজ একটি সম্পূর্ণ নতুন ছবি আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে; একটি ছবি, যার ভেতর আছে টুকরো টুকরো ভাগ, বিকৃতমূর্তি, ঝগড়া বিবাদের চিহ্ন এবং সর্বশেষে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টা [মাউন্টব্যাটেন—জিগলার পৃষ্ঠা-৩৭:]।

মাউন্টব্যাটেনের জীবনীর লেখক ফিলিপ জিগলার বলেছেন নেহরু দেশভাগকে 'ক্ষতিকর এবং অশুভ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি বলেছিলেন দেশের স্বাধীনতা পাবার জন্যে এই ক্ষতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু যদি দেশের বিভিন্ন অংশগুলিকে টুকরো টুকরো করা হয় এবং নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেশকে আরও খণ্ডন করা হবে। নেহরু এই প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে চাইলেন না। [মাউন্টব্যাটেন, জিগলার : পৃষ্ঠা-৩৭৯]

মাউন্টব্যাটেন নেহরুর কাছ থেকে এত 'তীব্র প্রতিক্রিয়া' আশা করেন নি। তিনি হতভম্ব হলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস এবং নেহরু তার

এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। কারণ তিনি তার এক সহকর্মীর কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ইসমে যে প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে লণ্ডনে গিয়েছিলেন সেই খসড়াটি নেহরু মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছেন। 'কিন্তু আজ আলোচনার পর বুঝতে পারলাম তিনি এই খসড়া প্রস্তাবের বিরোধী।'

কী হয়েছে আমি সঠিক বলতে পারব না, পরে মাউণ্টব্যাটেন তার মেয়ে পাট্রিসিয়ার কাছে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি এই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে দেশের আরও পাঁচজন নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন এবং সবাই তার এই খসড়া প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

পরের দিন সকালেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হল না। কারণ নেহরু তার চিঠিতে লিখেছিলেন যে ভাইসরয়ের প্রস্তাব এই দেশকে ভাগ করবে... দেশে নাগরিকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ইন্ধন সৃষ্টি করবে। এবং উগ্রতা, অরাজকতা বাড়াবে এবং কেন্দ্রের শাসনযন্ত্র আরও ভেঙ্গে পড়বে। একমাত্র কেন্দ্রের শাসনই এই অরাজকতা বন্ধ করতে পারবে। (এই প্রস্তাব) সৈন্যবাহিনী, পুলিশ এবং কেন্দ্রের শাসনকে আরও দুর্বল করবে। 'যদি ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হয় জনগনের ইচ্ছাকে যাচাই করে এবং কোন জিনিষকে গ্রন্থিচ্যুত না করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা তাহলে তারা আজ যে প্রস্তাব করেছেন তাদের ঐ উদ্দেশ্যকে সফল করবে না।'

'কোন কিছু বেছে নেবার আগে জনগণ জানতে চাইবে', নেহরু লিখেছিলেন, 'তারা কী জিনিষ বেছে নিচ্ছে। এই প্রস্তাবে কোন পটভূমিকা নেই এবং এর থেকে কোন কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'গ্রন্থিচ্যুত না করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে গেলে (এই প্রস্তাব) আরও তীব্র হিংস্রতা, এবং জটিল সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার শাখা-প্রশাখা আরও দুর্বল হবে। কংগ্রেস কোন প্রকারেই এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে না' ['দি লাষ্ট অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১২৪]।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন সহজে পরাজয় স্বীকার করতে চাইলেন না। এবার তিনি ভি. পি. মেননকে স্মরণ করলেন।

ভি পি মেনন নেহরুর সঙ্গে বসে কফি খাচ্ছিলেন। নেহরু ভি পি মেননের উপর বেশ রাগ করেছিলেন। মেনন এবং 'ডিকি বার্ডের প্রস্তাবের' খসড়ার খবর মেনন জানতেন। এই প্রস্তাবের খবর ভি পি মেনন কেন নেহরুকে আগে বলেন নি? 'কারণ সহজ', মেনন জবাব দিলেন, ভাইসরয় এই সম্বন্ধে তাকে অন্য কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন। তাই মেনন কিছু বলেন নি।

ঠিক এই সময়ে ভাইসরয় মেননকে তলব করলেন।

'নেহরু এবং কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের খসড়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।' অতএব তিনি এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মেননের পরামর্শ চাইলেন।

* * *

এবার আর একটি পুরান ঘটনা বলা দরকার। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মেনন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। একমাত্র মেননই বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে না। কারণ তিনস্তরে দেশের সংবিধানকে রচনা করা যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়নি....অন্ততঃ মেনন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ যোগ্য নয় বলে মনে করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জিন্না কখনই তার পাকিস্তান দাবীকে এত সহজে ত্যাগ করবেন না।

'আমি প্যাটেলকে বলেছিলাম। [ভি. পি. মেনন তার বই 'ট্রান্সফার অব পাওয়ারে' বলেছেন] যে এই দেশের কিছু লোক এবং ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট ইংরেজরা জিন্নার এই পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করছে।'

'আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা জিন্নার প্রস্তাবকে সমর্থন করে।' অতএব মেনন প্যাটেলকে বললেন যে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আগে দেশকে ভাগ করাই হবে বিবেচকের কাজ। আর আমরা যদি দেশভাগ করতে রাজি থাকি, পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের যে সব এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই এলাকাগুলি কখনই জিন্না দাবী করতে পারবে না। কিন্তু জটিল প্রশ্ন হল কী ভিত্তিতে এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সম্ভব হবে।

মেনন প্যাটেলকে বলেছিলেন 'দেশভাগ করা হলে দুইটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হবে এবং দেশভাগ ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে করা হবে। এই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণ করলে কংগ্রেস তিনটি সুবিধে পাবে।'

প্রথম সুবিধে হল নিরাপদ এবং শান্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। দুই, এই প্রথায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হলে ব্রিটেনের সবাই আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং কংগ্রেসও ব্রিটেনের বন্ধুত্ব এবং শুভেচ্ছা পাবে। তৃতীয়ত ভারতের উচ্চপদস্থ পদে অধিকাংশই ইংরেজ সরকারি কর্মচারিরা কাজ করছেন এবং ভারত কমনওয়েলথে থাকলে এরা সবাই যে যার নিজেদের পদে বহাল থাকবেন এবং ভারতকে সাহায্য করবেন। চার, ভারতীয় সেনাবাহিনী, এয়ারফোর্সেও ইংরেজ কর্মচারিরা কাজ করবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্যে তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। এবং পাঁচ, নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার সুযোগ পাবে।

'এই ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হলে তাদের [নৃপতিদের] মনে কোন দুশ্চিন্তা হবে না এবং তারা ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে সহজে রাজি হবেন।

'এর পরিবর্তে আমাদের ক্ষতির দিকটা খতিয়ে দেখা [মেনন বলেছিলেন] দরকার। আমরা যে সংবিধানই রচনা করি না কেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস তার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না। এ ছাড়া আমরা যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গ্রহণ করি তাহলে আমরা অবিলম্বে ক্ষমতা পেতে পারি এবং একবার ক্ষমতা পাবার পর আমরা যে কোন সময়ে কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি।

সর্দার প্যাটেল মেননের এই যুক্তিতে বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। প্যাটেল মেননকে আশ্বাস দিলেন যদি এই প্রথায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয় তাহলে তিনি চেষ্টা করবেন যেন কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

মেনন প্যাটেলের সামনেই প্রস্তাবের একটি নকশা তৈরি করলেন এবং প্যাটেলের সম্মতি নিয়ে এই নকশাটি সেক্রেটারী অব ষ্টেটসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মেনন সেক্রেটারী অব ষ্টটসের কাছ থেকে এই চিঠির কোন জবাব পাননি।

পরে মেনন ভাইসরয়কে প্যাটেলের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনার সারাংশ দিয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন ইস্‌মে যে প্রস্তাবের খসড়া লণ্ডনে নিয়ে গেছেন ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার কী মত?

আপনি যদি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করতেন তাহলে আমি ঐ প্রস্তাব লণ্ডনে পাঠাতে কখনই বলতাম না, মেনন জবাব দিলেন।

মাউব্যাটেন চুপ করে গেলেন ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', ভি. পি. মেনন এবং 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা—১:৬-১২০ এই কাহিনী পাওয়া যাবে]।

নেহরু তার প্রস্তাবকে বাতিল করে দেবার পর মাউন্টব্যাটেন নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করলেন এবার কী করা যায়? হঠাৎ তার মেননের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কথা মনে পড়ল। মেনন তাকে যে প্রস্তাবটির বলেছিলেন সেই প্রস্তাবটির কথা তার স্মরণ হল। তিনি স্থির করলেন যে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের কাঠামোর ভিত্তিতে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাবটি নিয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তবে প্রথমে তিনিএই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস প্রস্তাবটি নিয়ে মেননের সঙ্গে আবার আলাপ-আলোচনা করলেন।

মাউন্টব্যাটেন এবং মেননের বক্তব্য ছিল ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস মর্যাদাটির প্রস্তাব নতুন কিছু নয়। ১৯২৬ সালে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের পর ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। অবশ্যি সব ইংরেজরা ভারতকে কমনওয়েলথে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্নর আপত্তি করেছিলেন যে ভারতকে ডোমিনিয়নের ভেতর গ্রহণ করা হলে ইংরেজের সরকারের দায়-দায়িত্ব বাড়বে। ইংল্যাণ্ডেও অনেক ব্রিটিশ কর্মচারিও এই ধরণের মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মেননের প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেনের পছন্দ হল। রাজার সঙ্গে ডোমিনিয়নের মাধ্যমে এই সম্পর্ক রাখবার প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করলেন। মাউন্টব্যাটেন একবার কৃষ্ণ মেননকে বলেছিলেন যে সব দেশ কমনওয়েলথের ভেতর থাকতে চায় তাদের ঐ প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করবেন। শুধু তাই নয় মাউন্টব্যাটেন কৃষ্ণ মেননকে একটি অতিরঞ্জিত কথা বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাকে নির্দেশ দিয়েছে যেন ভারতকে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের ভেতর রাখা হয়। পরে মাউন্টব্যাটেন এই কথা মিথ্যে বলে স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু ইস্মে যে খসড়া প্রস্তাবটি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন সেই প্রস্তাবের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের কোন কথা উল্লেখ ছিল না।

তার প্রধান কারণ ছিল মাউন্টব্যাটেন ভেবেছিলেন হয়ত নেহরু এই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে রাজি হবেন না।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করবার পর ভি. পি. মেনন এই প্রস্তাব নিয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। প্যাটেলের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই কথাও ভি পি মেনন নেহরুকে বললেন।

মাউন্টব্যাটেন এর পর এই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের প্রস্তাব নিয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন।

মাউবন্টব্যাটেন নেহরুকে বললেন যে এই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের প্রস্তাবানুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি ভারত থেকে আলাদা করা হবে। তারপর ক্ষমতা দুইটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, একটি 'হিন্দুস্থান' এবং অপরটি 'পাকিস্তানের' হাতে তুলে দে'য়া হবে। দুইটি দেশের পৃথক গভর্নর জেনারেল থাকবে। দুইটি দেশের সংবিধান সংসদ দ্বারা রচনা না করা পর্যন্ত দুই ডোমিনিয়নের সরকার অন্তবর্তীকালীন সরকারের শাসনের কাঠামোয় তৈরি করা হবে। ভারত সরকারের ১৯৩৫ এ্যাক্ট হবে এই কাঠামো। প্রয়োজনবোধে এই এ্যাক্টের অদল বদল করা চলবে।

[বলা প্রয়োজন আজ অবধি এই ১৯৩৫ সালের এই এ্যাক্ট দ্বারা আমাদের

বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে শাসন করা হয়। যদিও এই এ্যাক্টের বেশ কিছু অদল বদল করা হয়েছে]।

ভাইসরয় নেহরুকে বললেন যদি এই প্রথানুযায়ী কংগ্রেস ক্ষমতা হস্তান্তরিত প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি থাকে তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার জন্যে ১লা জুন ১৯৪৮, সাল পর্যন্ত দেরী করতে হবে না। [বলা দরকার এর আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরেজ সরকার ১লা জুন ১৯৪৮ সালের মধ্যে ভারত থেকে চলে যাবে]। মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে বললেন তার এই প্রস্তাবে 'সবুজ সংকেত' দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সম্ভব হবে।

প্রথমে নেহরু আপত্তির সুর তুলে বললেন দেশবাসীদের সবাই পূর্ণ-স্বাধীনতার স্বপক্ষে। এই 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' শব্দটি, বিরক্তিজনক এবং এই কথা সবাইকে অতীত স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

যদিও আমি স্বীকার করি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পূর্ণ স্বাধীনতার সমান কিন্তু তবু জনগণ এই সূক্ষ্ম পার্থক্য, বিভেদ বুঝতে পারবে না।

এবার ভি পি মেনন মন্তব্য করলেন। প্রয়োজন হলে রাজার পদবী থেকে 'সম্রাট' শব্দটি বাদ দেওয়া হবে।

নেহরু-এর জবাবে বললেন শব্দের এই অদল বদলের পর ও দেশবাসীরা বলবে যে ইংরেজ শাসনের অবিচ্ছিন্ন প্রভুত্ব রয়েছে। 'আমি ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার পক্ষপাতী। কী করে এই সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে এই নিয়ে আরও চিন্তা করা দরকার। পরে একটু চিন্তা করে নেহরু বললেন: অবশ্যি এই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস প্রস্তাবের অনুযায়ী যে কোন সময়ে ভারত, কমনওয়েলথের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে।'

আমি আপনার সঙ্গে একমত, মাউন্টব্যাটেন এর জবাবে বললেন।

১১ই মে, নেহরু এবং প্যাটেল আলোচনা করে স্থির করলেন যে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে এই দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। ['দি লাষ্ট ডেজ, অব দি ব্রিটিশ রাজ' লিওনার্ড মোসলে পৃষ্ঠা-১২০ এবং মাউন্টব্যাটেন-ফিলিপ : জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮২]।

পরে রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখেছিলেন : আমরা যে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণ করছি, বলা যায় সেই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এবং পূর্ণ স্বাধীনতা একই জিনিষ। [মাউন্টব্যাটেন জিগলার : পৃষ্ঠা-৩৮৩]।

আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ১৯২৯-১৯৩০ সালে গান্ধীজি লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি সদস্যদের কাছে রেখেছিলেন সেই প্রস্তাবটি-

ছিল—স্বরাজ বলতে "পূর্ণ স্বাধীনতা" হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য। কিন্তু পরে সুভাষ বোস এই প্রস্তাবে এক সংশোধন প্রস্তাব রেখে বলেছিলেন যে "পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার পর ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।" এ ছাড়া সুভাষ বোস এক 'সমান্তরাল সরকার' গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন কংগ্রেস কোন প্রকারেই ব্রিটিশের সঙ্গে মীমাংসা করবে না। এই ছিল সুভাষ বোসের দাবী। কিন্তু গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। নেহরু সুভাষ বোসের সংশোধন প্রস্তাবের অর্থাৎ "পূর্ণ স্বাধীনতা" এবং 'সক্রিয় সংগ্রামের' পক্ষে ছিলেন। নেহরু ঐ দিন তার সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদকে বর্জন না করা হলে ভারত কোনদিনই কমনওয়েলথের সদস্য হবে না।' অবশ্যি সুভাষ বোসের মত তিনি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি ছিলেন না ['নেহরু এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফী', মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠ —১৪১-১৪৫]।

নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করবার পর রাত নটার সময় মাউন্টব্যাটেন ইস্‌মের কাছে এক বিশেষ তার পাঠালেন। টেলিগ্রামে তিনি বললেন যে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের কাছে নির্ধারিত দিনের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

পরে মাউন্টব্যাটেন তার প্রস্তাবের সুবিধাকে ব্যাখ্যা করে বললেন: ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করলে যে সুবিধা পাওয়া যাবে সেই সুবিধেগুলি হল:—(১) সারা জগতে ইংরেজের সম্মান বাড়বে এবং বর্তমানে ব্রিটিশ সরকারের সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে।

(২) সাম্রাজ্যর সুরক্ষার দিক থেকে অনেক সুবিধে হবে।

(৩) অবিলম্বে, বিশেষ করে, ব্রিটিশ সরকারের আইন শৃঙ্খলার রাখবার দায়িত্বের অবসান হবে।

(৪) ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব আরোও দৃঢ় হবে [মাউন্টব্যাটেন: জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৩]।

তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীকে আরও জানালেন যে প্রস্তাবের খসড়া তিনি পাঠিয়েছিলেন এবং যে প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন করেছে সেই প্রস্তাবের খসড়াকে নাকচ করা হক। নতুন প্রস্তাবের খসড়া পাঠান হচ্ছে।

এর জবাবে ইস্‌মে বললেন যে সমস্ত ব্যাপারটি 'অস্পষ্ট', ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যরা বললেন যে মাউন্টব্যাটেনের এই 'অস্পষ্ট প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে লণ্ডন থেকে হয় কোন মন্ত্রিদের ডেলিগেশন দিল্লী পাঠাতে হবে নতুবা মাউন্টব্যাটেনকে লণ্ডনে আসতে হবে।

ইস্‌মে জানতেন যে ক্রীপসের দিল্লীতে আগমন মাউন্টব্যাটেন কোন প্রকারেই পছন্দ করবেন না। অতএব ইস্‌মে মাউন্টব্যাটেনকে লণ্ডনে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

প্রথমে মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইতস্তত বোধ করেছিলেন। তিনি ভাবলেন হয়ত লণ্ডনে গিয়ে তিনি তার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে পারবেন না। প্রথমে তিনি মনে মনে ঠিক করলেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেট হয় তার প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে নতুবা তিনি (মাউন্টব্যাটেন) ভাইসরয়ের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। এবার ভি. পি. মেনন ও লেডী মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়কে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তাঁকে লণ্ডনে ডেকে পাঠাবার পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব আলোচনার পর ঠিক হল, মাউন্টব্যাটেন লণ্ডন যাবেন [মাউন্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা—৩৮৩-৩৮৪]।

এতদিন মাউন্টব্যাটেন জিন্না, লিয়াকৎ এবং মুসলিম লীগের কারু সঙ্গেই এই প্রস্তাব নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি কিংবা তাদের কাউকে কোন কিছু বলতে চাননি যে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে কী প্রস্তাব করেছেন। একমাত্র নেহরুর সঙ্গেই এই বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন।

এবার ইংল্যাণ্ডে যাবার আগে মাউন্টব্যাটেন তার নতুন প্রস্তাবের খসড়া লিয়াকৎ আলিকে দেখালেন। মাউন্টব্যাটেন লিয়াকৎ আলিকে জিজ্ঞেস করলেন পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করলে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা?

লিয়াকৎ আলি এর জবাবে বললেন যে এই দুইটি প্রদেশকে যদি ভাগ করা হয় তাহলে তারা (মুসলিম লীগ) এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে না। তবে ভাগ করা যদি একান্ত অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে তারা এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে। লিয়াকৎ আলি আশা প্রকাশ করলেন হয়ত সব দলই রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে এই প্রস্তাবে রাজি হবেন। 'অবশ্যি এই ব্যাপারটি নিয়ে আপনি জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করুন।'

জিন্না তীব্র প্রতিবাদ করলেন। মুসলিম লীগ পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগে সম্মতি দিতে পারে না। ঐতিহাসিক, আর্থিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক কারণ দিয়ে এই প্রদেশকে ভাগ করবার যুক্তিকে সমর্থন কোন প্রকারেই করা যায় না। জিন্না বললেন : শতবছর ধরে এই দুই প্রদেশের নাগরিকেরা তাদের জীবনকে একসঙ্গে গড়ে তুলেছে। আজ প্রদেশ ভাগ করবার প্রস্তাবে বলা হয়েছে যেখানে শিখ এবং হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই জায়গাগুলি ভাগ করা হবে। এর পরিণাম খুব খারাপ হবে। বিশেষ করে, দুই প্রদেশের নাগরিকদের

এবং সর্ব সম্প্রদায়ের উপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করবে। কলকাতাকে পূর্ববঙ্গ থেকে আলাদা করা যায় না। দরকার হলে কলকাতাকে 'ফ্রীপোর্ট' বলে ঘোষণা করতে হবে।' ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', জিন্নার চিঠি, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৯৬ এবং জিন্না : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩২৫]।

মাউন্টব্যাটেন ইংল্যাণ্ডে গেলেন এবং ১৯শে মে তারিখে ১০নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের এক বৈঠক হল।

মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যদের বললেন যদি মুসলিম লীগকে পাকিস্তান না দেয়া হয় তাহলে তারা (লীগ) অস্ত্রের সাহায্য নেবে এবং সংগ্রাম শুরু করবে।

এরপর জিন্না রয়টার্সের কাছে এক বিবৃতিতে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ রাখবার জন্যে ৮০০ মাইলের একটি করিডর দাবী করলেন। নেহরু এই করিডর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এমন কী জিন্নার প্রস্তাব যে কলকাতাকে এক 'ফ্রী পোর্ট' করা দরকার এই দাবীরও প্রতিবাদ করা হল। পরে জিন্না ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে এক টেলিগ্রাম করে দাবী করলেন যে পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করবার আগে ঐ দুই প্রদেশের জনগণের মতামত জানবার জন্যে ভোট গ্রহণ করা হক। মাউন্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কারণ তিনি বললেন তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সময় নেবে।'

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মাউন্টব্যাটেনের এই যুক্তিকে স্বীকার করে নিল। [জিন্না, ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩২৫]।

২১শে মে, কৃষ্ণমেনন লণ্ডনে গেলেন এবং তিনি মাউন্টব্যাটেনকে বললেন যে নেহরু এবং প্যাটেল ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। অবশ্যি তাদের সর্ত হল এই ১৯৪৭ সালের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে।

সেদিনই এক চিঠিতে কৃষ্ণমেনন মাউন্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন : যদি জিন্না সম্পূর্ণরূপে পৃথক হতে চান এবং আমরা দেশের শান্তির জন্যে দেশ ভাগ করতে রাজি হই তাহলে অবিলম্বে আমরা তার হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। কারণ কংগ্রেসের ভয় ছিল যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে হয়ত তারা (কংগ্রেস) পাঞ্জাব, কলকাতা এবং বাংলা থেকে শিখদের এবং বাঙালীদের সমর্থন এবং সহানুভূতি হারাবেন। নেহরু জিন্নার দাবীতে এবং এই দেশ ভাগের তর্কবিতর্কে এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবে রাজি হলেন, কারণ তার বক্তব্য ছিল 'মাথা কেটে দিলে মাথা ব্যাথার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে' ['মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' : এ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন, পৃষ্ঠা-৯৮]।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এটলীর প্রধান সমস্যা হল বিরোধীদলের কনসারভেটিভ পার্টির নেতা উইনষ্টন চার্চিল কেনিয়ে কী করা যায়? ভারতকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে তার বিশেষ আপত্তি ছিল। তিনি কী মাউন্টব্যাটেনের এই প্রস্তাবে রাজি হবেন?

এটলী জানতেন চার্চিল এই ক্ষমতা হস্তান্তরিতের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে চার্চিলের কাছে এই ক্ষমতা হস্তান্তরিতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পাঠালেন।

মাউন্টব্যাটেন যখন চার্চিলের কাছে গেলেন তখন চার্চিল অসুস্থ ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীকে এই ক্ষমতা হস্তান্তরিতের বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। মাউন্টব্যাটেন পরে লিখেছিলেন :—

"চার্চিল আমার প্রতি সদয় ছিলেন এবং আমার কাজের প্রশংসা করলেন। কিন্তু তিনি লর্ড ওয়েভেলের প্রতি বিষোদ্গার করতে শুরু করলেন।

তিনি আমাকে বললেন যে তিনি ভারতীয় প্রশ্নটি নিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন।

তিনি বললেন যদি আমি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান গঠন করতে পারি তাহলে সমস্ত ইংল্যাণ্ড আমাকে সমর্থন করবে এবং কনসারভেটিভ পার্টি পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়া বিল' গ্রহণ করতে সাহায্য করবে।"

পরে মাউন্টব্যাটেন যখন বললেন যে নেহরু ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস গ্রহণ করতে রাজি আছেন, কিন্তু জিন্নার আপত্তি আছে, তখন চার্চিল বেশ অবাক হয়ে বললেন, বল কী হে? তিনি তো ইংরেজদের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারেন না। (But be is the one man who can not do without British help.) [মাউন্টব্যাটেন-জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৫]।

পরে চার্চিল জিন্নার কাছে একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠালেন।

এই বার্তায় চার্চিল বললেন : এই ক্ষমতা হস্তান্তরিতের ব্যাপারটি হল পাকিস্তানের জীবন-মৃত্যুর সমস্যা। অতএব আপনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করুণ। [জিন্না, ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৮৫]।

চার্চিল মাউন্টব্যাটেনকে আরও বললেন আপনাকে যদি হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করা হয় তাহলে আপনি ভাইসরয়ের পরিবর্তে 'মডারেটর' পদবীটি ব্যবহার করবেন। [মাউন্টব্যাটেন, জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৫]।

মাউন্টব্যাটেন যখন তার দেশভাগের প্রস্তাব নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে দিল্লীতে শলা পরামর্শ করছিলেন তখন দিল্লীতে আরও কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল গান্ধীজির এই দেশভাগের

প্রস্তাবের বিরোধিতা। তিনি ছাড়া আরও অনেক কংগ্রেস সদস্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। গান্ধীজি এক বক্তৃতায় বললেন: একথা যেন কেউ না বলে গান্ধী ভারত ভাগের সমর্থক ছিলেন। আজ দেশের সবাই স্বাধীনতা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে··কংগ্রেস দেশভাগ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। এই নতুন প্রস্তাবে এক টুকরো কাঠের রুটি খেতে দেওযা হয়েছে। যদি সবাই এই রুটি খায তাহলে সবাই পেটের যন্ত্রণায় মারা পড়বেন। যদি তারা এই রুটি না গ্রহণ করেন তাহলে তারা অনশনকারী, ক্ষুধার্ত থাকবেন।

গান্ধীজি আবার বিহার বাংলা সফর শেষ করে দিল্লীতে ফিরে এলেন। এবার ট্রেনে যাত্রার সময় তার আদরের ঘড়িটা কে জানি চুরি করে নিল। ঘড়িটি গান্ধীজির অতি প্রিয় ছিল। কারণ গান্ধীজি ঘড়ির কাঁটা দেখে তার দিনের কাজ করতেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা দরকার।

গান্ধীজি যখন আগষ্ট ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে বেলেঘাটায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন লেখক তখন ঐ শিবিরে রয়টারস, এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছিলেন। একদিন বিকেল ছ'টার পর বেলেঘাটার একদল বিক্ষোভকারীরা গান্ধীজির কাছে এসে ঐখানে তার শিবির স্থাপনের প্রতিবাদ করল। ক্রমে ক্রমে বিক্ষোভকারীরা বিশেষ উত্তেজিত হল এবং পুলিশ (এ-সি, হেমন্ত সেনগুপ্ত) শিবিরে ঢুকবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে গান্ধীজি সেনগুপ্তকে ডেকে বললেন: আপনি ওদের ভেতরে আসতে দিন। ওরা কী বলতে চায, আমি শুনতে চাই। সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ একদল বিক্ষোভকারীরা এসে গান্ধীজিকে অভিযোগ করতে শুরু করল আপনি মুসলিম এলাকায় যাচ্ছেন না কেন ইত্যাদি। এই আলোচনা যখন খুব উত্তেজনামূলক হল তখন গান্ধীজি তার ট্যাঁক থেকে ঘড়ি বের করে বললেন, মাপ করবেন, দশটা বাজে। আমার ঘুমুবার সময় হয়েছে। আমি ঘড়ি দেখে আমার কাজ করি। অনেকে গান্ধীজির ট্রেনে এই ঘড়ি হারাবার ঘটনাকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য করলেন। কারণ এই ঘড়ি ছিল গান্ধীজির একমাত্র মূল্যবান সম্পত্তি।

গান্ধীজি বলেছিলেন যে নেহরু এবং প্যাটেল দেশভাগের সপক্ষে ছিলেন কারণ তারা ভেবেছিলেন দেশভাগ করেই স্বাধীনতা সহজে পাওয়া যাবে।

তিনি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির কাছে অভিযোগ করলেন যে কংগ্রেস তাদের দেশ ভাগের নীতি পরিবর্তনের কথা তাকে জানান নি। কিন্তু নেহরু এর জবাবে বললেন যে তারা গান্ধীজিকে সব সময়ে সব খবর দিয়েছিলেন। গান্ধীজি এই বিবৃতিরও প্রতিবাদ করলেন। নেহরু জবাবে বললেন 'নোয়াখালি

দিল্লী থেকে অনেক দূরে। যদিও তারা গান্ধীজিকে পুরো ঘটনা বলেন নি তবু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং দেশভাগের সারাংশ তাকে জানিয়েছিলেন'.... (গান্ধীজিকে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি দেশভাগের পুরো ঘটনা বলেনি কারণ হয়ত গান্ধীজি কংগ্রেস নেতাদের সিদ্ধান্তে বাধা সৃষ্টি করতে পারতেন) [নেহরু, মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা—২০৩-২০৪]।

গান্ধীজি দিল্লী স্টেশনে নেমে এক বক্তৃতায় বললেন: আমি চিরকাল সংগ্রাম করেছি। আজ আমি দিল্লীতে একটি যুদ্ধ.... ...করতে এসেছি।

৩১শে মে তিনি তার প্রার্থনা সভায় সবাইকে বললেন: যদি দেশ পুড়েও যায় এবং মুসলমানেরা তরবারির সাহায্য নেয় তাহলেও আমরা পাকিস্তান গ্রহণ করব না। [নেহরু, ব্রেসার পৃষ্ঠা ৩৪৭।]

৪ঠা জুন গান্ধীজি প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার আগে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আবার দেখা করলেন। মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাবার পরই তিনি এই প্ল্যান রচনা করেছেন। 'কারণ গান্ধীজি বলেছিলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতবাসীরাই স্থির করবে। অতএব এই প্ল্যানকে গান্ধী প্ল্যান বলা উচিৎ, 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান' বলা ঠিক হবে না'। গান্ধীজি মাউন্টব্যাটেনের এই যুক্তিতে বিশ্বাস করেছিলেন কিনা জানা যায়নি, তবে তিনি ভাইসরয়ের এই জবাবে খুশি হলেন। গান্ধীজি এর পরে এক প্রার্থনা সভায় বললেন এই (প্ল্যানের) ব্যাপারে ভাইসরয়ের কোন হাত ছিল না। যদি আমরা, হিন্দু এবং মুসলমান, এক না হতে পারি তাহলে ভাইসরয়ের অন্য কিছু করা সম্ভব ছিলনা।" [মাউন্টব্যাটেন: জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৯।]

মাউব্যাটেন গান্ধীজির দিল্লীতে আগমনকে খুব সুনজরে দেখতে পারলেন না। কারণ মাউন্টব্যাটেন জানতেন যে দেশের জনগণের কাছে গান্ধীজির ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি নেহরু এবং প্যাটেলের চাইতে অনেক বেশি। এর আগে মাউন্টব্যাটেন সুকৌশলে গান্ধীজিকে দিল্লী এবং ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরিয়ে নোয়াখালি এবং বিহারে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি বুদ্ধি এবং বিচারে সবাইকে পরাজিত করতে পারতেন। এবং তিনি ইংরেজদের সূক্ষ্ম রাজনীতি অন্যর চাইতে আরও বেশি বুঝতেন। এই সব কারণে মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে গান্ধীজির দিল্লীতে উপস্থিতি বাধা এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। কারণ গান্ধীজি ইচ্ছা করলে অতি সহজেই দেশবাসীর কাছে বক্তৃতা দিয়ে কিংবা অনশন শুরু করে মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যানকে বানচাল করে দিতে পারতেন।

দেশভাগের আর একজন তীব্র বিরোধী ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম

আজাদ। তার দেশভাগের এই বিরোধিতা নেহরু, প্যাটেল এবং অন্য সবার কাছে এক বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশভাগের কী পরিণাম হবে তার সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে কেউ কান দেয়নি। কিন্তু দেশভাগের সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে ঘোষণা করবার আগে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তার এই সাক্ষাৎকারের বিবরণী তার বই 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম' বইতে বর্ণনা করেছেন।

'আমি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে দেশভাগের কী ভয়াবহ পরিণাম হবে সেই কথা উল্লেখ করলাম। দেশভাগের আগেই কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যদি দেশ ভাগ করা হয় তাহলে দেশের চারদিকে রক্তের নদী বইবে এবং ইংরেজ এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী হবে।

মাউণ্টব্যাটেন বিদ্রূপের কণ্ঠে বললেন 'অদূর ভবিষ্যৎ কী হবে আমি বলতে পারব না'।

এরপর মাউণ্টব্যাটেন মৌলানা আজাদকে আশ্বাস দিয়ে বললেন: তবে ব্যা. ক হত্যাকাণ্ড যেন না হয় সেই সম্বন্ধে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি। আমি দেখব যেন কোন রক্তপাত কিংবা দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয়। আমি একজন সেনা, অসামরিক বাহিনীর কর্মচারি নই। একবার দেশভাগের মূলনীতি গ্রহণ করা হলে আমি হুকুম জারী করব যে দেশে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে পারবে না। যদি সামান্য কোন গোলযোগও হয়, তাহলে আমি এই গোলমাল, হাঙ্গামা বন্ধ করবার জন্যে কঠোর উপায় অবলম্বন করব। এর জন্যে আমি শুধু পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করব না। আমি সৈন্য এবং বিমান বাহিনীকে এই কাজ করবার আদেশ দেব এবং কেউ যদি কোন গোলমাল হাঙ্গামা করতে চায় তাহলে আমি তাদের দমন করতে ট্যাঙ্ক এবং প্লেন ব্যবহার করব। ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১৩০]।

কিন্তু এরপর যখন দেশে গোলমাল শুরু হল তখন কেউ মাউণ্টব্যাটেনকে তার এই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেননি!

* * *

২রা জুন, ১৯৪৭, নির্ধারিত দিনে ভাইসরয়ের বাড়িতে নেহরু, প্যাটেল, জে. বি কৃপালিনী [ঐ বছরে কংগ্রেসের সভাপতি] বলদেব সিং এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে জিন্না, লিয়াকৎ এবং আবদরব নিষতার গেলেন। সেদিনকার সভায় মাউণ্টব্যাটেন নেতাদের কাছে তার প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বললেন। এর আগেই

মাউন্টব্যাটেন দেশ নেতাদের কাছ থেকে তার প্রস্তাবের সমর্থনে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন। অতএব নেতাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাকে কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হল না। প্রথম অধিবেশনের পর ঠিক হল নেহরু, জিন্না এবং বলদেব সিং দেশবাসীর কাছে মাউন্টব্যাটেনের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবার জন্যে আবেদন করবেন।

প্রথম অধিবেশন মাত্র দুঘণ্টাব জন্যে হল। মাউন্টব্যাটেন পরে লিখেছিলেন: আমি নেতাদের রাত বারোটার মধ্যে তাদের জবাব দিতে বললাম। জিন্না বললেন তিনি লীগের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে রাত এগারটার সময় এসে তার জবাব দেবেন। কিন্তু আমি জিন্নাকে সভার পরে কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে বললাম।

আমি তাকে বললাম যে আমি তার কাছ থেকে কোন নেতিবাচক জবাব শুনতে চাইনে।

তারপর আমি চার্চিলের বার্তা তাকে দিলাম। ভাইসরয় ইতিমধ্যে গান্ধীজির উপর তার বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: He may by a saint but he seems to be a disciple of Trotsky. [জিন্না: ওলপোট পৃষ্ঠা—৩২৬-৩২৭]।

জিন্না রাত এগারটার সময় এসে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন। মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে জিন্না আধঘণ্টার মত তার সঙ্গে ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত যে তারা প্রদেশ বিভাগের বিরোধী এই আপত্তির কথা জানালেন।

ভাইসরয় পরে লিখেছিলেন আমি তাকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলাম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা? ইতিমধ্যে আমি কংগ্রেস এবং শিখদের কাছ থেকে জবাব পেয়েছিলাম। ওরা সবাই তাদের আপত্তির বিভিন্ন কারণ এবং মতামত জানিয়েছিলেন কিন্তু সবার জবাবে সম্মতির রেশ ছিল। আমি জিন্নাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি নিজে কী এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন? তিনি আমাকে জবাব দিলেন যে তিনি নিজে আমাকে সমর্থন করবেন এবং লীগ যেন এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন সেই চেষ্টা করবেন।

তিনি বললেন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে তিনি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এক জরুরী অধিবেশন ডেকেছেন। পরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি কী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারি আপনার এই প্রস্তাবে সম্মতি আছে, জিন্না সম্মতি জানিয়ে বললেন, হ্যাঁ। [জিন্না: ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩২৭ এবং 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে পৃষ্ঠা-১৩১]।

পরে মাউন্টব্যাটেন তার কন্যা প্যাট্রিসিয়ার কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : (মাউন্টব্যাটেন-জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৭), ২/৩রা জুন ছিল আমার জীবনের সবচাইতে খারাপ সময়।

'আমি বেলা দশটার সময় নেতাদের কাছে প্ল্যানটি দিয়েছিলাম এবং সবাইকে বলেছিলাম যে রাত বারোটার মধ্যে তাদের কার্যকরী সমিতির জবাব চাই এবং তিনটি অসন্তোষজনক জবাব পেলাম। বাকী সবাই প্ল্যান গ্রহণ করল। একটি বিন্দুও পরিবর্তন করা হল না। ঐ রাত্রে সমস্ত ঘটনা আমার কাছে অস্পষ্ট, ঝাপসা বলে মনে হচ্ছিল। আমি একবার ভেবেছিলাম দেশে ফিরে আসব যদিও আমি কাউকে জানতে দিইনি যে আমি চিন্তিত ছিলাম'।

'অবশ্যি কখনই আমি কাউকে আমার মনের দুশ্চিন্তার কথা বলি না'।

পরের দিন প্ল্যানের মূল প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত করা হল। এই প্রস্তাবে বলা হল যে সব এলাকায় পাকিস্তান গঠিত হবার সম্ভাবনা আছে সেইখানে জনগণের মতামত যাচাই করা হবে। বাংলা, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক বিধানসভা এই প্রশ্নের বিচার করবে। বাংলা এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক বিধান সভায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যে সব জিলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, অর্থাৎ এই দুইটি শাখা হিসাবে মিলিত হবে এবং প্রতিটি শাখা ভিন্ন ভাবে স্থির করবে যে তাদের প্রদেশ ভাগ করা হবে কিনা? যদি কোন শাখা তাদের প্রদেশ বিভাগ করতে চায় তাহলে তাদের রায়কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। যদি দুইটি শাখা একত্রে থাকতে চায় তাহলে তারা স্থির করবে যে কোন সংবিধানে সংসদে তারা যোগ দেবে। ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হবে। কারণ গত নির্বাচনে ঐ এলাকার জনগণের ইচ্ছার পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। আসামের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলা সিলেটে সর্বসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হবে এবং যদি বাংলা প্রদেশ ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সিলেট যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে চায়, তাহলে সিলেট হবে পূর্ববাংলার একটি অংশ। প্ল্যানে বলা হল পয়লা জুন, ১৯৪৮ সালের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী এটলী এই প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। পরে ভাইসরয় আকাশবাণীতে প্ল্যানের মূল বিষয় বস্তুগুলি ঘোষণা এবং ব্যাখ্যা করলেন।

এরপর নেহরু জিন্না এবং বলদেব সিং রেডিওতে বক্তৃতা দিলেন। নেহরু তার বক্তৃতার শেষে বললেন 'জয়হিন্দ', জিন্না বললেন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।

পরের দিন মাউন্টব্যাটেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রায় তিনশোর বেশি সাংবাদিক এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে এক মামুলি প্রশ্নের জবাবের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন যে ব্রিটিশ সরকার ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে।

তারিখ ঠিক হল। গত মে মাসে অর্থাৎ লণ্ডনে যাবার আগে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নাকে বলেছিলেন তার ইচ্ছা যত শিগির, খুব সম্ভবত, পয়লা অক্টোবরের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরিতের নতুন তারিখ নিয়ে কারু সঙ্গে কোন আলোচনা করলেন না কিংবা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকেও তার মনের এই ইচ্ছার কথা বলেন নি।

মাউণ্টব্যাটেনের জীবনীর লেখক জিগলার লিখেছেন যে মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন এই ১৫ই আগষ্ট তারিখটিতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার প্রেরণা তিনি মন থেকে পেয়েছিলেন, কারণ ১৫ই আগষ্ট দিনটি ছিল তার সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের পদে নিয়োগ হবার বার্ষিকী। কিন্তু পরে মাউণ্টব্যাটেন বলেন যে ১৫ই আগষ্ট তারিখটি তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই স্থির করেছিলেন। [মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা-৩৮৮]।

তিনি তার মেয়ে প্যাট্রিসিয়ার কাছে ১১ই জুন এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে আমি যখন ১৫ই আগষ্ট দিনটি প্রস্তাব করলাম তখন আমার কর্মচারিরা শুনে হতভম্ব হয়েছিল এবং সবাই বলতে লাগল এত শিগ্‌গির ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব নয়।

যখন নেহরু এই ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিতের খবর শুনতে পেলেন তখন তিনিও বললেন 'আমি (এই খবর) বিশ্বাস করতে পারছিনে।

এমন কী এটলী যখন শুনতে পেলেন যে ভাইসরয় সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে পনেরই আগষ্ট ১৯৪৭ মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে তখন তিনিও বিস্মিত, অবাক হলেন। কারণ সাংবাদিক সম্মেলনের পরে মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক তার (২৮শে জুন) পাঠিয়ে বললেন 'আমি নেতাদের আশ্বাস দিয়েছি যে ১৫ই আগষ্টের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে....আমি ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করব যেন ঐ তারিখের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার বন্দোবস্ত করা যেন হয়। এই টেলিগ্রাম পাবার পর এটলীর সেক্রেটারী লেসলী রোয়ান বললেন : এত অল্প সময়ের মধ্যে পার্লামেণ্ট 'ইণ্ডিয়া বিল' প্রস্তাবটি অনুমোদন করবে না... কিন্তু এটলী ঐ নোটের উপর লিখলেন 'ভাইসরয়ের প্রস্তাবই গ্রহণ করা হবে।' অতএব ক্ষমতা হস্তান্তরিতের তারিখ ঠিক হল, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭।

কিন্তু ঐ ১৫ই আগষ্ট তারিখটি অনেক কংগ্রেস নেতাদের কাছে পছন্দসই

হল না। কারণ দিল্লীর জ্যোতিষীরা সময়, তারিখ গণনা করে বললেন ঐ তারিখটি 'অপয়া'।

নেহরু জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীতে একেবারেই বিশ্বাস করতেন না কিন্তু তিনি তার সহকর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইলেন না। হিসেব করে দেখা গেল ১৪ই আগষ্ট মাঝ রাত্রে হল শুভ সময়... অতএব ঠিক হল যে ১৪ই আগষ্ট মাঝ রাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে।

৫ই জুন, মাউণ্টব্যাটেন বিভিন্ন নেতাদের এবং পরামর্শদাতাদের নিয়ে এক বৈঠকে দেশভাগ নিয়ে আলোচনা করলেন।

৯।১০ই জুন নিউ দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটলে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের' শেষ অধিবেশন হল। প্রায় ৪২৫ জন মুসলিম সদস্য এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। হঠাৎ এই সভায় এরা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছিল। বেশ কিছু মুসলিম সদস্য সভায় গোলমাল করতে শুরু করল।

এরা সবাই 'বিশ্বাসঘাতকতা,' 'ট্রাজেডি ফর পাকিস্তান' বলে চিৎকার করতে লাগল। এর মধ্যে বেশ কিছু লোক ছিলেন যারা কলকাতাকে হিন্দুদের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। গোলমাল এত বেশি হল যে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যাবহার করল। প্রায় পঞ্চাশজন খাকসারকে গ্রেপ্তার করা হল।

কনফারেন্সের চারদিকে বড বড় করে লেখা হয়েছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। জিন্নাকে বলা হল 'শাহনশাহ্' (পাকিস্তানের সম্রাট) কিন্তু পরে জিন্না মঞ্চে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন তারা যেন এই পদবী ধরে তাকে অভিবাদন না করেন। 'আমি পাকিস্তানের সেনামাত্র, শাহনশাহ্ নই। লীগের কার্যকরী সমিতি এই মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবকে' মীমাংসা প্রস্তাব বলে বর্ণনা করল এবং জিন্নাকে এই প্ল্যানের মূল নীতি নিয়ে আলোচনা করবার এবং প্ল্যান গ্রহণ করবার ক্ষমতা দে'য়া হল [জিন্না : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৩০]।

লীগের প্রস্তাব কংগ্রেস মহলে আলোড়ন এবং প্রতিবাদ সৃষ্টি করল।

নেহরু এবং প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন যে লীগ মাউণ্টব্যাটেনের প্ল্যানকে চূড়ান্ত মীমাংসা হিসাবে গ্রহণ করেন নি। এই অবস্থায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে কিছু গোলমাল হবার সম্ভবনা আছে।

'পাকিস্তান' প্রস্তাবের মূল লেখক রহমৎ আলি কেমব্রিজ থেকে এক প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন। তিনি বললেন, জিন্না তার মূল পাকিস্তান প্রস্তাবকে বিকৃত করে দিয়েছেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমরা এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নেব না। আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব, এই ছিল রহমৎ আলির মত।

*   *   *

মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান ঘোষণা হবার আগে ভাইসরয় বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের নিয়ে এক বৈঠক করেছিলেন। এই বৈঠক হবার তারিখ ছিল ১৫ই এপ্রিল ১৯৪৭। (ট্রান্সফার অব পাওয়ার-দশম খণ্ড পৃষ্ঠা-২৫৪) গভর্নরদের এই বৈঠকে বাংলার গভর্নর বারোজ উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সভায় তার প্রতিনিধি ছিলেন তার সেক্রেটারী টাইসন। টাইসন বাংলা বিভাগের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সভায় গভর্নর বারোজের মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যখন ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল তখন বাংলার সবাই খুশি হয়েছিল যে বাংলাকে ভাগ করা হবে না। এই সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী ভেবে ছিলেন (টাইসন ভাইসরয়কে এই সভায় বললেন) যে তার মুসলিম লীগ সরকারই প্রদেশে স্থায়ী থাকবেন সুরাবর্দী। স্বাধীন বাংলার গঠনের ব্যাপার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। সুরাবর্দীর ইচ্ছা ছিল এই স্বাধীন বাংলা হবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের একটি অংশ।

টাইসন গভর্নরদের সভায় আরও বললেন যে বর্তমানে বাংলায় মুসলিম লীগের বিকল্প সরকার গঠন কবা সম্ভব নয়। সমস্ত বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা হল তিন-কোটি ত্রিশ লাখ, হিন্দু আড়াই কোটি এবং তপশীলি জনসংখ্যা হল নব্বই লাখ। কিন্তু প্রধান প্রশ্ন ও সমস্যা হল এই তপশীলিদের হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা? তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলার সব হিন্দুরাই পাকিস্তান গঠনের বিরোধী। টাইসন আরও বললেন হিন্দুরা বাংলা ভাগের পরিবর্তে এক 'অখণ্ড বাংলা' গ্রহণ করতে রাজি হবে।

এই প্রসঙ্গে গভর্নর বারোজ বলেছেন : যে পূর্ব বাংলা কোন কারণেই চলতি সংস্থা হবে না। এবং ভবিষ্যৎএ হতে পারবে না। কারণ পূর্ববাংলা ভাগ করা হলে নাগরিকদের উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য ইত্যাদি দিতে পারবে না। দেশের পাটের জমিগুলিতে খাদ্য উৎপাদন করা হলেও পূর্ব বাংলার খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে হবে না। গভর্নর বারোজের বক্তব্য হল ভবিষ্যৎ 'পূর্ববাংলা হবে এক 'গ্রামীণ পল্লী' (A rural slum)। টাইসন আরও বললেন যে মুসলীম লীগ এবং হিন্দুরা সবাই বলছেন যে স্বাধীন 'অখণ্ড বাংলা' গঠন করবার উদ্দেশ্য হল পাকিস্তান পরিকল্পনাকে বানচাল করা। (They felt that the partition of Bengal was to torpedo Pakistan.) তিনি [গভর্নর বারোজ] বলতে পারেন না এই বাংলা ভাগের প্রস্তাবটি কী করে জনগণকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে।

এর কিছুদিন আগে টাইসন ভাইসরয়ের সেক্রেটারী আবেলের কাছে এক

চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন গভর্নর বিশ্বাস করেন না যে বাংলা ভাগের পরিকল্পনাটি বাস্তব কার্যে রূপায়ন করা সম্ভব হবে। [ট্রান্সফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৮৯]

যদি ভাগ করা হয় তাহলে পূর্ববাংলায় বিদ্রোহ হবে এবং কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্যি জিন্না যদি বর্তমান লীগ সরকারকে প্রদেশভাগ প্রস্তাবে রাজি করাতে পারেন তাহলে ভিন্ন কথা। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৯]।

টাইসন এক চিঠিতে গভর্নর বারোজের প্রদেশভাগের প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করে লিখলেন : এই প্রস্তাব বারোজ মাউন্টব্যাটেনের দেশ ভাগ পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার আগেই করেছিলেন। কারণ ঐ সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে নেতাদের মধ্যে এবং সরকারি মহলে আলোচনা হচ্ছিল। ভাইসরয় গভর্নর বারোজের কাছে এই বঙ্গভঙ্গের উপর তার মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং বিকল্প একটি প্রস্তাব চেয়েছিলেন। তার সেক্রেটারী টাইসন ভাইসরয়ের সেক্রেটারীর কাছে এক চিঠি লিখে গভর্নর বারোজের মতামত জানিয়ে ছিলেন।

বারোজের প্রস্তাবে বলা হল যে প্রথম ধাপ হবে একটি সংবিধান সংসদ গঠন করা। দুই, পরে উভয়পক্ষের মধ্যে সমান সমান ভিত্তিতে পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করে প্রদেশ ভাগের একটি পথ খুঁজে বার করা।

বর্তমান বিধান সভার যুরোপীয় এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যরা এই দুইটি নতুন সংবিধান সংসদের সদস্য হবেন। এই কাজের জন্যে সময়কালীন প্রদেশ ভাগ করবার প্রয়োজন হবে। এই সময়কালীন প্রদেশ ভাগ এই ভিত্তিতে করা হবে।

"১৯৪১ আদম সুমারীর গণনা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলাগুলিকে নতুন পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং যে সব জি· য মুসলমান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়, হিন্দু, তপশীলিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কলকাতা শহর এবং শহরতলিতে আছে, তাদের পশ্চিম বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বর্তমান বিধান সভার ভারতীয় এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সদস্যরা দুইটি সংবিধান সভায় বসতে পারবেন। তবে সদস্যরা কোন সংবিধান সভায় বসবেন সেইটি বিধান সভার হুইপ স্থির করবেন। যে সদস্যরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম বাংলার কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ হিন্দু না মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি সেই নিয়ম অনুসারে তাদের বিধান সভায় যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া হবে।"

'স্বাধীন বাংলা, পরিকল্পনাটি নিয়ে দিল্লীর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সদস্যরা যেমন গভীর চিন্তাভাবনা করছিলেন তেমনি বাংলার নেতারাও এই

বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করছিলেন। বাংলায় এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী এবং কিরণশঙ্কর রায়।

২১শে মে (মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান প্রকাশিত হবার আগে) বারোজ ভাইসরয়কে এক চিঠি লিখে জানালেন যে সুরাবর্দী তাকে জানিয়েছেন তিনি (সুরাবর্দী) কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে এক জোট হয়ে সম্মিলিত সরকার গঠন করবার প্রস্তাব করেছেন। শরৎ বোস এই চুক্তিকে সমর্থন করছেন। সুরাবর্দী কিংবা কিরণ শঙ্কর রায় তাদের এই প্রস্তাবটি নিয়ে নিজে দলের মধ্যে কোন আলোচনা করেন নি। তবে সুরাবর্দী আশা প্রকাশ করেছেন তিনি তার দলের সদস্যদের কাছ থেকে এই প্রস্তাবের সমর্থন এবং অনুমোদন পাবেন।

বারোজের চিঠি পাবার পর মাউন্টব্যাটেন 'স্বাধীন বাংলা' প্রস্তাবটি নিয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। প্রথমে নেহরু জবাব দিলেন বিভিন্ন কারণে এই স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবটি ক্ষতিকর। প্রথমত, কলকাতা হল সমস্ত উত্তর ভারতের বন্দর। কলকাতা চলে গেলে উত্তর ভারতের বিশেষ ক্ষতি হবে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন হয়ত 'স্বাধীন বাংলার' প্রস্তাবটি নিয়ে আর কোন আন্দোলন করা হবে না।

কিন্তু গভর্নর বারোজ 'স্বাধীন বাংলা' প্রস্তাবটি তাব মন থেকে মুছে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ভাইসরয়কে আবার লিখলেন যদি বাংলাকে ভাগ করা হয় তাহলে নতুন পূর্ব বাংলা প্রদেশ কলকাতা বন্দরের ব্যবহারের সুবিধা হারাবে। ভবিষ্যৎ-এ [বারোজ বললেন] হয়ত এই কলকাতা শহরকে নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হবে। কারণ বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে জানালেন যে তিনি বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছেন এবং সবাই 'স্বাধীন বাংলা' গঠনের পক্ষপাতী ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৩]।

পরে ৩রা মে, ১৯৪৭ কিরণশঙ্কর রায় গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৫]

ভাইসরয় কিরণশঙ্কর রায়কে বললেন যে বাংলার লেজিসলেটিভ এসেম্বলী এবং কৌন্সিল থেকে চুয়াত্তরজন সদস্য তার কাছে বাংলা ভাগের প্রস্তাব করে আবেদন পত্র পাঠিয়েছেন। কিরণশঙ্কর রায় এর জবাবে বললেন যে এই আবেদন পত্র খুব তাড়াতাড়ি পাঠান হয়েছে। আর একটু দেরী করলে হয়ত আরও অনেক সই সংগ্রহ করা সম্ভব হত। ভাইসরয়ের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থাৎ শ্রী রায় কী 'অখণ্ড বাংলা, না দুই বাংলা চান'? কিরণশঙ্কর রায় বললেন যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি 'অখণ্ড বাংলার' সমর্থক কিন্তু মুসলিম লীগের "আপোষ বিরোধী" মনোভাব এবং কংগ্রেসের পীড়াপীড়ি ও চাপের দরুণ তিনি বাংলা

ভাগের প্রস্তাব করেছেন। এর জবাবে মাউন্টব্যাটেন তাকে বললেন বাংলা ভাগের দরুণ যে এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার সৃষ্টি হবে, এই বিষয়টি নিয়ে তিনি কোন চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা? এর মধ্যে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরাই সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ভাইসরয় পরে কিরণশঙ্কর রায়কে বললেন আমি আপনার 'হিন্দু স্বদেশপ্রেমের' জন্যে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছিনে। আপনি পশ্চিম বাংলার শুধু কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বাঁচাবার জন্যে নিজের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার এবং ঐ এলাকার হিন্দুদের ক্ষতির বিনিময়ে, নিজের প্রদেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। [**Congratulated him on his Hindu patriotism at being prepared to see the province destroyed to save Hindu' majority, in West Bengal at the expense of the Hindus like himself living in East Bengal.**]

পরে মাউন্টব্যাটেন কিরণশঙ্কর রায়কে বললেন যে তার প্ল্যান হল বাংলার প্রতিনিধিরা যদি বাংলাকে অখণ্ড রাখতে চায় তাহলে তার ভবিষ্যৎ নীতি কী হবে এক বৈঠকে ভোট গ্রহণ করে ঠিক করবে। যদি বাংলা অখণ্ড থাকতে চায় তাহলে কী বাংলা (১) স্বাধীন থাকতে চায় (২) না পাকিস্তান (৩) হিন্দুস্থানে যোগ দেবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সমস্ত প্রশ্নটি যখন স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হবে যে বাংলা অখণ্ড থাকলে কি হবে তারপর এক ভোট গণনা করে ঠিক কর. হবে প্রদেশকে ভাগ না অখণ্ড রাখা হবে।

আমি তাকে (কিরণশঙ্কর রায়কে) বললাম সংবিধান সংসদে বাঙালী প্রতিনিধিরা এক সপ্তাহ (অর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর) কিংবা একপক্ষ বাদে ভোট দিয়ে তাদের মতামত জানাতে পারেন কিংবা গণভোট (Referendum) দ্বারা মতামত যাচাই করা যেতে পারে আপনি কোন পন্থা পছন্দ করেন? মাউন্টব্যাটেন কিরণশঙ্কর রায়কে জিজ্ঞেস করলেন।

এর জবাবে কিরণশঙ্কর বললেন যে প্রশ্নটি সবার কাছে স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। অতএব যে কোন দুটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। কারণ দুটি প্রথা দিয়ে জনগণের মতামত যাচাই করা হবে। (পরে শুধু এসেম্বলী ও কৌন্সিলের সদস্যদের ভোট নিয়ে মতামত যাচাই করা হয়েছিল। এই সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু সদস্য ছিলেন সরকার মনোনীত সদস্য। তাদের এই বাংলা ভাগ প্রশ্নে ভোট দেবার অধিকার ছিল কিনা এই নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। টাইসন এই বিষয়টি নিয়ে দিল্লীতে আলোচনা করেছিলেন]। কিরণশঙ্কর রায় বাংলা স্বাধীন, অখণ্ড হবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে বললেন যদি মুসলিম লীগ কোন

গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব পেশ না করে তাহলে স্বাধীন বাংলা গঠন করবার সম্ভাবনা খুবই কম। [এই ঘটনার পুরো বিবরণী ট্রান্সফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৫ পাওয়া যাবে]।

১১শে মে গভর্নর বারোজ ভাইসরয়ের চীফ অব দি ষ্টাফ, লর্ড ইসমকে জানালেন [ট্রান্সফার অব পাওয়ার দশম খণ্ড পৃষ্ঠা-১০৩] যে তিনি কিরণশঙ্কর রায় এবং সুরাবর্দীর কাছ থেকে চুক্তির একটি স্মারকলিপি পেয়েছেন। বিভিন্ন ধারা নিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে শরৎ বোসও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তিনি তার প্রস্তাবিত নতুন বাংলার নাম 'সোশ্যালিষ্ট রিপাব্লিক অব বেঙ্গল' পাল্টে 'ফ্রী ষ্টেট অব বেঙ্গল' রাখতে রাজি হয়েছেন।

বারোজ লর্ড ইসমেকে আরও জানালেন যে তিনি কিরণশঙ্কর রায় এবং সুরাবর্দীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলার সংবিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ঐ ভিত্তিতে বাংলায় অবিলম্বে এক সম্মিলিত সরকার গঠন করা দরকার সেই কথাও তাদের বলেছেন।

গভর্নর বারোজের এই চিঠির উপর লর্ড মাউন্টব্যাটেন মন্তব্য করলেন স্বাধীন অখণ্ড বাংলার প্রশ্নটি কঠিন হবে এবং নতুন প্ল্যানে এর স্থান দেওয়া মুস্কিল হবে।

ইতিমধ্যে সুরাবর্দী কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে যে স্মারক লিপি পাঠিয়েছিলেন তার একটি কপি ভাইসরয়কে পাঠালেন। এই স্মারকলিপিতে সুরাবর্দী লিখে ছিলেন যে নতুন বাংলা হবে স্বাধীন এক দেশ। নতুন বাংলা ভারতের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক হবে সেইটে বিচার করে ঠিক করবে। নতুন বাংলার সংবিধানে বলা হল যে বাংলার বিধান সভায় নির্বাচন যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে করা হবে।

স্বাধীন বাংলার কথা ঘোষণা করবার পর বাংলাকে আর ভাগ করা হবে না বর্তমান মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেওয়া হবে এবং তার পরিবর্তে হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। এর মধ্যে তপশীলিদের প্রতিনিধিও থাকবেন। এর মধ্যে প্রধান মন্ত্রীকে গণনা করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলমান, হিন্দু হবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এ ছাড়া চাকুরীতে হিন্দু এবং মুসলমান সমান সংখ্যক হবে।

সংবিধান সভায় ত্রিশজন সদস্য থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন হবেন মুসলমান সদস্য এবং ১৪ জন হিন্দু সদস্য। এই ত্রিশজনকে বিধান সভার মুসলমান এবং হিন্দুরা নির্বাচন করবে। ক্ষমতা জুন ১৯৪৮ এর আগে হস্তান্তরিত করা হবে। [ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-১০৩।

পরে মাউন্টব্যাটেন এই স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব নিয়ে নেহরুর সঙ্গে সিমলাতে আলোচনা করলেন।

নেহরু ভাইসরয়কে বললেন যে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবটি গ্রহণ করবে না কিংবা বাংলার সদস্যদের এই প্রস্তাবে সমর্থন করবার উৎসাহ দেবে না। তার কারণ নেহরুর বক্তব্য হল যে বাংলার হিন্দুস্থানে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

৪ঠা জুন ১৯৪৭ বাংলা এবং আসামের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবার জন্তে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির তিনজন সদস্য সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে গভর্নর বারোজ ভাইসরয়কে যে গোপনীয় চিঠি লিখেছিলেন তার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করা হল ['ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খণ্ড]। বারোজ বললেন যে তিনি ডি. আই. বি'র (১৭ই জুন ১৯৪৭) অতি বিশ্বাসজনক রিপোর্ট থেকে জানতে পেরেছেন যে বাংলার তিনজন কংগ্রেস সদস্য সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে গিয়ে বাংলা ও আসামের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবার জন্তে দেখা করেছিলেন। (এখানে বলা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিকাংশ ঘরোয়া খবর দেশ নেতারাই ব্রিটিশ সরকারকে নিয়মিত ভাবে দিতেন। তার অজস্র প্রমাণ 'এই ট্রান্সফার অব পাওয়ারের' বারোটি খণ্ডে পাওয়া যাবে।) এই সময়ে সর্দার প্যাটেল অসুস্থ ছিলেন। প্রথমে সর্দার প্যাটেল চিন্তিত হয়ে বাংলার সদস্যদের জিজ্ঞেস করলেন যে মাউন্টব্যাটেনের দেশভাগের প্ল্যানের উপর বাংলার সদস্যদের কী মনোভাব হবে। তিনি এই বিষয়টি নিয়ে এই তিন বাঙালী সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। বাংলার সদস্যরা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব গ্রহণ করলে সংবিধান সংসদের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ করা হবে কিনা। এর জবাবে সর্দার প্যাটেল বললেন (ডি. আই. বির রিপোর্ট অনুযায়ী) যে সংবিধান-সংসদ এক সার্বভৌম সংস্থা নয়। এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সংবিধান সংস্থাকে ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। শুধু ভারতবাসীদের মনে আশ্বাস দেবার জন্তে কংগ্রেস সংবিধান সংস্থাকে সার্বভৌম বলে প্রচার করছে। তিনি (সর্দার প্যাটেল) আরও বললেন যদি ৬ই ডিসেম্বরের ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ না করা হয় তাহলে এর বিকল্প হল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করা কিন্তু কংগ্রেস এই সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত নয়। আজ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন যুদ্ধ করবার মানে হল যে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। কংগ্রেস মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নয়।

এরপর একজন বাঙালী সদস্য সর্দার প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করলেন যে কংগ্রেসের এই নতি স্বীকার করবার পর মুসলিম লীগ কী সংবিধান-সংসদে যোগ দেবে? সর্দার প্যাটেল স্বীকার করলেন যে কংগ্রেস নতি স্বীকার করেছে।

(অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে)। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু অনেক সময় দেশের এবং দেশবাসীর মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই নীতিকে বিসর্জন দিতে হয়। (**But for good of the people of India and Indians principles have to be swallowed for the sake of expedience.**)

রাজনীতির খেলায় অনেক সময় মীমাংসা করতে হয় এবং এই আপস মীমাংসার জন্যে ভারতে কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি যেটুকু হ্রাস পাবার তা হয়েছে এবং এর চাইতে আর বেশি কমবে না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দে'য়া কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবার এ হল এক ধাপ। এবং এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেওয়া যদি তাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিবন্ধক হয় তাহলে কংগ্রেস পদত্যাগ করবে এবং সংগ্রাম করবে। কিন্তু সমস্ত ভারত একমাত্র আসামের জন্যে গৃহযুদ্ধ করতে পারে না। কংগ্রেসের বক্তব্য হল যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমতার দেয়ালের মধ্যে একটি ছিদ্র পেয়েছে এবং সেই ছিদ্র হল ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব। এই ছিদ্রের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে এ দেশ থেকে তাড়াতে চায়।

মাউন্টব্যাটেন পরে এক চিঠিতে বারোজকে লিখলেন "আমার এই কথার (অর্থাৎ নেহরু যা বলেছেন) মানে এই নয় যে সুরাবর্দী তার এই চেষ্টার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেবেন।" [ট্রান্সফার অব পাওয়ার, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮০৯]।

কিন্তু এরপর সবাই স্বাধীন বাংলা গঠনের চেষ্টা ছেড়ে দিল।

এরপর দেশ ভাগ হল। পাঞ্জাব বাংলা এবং নর্থ ওয়েষ্ট প্রদেশ ভাগ করা হল। এই তিনটি প্রদেশ ভাগের পার্থক্য ছিল যে পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগ করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল বিধানসভার সদস্যরা। নর্থ ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে গণভোট দ্বারা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এই সময়ে বাংলার মুসলিম জনসংখ্যা ছিল তিনকোটি ত্রিশ লাখ এবং অন্য দিকে হিন্দু, তপশীলি, ক্রিশ্চিয়ান মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি সত্তর লাখ। পাঞ্জাবের মুসলমান জনসংখ্যা ছিল এক কোটি ষাট লাখ এবং হিন্দু, শিখ ছিল এক কোটি কুড়ি লাখ।

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ভাগ করবার দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অনেক চিন্তার পর ঠিক করল যে দেশভাগের পর সীমানা নির্ধারণ করবার দায়িত্ব স্যর সিরিল রাডক্লিফকে দেওয়া হবে। স্যর সিরিল এর আগে কোনদিন ভারতবর্ষে

আসেন নি। অতএব এই কাজের দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হল। তিনি হলেন সীমান্ত নির্ধারণ কমিশন কিংবা বাউণ্ডারী কমিশনের চেয়ারম্যান।

স্যর র‍্যাডক্লিফ (পরে তিনি লর্ড র‍্যাডক্লিফ হয়েছিলেন) ৮ই জুলাই ভারতে এলেন। আইনত, তার শুধু দেশভাগ কমিটির চেয়ারম্যান হবার কথা ছিল। কিন্তু কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত বাংলা ভাগের জন্যে সি. সি. বিশ্বাস এবং বি. কে. মুখার্জি হলেন দুই হিন্দু সদস্য এবং সালে মহম্মদ আক্রাম খান এবং এস. এ. রহমান হলেন মুসলমান সদস্য এবং পাঞ্জাব ভাগের জন্যে হিন্দু প্রতিনিধি হলেন মেহের চাঁদ খান্না এবং তেজ সিং ও মুসলমানদের প্রতিনিধি হলেন দীন মুহম্মদ এবং মুহম্মদ মুনীর। এইসব সদস্যদের মধ্যে মতের অমিল থাকবার জন্যে চেয়ারম্যান স্যর সিরিলকে সব ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দিতে হল।

স্যর সিরিল যেদিন দিল্লীতে এসে পৌছুলেন সেই দিনই ভাইসরয় তাকে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন।

নেতাদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসের তরফ থেকে নেহরু এবং প্যাটেল এবং লীগের তরফ থেকে জিন্না ও লিয়াকৎ আলি। আলাপ-পরিচয়ের পর স্যর সিরিল বললেন যে তাকে এক গুরুতর কাজের দায়িত্ব দে'য়া হয়েছে। কারণ আয়তনে ভারত এক বিশাল দেশ, এখানে বিবিধ ভাষার প্রচলন, অতএব তার কাজ শেষ হতে বেশ কয়েক বছর প্রয়োজন হবে। অবশ্যি তিনি এবং তার সহকর্মীরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাকে সহজ স্পষ্ট ভাষায় বললেন আপনাকে দেশভাগের সীমানা নির্ধারণ পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে করতে হবে।

পাঁচ সপ্তাহ! স্যর সিরিল যেন ভাইসরয়ের কথাগুলি বুঝতে পারলেন না। আপনি কী বলছেন?

এর জবাব দিলেন নেহরু। তিনি বললেন অবশ্যি আপনি যদি পাঁচ সপ্তাহের আগেই এই কাজ শেষ করতে পারেন তাহলে আমরা আরও খুশি হব। নেহরুর এই প্রস্তাবের সঙ্গে উপস্থিত সবাই একমত হলেন।

স্যর সিরিল বললেন যে এত তাড়াতাড়ি দেশ ভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে নেতারা সবাই দেশ ভাগ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু তাড়াতাড়ি এই কাজ করতে গেলে ভুল ত্রুটি হবার সম্ভাবনা আছে, এই কথা হয়ত নেতারা স্বীকার করে নেবেন, স্যর সিরিল বললেন।

স্যর সিরিল দিল্লীতে তার প্রধান দপ্তর খুললেন। দপ্তরের একটি শাখা কলকাতায় আর একটি লাহোরে খোলা হল। এরপর কাজ শুরু করে স্যর সিরিল উপলব্ধি করলেন যে কাজের দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন সেই কাজ জটিল

এবং সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। দেশ ভাগ অতি কঠিন কাজ।

ভারতীয় জজেরা স্যর সিরিলকে প্রথমেই বললেন তারা এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাননি কিন্তু প্রায় জোর করেই তাদের উপর এই কাজের বোঝা চাপান হয়েছে। তারা বললেন দেশভাগের কাজ আপনাকেই করতে হবে। আমরা যদি আপনার সিদ্ধান্তে কোন অংশ গ্রহণ করি তাহলে আমাদের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্যি আপনাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব।

বাংলা ভাগ করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ স্যর সিরিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কলকাতাকে নিয়ে কী করা হবে অর্থাৎ কলকাতা কী পূর্ব না পশ্চিম বাংলার অংশ হবে। প্রথম যে দিন স্যর সিরিল বাংলার গভর্নর বারোজের সঙ্গে দেখা করলেন সেদিন গভর্নর বারোজ তাকে বললেন আপনার কাজ কঠিন হবে। কারণ বাংলাকে ভাগ করতে গেলে প্রদেশে সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়ত, দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলা হবে এক 'A rural slum' ['দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা-১৯৬]। কিন্তু স্যর সিরিলের বাংলাকে ভাগ করতে কোন বিশেষ অসুবিধে হল না যদিও অধিকাংশ বাঙালীরা দেশ ভাগের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু পাঞ্জাব ভাগ করা নিয়ে গোলমাল শুরু হল। এই গোলমাল বিভিন্ন কারণে শুরু হয়েছিল।

প্রথমত পাঞ্জাবে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখরা উত্তেজিত ছিল। বিশেষ করে শিখরা বুঝতে পারল যে দেশ ভাগের প্রস্তাব তাদের মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গল বেশি করবে। এত তাড়াহুড়োয় এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া উচিত হয়নি। বিশেষ করে অধিকাংশ বর্দ্ধিষ্ণু পাঞ্জাবী, হিন্দু এবং শিখ পশ্চিম পাঞ্জাবেই থাকত এবং প্রদেশ ভাগ করা হলে অনেক এলাকা যে পাকিস্তানের অংশ হবে এ নিঃসন্দেহে বলা যায়। পাঞ্জাবী হিন্দু শিখরা এসে স্যর সিরিলের কাছে ম্যাপ, কাগজপত্র নিয়ে দেখা করল। তারা দাবী করল যে পশ্চিম পাঞ্জাবের কিছু কিছু এলাকার শহরকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা হক। এর পর মুসলমান প্রতিনিধিরা এসে তার সঙ্গে দেখা করল এবং তারাও দাবী করল যে পাঞ্জাবের কিছু কিছু শহরকে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে দে'য়া হক। এই সব আবেদন, দেখা-সাক্ষাৎ হবার পর স্যর সিরিল স্থির করলেন যে তিনি মুসলমান কিংবা শিখ কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আর দেখা করবেন না। নিজের কাজ নিজেই করে যাবেন।

কিন্তু পাঞ্জাব ভাগের সবচাইতে বড় অসুবিধে ছিল তার সেচ প্রণালী এবং

জল বণ্টনের ব্যবস্থা। এই সেচ প্রণালী শিখদের বক্তব্য অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবীদের (অর্থাৎ হিন্দু এবং শিখ) চাষবাসের জন্যে তৈরি করেছিল। আর পাঞ্জাবের এই সেচ প্রণালী ছাড়া পাঞ্জাবে শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হত না। কিন্তু দেশভাগের পর এই সেচপ্রণালী এবং কী করে এর জল বণ্টন করা যায় এইটে হল সিরিলের প্রধান এবং বড় সমস্যা। পরে স্যর সিরিল ভাইসরয়কে বললেন যে, এই সেচ প্রণালী এবং জল বণ্টনের কাজ সহজ নয়। এই সেচ প্রণালীকে যৌথ ভাবে অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানের পরিচালনা করা দরকার। কিন্তু নেহরু এবং জিন্না এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। দুই নেতাই স্যর সিরিলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করলেন (পরে ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তান এই সেচ প্রণালী এবং জল বণ্টন নিয়ে এক চুক্তি করেছিল)।

স্যর সিরিল পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তার বিচারের কাজ শেষ করলেন। তিনি তার কাজের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি ৯ই আগষ্ট তার রায়ের কাগজপত্র ভাইসরয়ের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন নেহরু এবং জিন্নার কাছে র‍্যাডক্লিফের সীমান্ত নির্ধারণের বিচারের রায় পাঠিয়ে দিলেন।

বিচারের রায়ে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে দে'য়া হল। কিন্তু স্যর সিরিলের রায় শুনে নেহরু ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি এই রায়কে স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করলেন এবং ভাইসরয়কে বললেন যে স্থানীয় লোকেরা এই বিচারের প্রতিবাদ করবে। প্রয়োজন হলে জোর করেই এই এলাকা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু পরে এই এলাকা পাকিস্তানকেই দে'য়া হল।

দেশ ভাগ করা হল বটে কিন্তু আরও কয়েকটি সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হল। প্রথমত দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনয. সৈন্যবাহিনী ভাগ করবার দরকার হল। দুই পক্ষের কারুর হাতে বেশি সময় ছিল না। সৈন্যবাহিনী, আইন-আদালত এবং দেশের সম্পদ ভাগ করবার জন্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হল। ইতিমধ্যে সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে কে কে কোন দেশে গিয়ে কাজ করবেন তার তালিকাও তৈরি করা হল। নেতারা এই দেশভাগের সমস্যা সমাধান করবার জন্যে বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হলেন। এইসব সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ভাইসরয়। মাউন্টব্যাটেনের লীগের চাইতে কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি গভীর সম্পর্ক ছিল। প্রথমত নেহরুর সঙ্গে তাঁর এবং লেডী মাউন্টব্যাটেনের সম্পর্ক বেশ দৃঢ় ছিল। ভি. পি. মেননও তার একজন পরামর্শদাতা ছিলেন। ভি. পি. মেননের মাধ্যমে তিনি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ

রাখতেন।

কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিয়ে ইংরেজ সরকারি মহলে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল।

সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড লিষ্টওয়েলের এক চিঠির জবাবে মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন : "আমি জানি তিনি (কৃষ্ণ মেনন) আমাদের দেশের অনেক মহলের খুব বেশি প্রিয়পাত্র নন · এমন কী এখানেও তিনি খুব বেশি জনপ্রিয় এবং সবার বিশ্বাসী নন....কিন্তু তবু তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। অতীতে ইংল্যাণ্ডে যখন তিনি তার বামপন্থী নীতি এবং কার্যকলাপের জন্যে একঘরে হয়েছিলেন তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। একথা তিনি (কৃষ্ণ মেনন) ভুলে যাননি এবং নেহরুও তার উপর পূর্ণ সমর্থন রাখেন। আমার কাছে দূতের কাজ করবার ব্যাপারে মেননের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং তার কাছ থেকে আমি কংগ্রেসের চিন্তা, নীতি এবং মতামত জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম" [মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার : পৃষ্ঠা-৩২৪]।

অনেকে অভিযোগ করেছিলেন যে মাউণ্ট্যবাটেন তাঁর প্রস্তাবের খসড়া জিন্নাকে দেখান নি, এর জবাবে মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন, তিনি জানতেন জিন্না এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন, নেহরু এবং কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নে'য়া সম্বন্ধে তার মনে সন্দেহ ছিল। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের রাজনীতি নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন। অনেকে মাউণ্টব্যাটেনকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের সমর্থক বলে অভিযোগ করেছিলেন। বলা হত এই ব্যাপারে তিনি পিটার মারফি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এরপর উলিয়াস আঁলমস যিনি আমেরিকাতে ইণ্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন সার্ভিস পরিচালনা করতেন বলেছিলেন যে তার কাছে প্রমাণ আছে। "মাউণ্টব্যাটেন কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন"। [মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা-৩১৭।] ....পরে মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন যে কেউ যদি বামপন্থী নীতি এবং পশ্চিম জগতের বিরোধী নীতি অনুসরণ করে তাহলে তাকে কম্যুনিষ্ট বলা ঠিক হবে না। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন যে চীনের কম্যুনিষ্টদের রাশিয়ান কম্যুনিজমের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রকৃত কম্যুনিষ্ট বলা যায় না [মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার : পৃষ্ঠা-৩১৪]।

মাউণ্টব্যাটেন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবার বিরোধী ছিলেন। বাংলার গভর্নর বারোজ যখন প্রদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করবার প্রস্তাব করলেন তখন মাউণ্টব্যাটেন বললেন :—'ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা এক বিশেষ

দুর্ঘটনা হবে। এই কাজ অনেকটা 'ফাসিস্ত নীতির' সমান হবে।

কারণ তিনি বললেন, এমন কী যুদ্ধের সময়ও গ্রেট ব্রিটেনে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়নি। শান্তির সময় কোন রাজনৈতিক দল যদি প্রকাশ্যে ধ্বংসমূলক কাজ না করে তবে সেই সংস্থাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা উচিত হবে না। [মাউন্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা ৩৭১] এ ছাড়া মাউন্টব্যাটেন সেন্টো (সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানিজেশন) এবং বাগদাদ চুক্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁর বক্তব্য ছিল যে এই সামরিক চুক্তিগুলি রাশিয়াকে মধ্যপ্রাচ্যে হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ দেবে এবং এই চুক্তিগুলি পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। এ ছাড়া পরবর্তীকালে তিনি কিছু ভারতীয় সরকারি কর্মচারী, ভি. পি. মেনন, গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে এবং অনেক সরকারি কর্মচারীকে তাদের পদোন্নতির কাজে সাহায্য করেছিলেন।

মাউন্টব্যাটেনের প্রধান একটি উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড এক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ১৯৪৭ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে একদল অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ দলকে ভারতের শিল্পায়নের কাজ-কারবারে সাহায্য এবং ঐ প্রকল্পের জন্যে এক খসড়া তৈরি করবার জন্যে পাঠান হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন এই দলের প্রস্তাবকে খুব বেশি সমর্থন করতে পারলেন না। এই সময়ে আমেরিকান সরকার গ্রেডী নামে এক আমেরিকানকে ভারতে আমেরিকার দূত করে পাঠিয়েছিলেন।

'তাঁর (গ্রেডীর) একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই দেশে আমেরিকান শিল্প,— মাউন্টব্যাটেন পরে মন্তব্য করেছিলেন,—আমেরিকান যন্ত্র এবং মেশিনারী বিক্রী করা। যদি ইংরেজ সরকারের প্রস্তাব আমেরিকানদের আগে না পাওয়া যায় তাহলে আমরা আমেরিকানদের কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে যাব।

পরে গ্রেডী আমেরিকান ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে নালিশ করলেন মাউন্টব্যাটেন ভারতীয়দের কাছে ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিপদের কথা বলছেন।

'ব্রিটিশদের এদেশে ভিত্তি দুর্বল এবং আমাদের দৃঢ় ভিত্তি আছে। সেইটে ব্রিটিশরা খুব সুনজরে দেখতে পারছে না [ফরেইন রিলেশন্স অব দি য়ুনাইটেড ষ্টেটস, ১৯৪৭, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৭-১৭৮, মাউন্টব্যাটেন : জিগলার, পৃষ্ঠা— ৪৬৭-৪৬৮]।

* * *

দেশভাগ হবার প্রস্তাব এবং ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের মর্যাদা গ্রহণ করবার প্রস্তাব যখন দুপক্ষই স্বীকার করে নিল তখন প্রশ্ন হল এই দুই ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল কে হবেন। (এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৪৭ সালে

ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের মর্যাদা দিয়েই এই দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছিল]।

প্রথমে মাউন্টব্যাটেন ভেবেছিলেন যে দুই ডোমিনিয়নই তাকে গভর্নর জেনারেল হবার জন্যে অনুরোধ করবেন। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসও আশা করেছিল যে নেহরু এবং জিন্না দুজনেই মাউন্টব্যাটেনকে তাদের নিজেদের দেশের গভর্নর জেনারেল হবার জন্যে অনুরোধ করবেন।

নেহরু যখন মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের খসড়া (১৭ই মে) গ্রহণ করলেন তখন তিনি (নেহরু) মাউন্টব্যাটেনকে লিখেছিলেন 'আমরা আশা করি এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্যে (ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস থাকাকালীন অবধি) দুই দেশের জন্যে একজনই গভর্নর জেনারেল হবেন। আপনি যদি আমাদের দেশে এই পদে আসীন থাকেন এবং আপনার কাছ থেকে যদি আমরা বুদ্ধি-পরামর্শ পাই তাহলে আমরা খুশি হব।

মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে খুশি হলেন। পরে মাউব্যাটেন নেহরু এবং প্যাটেলকে তার সম্মতি জানালেন। তবে তিনি বললেন তিনি যদি শুধু একটি ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল থাকেন তবে কিছু অসুবিধে হবে। পরে মাউন্টব্যাটেন (১৭ই মে) লণ্ডনে যাবার আগে জিন্না এবং লিয়াকৎ আলির সঙ্গে গভর্নর জেনারেলের পদের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করলেন। পাকিস্তান কী একজন গভর্নর জেনারেল চান না তাদের ডোমিনিয়নের জন্যে তারা ভিন্ন গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন? জিন্না ঐ দিন এই প্রস্তাবের কোন জবাব দিতে চাইলেন না, কারণ তিনি বললেন তাড়াহুড়ো করে কিছুই করতে চান না। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন পীড়াপীড়ি করবার পর জিন্না দুই দেশের জন্যে দুই গভর্নর জেনারেল নিয়োগের প্রস্তাব করলেন। পরে তিনি বললেন এই প্রস্তাবের উপর তার মত প্রকাশ করে চিঠি লিখে জানাবেন।

মাউন্টব্যাটেন তার দেশভাগের প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে লণ্ডনে চলে যাবার পর ভাইসরয়ের সেক্রেটারী মিয়াভিল জিন্নার কাছে তার মন্তব্য চেয়ে তার চিঠি চাইলেন। কিন্তু জিন্না কোন চিঠি লিখলেন না।

মাউন্টব্যাটেন লণ্ডন থেকে ফিরে এসে ঠিক করলেন যে তিনি দুই দেশেরই গভর্নর জেনারেল হবেন। 'কিন্তু জিন্না স্বার্থপর, গর্বিত, হিংসুটেও' [লিওনার্ড মোসলের ভাষায়] কোন প্রকারেই মাউন্টব্যাটেনকে ভারত ও পাকিস্তানের দুই দেশের গভর্নর জেনারেল হবার পক্ষে ছিলেন না। ইতিমধ্যে মাউন্টব্যাটেনও দুই দেশের গভর্নর জেনারেল হবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। এবং এই গভর্নর জেনারেলের পদ নিয়ে মাউন্টব্যাটেন ও জিন্নার মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই

শুরু হল।

পরে ২০শে জুন লর্ড ইসমে এবং এরিক মিয়াভিল আবার জিন্নার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে দেখা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। কারণ এই সময়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা করা এক বিশেষ কষ্টকর কাজ ছিল। অতএব তারা গিয়ে লিয়াকৎ আলির সঙ্গে দেখা করলেন এবং প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়া বিলের খসড়া নিয়ে আলোচনা করলেন। তারা লিয়াকৎ আলিকে বললেন যে বিলটি পার্লামেণ্টে আলোচনার জন্যে পাঠাবার আগে তারা জানতে চান, যে দুই ডোমিনিয়নের জন্য কী দুইজন ভিন্ন গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করা হবে, এবং গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবার জন্যে কী প্রথা অবলম্বন করা হবে?

এই প্রসঙ্গে ইস্‌মে এবং মিয়াভিল লিয়াকৎ আলির সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং গভর্নর জেনারেল নিয়োগ নিয়ে আলাপ-আলোচনার ফলাফল জানতে চাইলেন। এর জবাবে লিয়াকৎ আলি বললেন যে এই প্রশ্নটি নিয়ে তিনি জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করবার সময় কিংবা সুযোগ পাননি

ইতিমধ্যেম মাউণ্টব্যাটেন অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জিন্নাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে স্পষ্ট করে বললেন যে দেশ ভাগের সময় দুই দেশের একজন গভর্নর জেনারেল হওয়াই দরকার।

'এই বিষয়ে আপনাব মত জানা একান্ত আবশ্যক কারণ ইণ্ডিয়া বিল শীঘ্রই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনাব জন্যে পাঠান হবে··বিশেষ করে গভর্ণর জেনারেল পদটি নিয়ে কী করা হবে?'

এবার জিন্না মাউণ্টব্যাটেনের কথায় বাধা দিয়ে বললেন· আমি আপনার বিপক্ষে কিছু বলতে চাইনে। আপনার উপর আমার পুরো বিশ্বাস এবং আস্থা আছে। কিন্তু আমার নিজের দেশের জনগণের স্বার্থের প্রতি আমার দৃষ্টি রাখতে হবে···।

এরপরে ১লা জুলাই জিন্না এক চিঠি লিখে জানালো তিনি ঠিক করেছেন যে তিনিই পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হবেন [মাউণ্টব্যাটেন: জিগলার, পৃষ্ঠা-৩৯৭]।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না! সেইদিন বিকেলে তিনি ভূপালের নবাবকে ডেকে পাঠালেন। কারণ তিনি জানতেন যে ভূপালের নবাব ছিলেন জিন্নার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ভূপালের নবাবের চেষ্টাও ব্যর্থ হল। জিন্না তার মত পরিবর্তন করলেন না। তিনি বললেন তিনিই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হবেন।

মাউণ্টব্যাটেন এর জবাবে বললেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে তার

(জিন্নার) হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকবে....।'

জিন্না বললেন, না গভর্নর জেনারেল হিসাবে আমি সবাইকে পরামর্শ দেব এবং বাকী সবাই আমার পরামর্শানুযায়ী কাজ করবে। মাউন্টব্যাটেন বললেন দুই দেশের একজন গভর্ন্‌র জেনারেল থাকলে দেশের সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে আলোচনা করবার অনেক সুবিধে হবে। আপনি কী জানেন, কত কোটি কোটি টাকার বিষয়-সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করা হবে? আপনার কত কোটি টাকা ক্ষতি হবে?

হ্যাঁ আমি জানি, আমার বেশ কয়েক'শ কোটি টাকা ক্ষতি হবে, জিন্না জবাব দিলেন।

হয়ত আপনাদের, পাকিস্তানের ভবিষ্যতেরও ক্ষতি হতে পারে মাউন্টব্যাটেন মন্তব্য করলেন। এই বলে মাউন্টব্যাটেন চলে এলেন। কারণ জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার পর তার মেজাজ খারাপ হয়েছিল।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন ভাবতে শুরু করলেন এরপর তার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তিনি কী শুধু ভারতের গভর্ন্‌র জেনারেল হয়ে থাকবেন। প্রথমে তিনি ঠিক করলেন দুই ডোমিনিয়নের গভর্ন্‌র জেনারেল না হলে তিনি কোন দেশেরই গভর্ন্‌র জেনারেল হবেন না। কারণ শুধু এক দেশের গভর্ন্‌র জেনারেল হলে ব্রিটেনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন উঠতে পারে [মাউন্টব্যাটেন : জিগলার, পৃষ্ঠা-৩৯৮]।

কংগ্রেসের অনুরোধে এবং পরে যখন জিন্না বললেন যদি মাউন্টব্যাটেন জয়েন্ট ডিফেন্স কমিটির চেয়ারম্যান থাকেন তাহলে জিন্নার কোন আপত্তি থাকবে না, মাউন্টব্যাটেন বললেন সমস্ত বিষয়টি নিয়ে তিনি পুনর্বিবেচনা করবেন।

তিনি তার মেয়ে প্যাট্রিসিয়াকে এক চিঠি লিখে তার দোটানা মনের কথা প্রকাশ করলেন। 'ভাবছি কী করব? আমি কী কংগ্রেস নেতাদের নিরাশ করব? তোমরা কী চাও আমি ব্রিটেনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখি এবং ১৫ই আগষ্ট এখান থেকে চলে যাই। আবার অনেকে বলছেন আমি নেহরুকে নিরাশ করতে পারিনে... অতএব আমার থাকা উচিত।'

মাউন্টব্যাটেন এবার লর্ড ইসমেকে ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী এবং রাজার মত জানবার জন্যে পাঠালেন। পরে মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট আলোচনা করল। মন্ত্রীদের মধ্যে শুধু ক্রীপস তার ভারতে থাকবার বিরোধিতা করে বললেন যদি মাউন্টব্যাটেন ভারতে থাকেন তাহলে তার সম্মানের হানি হবে। কিন্তু ক্যাবিনেটের অন্যান্য মন্ত্রীরা মাউন্টব্যাটেনের ভারতে গভর্ন্‌র জেনারেল হয়ে থাকবার প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন।. চার্চিল

বললেন যে মাউণ্টব্যাটেনের ভারতে থাকা উচিত। পরে সম্রাট নিজেও মাউণ্ট-ব্যাটেনকে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে থাকবার জন্তে অনুরোধ করলেন।

মাউণ্টব্যাটেন ভারত এবং পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার নকশা নিজের হাতে এঁকে জিন্না ও নেহরুর কাছে পাঠালেন। তিনি ভারতের জন্তে কংগ্রেসের পতাকার মধ্যে চরকা এঁকে দিলেন। মুসলিম লীগের পতাকায় চাঁদের চিহ্ন রইল। দুই পতাকায়ই ইউনিয়ন জ্যাক রাখা হল। কিন্তু নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের আঁকা নকশা গ্রহণ করলেন না। তার নকশায় আঁকা রইল সারনাথের স্তম্ভ এবং সম্রাট অশোকের ধর্মচক্র। জিন্না বললেন যে তিনি কোন প্রকারেই মাউণ্টব্যাটেনের নকশা গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ পবিত্র ঈদের চাঁদের পাশে ক্রিশ্চিয়ানদের ক্রস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তাহলে পাকিস্তানীদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দেবে।

*　　　*　　　*

ভারত ও পাকিস্তান গঠিত হবার আগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ও ব্রিটিশ সরকারকে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল।

এই বিষয়টি হল নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি যাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের এক বিশেষ চুক্তি ছিল, তাদের সেই চুক্তি বাতিল করা হবে কিনা? বাতিল করা হলে এদের অর্থাৎ নৃপতিদের এবং তাদের রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে? ভারতকে স্বাধীনতা দেবার আগে রাজা-মহারাজাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ছিল।

রাজা-মহারাজাদের সম্রাটের সঙ্গে যে চুক্তি ছিল সে চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সম্রাট এই ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে এবং বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে তাদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই চুক্তি ছিল অতি মামুলি, কারণ রাজা-মহারাজারা সম্রাটের প্রতিনিধি অর্থাৎ ভাইসরয়ের বিনানুমতিতে কোনো পদক্ষেপও করতে পারতেন না। এছাড়া অধিকাংশ রাজা-মহারাজারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করতেন এবং প্রজাদের সুখ-সুবিধার প্রতি তাদের নজর দেবার কোন সময় ছিল না। তারা শুধু ভাইসরয়ের প্রতিনিধিদের খুশি রাখতেন। এই সব রাজা-মহারাজাদের দেখাশোনা করবার দায়িত্ব ছিল স্যার কনরাড কোরফিল্ডের হাতে। নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে তার নীতির বিরোধিতা করবার কোন সাহস কারুর ছিল না।

মাউণ্টব্যাটেন যখন তার নতুন প্ল্যান নিয়ে দেশে ফিরে আসছিলেন তখন সম্রাট তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে ভারত স্বাধীন হলে এই নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে? তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যদি এই সব

রাজা-মহারাজারা নতুন দুই রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করে কোন মীমাংসা না করে তাহলে এই সব নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি বিপদের সম্মুখীন হবে। সম্রাট মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন যে এই নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি যেন 'অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য' এই পরিস্থিতি বুঝেই নতুন দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে এক আপস মীমাংসায় চুক্তি করে। সম্রাটের কাছ থেকে এই নির্দেশ পাবার পর মাউন্টব্যাটেন চেষ্টা করলেন যে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি যেন ভারত কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেয়। মাউন্টব্যাটেন এই সব রাজা-মহারাজাদের একেবারেই সুনজরে দেখতে পারতেন না।

রাজা-মহারাজারা সংঘবদ্ধ হয়ে এক সংস্থা করেছিলেন যার নাম ছিল 'চেম্বার অব প্রিন্সেস'। ১৯৪৬-৪৭ এই চেম্বার অব প্রিন্সেসের 'চ্যান্সেলর' ছিলেন ভূপালের নবাব। মাউন্টব্যাটেন তার দেশভাগের প্ল্যানটি প্রকাশিত করবার আগে প্ল্যানের কপি ভূপালের নবাবকে দেখিয়েছিলেন। ভূপালের নবাব এই প্ল্যান পড়ে দেখবার পর মাউন্টব্যাটেনকে জিজ্ঞেস করলেন রাজা-মহারাজাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? ব্রিটিশ সরকার কী তাদেরও প্রত্যেককে ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস দেবেন? মাউন্টব্যাটেন তাকে বললেন যে ব্রিটিশ সরকারের তাদের ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস দেবার কোন ইচ্ছে নেই।

ভূপালের নবাব নালিশ করে বললেন যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

ভূপাল ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য কিন্তু নবাব নিজে ছিলেন মুসলমান। অতএব তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে ব্রিটিশ সরকারের প্ল্যান ঘোষণার পর তাকে কংগ্রেসের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে।

ভাইসরয়ের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনায় তিন দিন পরে ভূপালের নবাব 'চেম্বার অব প্রিন্সেস' সংস্থা থেকে পদত্যাগ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ভারত থেকে ব্রিটিশ চলে যাবার পর তিনি নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করবেন। ভূপালের নবাব মাউব্যাটেনকে আরও বললেন তিনি কংগ্রেস নেতাদের দু'চোখে দেখতে পারেন না। এবং কংগ্রেস শাসিত ভারতের সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক রাখতে চান না।

ভূপালের নবাব মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণার একটি ধারার উল্লেখ করে বললেন যে ঘোষণায় বলা হয়েছে যদি নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে কেউ যদি কোন নতুন ডোমিনিয়নে যোগ না দিতে চায় তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাদের সঙ্গে পৃথক সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করবে....কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এর জবাবে বললেন যে এই ধারাকে 'কল্পনা বলাই উপযুক্ত হবে'।

ইতিমধ্যে অনেক রাজা-মহারাজারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলেন। বিকানীরের মহারাজা আরও কিছু মহারাজাদের নিয়ে স্থির করেছিলেন যে দেশ স্বাধীন হবার আগেই তারা ভারতের সঙ্গে যোগ দেবেন। এই ভাবে বিকানীরের মহারাজা এবং তার বন্ধুরা তাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থকে বজায় রাখবার চেষ্টা করলেন।

এই সময়ে ভাইসরয়ের সেক্রেটারী মিয়াভিল বললেন যদি রাজা-মহারাজাদের স্পষ্ট করে বলা হয় যে তারা ভারত কিংবা পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ না দে'য় তাহলে তাদের কমনওয়েলথে যোগ দেবার এবং সম্রাটের কাছ থেকে সম্মান এবং উপাধি পাবার কোন সুযোগ দে'য়া হবে না। এ ছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে ব্রিটিশ সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, ছোট রাজাদের 'হিজ হাইনেস' বলা হবে এবং তাদের নয় কামানের গোলায় স্যালুটের সম্মান দেয়া হবে।

অবশ্যি এই সম্মানের ঘোষণা কোন কারণে করা হল না। এ ছাড়া সম্রাট ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি নিজামের দ্বিতীয় সন্তানকে 'হিজ হাইনেস' সম্মান দিতে রাজি আছেন।

কিন্তু রাজা-মহারাজারা বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এর মধ্যে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এ্যাডভাইজার স্যর কনরাড কোরফিল্ড রাজা-মহারাজাদের উপদেশ দিলেন যেন তারা তাদের শাসনের লাগাম আরও শিথিল এবং প্রগতিশীল করেন। এ ছাড়া সবাই যেন একজোট হয়ে ভারতীয় নেতাদের বিরোধিতা করেন।

কিন্তু স্যর কনরাড দেখতে পেলেন যে তার এই প্রস্তাবে মাউণ্টব্যাটেন একেবারেই সহানুভূতি সম্পন্ন নন এবং সায় দিচ্ছেন না। তারপর যখন ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ঠিক করল, তখন স্যর কনরাড এই নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন। স্যর কনরাড এবং রাজা-মহারাজাদের চিন্তা করবার কারণ ছিল বৈকি? প্রধান কারণ হল, এই সব রাজা-মহারাজাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল। তারা কাষ্টমস্ থেকে ট্যাক্স আদায় করে এবং খনিজ দ্রব্য থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন। এ ছাড়া তাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতাও ছিল। এই সব রাজা-মহারাজাদের মধ্যে কিছু কিছু মহারাজারা বিচক্ষণ ছিলেন এবং তারা তাদের রাজ্যগুলি উপযুক্ত ভাবে শাসন করবার জন্যে যোগ্য দেওয়ান, কিংবা চীফ মিনিষ্টার নিয়োগ করে প্রজাদের উপকার করছিলেন। এরা নর্তকী কিংবা উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে অর্থের অপব্যয় করেননি বটে তবে এরাও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। স্যর কনরাডের হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল। তিনি ইচ্ছে করলে যে কোন রাজা-মহারাজাকে

ক্ষমতার গদী থেকে সরাতে পারতেন।

কোন প্রজাকে কারাগারে আটক করে রাখা হলে রাজা-মহারাজাকে ধমক দেয়া হত কিন্তু শাসনের গদী থেকে তাকে সরান হত না। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করলেই তাকে শাস্তি দেয়া হত। এই কথা পরে স্যার কনরাড স্বীকার করেছিলেন লেখক লিওনার্ড মোসলের কাছে [পৃষ্ঠা-১৬১, 'দি লাষ্ট ডেজ অব দি ব্রিটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে]। এই সব নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিতে আইন সংশোধন এবং উন্নতি করবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু করা হয়নি। এর জবাবে স্যার কনরাড কৈফিয়তের সুরে বলতেন রাজা-মহারাজাদের উপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করলে তারা বলতেন যে, চুক্তির বিরোধী কাজ করা হচ্ছে।

স্যর কনরাড ঠিক করেছিলেন যে, তিনি কিছু বড় বড় নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিকে কংগ্রেসের কবলের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন।

এই সব বড় নৃপতি-শাসিত দেশগুলির মধ্যে একটি ছিল হায়দ্রাবাদ। এ ছাড়া অন্য রাজ্যগুলিকে যেন সহজে নতুন ভারত সরকার "গ্রাস" না করতে পারে সেই চেষ্টাও তিনি করেছিলেন।

স্যার কনরাড এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করবার জন্যে এক উপায় অবলম্বন করলেন যার নাম হল 'প্যারামাউন্টসি'। এই সব নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সম্রাটের সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ চুক্তি ছিল। কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে রাজা-মহারাজারা ছিলেন স্বাধীন। ভারত পাকিস্তান স্বাধীন হলে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির চুক্তিও বাতিল করা হবে এবং যে চুক্তি দ্বারা ব্রিটিশ সরকার এই সব নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির যে সব ক্ষমতা তাদের হাতে রেখেছিল সেই ক্ষমতা তাদের ফিরে পাবার কথা ছিল।

প্রতিটি নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি ইচ্ছা করলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দেবার ক্ষমতা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে এই সব ভারতীয় সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়েছিল। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এই রাজ্যগুলির ভেতর দিয়ে রেলওয়ে চলাচল করত। ভারতীয় পোষ্ট অফিসকে বন্ধ করে দেবার ক্ষমতাও রাজা-মহারাজাদের হাতে ছিল।

নেহরু বললেন যে এই নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিকে স্বাধীন বলা ঠিক হবে না কারণ তাদের যুদ্ধ করবার কিংবা নিজেদের বিদেশ নীতি পরিচালনা করবার কোন ক্ষমতা ছিল না।

তিনি বললেন যে, এদের অবিলম্বে ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগ দেয়া উচিত।

কিন্তু স্যর কনরাড এই প্রস্তাবে বাধা দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি ঠিক করলেন কোন প্রকারেই নেহরুর এই প্রস্তাবকে কার্যকরী হতে দেবেন না। স্যর কনরাড যখন দেখতে পেলেন যে তিনি ভাইসরয়ের কাছ থেকে কোন সাহায্য কিংবা সমর্থন পাবেন না, তখন তিনি ভাইসরয়কে ডিঙিয়ে সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড লিষ্টওয়ালের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে পত্রালাপ করতে শুরু করলেন।

ভাইসরয় স্যর কনরাডের এই পত্রালাপের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হল শ্রমিকমন্ত্রী লর্ড লিষ্টওয়েল এই ব্যাপারে স্যর কনরাডের প্রস্তাবে সহানুভূতি দেখালেন।

মে মাসের প্রথম দিকে লর্ড ইসমে এবং আবেল মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে যখন ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিলেন তখন স্যর কনরাড মাউন্টব্যাটেনকে এসে বললেন (স্যর কনরাড কোরফিল্ড ভাইসরয়ের অধীনেই কাজ করতেন) তিনি নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির প্যারামাউন্টসি সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লণ্ডনে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি তার আসল কাজের কথা খুলে বললেন না। অর্থাৎ এই প্যারামাউন্টসি (চুক্তি বাতিল হয়ে যাবার পর) শেষ হবার পর নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির কী পরিণাম হতে পারে সে কথা তিনি মাউন্টব্যাটেনকে খুলে বললেন না।

'আমার কাজ ছিল নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির স্বার্থ রক্ষা করা', স্যর কনরাড কোরফিল্ড পরে মন্তব্য করেছিলেন। লণ্ডনে গিয়ে স্যর কনরাড সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড লিষ্টওয়ালের সঙ্গে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির প্যারামাউন্টসি বাতিল হবার পর কী পরিণাম হতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। পরে স্যর কনরাডের পরামর্শে লর্ড লিষ্টওয়েল এবং ব্রিটিশ সর[কা]র ভারতীয় বিলে একটি নতুন ধারা জুড়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। এই ধারায় বলা হল যে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তি শেষ হবে।

অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ছশো'র বেশি নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিও স্বাধীন হবে। অবশ্যি ইচ্ছা করলে এই রাজ্যগুলি দেশ স্বাধীন হবার আগেই ভারত কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। নেহরুর ভাষায় এই হল দেশকে পৃথক পৃথক টুকরো করবার ব্রিটিশ সরকারের শেষ প্রচেষ্টা।

যদি স্যর কনরাডের প্রস্তাব গ্রহণ করা হত তাহলে ভারত স্বাধীন হবার পর দেশে তুমুল গোলমাল, বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্যর কনরাডের এই

ইচ্ছা কিংবা প্রচেষ্টা তারই এক মারাত্মক ভুলের জন্যে কার্যকরী হল না।

মাউন্টব্যাটেনের 'ডিকিবার্ড প্ল্যান' অর্থাৎ তিনি যে প্ল্যান লর্ড ইসমে এবং আবেলের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং পরে তিনি (সিমলায় নেহরুর সঙ্গে আলোচনার পর) ঐ প্ল্যান বাতিল করলেন, তখন ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মাউন্টব্যাটেনকে আলোচনার জন্যে ইংল্যাণ্ডে আসবার নির্দেশ দিলেন। মাউন্টব্যাটেন তার নিজস্ব বিশেষ প্লেন (যে প্লেন নিয়ে ইসমে, আবেল এবং কোরফিল্ড ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন) ফেরৎ চাইলেন।

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডে স্যর কনরাড কোরফিল্ড ব্রিটিশ সরকারের কাছে যা চেয়েছিলেন তা পাবার পর দিল্লীতে ফিরে এলেন।

এইখানে কোরফিল্ড এক 'অনিচ্ছাকৃত' মারাত্মক ভুল করলেন। তিনি দিল্লীতে ফিরে এসে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখাও করলেন না এবং লণ্ডনে লর্ড লিষ্টওয়েলের সঙ্গে তার কী আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তার কোন আভাস ভাইসরয়কে দিলেন না। বরং মাউন্টব্যাটেন চলে যাবার পর তিনি পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে (যার প্রধান সচিব ছিলেন স্যর কনরাড কোরফিল্ড) নির্দেশ দিলেন ভবিষ্যতে এই নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেন কোন সৈন্য মোতায়েন না করা হয় এবং অন্যান্য আয়োজন, পোষ্ট অফিস, রেলওয়ের ইত্যাদি খুলবার বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়।

শুধু তাই নয়, তিনি তার দপ্তরে এক নির্দেশ জারী করলেন যে রাজা-মহারাজাদের কলঙ্কময় জীবন কাহিনীর যে সব ফাইল আছে সেই ফাইলগুলি যেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতএব অনেক রাজা-মহারাজার কলঙ্কের কাহিনীর ফাইলগুলি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হল। পরে হিসেব করে দেখা গিয়েছিল যে স্যর কনরাডের নির্দেশে প্রায় চার টন কাগজ পোড়ান হয়েছিল।

মাউন্টব্যাটেন জানতে পারেননি যে কোরফিল্ড দেশে ফিরে এসেছেন এবং তিনি গোপনে রাজা-মহারাজাদের ফাইল পুড়িয়ে ফেলছেন এবং অন্যান্যদের নির্দেশ দিচ্ছেন। মাউন্টব্যাটেন বিশেষ প্লেনে যখন দিল্লী থেকে করাচির পথে যাচ্ছিলেন তখন তার প্লেনের পাইলট এসে বললেন যে এই প্লেনে করে স্যর কনরাড দু'দিন আগে দিল্লীতে ফিরে এসেছেন। এই খবরটি শুনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন অবাক হলেন। তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন তিনি একটি চিরকুটে তার সহযাত্রী ভি. পি. মেননকে লিখলেন ঐ 'হারামজাদা' [এখানে খুব ভদ্রভাষা ব্যবহার করা হল, কারণ মাউন্টব্যাটেন এর চাইতে খুব অপ্রিয়, কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন] কোরফিল্ড কী করেছে আপনি জানেন?

অবাক হয়ে ভি. পি. মেনন জিজ্ঞেস করলেন না, তিনি কী করেছেন?

আমাকে না বলে তিনি দিল্লীতে ফিরে এসেছেন।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ওর আসল মতলব কী?

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন পরে লণ্ডনে পৌঁছে স্যর কনরাড কোরফিল্ডের কীর্ত্তি কাহিনী জানতে পারলেন।

মাউণ্টব্যাটেন ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র তুলে নেবার যে প্ল্যান পরিকল্পনা করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে ইণ্ডিয়া অফিসের কর্মচারিরা মাউণ্টব্যাটেনের এই প্ল্যানকে সুনজরে দেখতে পারেননি। বিশেষ করে, এত তাড়াতাড়ি ভারত থেকে চলে আসবার প্ল্যান তাদের পছন্দ হয়নি। এমন কী ভাইসরয়ের এত তাড়াহুড়ো দেখে প্রধানমন্ত্রী এটলী তাকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন, আপনি, বড্ডো তাড়াহুড়ো করেছন।

হোরেস রামবোল্ড ছিলেন ইণ্ডিয়া অফিসের এ্যাসিটাণ্ট সেক্রেটারী। রামবোল্ড বললেন মাউণ্টব্যাটেন আমাদের জন্যে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। পরে মাউণ্টব্যাটেন রাজা-মহারাজাদের কাছে তার বক্তৃতা দেবার যে খসড়া ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন সেই খসড়ার উপর ইণ্ডিয়া অফিসের কর্মচারিরা মন্তব্য করলেন এই বক্তৃতা বিষয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী রাজা-মহারাজাদের আশ্বাস দিয়েছেন 'তারা ইচ্ছেমত তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে পারবে। এর জবাবে মাউণ্টব্যাটেন ইণ্ডিয়া অফিসের কর্মচারিদের বললেন 'আপনারা আমার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারেননি'।

'আমি শুধু রাজা-মহারাজাদের বলতে চাইছি কী নীতি গ্রহণ করলে তাদের উপকার হবে। যদি তারা আজ এই সুযোগ না নেয় তাহলে ব্রিটেন ভবিষ্যৎ তাদের আর কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারবে না।

আমি শুধু এক 'অখণ্ড ভারত' তৈরি করবার চেষ্টা করি এবং দেশ যদি সুপ্রতিষ্ঠ, স্থায়ী হয় তাহলে আমরা ভারতের কাছ থেকে বন্ধুত্ব পাব। 'যদি আমার এই কাজে কেউ বাধা না দেয় তাহলেই আমি সফল হব।'

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই জবাব পাবার পর এ্যাসিটাণ্ট সেক্রেটারী রামবোল্ড আবার ভাইসরয়ের চিঠির উপর মন্তব্য করলেন, 'ভাইসরয় অতি দক্ষতার সঙ্গে নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করছেন। হয়ত কয়েকটি বিষয়ে তিনি পার্লামেণ্টের ঘোষণার বাইরেই কাজ করছেন। কিন্তু তিনি যা করতে চান এবং সেই কাজ যদি বিনা বাধায় না করতে দিই তাহলে আমরা ভুল করব'। [মাউণ্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা-৪০৮]। পরে সেক্রেটারী অব ষ্টেটস লর্ড লিষ্টওয়েল মাউণ্টব্যাটেনের 'দূরদর্শিতা এবং কাজের' প্রশংসা করলেন।

কিন্তু কনরাড কোরফিল্ড ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তার মত ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার আগে নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির ভারতে যোগ দেয়া অন্যায় হবে। (১৯৪৯ সংবিধান সংসদে সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন যে দেশ ভাগ করবার প্ল্যানে বলা হয়েছিল যে ইংল্যাণ্ড এই দেশ থেকে দুমাসের মধ্যে চলে যাবে এবং নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না)।

'এই প্রশ্নের সমাধান আমরা করব', সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন। 'রাজা-মহারাজাদের নিয়ে কী করতে হবে সেই নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করব।' গান্ধীজি একবার মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন রাজা-মহারাজারা হলেন ইংরেজের সৃষ্টি, শুধু ভারতকে দুর্বল করা তাদের কাজ।

মাউন্টব্যাটেন দেশে ফিরে এসে ১৩ই জুন তার বাড়িতে নেহরু এবং জিন্না এবং কনরাড কোরফিল্ডকে নিয়ে এক মিটিং করলেন। এই সভার আলোচনার বিষয় ছিল নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ।

এই সভায় নেহরু জিন্না এবং কনরাড কোরফিল্ডের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হল। মাউন্টব্যাটেন ছিলেন নীরব শ্রোতা।

নেহরু তার বক্তৃতায় স্যর কনরাডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে তিনি পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে নতুন ভারত সরকার বিরোধী কিছু কার্যকলাপ করছেন। 'তার প্রতিটি কাজ আমাদের ক্ষতি করবে। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কাজ কারবারের বিবরণী চেয়ে আমি বেশ কয়েকটি চিঠি তাকে [স্যর কনরাডকে] লিখেছিলাম কিন্তু কোন চিঠিরই জবাব পাইনি। স্যর কনরাড শুধু এক তরফা এবং অবৈধ ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি বিভাগীয় তদন্ত চাই।'

স্যর কনরাড ভেবেছিলেন যে মাউন্টব্যাটেন তাকে সমর্থন করবেন কিন্তু মাউন্টব্যাটেন চুপ করে রইলেন। কিন্তু স্যর কনরাডকে সমর্থন করলেন জিন্না। তিনি বললেন', 'নেহেরু এই সভায় মিথ্যে অভিযোগ করছেন।

স্যর কনরাড এর জবাবে বললেন, যে তিনি শুধু সম্রাটের প্রতিনিধির নির্দেশানুযায়ী এবং সেক্রেটারী অব ষ্টেটসের অনুমতি নিয়ে সব কাজ করেছেন। 'সেক্রেটারী অব ষ্টেটস' বলেছেন রাজা-মহারাজারা দেশ স্বাধীন হবার আগের মুহূর্ত অবধি তাদের চুক্তি রদ করবার অধিকার বজায় রাখতে পারবে। 'এর পরে নেহরু এবং জিন্না উভয়েই স্যর কনরাডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে তিনি পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অনেক মূল্যবান দলিল পুড়িয়ে ফেলেছেন। এর জবাবে স্যর কনরাড বললেন যে, ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের নির্দেশানুযায়ী তিনি এই সব রেকর্ড পুড়িয়ে ফেলছেন। তিনি (নেহরু এবং জিন্নাকে) আশ্বাস দিলেন যে কোন মূল্যবান দলিলই পোড়ান হবে না।

তবে তিনি রাজনীতিবিদদের হাতে এমন কোন দলিল তুলে দিতে চান না, যার সাহায্য নিয়ে তারা পরে রাজামহারাজাদের বিপদে ফেলতে পারবেন। এই সব দলিল, কাগজপত্র বাছাই করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু দলিল তিনি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেবেন না। তবে এই সব দলিল তিনি ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ হাইকমিশনের হাতে তুলে দেবেন'।

এই সভায় নেহরু ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেস স্থির করেছেন যে রাজা-মহারাজাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থ সম্বন্ধে বিচার করবার জন্যে এক নতুন সরকারি দপ্তর, 'ষ্টেটস ডিপার্টমেন্ট' খোলা হবে। নতুন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী হলেন রিফর্মস কমিশনার, ভি. পি. মেনন। এবং সর্দার প্যাটেল হবেন এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। (পরে মাউন্টব্যাটেন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আমি খুশি হয়েছি যে, নেহরু এই দপ্তরের মন্ত্রী হননি। তিনি এই দপ্তরের মন্ত্রী হলে সব নষ্ট হয়ে যেত। সর্দার প্যাটেল বাস্তববাদী' [মাউন্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা-৪০৮)।

জিন্না এই ব্যাপারে নেহরুর সঙ্গে একমত হলেন। পাকিস্তানও এই রাজা-মহারাজাদের রাজ্যগুলির পরিচালনা করবার জন্যে এক নতুন দপ্তর খুলবেন।

স্যর কনরাড কোরফিল্ড এই নতুন ষ্টেটস ডিপার্টমেন্ট খুলবার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তার প্রতিবাদে কান দিলেন না। পরের দিন মাউন্টব্যাটেন স্যর কনরাডকে খুশি করবার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন যে নেহরু পরোক্ষে তাকেই [মাউন্টব্যাটেনকে] গালমন্দো দিয়েছেন, স্যর কনরাডকে নয়। প্রকাশ্যে, তিনি কোন ইংরেজ কর্মচারীর কাজকর্মের নীতি নিয়ে কখনও আলোচনা করেন না। এ ছাড়া তিনি নেহরুর অভিযোগ স্বীকার করে নিতে রাজি নন। স্যর কনরাড চুপ করে ভাইসরয়ের আলোচনা শুনলেন।

অবশ্যি ইতিমধ্যে স্যর কনরাড বিভিন্ন রাজা-মহারাজাদের অবৈধ কাজকর্মের দলিলগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। পরে তিনি বিভিন্ন বড় বড় মহারাজা, রাজকুমারদের গিয়ে বললেন যে, ভারত এবং পাকিস্তান গঠন হবার পর তারা তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। তারা ভারত কিংবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারেন কিংবা তারা আদৌ কোন রাষ্ট্রে যোগ না দিতে পারেন এবং নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে পারেন।

স্যর কনরাডের সঙ্গে আলোচনা করবার পর ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ঘোষণা করলেন যে ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করবেন। হায়দ্রাবাদের নিজামও ঐ ধরনের একটি ঘোষণা করলেন। এর পর এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হল যে, স্যর কনরাডের উদ্দেশ্য সার্থক হবার

সম্ভাবনা দেখা ছিল। কারণ দেখা গেল ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিতের পর রাজা-মহারাজাদের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তারা স্বাধীন হবেন।

কিন্তু স্যর কনরাড কোরফিল্ডের এই আনন্দ বেশিদিনের জন্যে স্থায়ী হল না। কারণ ইতিমধ্যে কংগ্রেস স্থির করেছিল যেন নতুন দপ্তরের সেক্রেটারী হবেন ভি. পি. মেনন। তিনি এবং সর্দার প্যাটেল এবার ধীরে ধীরে তাদের জাল গোটাতে লাগলেন। প্রথমে ভি. পি. মেনন প্যাটেলকে বললেন আপনি নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিকে তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে—প্রতিরক্ষা, বিদেশ এবং কম্যুনিকেশন—ভারতে যোগ দিতে বলুন।

প্যাটেল বললেন, তারা যদি আপত্তি করেন?

প্যাটেলের এই প্রশ্ন শুনে ভি. পি. মেনন হাসলেন। তিনি দীর্ঘকাল ইংরেজের অধীনে ভারত সরকারের দপ্তরে কাজ করেছেন। সরকারের প্রতিটি আইন-কানুন ছিল তার নখদর্পণে। শুধু তাই নয়, সরকারের কোন আইন কী ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তিনি জানেন। এ ছাড়া দেশভাগ হবার সময় তার সরকারি চাকুরী থেকে বিদায় নেবার কথা ছিল। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের অনুরোধেই ভি. পি. মেনন নতুন দপ্তরের কাজের দায়িত্বের ভার নিতে রাজি হলেন। ভি. পি. মেনন এবার প্যাটেলের কৌতুহলের জবাব দিলেন: আপনি কোন চিন্তা করবেন না। কারণ এতদিন এই সব নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার সাহায্য করত। যদি তাঁদের রাজ্যে কোন গণ-আন্দোলন কিংবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত তাহলে ব্রিটিশ সরকার তার নিজের ফৌজ পাঠিয়ে এই হাঙ্গামা বন্ধ করত। কিন্তু ব্রিটিশ চলে গেলে এদের সাহায্য করবার আর কেউ থাকবে না। যদি ভবিষ্যৎ তাদের রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ করে তাহলে ঐ বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে তারা কোন ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীও পাবে না।

সর্দার প্যাটেল এবার বুঝতে পারলেন মেনন কী বলতে চাইছেন। এছাড়া সর্দার প্যাটেল ছিলেন এই সব নৃপতি-শসিত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অল ইণ্ডিয়া ষ্টেটস পিপলস সংস্থার প্রেসিডেণ্ট।

মেনন বললেন এই নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি 'প্যারামাউন্টসি' বাতিল করে দে'য়া শাপে বর হয়েছে। কারণ প্যারামাউন্টসি তামাদি হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা-মহারাজাদের সুখ সুবিধাও বাতিল হয়ে যাবে। এর পর এই সব নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলি সম্বন্ধে আমরা কী করি না করি এই নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারবে না।

এর পর ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাহায্য নেয়া হল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রকাশ্যেই রাজা-মহারাজা এবং স্যর কনরাড কোরফিল্ডের নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। প্রথমে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ধোলপুরের মহারাজার কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন যে কোন রাষ্ট্রে যোগ দিলে তিনি কী কী সুবিধা পাবেন ইত্যাদি '....যদি আপনি কোন ডোমিনিয়নে যোগ দেন তাহলে সম্রাটই হবেন ঐ রাষ্ট্রের প্রধান। অবশ্যি পরে কোন ডোমিনিয়ন যদি গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করে এবং কমনওয়েলথের বাইরে চলে যায় তাহলে আপনার এই যোগ দেবার শর্তানুযায়ী নতুন গণতন্ত্র দেশ থেকে বাইরে চলে যাবার পুরো অধিকার আপনার থাকবে এবং স্বাধীন বলে নিজেকে ঘোষণা করতে পারবেন। যদি আপনি ভারতে যোগ না দেন তাহলে ভারত কী করবে ? কিছু করবে না। ঐটে হল আপনার সবচাইতে বড বিপদ। শুধু সমস্ত ভারত থেকে আপনার রাষ্ট্র আলাদা হয়ে যাবে'।

এরপর ২৫শে জুলাই তিনি রাজা-মহারাজাদের অর্থাৎ চেম্বার অব প্রিন্সেসের সদস্যদের নিয়ে এক সভা ডাকলেন। ইতিমধ্যে তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন প্রতিটি নৃপতি-শাসিত রাজ্যগুলিকে ভারত কিংবা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হবে। এ ছাড়া তার পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বিরোধিতা আরও স্পষ্ট হয়েছিল।

২৫শে জুলাই'র সভায় মাউন্টব্যাটেন এই সব রাজা-মহারাজাদের নতুন রাষ্ট্রে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। নতুন রাষ্ট্রে যোগ দিলে কী সুবিধা পাওয়া যাবে ব্যাখ্যা করে বললেন। মাউন্টব্যাটেনের প্রেস সেক্রেটারী এ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনের ভাষায় ইতিমধ্যে ভি. পি. মেনন তার প্ল্যানকে রাজা-মহারাজাদের কাছে বিক্রী করবার করবার জন্যে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন উপস্থিত রাজা-মহারাজাদের বললেন ১৫ই আগষ্টের পর তিনি তাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবেন না। একজন মহারাজার প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেনকে বললেন যে, এই নতুন রাষ্ট্রে যোগ দেবার ব্যাপারে তার মহারাজা এখনও মনস্থির করেননি। তিনি কী করবেন ? তিনি কী নতুন রাষ্ট্রে যোগ দেবেন। মাউন্টব্যাটেন তার টেবিল থেকে একটি ক্রুস্টাল তুলে বললেন আমি এই ক্রুস্টালের দিকে তাকিয়ে বলছি আপনার মহারাজা এই ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।... একটু পরে তিনি ঐ রাজার দেওয়ানকে বললেন 'মহারাজা আপনাকে নতুন রাষ্ট্রের যোগ দেবার চুক্তিতে সই করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।'

উপস্থিত সবাই মাউন্টব্যাটেনের জবাব শুনে হেসে উঠল।

এরপর থেকে শুরু হল বিভিন্ন রাজা-মহারাজার কাছে তদ্বির। ক্রমে ক্রমে

সব রাজা-মহারাজারাই মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশকে স্বীকার করে নিলেন। শুধু কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগর কোন রাষ্ট্রে যোগ দিল না। পরে এই তিনটি রাজ্যগুলি নিয়ে যে গোলমাল হাঙ্গামা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণী এখানে দেওয়া সম্ভব হল না।

নতুন ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট গঠিত হবার পর স্যর কনরাড কোরফিল্ডও ভারত থেকে বিদায় নিলেন।

প্রথমে বিকানীরেরর মহারাজা ভারতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারপর কাগজ সই করলেন বরোদার মহারাজা....

অনেক রাজা মহারাজার মত যোধপুরের মহারাজা উশৃঙ্খল, জীবন যাপন করতেন। যোধপুরের মহারাজা ঠিক করলেন যে তিনি গোপনে জিন্নার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন। এ ব্যাপারে তিনি জয়সালমারের মহারাজাকে তার সঙ্গে নিলেন। জিন্না যোধপুর এবং জয়সালমারের মহারাজাদের প্রস্তাব শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। কারণ জিন্না জানতেন যদি যোধপুর এবং জয়সালমার, দুইটি রাজপুত প্রধান রাজ্য, পাকিস্তানে যোগ দেয় তাহলে অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি হয়ত পাকিস্তানে যোগ দেবে। তাছাড়া পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের দরুণ তার যে ক্ষতি হয়েছিল সেই ক্ষতিও পুরণ হবে।' আর কংগ্রেসেরও সম্মান হানি হবে। এবার জিন্না তার ড্রয়ার খুলে একটি কাগজ বের করে দুই মহারাজার সামনে রাখলেন। তিনি তাদের বললেন: আপনারা পাকিস্তানে যোগ দেবার শর্ত আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী লিখে দিন; আমি ঐ কাগজে সই করব।

যোধপুরের মহারাজা এবার জয়সালমারের মহারাজার পানে তাকিয়ে বললেন আপনি কী আমার সঙ্গে যোগ দেবেন?

শুধু এক শর্তে।—জয়সালমারের মহারাজা জবাব দিলেন। 'যদি দেশে হিন্দু, মুসলমান কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তাহলে আমার রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে।'

জিন্না এদের দুজনকেই বললেন যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে পাকিস্তানে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে না। 'এই নিয়ে আপনাদের কোন চিন্তা ভাবনা করতে হবে না'।

কিন্তু এই আলোচনা থেকে যোধপুরের মহারাজা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন যে তার রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হল 'হিন্দু'—এবং তিনি নিজে 'হিন্দু।' তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবার জন্যে আরো সময় চাইলেন। তারা দুজনেই জিন্নাকে বললেন যে এই ব্যাপারটি নিয়ে তারা আরও একটু ভেবেচিন্তে দেখতে চান।'

এই বলে তারা হোটেলে ফিরে এলেন।

ইতিমধ্যে ভি. পি. মেনন খবর পেয়েছিলেন যে যোধপুর ও জয়সালমারের মহারাজারা পাকিস্তানে যোগ দেবার পরিকল্পনা করছেন। সময় থাকতেই তাদের বাধা দেয়া দরকার।' ভি. পি. মেনন, যোধপুর এবং জয়সালমারের মহারাজাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাদের হোটেলে এসে হাজির হলেন। প্রথমে যোধপুরের মহারাজা ভি. পি. মেননের সঙ্গে দেখা করতে আদৌ রাজী হ'ননি কিন্তু পরে ভি. পি. মেনন তাকে বললেন যে তিনি ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের কাছ থেকে এসেছেন। 'ভাইসরয় এক্ষুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান'।

ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না—। পরে মেনন ও যোধপুর ভাইসরয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। প্রথমে মেনন গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। পরে ভাইসরয় যোধপুরের মহারাজার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। এই সময়ে যোধপুরের মহারাজা উত্তেজিত হয়ে ভাইসরয়ের বসবার ঘরে পায়চারি করছিলেন। মাউন্টব্যাটেন ও মেনন তার সঙ্গে মিষ্টি গলায় কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, আপনি মনে রাখবেন আপনার হল 'হিন্দু' রাষ্ট্র এবং আপনার রাষ্ট্রের বাসিন্দারা হল 'হিন্দু'। ইচ্ছে করলে আপনি পাকিস্তানে যোগ দিতে পারেন, এবং এই কাজ করলে এর পরিণাম কী হবে ভেবে দেখবেন। কারণ আপনার রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবার সম্ভাবনা আছে। যোধপুরের মহারাজা এর জবাবে বললেন, জিন্না একটি সাদা কাগজে আমার পাকিস্তানে যোগ দেবার শর্তগুলি লিখে দিতে রাজি আছেন। আপনারা কী দেবেন?

ভি. পি. মেনন বললেন, আপনি চান, আমিও আপনাকে একটি সাদা কাগজ শর্ত লিখে দেব। কিন্তু ঐ সাদা কাগজ দিয়ে কী হবে? আপনাকে মিথ্যে আশা দেয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।

আলোচনার পর ঠিক হল মেনন যোধপুরের মহারাজাকে কিছু সুবিধা দেবেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার জন্যে মেনন যোধপুরে যাবেন। পরে যোধপুরের মহারাজা ভারতে যোগ দেবার চুক্তিপত্রে সই করলেন। এর কিছুদিন পরে ভূপালের নবাবও ভারতে যোগ দিতে রাজি হলেন। কিন্তু গোলমাল হল জুনাগড় রাষ্ট্র নিয়ে। জুনাগড় রাষ্ট্রের বিশেষত: ছিল যে এই রাষ্ট্র ছিল 'হিন্দু রাষ্ট্র' কিন্তু এর শাসনকর্তা ছিলেন এক যথেচ্ছাচারী মুসলমান নবাব। এই রাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানের দূরত্ব হল ২৫০ মাইল। এই জুনাগড় ছিল কাথিয়া-ওয়ারের অন্তর্ভুক্ত। কাথিয়াওয়ারের বড় রাষ্ট্র হল নওনগর। এই নওনগরের

রাজা ছিলেন জামসাহেব এবং তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।

জুনাগড়ের আরও কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। প্রথমত এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এই রাষ্ট্রের দুইদিকে ছিল পাহাড়। একটি পাহাড়ের নাম হল গিরনার পর্বত এবং এই পাহাড়ের পাশেই জৈন সম্প্রদায় বাস করে থাকে। জুনাগড়ের মোট বাসিন্দা হল ৭০০,০০০ এবং এরা গুজরাটি। জুনাগড়ের গির জঙ্গলে আজও সিংহ দেখতে পাওয়া যাবে।

জুনাগড়ের নবাবের দুটি শখ ছিল; এক কুকুর পোষা, দুই, শিকার করা। তিনি শুধু কুকুর পুষতেন না, তিনি কুকুর লালন-পালন এবং তাদের বংশবৃদ্ধি করতেন। তার মোট পোষা কুকুরের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শ। প্রতিটি কুকুরের একটি থাকবার ঘর, খাবার টেবিল, একজন চাকর এবং টেলিফোন ছিল। এই সব কুকুরদের জন্যে একজন বিশেষ ইংরেজ পশুর চিকিৎসক ছিল। নবাব যদি কখনও কুকুরদের দেখতে চাইতেন তবে পালকীর ভেতরে ভরে এদের নবাবের কাছে নিয়ে আসা হত।

এছাড়া তার কিছু শিকারী কুকুর ছিল। শিকারে যাবার সময় তিনি এদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বাজারে গুজব ছিল যে নবাব শিকারের আগে এই সব শিকারী কুকুরদের অনাহারে রাখতেন। পরে এরা শিকারে কোন হরিণ কিংবা সিংহকে জখম করত। এর পর ক্ষুধার্ত কুকুরগুলি আহত হরিণ কিংবা সিংহকে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত। দূর থেকে দাঁড়িয়ে নবাব মজা দেখতেন। নবাবের চারজন বেগম এবং বহু সংখ্যক রক্ষিতা ছিল। ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনার পর নবাব প্রথমে স্থির করলেন যে তিনি ভারতে যোগ দেবেন এবং ভাইসরয়কে তার মনের ইচ্ছার কথা বললেন, কিন্তু আসলে নবাব ভাইসরয় এবং কংগ্রেসের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছিলেন। কারণ তিনি গোপনে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবার ফন্দী করছিলেন। জিন্না জুনাগড়কে তার দেশের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিনা এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ পাকিস্তানের জুনাগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বেশ কঠিন কাজ ছিল। কারণ জুনাগড়ের চারদিকে ছিল ভারতের সীমান্ত এবং ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র। পাকিস্তানের পক্ষে এত দূর থেকে জুনাগড়কে শাসন করা বেশ কঠিন কাজ ছিল।

কিন্তু এই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলির যোগ দেবার ব্যাপার নিয়ে তীব্র রেষারেষি চলছিল। বলা যায় দুই পক্ষের মধ্যে এই সব নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিল।

১৯৪৭ সালের আগে এক মুসলিম লীগের সদস্য জুনাগড়ে গোপনে প্রবেশ

করে পুরান দেওয়ানকে হটিয়ে নিজে দেওয়ানের গদীতে বসেছিলেন। এই নতুন দেওয়ান জুনাগড়ের নবাবকে ভয় দেখালেন যদি তিনি ভারতে যোগ দেন, তাহলে ভারত সরকার তার কুকুরগুলিকে মেরে ফেলবে। এ ছাড়া গির জঙ্গলকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হবে এবং নবাবকে কোন শিকার করবার সুযোগ দেয়া হবে না। এর পরিবর্তে নবাব যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তাহলে পাকিস্তান তাকে রক্ষা করবে....এবং তার রাষ্ট্রের প্রজারা যদি বিদ্রোহ করে তাহলে পাকিস্তানের পুলিশ তাদের দমন করবে।

ভাইসরয়ের চেম্বার অব প্রিন্সেসের সঙ্গে সম্মেলনের পর ভি. পি. মেনন এবং প্যাটেল জুনাগড়ের নবাবের কাছে এক চুক্তিপত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জুনাগড়ের নবাব মেননের চিঠির কোন জবাব দিলেন না। টেলিগ্রাম পাঠান হল তবু নবাব নিরুত্তর রইলেন। ইতিমধ্যে নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতে শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে, জুনাগড় পাকিস্তানে যোগ দিবেন। নবাব সংবাদপত্রে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন। এই ইস্তাহারে বলা হল : বেশ কিছুদিন যাবৎ জুনাগড়ের সরকার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন যে, তারা ভারত না পাকিস্তানে যোগ দেবেন। এই বিষয়টি নিয়ে তারা গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন, এবং তারা দেশের জনগণের মঙ্গল, উন্নতির এবং দেশের অখণ্ডত, স্বাধীনতা এবং সায়ত্তশাসনের কথা চিন্তা করে একটি উপায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করবার পর জুনাগড় পাকিস্তানে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এই মর্মে তারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে। জুনাগড় আশা করে এই সিদ্ধান্তকে সবাই সাদরে অভিনন্দন জানাবে।

জুনাগড়ের এই বিবৃতি মিথ্যে ছিল। নবাব না জানলে পাকিস্তান জানত।

এবার ভারত সরকার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলির কাছে টেলিগ্রাম পাঠাল এবং জিজ্ঞেস করল তারা কী জুনাগড়কে পাকিস্তানে গ্রহণ করেছে? কিন্তু পাকিস্তানের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না। কয়েক সপ্তাহ পরে পাকিস্তান ঘোষণা করল যে, পাকিস্তান জুনাগড়ের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ পাকিস্তানে যোগ দেবার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছে। অবশ্যি পাকিস্তান সামান্য কয়েকজন পুলিশ জুনাগড়ে পাঠান ছাড়া আর কোন কিছু করল না। কারণ পাকিস্তান জানত যে জুনাগড়ে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং কংগ্রেস পরিচালিত সংস্থা বেশ শক্তিশালী। এ ছাড়া জুনাগড়ের অধিকাংশ প্রজারাই ছিল হিন্দু।

ইতিমধ্যে জুনাগড় থেকে হিন্দু শরণার্থীরা পালিয়ে আসতে লাগল।

- জুনাগড়ের এই সিদ্ধান্তে সর্দার প্যাটেল ক্ষিপ্ত হলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ভারত সরকারের এক ক্যাবিনেট মিটিংএ ক্যাবিনেটের সদস্যরা দাবী করলেন যে, জুনাগড়ে সৈন্যবাহিনী পাঠান হক। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন [তিনি ইতিমধ্যে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন] আপত্তি করলেন। তিনি বললেন· জুনাগড়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠালে বিশ্বের চোখে ভারতের সম্মানের হানি হবে এবং ভারত ছোট হবে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের ইংরেজ সহকর্মীরা আর এক কাণ্ড করলেন যার জন্যে মাউন্টব্যাটেনকে বিশেষ বিব্রত হতে হল। সৈন্যবাহিনীর তিনজন প্রধান, চীফ অব দি ষ্টাফ, ভারতীয় মন্ত্রীসভার কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জুনাগড়ে যাবার মত অবস্থা নেই ···এবং যেহেতু এই লড়াই কমনওয়েলথের আর একটি ডোমিনিয়নের সঙ্গে করা হচ্ছে তারা (ইংরেজ সেনারা) এই লড়াইতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। অতএব সৈন্যবাহিনীর 'চলাচল' অবিলম্বে বন্ধ করা হক এবং জুনাগড়ের সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হক।' এই ছিল তিন ব্রিটিশ 'চীফ অব দি ষ্টাফের' মন্তব্য।

নেহরু এই চিঠি পেয়ে ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি বললেন, এই চিঠি থেকে মনে হচ্ছে যে 'চীফ অব দি ষ্টাফরা' যদি ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে একমত না হন তাহলে তারা সেই নীতিকে পালন করবেন না। সরকার কোন প্রকারেই সৈন্যবাহিনীর এই অবাধ্যতাকে স্বীকার করে নিতে পারে না। মাউন্টব্যাটেন গোপনে 'চীফ অব দি ষ্টাফ'দের প্রতি সহানুভূতি জানালেন। প্রকাশ্যে পরে অবশ্যি তিনি তিন অফিসারকে ডেকে ধমক দিলেন। 'চীফ অব দি ষ্টাফসরা' তাদের চিঠি প্রত্যাহার করে নিলেন। অকিনলেক নেহরুকে এক চিঠি লিখে জানালেন, যে 'চীফস অব দি ষ্টাফেরা' বিশেষ কাজের চাপে ছিলেন। তাই তারা এই ধরনের চিঠি লিখেছেন। ভবিষ্যৎএ যেন এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না হয় তার জন্যে ক্যাবিনেটের এক ডিফেন্স কমিটি গঠন করা হল, এবং মাউন্টব্যাটেন হলেন তার প্রথম চেয়ারম্যান। পাকিস্তানীরা এবার থেকে বলতে শুরু করলেন যে, 'মাউন্টব্যাটেন ভারতীয়দের চাইতে বেশি ভারতীয়' [মাউন্টব্যাটেন : জিগলার পৃষ্ঠা-৪৪৫]।

ইতিমধ্যে জুনাগড়ের নবাব পালিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। প্লেনের ভেতর তিনি তার পোষা যত কুকুর সম্ভব এবং চার স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন। এক স্ত্রী প্লেনে উঠবার পর দেখতে পেলেন যে, তিনি তার এক ছেলেকে রাজপ্রাসাদে ফেলে এসেছেন। স্ত্রী যেই তার ছেলেকে আনবার জন্যে রাজপ্রাসাদে গেলেন অমনি নবাব স্ত্রীর পরিবর্তে আরও দুটি কুকুর প্লেনের ভেতর ভরে নিলেন।

যাবার সময় তিনি জুনাগড়ের কোষাগার থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ধন-দৌলত নিয়ে গেলেন। ভবিষ্যৎ জীবন আরামে কাটাবার জন্যে তার কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হল না।

নেহরু এবার ঠিক করলেন জুনাগড়, ভারত না পাকিস্তানে যোগ দেবে এই বিষয়টি নিয়ে তিনি জনগণের মতামত যাচাই করবেন। ভারত জুনাগড়ের মতামতের বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর এই নীতিকে সমর্থন করলেন। পাকিস্তান রাজি হল। কারণ এই সময়ে পাকিস্তান কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা করছিল।

জুনাগড়ের পরে, কাশ্মীরও হায়দ্রাবাদ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যে হাঙ্গামা লড়াই হয়েছিল সেই কাহিনী আজকে আলোচনা করা সম্ভব হল না।

দেশের বিষয় সম্পত্তি এবং পাকিস্তান কী পাবে, ভারত কী রাখবে, এই নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে এক দেশভাগ কমিটি (পার্টিশন কমিটি) গঠন করা হয়েছিল। পরে এর নাম হয়েছিল 'পার্টিশন কৌন্সিল'। এই কৌন্সিলের চেয়ারম্যান হলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং কংগ্রেস ও লীগের দুইজন প্রতিনিধিকে এই কৌন্সিলের প্রতিনিধি করা হল। পরে মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধে দুই দেশের দুইজন সরকারি কর্মচারী, এইচ. এম. প্যাটেল, ক্যাবিনেট সেক্রেটারী এবং চৌধুরী মুহম্মদ আলিকে এক বিশেষজ্ঞ সব কমিটির সদস্য করা হল। কোন অচল অবস্থা সৃষ্টি হলে তার সমস্যা সমাধান করবার জন্যে এক ট্রিবিউন্যাল গঠন করা হল।

সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাগ করা নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিল। ১৯৪৭ সালে (ব্রিটিশ) ভারতের কম্যাণ্ডার ইন চীফ ছিলেন ক্লড অকিনলেক। অকিনলেক ভারত আসবার আগে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রধান জেনারেল ছিলেন কিন্তু পরে যখন জার্মান জেনারেল রোমেল দ্রুতগতিতে কায়রোর দিকে এগিয়ে এল তখন অকিনলেককে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বদলি করে ভারতবর্ষের 'কম্যাণ্ডার ইন চীফ' করা হল।

১৯৪৫ অকিনলেকের প্রস্তাবনুযায়ী আই এন এ সৈন্যবাহিনীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হল। তার এই নীতির বিরোধিতা করে কিছু ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারি (এর মধ্যে নর্থওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের গভর্নর স্যর জর্জ কানিংহ্যাম ছিলেন একজন) বললেন আই এন এদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হলে তাদের [আই-এন-এ'র] একতা এবং জনপ্রিয়তা বাড়বে। পরে অকিনলেকও স্বীকার করেছিলেন যে দেশে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে 'এক আই-এন-এ'র আবহাওয়া বইছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আই-এন-এ'র

প্রতি সহানুভূতি বেড়েছে এবং প্রতিদিন বাড়ছে। অকিনলেক বললেন যে এই আই-এন-এ'র আবহাওয়ার দরুণ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর আর নির্ভর করতে পারে না এবং পরে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে হবে।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশভাগের নীতি গ্রহণ করবার পর অকিনলেকের সমস্যা আরও গুরুতর হল।

তাকে বলা হল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুই অংশে ভাগ করতে হবে। (বলা দরকার যে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের ব্রিগেডিয়ারের পদ ছিল সবচাইতে উচু পদ)।

লর্ড ইসমে এবার অকিনলেককে নির্দেশ দিলেন সৈন্যবাহিনীকে যেন দুই অংশে ভাগ করা হয়। অকিনলেক জবাব দিলেন যে এই কাজটি খুব সহজ নয়। কারণ তিনি বললেন যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বর্তমানে একটি বিশেষ বড় এবং দক্ষ সেনাবাহিনী। একে সম্প্রদায় ভিত্তিতে দুই অংশে ভাগ করা যায় না।

এবার মাউণ্টব্যাটেন অকিনলেককে ডেকে পাঠালেন। সৈন্যবাহিনীতে পদ-মর্যাদায় মাউণ্টব্যাটেন অকিনলেকের চাইতে উচু পদে ছিলেন। এ ছাড়া মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন ভাইসরয় এবং অকিনলেক তার অধীনেই 'কম্যাণ্ডার ইন চীফের' কাজ করতেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের দেশ ভাগের প্রস্তাব যখন প্রকাশিত হল তখন মাউণ্টব্যাটেন ও অকিনলেকের মধ্যে বন্ধুত্বের চিড় ধরেছিল। মাউণ্টব্যাটেন এবার অকিনলেককে ডেকে বললেন, যেন অবিলম্বে এ সৈন্য বাহিনীকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুই অংশে ভাগ করা হয়। এই ব্যাপারে তিনি অকিনলেকের কোন জবাব শুনতে চান না....No **bloody nonsense about it, Claude.**

ক্লড অকিনলেক ভাইসরয়ের এই আদেশ শুনে ক্ষুব্ধ হলেন।

মাউণ্টব্যাটেন অকিনলেককে সৈন্যবাহিনী দুই অংশে ভাগ করবার নির্দেশ দেবার পর এই বিষয়টি নিয়ে কিংবা এই ব্যাপারে কোন নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে তার সঙ্গে আর কোন আলোচনা করেননি।

সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করবার জন্যে জুনমাসে 'আর্মড ফোর্সেস রিকনষ্টিটিউশন' কমিটি গঠন করা হল। ইচ্ছা করে 'পার্টিশন' শব্দটি ব্যবহার করা হল না। কয়েকটি বিশেষ নিয়মানুসারে সৈন্য বাহিনীকে ভাগ করা হল। আরও ঠিক করা হল ১৫ই আগষ্টের পর ক্লড অকিনলেক হবেন দুই দেশের সৈন্যবাহিনীর 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডার'। এই পদে তার একমাত্র কাজ ছিল একদেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে দুই দেশের সৈন্যবাহিনীকে পরিদর্শন করা।

এ ছাড়া তাকে জয়েন্ট ডিফেন্স কমিটির দায়িত্ব দেয়া হল। মাউন্টব্যাটেনের জীবনীর লেখক জিগলার বলেছেন [পৃষ্ঠা-৩৯০] যে 'অকিনলেক হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের বেশি পছন্দ করতেন'। (অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অফিসারেরা মুসলমানদের বেশি পছন্দ করতেন) নেহরু এবং বলদেব সিং অকিনলেককে সুনজরে দেখতে পারতেন না।

অকিনলেক দেশভাগের পর ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এবং ব্রিটিশ প্রজাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। কারণ তিনি বললেন দেশ স্বাধীন হবার পর এক বড় হত্যাকাণ্ড শুরু হবার সম্ভাবনা আছে এবং তখন ব্রিটিশ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ১লা জানুয়ারী ১৯৪৮, পর্যন্ত রাখবার প্রয়োজন হবে।

অকিনলেকের এই প্রস্তাবের জবাবে ভাইসরয় বললেন ১৫ই আগষ্টের পর ব্রিটিশ প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হল দুই দেশের সরকারের এবং দুই দেশের সরকার যদি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে এই দেশের কোন বিশেষ কাজের জন্যে থাকতে অনুরোধ না করে, তাহলে আমরা যদি জোর করি, তাহলে সবার মনে ধারণা হবে যে আমরা এই দুই দেশের সরকারকে অবিশ্বাস করি। অতএব আমাদের উচিৎ কাজ হবে অবিলম্বে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে এদেশ থেকে তুলে নেয়া।

অবশ্যি দুই দেশের সরকার যদি অনুরোধ করেন তাদের কাজের জন্যে এদেশে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আরও ছয়মাসে জন্য রাখা হক তাহলে তাদের এই অনুরোধ ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিবেচনার জন্যে পাঠান হবে।

অকিনলেক ভাইসরয়ের এই আদেশে একেবারেই সন্তুষ্ট হলেন না। তার বক্তব্য ছিল যে 'সামান্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কলকাতা, বাম্বাই, দিল্লী এবং করাচিতে আছে ঐ বাহিনী দিয়ে ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাবকে কিংবা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলা করা যাবে না। সব কিছুই অবস্থার উপর নির্ভর করবে··· এবং আমার এই মন্তব্য ব্রিটিশ সরকারকে জানান হ'ক। কারণ ভাইসরয়ের সামরিক পরামর্শদাতা হিসাবে এই হল তার কাছে আমার পরামর্শ'।

এদিকে মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদ কিংবা মতান্তর হয় চাইলেন না। কারণ ভারত ও পাকিস্তান স্থির করেছিল যে ১৫ই আগষ্টের পর দুই দেশের সৈন্যবাহিনী হবে তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে এদেশে মোতায়েন রাখবার প্রশ্নটি নিয়ে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। কারণ দেশভাগের ঠিক কিছু পরে লিয়াকৎ আলি লর্ড ইসমেকে জিজ্ঞেস করলেন যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে এদেশে

রাখা সম্ভব হবে কিনা। ভাইসরয় স্থির করেছিলেন শুধু একপক্ষের অনুরোধ ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠাবেন না। কিন্তু তবু তিনি সেক্রেটারী অব ষ্টেটসকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে ১৫ই আগষ্টের পর এদেশে কোন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রাখা হবে কিনা। যদি হয় তাহলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ১লা এপ্রিল ১৯৪৮ তুলে নেয়া হবে। এই টেলিগ্রামে তিনি কম্যাণ্ডার ইন চীফ ক্লড অকিনলেকের প্রস্তাবকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করলেন। মাউন্টব্যাটেন ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এবং ভবিষ্যৎ 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তার প্ল্যানকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই অবস্থায় অকিনলেকের প্রস্তাবকে গ্রহণ করে তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোন মতবিরোধ কিংবা মনোমালিন্যর সৃষ্টি করতে চাননি।

সেক্রেটারী অব ষ্টেটস অকিনলেকের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে মাউন্টব্যাটেনকে সমর্থন করলেন।

অবশ্যি যদি দুই দেশের সরকার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে আর কিছু কালের জন্যে রাখতে চায় তাহলে ব্রিটিশ সরকার কোন আপত্তি করবে না, এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত।

এই নির্দেশানুযায়ী মাউন্টব্যাটেন দুই দেশের সরকারের মতামত জানতে চাইলেন। নেহরু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন 'বরং এর চাইতে দেশের প্রতি শহর এবং গ্রাম আগুনে ধ্বংস হয়ে যাক আমি আপত্তি করব না।'

১৫ই আগষ্টের পর সত্যি সত্যিই দেশের চারদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গমার আগুন জ্বলে উঠেছিল।

*   *   *

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' পেল। ইংরেজী ভাষায় বলা হল 'ক্ষমতার হস্তান্তর অর্থাৎ 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার' করা হল'।

দুই নতুন রাষ্ট্রের ভারতের গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং পাকিস্তানের হলেন জিন্না। পাকিস্তানে রাজধানী হল করাচি। দীর্ঘদিন পরে জিন্না আবার করাচিতে ফিরে গেলেন। তবে সাধারণ নাগরিক হিসাবে নয় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদমর্যাদা নিয়ে। জিন্নার দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস বিরোধী সংগ্রাম এবং দুই দেশ গঠনের চেষ্টা সার্থক হল। তিনি আশা করেননি পাকিস্তান পাবেন এবং যে আকাশকুসুম তিনি রচনা করেছিলেন তার সেই কল্পনা, স্বপ্ন, সার্থক হল। তিনি যেদিন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে গিয়ে পৌছুলেন সেদিন করাচির অসংখ্য জনতা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' চিৎকার করে তাকে তাদের

নবগঠিত রাষ্ট্রে অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন জানাল। পরে তিনি করাচিতে পাকিস্তানের নবগঠিত সংবিধান সংসদকে বললেন: 'এই ঘটনায় (অর্থাৎ পাকিস্তান গঠনে) শুধু আমরাই বিস্মিত হইনি, সমস্ত বিশ্বের লোকেরাও এই বিপ্লবে, যে বিপ্লব থেকে জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান এবং ভারত দুইটি স্বাধীন দেশ, অবাক হয়েছে। এ হল এক অভূতপূর্ব ঘটনা এবং দুনিয়ায় এর কোন নজীর নেই।

জিন্না প্রথমে 'বিশ্বাস' করতে চাইলেন যে তিনি পাকিস্তান পেয়েছেন। 'কংগ্রেসের ভুলই যে তার সাফল্য হবে তিনি কোন দিন এ আশা করেননি।' [জিন্না : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৩৭]।

জিন্না পাকিস্তান কী এবং কী করে এই নতুন রাষ্ট্র শাসন করা হবে এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। এই নতুন সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দেশের সবার জীবনের এবং সর্ব ধর্মের বিশ্বাসকে নিরাপদ রাখা। তিনি বললেন, 'আমরা এবং ভারত যে অভিশাপ থেকে ভুগছে অর্থাৎ দুর্নীতি এবং ঘুষ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব। এই দুইটি জিনিষ হলো বিষ : আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে দুর্নীতি এবং ঘুষকে বন্ধ করবার চেষ্টা করব। আর একটি অভিশাপ হল কালোবাজারী। আজ দেশের চারদিকে, এই দুঃখ-দুরবস্থায় মধ্যে, এই পাপ সমাজের কাছে এক ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে নাগরিক এই হীন কাজ করছে সে সমাজে সবচাইতে বড় পাপের কাজ করছে। এদের কঠিন শাস্তি দেয়া দরকার। আর দুটি জিনিষ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি সে হল অসদাচারণ এবং আত্মীয়স্বজন পোষণ। এই অসৎ কাজকে বন্ধ করতে হবে। আমি কোন প্রকারেই দুর্নীতি, 'অসদাচারণ এবং আমার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করাকে সহ্য করব না'।

'আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করবার বিরোধী ছিলেন কিন্তু এখন যখন দেশভাগ গ্রহণ করা হয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিতে হবে। অনেকে বলেন যে দেশভাগের বিকল্পে অন্য কোন কার্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ করা কী সম্ভব ছিল? মনে হয় না। দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী ছিল [জিন্না, বলিথো, পৃষ্ঠা-২১০]।

দেশভাগ হবার পর জিন্না আবার 'হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের দূত' হিসাবে পাকিস্তানের জনগণের কাছে, বিশেষ করে, সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্য করে, এক বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বললেন' অ. মারা সবাই স্বাধীন, মুক্ত। আপনারা ইচ্ছে করলে আপনাদের মন্দিরে, গির্জায় এবং মসজিদে এবং যে কোন পুজোর স্থানে যেতে পারেন। আপনি যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হন না

কেন····আপনার ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই। এবার থেকে বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্যমূলক বিচার, এবং এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোন বিভেদমূলক আচার-ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মৌলিক নীতি হল, আমরা হলাম এই স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের সবার সমান অধিকার'। পরে জিন্না সংবিধান সংসদের সবাইকে বললেন, 'এমন একটা যুগ আসবে যখন হিন্দুরা নিজেদের হিন্দু এবং মুসলমানরা নিজেদের মুসলমান বলে ভুলতে শিখবেন। ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে নয় কারণ ওটা হল ব্যক্তিগত বিচার এবং ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং দেশের নাগরিক হিসাবে তারা বসবাস করবেন' [জিন্না : ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৩৯]।

জিন্নার এই বক্তৃতার পরই র‍্যাডক্লিফের সুপারিশ ঘোষণা করা হল। তারপর থেকে শুরু হল, হত্যাকাণ্ড এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে নাগরিকদের পদযাত্রা।

* * *

নতুন গভর্নর জেনারেল হবার পর জিন্না সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত্রি বারোটা অবধি একটানা কাজ করতেন। এ ছাড়া জীবনের প্রথম দিন থেকেই তিনি প্রচুর সিগারেট খেতেন··· তার প্রিয় সিগারেট ছিল (Craven 'A')। পাকিস্তান হবার সময় এবং বিভিন্ন শহরে রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দেবার সময় জিন্না নিজের স্বাস্থ্যর প্রতি নজর দেননি। কিন্তু তিনি যখন নতুন রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেল হলেন তখন দেখা গেল তিনি ক্লান্ত এবং অসুস্থ····এবং রোজ বিকেলে তার জ্বর হয় এবং প্রচুর কাশছেন। এই সময়ে তিনি ছিলেন এক নিঃসঙ্গী ব্যক্তি। স্ত্রী রতনবাই জিন্নার মৃত্যু আগেই হয়েছিল। তার কন্যা দীনা তার বাবার সঙ্গে পাকিস্তানে যাননি। দীনা ইতিমধ্যে ঠিক করেছিলেন যে, তিনি নেভিল ওয়াদিয়াকে বিয়ে করবেন। এই নেভিল ওয়াদিয়া ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান পার্শী, এবং ব্যবসায়ী দীনা যখন নেভিল ওয়াদিয়াকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন জিন্না আপত্তি করে বলেছিলেন ভারতে অসংখ্য মুসলমান ছেলে আছে। দীনা ইচ্ছে করলে এদের মধ্যে কাউকে বেছে নিতে পারে। এর জবাবে দীনা বললেন, ভারতে অসংখ্য মুসলমান মেয়ে ছিল, আপনি তাদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করেননি কেন? দীনার এই জবাবের পর জিন্না দীনার সঙ্গে আর কোনদিন কথা বলেননি। জিন্না সবাইকে বলতেন 'যে তার কোন মেয়ে নেই।' (দীনা ওয়াদিয়ার নাতি হলেন নুসলি ওয়াদিয়া, বর্তমানে ওয়াদিয়া ব্যবসায়ের মালিক)। [জিন্না : ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৭০]।

এই সময়ে জিন্নার সঙ্গে তার বোন ফতিমা জিন্নাই ছিলেন। তখনও

পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি হয়নি। এই সংবিধান রচনা করা এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী করবার জন্যে জিন্না দিনরাত পরিশ্রম করছিলেন। এই জ্বর ও কাশির জন্যে তিনি কোন ওষুধ খেতে অস্বীকার করলেন। কিছু বললে বলতেন, আমার অনেক কাজ আছে....এই জ্বর ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর ফুসফুসের ব্যারাম ছিল। পুরান ব্যারাম। ফতিমা জিন্নার পীড়াপীড়িতে এবার ডাক্তার রহমানকে, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে, ডাকা হল।

পরে জিন্না বলেছিলেন, এই সময়ে পাকিস্তানের কোষাগারে মাত্র কুড়ি কোটি টাকা ছিল। অতএব দেশের বাজেট এবং খরচের ব্যাপারও তাকে দেখতে হত। তিনি পাকিস্তান অর্থ সংগ্রহের জন্যে অন্য দেশের কাছ থেকে টাকা পাবার চেষ্টা করছিলেন। এ ছাড়া ভারতের কাছে পাকিস্তানের ৫৫ কোটি টাকা বাকী ছিল। জিন্না এবার হায়দ্রাবাদের 'নিজামের কাছে টাকা ধার চাইলেন'। নিজামের পরামর্শদাতা ছিলেন মীর লায়েক আলি। তিনি ছিলেন জিন্নার বন্ধু। তার চেষ্টায় নিজাম পাকিস্তানকে কুড়ি কোটি টাকা ধার দিলেন। এই টাকা কর্জ দেবার কথা শুনে প্যাটেল ক্ষিপ্ত হলেন।

ইতমধ্যে আর একটি ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তান ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। সেই বিষয়টি হল কাশ্মীর। এই ঝগড়া-বিবাদের জের আজ অবধি চলছে। কাশ্মীরের মহারাজা পাকিস্তানের সঙ্গে একটি 'অস্থায়ী চুক্তি' (Standstila rgreement) করেছিলেন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে পেট্রোল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কাশ্মীরে আনা হত। (কাশ্মীরের মহারাজা ছিলেন, হিন্দু, প্রজারা অধিকাংশই মুসলমান) এবং মহারাজার চরিত্রদোষ ছিল। বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও কাশ্মীরের মহারাজা মনস্থির করতে পারছিলেন না তিনি কী করবেন? তিনি কী ভারতে যোগ দেবেন না পাকিস্তানে? ঠিক হল, মহারাজার উদ্দেশ্য কী জানবার জন্যে প্রথমে মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরে যাবেন এবং তার সঙ্গে দেখা করে তার উদ্দেশ্য জানবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু মহারাজা মাউন্টব্যাটেনকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তান কাশ্মীরে পেট্রোল ইত্যাদি পাঠাতে অস্বীকার করল। পরে এই সব জিনিষ ভারত থেকে নে'য়া হত। ২৩শে অক্টোবর ব্রিটিশ ট্রাক এবং পাকিস্তানের জীপে করে প্রায় পাঁচ হাজার সশস্ত্র পাঠান, আফ্রিদী, ওয়াজিরী এবং মাসুদ উপজাতিরা কাশ্মীরের বারমুলা, মুজাফ্ফরাবাদের রাস্তা দিয়ে শ্রীনগরের দিকে রওনা দিল। এর পর মহারাজা ভারতে যোগ দিতে রাজি হলেন। ভি. পি. মেনন শ্রীনগরে গিয়ে মহারাজার কাছ থেকে ভারতে যোগ দেবার কাগজে সই করিয়ে আনলেন। এর পর পাকিস্তানী

উপজাতিদের আক্রমণ রোধ করবার জন্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কাশ্মীরে পাঠান হল। কিন্তু কাশ্মীরে ভারতে যোগ দেবার পরও তিন 'ব্রিটিশ চীফস অব ষ্টাফ' কাশ্মীরে এই পাল্টা আক্রমণ করবার প্রতিবাদ করেছিলেন⋯কিন্তু নেহরু বললেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী না পাঠালে শ্রীনগর ধ্বংস হবে⋯ এবং পরে তার প্রতিক্রিয়া ভারতের উপর হবে [জিন্না : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৫০]।

২৭শে অক্টোবর জিন্না তার ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার ইন চীফ, ডগলাস গ্রেসীকে দুই ব্রিগেড সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরে পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু গ্রেসী গভর্নর জেনারেল জিন্নার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন যে, সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অকিনলেকের বিনানুমতিতে তিনি কিছুই করবেন না। কিন্তু জিন্না পীড়াপীড়ি করবার পর গ্রেসী অকিনলেককে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন, এবং তার নির্দেশ চাইলেন। অকিনলেক লণ্ডনের নির্দেশ চেয়ে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন। পরে অকিনলেক এবং গ্রেসী গিয়ে জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন এবং জিন্নাকে বললেন যে, কাশ্মীরের ভারতে যোগ দেবার পর পাকিস্তানী উপজাতিদের আক্রমণ বন্ধ করবার জন্যে মহারাজার অনুমতি নিয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠান যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী ভারতের সৈন্যবাহিনীর চাইতে দুর্বল। অকিনলেকের সঙ্গে আলোচনা করবার পর জিন্না তার আদেশ প্রত্যাহার করলেন, [জিন্না : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৫১]।

* * * *

'অল ইণ্ডিয়া' মুসলিম লীগের শেষ অধিবেশন করাচিতে ১৪-১৫ই আগস্ট হল। প্রায় তিনশো সদস্য এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। জিন্না তার রোগশয্যা থেকে উঠে এসে সদস্যদের কাছে ইংরাজিতে এক বক্তৃতা দিলেন। পরে এই বক্তৃতা উর্দুতে অনুবাদ করা হল। তিনি বললেন, মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে। এর আগে মুসলিম জনতার মনোবল ছিল দুর্বল, এবং তাদের আর্থিক কষ্টও স্বীকার করতে হয়েছে। 'কিন্তু আমরা পাকিস্তান গঠন করেছি, লীগের জন্যে নয়, আমার সহকর্মীদের জন্যে' নয় সর্বসাধারণ জনগণের জন্যে [পীরজাদা, ফাউণ্ডেশন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৭১] এর কিছুদিন পরে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ এক আততায়ী নাথুরাম গোডসের গুলিতে মহাত্মা গান্ধী প্রাণ হারালেন। প্রথমে জিন্না মন্তব্য করলেন : তিনি [গান্ধী] 'হিন্দু সম্প্রদায়ের' 'একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।' পরে তিনি তার মন্তব্যকে সংশোধন করে আরও উদার মনোভাব প্রকাশ করলেন। বললেন, 'গান্ধীর মৃত্যু মুসলমানদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে' [জিন্না : ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা-৩৫৮]।

জিন্না অসুস্থ ছিলেন তবু তাঁকে জোর করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে তিনি তার বক্তৃতায় বললেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। জিন্না তখনও বাঙালী মুসলমানদের ভাষার প্রতি কী টান ছিল স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি এবং ভাষার ভিত্তিতে যে একটা দেশ গড়ে উঠতে পারে একথাও কল্পনাও করেন নি।

"কারণ পরে বহু দুঃখ, কষ্টের মধ্যে দিয়েও বাঙালী মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষা হিসাবে বরণ করে নিল [জিন্না : ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৬০]।

ইতিমধ্যে জিন্নার চরিত্রের এবং আচার-ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। তার শরীর যতই দুর্বল হতে লাগল ততোই তার মেজাজ রুক্ষ হতে লাগল। তিনি লিয়াকৎ আলিকে অতি 'সাধারণ বুদ্ধির' লোক বলে বর্ণনা করলেন। কারণ ইতিমধ্যে জিন্নার সঙ্গে লিয়াকৎএর সম্পর্ক ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল।

জিন্না যখন তার কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন লিয়াকৎ আলি প্রধান-মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে রাজি হলেন। তিনি তার বিশ্বস্ত সাগরেদ মামদোতের নবাবকে বললেন 'তিনি (লিয়াকৎ আলি) শরণার্থীদের সমস্যা এখেনারে সমাধান করতে পারছেন না। লিয়াকৎ আলি প্রধান মন্ত্রী হিসাবে অনুপযুক্ত।' পরে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ গভর্নর ফ্রান্সিস মোদী এই ব্যাপারে জিন্নার সঙ্গে একমত হলেন। ব্রিটিশ গভর্নর মোদী পরে লিখলেন, 'জিন্না মিয়া মমতাজ দৌলতানাকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করলেন কিন্তু দৌলাতানা এই পদগ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কারণ তিনি বললেন তার মামদোতের নবাবের উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এ ছাড়া আমি (গভর্নর মোদী) এবং দৌলাতানা জানতাম যদি দৌলাতানা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হ'ন তাহলে তিনি (মামদোত) দৌলতানার গলা কাটবেন।' এবার জিন্না গভর্নরের পানে তাকিয়ে বললেন আপনার নীতি দুর্বল। আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাকে কী করতে হবে? জিন্না বললেন আপনাকে বলবার মত আমার কোন কিছু নির্দেশ নেই।

বন্ধু হিসাবে আপনার কী উপদেশ? ব্রিটিশ গভর্নর মোদী জিজ্ঞেস করলেন। ওদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকুন। (স্যর ফ্রান্সিস মোদীর এই রিপোর্ট ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে)।

৬ই জুলাই জিন্না এবং ফতেমা জিন্না কোয়েটা গেলেন। ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি হল। লেঃ কর্নেল ইলাহী বক্স ডাক্তারকে লাহোর থেকে কোয়েটা ডেকে পাঠান হল।

জিন্না ডাঃ ইলাহী বক্সকে বললেন আমার কিছুই হয়নি....গত ৪০ বছর ধরে আমি দিনে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে খেটেছি। জীবনে অসুখ কী জানতে পারিনি।

সাধারণত বোম্বাই'র ডাক্তারেরা আমার বুকে সর্দি, কাশি কমাবার জন্যে ওষুধ খেতে দিতেন।

ইতিমধ্যে ডাক্তারেরা রক্ত পরীক্ষা করে জানতে পারলেন যে তিনি টিউবার-ক্যুলেসিস এবং ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছেন। বাঁচবার আশা কম।

"এই সময়ে লিয়াকৎ আলি প্রতিদিন জিন্নার স্বাস্থ্যের খবর নিতে আসতেন। ফতেমা জিন্না লিয়াকৎ'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যদি তিনি (লিয়াকৎ আলি) তার ভাইকে লণ্ডন থেকে ভারতে না নিয়ে আসতেন তাহলে তার ভাই সুখে-শান্তিতে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটাতে পারতেন। পরে জিন্না তার বোনকে বললেন 'তুমি জান, লিয়াকৎ কেন এসেছে? জানতে চায় আমার রোগ কত কঠিন এবং আমি আর কতদিন বাঁচব' [জিন্না, ওলপোর্ট পৃষ্ঠা-৩৬৫]।

এই সময়ে জিন্নার দেহের ওজন ছিল মাত্র আশী পাউণ্ড। জিন্না এবার ডাক্তারদের কাছে সিগারেট খাবার অনুমতি চাইলেন। তিনি এর আগে দৈনিক পঞ্চাশটি সিগারেট খেতেন। এবার ডাক্তারেরা তাকে দিনে একটি সিগারেট খাবার অনুমতি দিলেন।

সেপ্টেম্বরে জিন্নার জ্বর বাড়ল এবং টিউবার ক্যুউলেসিস ও ফুসফুসের ক্যান্সার আরও স্পষ্ট হল। তিনি তার বোনকে বললেন, 'ফতি আমি আর বাঁচতে চাইনে। আমার শিগ্র মৃত্যু হওয়াই মঙ্গল'। এই কথা বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। জীবনে এর আগে আর একবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল; তার স্ত্রী রোটী জিন্নাকে কবর দেবার সময়। ইতিমধ্যে আমেরিকা এবং পাকিস্তানের অন্য প্রান্ত থেকে ডাক্তারেরা চিকিৎসা করতে এলেন এবং তারাও জিন্নাকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন তিনি টিউবার ক্যুউলেসিস এবং ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছেন। এর কোন চিকিৎসা নেই। পরে তাকে প্লেনে করে করাচিতে নিয়ে আসা হল।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ রাত ১০-২০ মিনিটে পাকিস্তানের স্রষ্টিকর্তা জিন্না মারা গেলেন।

যদি একবছর আগে এই দেশের নেতারা জিন্নার এই দুরারোগ্য অসুখের কথা জানতেন তাহলে দেশভাগ হত কিনা সন্দেহ। জিন্নার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতারা কেউ কোন দিন কোন অনুসন্ধান করেন নি। কারণ তখন সবাই ভাবছিলেন কত শিগ্‌গির দেশের ক্ষমতা পাওয়া যাবে।

* * *

এই খানে এই কাহিনী শেষ করা যেত কিন্তু তার আগে আরো কিছু বলা দরকার। কারণ দেশভাগের কী ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে এ কথা গান্ধীজি,

নেহরু, প্যাটেল এবং মাউণ্টব্যাটেন কেউ ভাবতে পারেননি।

নেহরু, মাউণ্টব্যাটেন সবাইকে আশা দিয়েছিলেন যে তারা কোন প্রকারেই সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা হতে দেবেন না। কিন্তু তাদের এই আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও দেশে ভয়াবহ দাঙ্গা হল। আর এই ভয়াবহ দাঙ্গার একটি বিশেষ কারণ ছিল। র‍্যাডক্লিফের বিচারের রায়।

১৬ই আগষ্ট ১৯৪৭ র‍্যাডক্লিফের রায় ঘোষণা করা হল। আর এই রায় ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পাঞ্জাবে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল। পাঞ্জাবের গুরুতর পরিস্থিতির কথা পাঞ্জাবের গভর্নর ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন। গভর্নর জানতেন যে র‍্যাডক্লিফের রায় ১৫ই আগষ্টের পর ঘোষণা করা হলে দেশে গুরুতর গোলমাল হতে পারে। হলও তাই। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক গোলমাল বন্ধ করবার জন্যে প্রদেশের বিভিন্ন শহরে মিলিটারী কম্যাণ্ড গঠন করা হল। সীমান্তরক্ষী বাহিনীও তৈরি করা হল। এই বাহিনীর সংখ্যা হল প্রায় ৫০,০০০। কিন্তু এত সতর্কতা নে'য়া সত্ত্বেও হাজার শরণার্থীরা যখন দিল্লী শহরে এসে পৌঁছুল তখন যেন মানুষের হিংসার বাঁধ ভেঙে গেল। পাঞ্জাব শরণার্থীদের থেকে চলে আসবার কাহিনী দিল্লীর জনগণকে উত্তেজিত করল। ট্রেন থামিয়ে কিংবা বাড়িতে ঢুকে মানুষ খুন করা শুরু হল। আর একটা খবরে শিখ সম্প্রদায় বিশেষ উত্তেজিত হল। গুজব রটল যে লাহোর থেকে বারো মাইল দূরে শিখদের নানকানা সাহেব মন্দিরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতএব শিখরা বেশ উত্তেজিত হল। বিভিন্ন স্থানে তারা সভা সমিতি করল। হিন্দু এবং শিখরা যে সভাসমিতি করে জনগণকে উত্তেজিত করছে এ খবর মুসলমান সম্প্রদায়ের কানে গেল। তারাও এর পাল্টা জবাব দেবার জন্যে তৈরি হতে লাগল। পাঞ্জাবের গভর্নর জেঙ্কিস ভাইসরয়কে অনুরোধ করলেন যে শহরের এই উত্তেজনাকে বন্ধ করবার জন্যে অবিলম্বে নানকনা সাহেব মন্দির ভারতকে দে'য়া হক। মন্টোগোমারী জিলাকেও ভারতে দে'য়া হক এবং এর পরিবর্তে লায়ালপুর জেলাকে পাকিস্তানে দেয়া হক এই ছিল গভর্নরের অনুরোধ। কিন্তু ১৬ই আগষ্ট র‍্যাডক্লিফ রায় প্রকাশিত হবার পর গভর্নরের অনুরোধ অনুযায়ী নতুন পাঞ্জাবের ম্যাপের কোন পরিবর্তন করা হল না। শিখদের দাবী আংশিক মেটান হলে হয়ত গোলমালের লাঘব হত। এবার তারা খণ্ড যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে লাগল। তারপর খবর এল রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রায় দু'হাজারের বেশি হিন্দু এবং শিখদের হত্যা করা হয়েছে। এর প্রতিশোধ অমৃতসহরে নে'য়া হল।

মাষ্টার তারা সিং ছিলেন শিখদের নেতা। তিনি প্রথম থেকে দেশভাগের বিরোধী ছিলেন। তার দাবী ছিল শিখদের জন্যে এক স্বতন্ত্র শিখ প্রদেশ

'খালিস্তান' গঠন করা হক।

তিনি শিখদের বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ উত্তেজিত করতে শুরু করলেন। পুলিশ মাষ্টার তারা সিংয়ের প্রচেষ্টার খবর পেলেন। কারণ পুলিশের খবর অনুযায়ী পাঞ্জাবের জলবণ্টনের ক্যানালগুলিকে ধ্বংস করবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। নেতারা দাবী করলেন যে অবিলম্বে মাষ্টার সিংকে গ্রেপ্তার করা হক কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাকে গ্রেপ্তার করতে ইতঃস্তত বোধ করলেন। মাউন্টব্যাটেন অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু তবু তিনি কোন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করছিলেন।

প্যাটেল দাবী করলেন তারা সিংকে গ্রেপ্তার করা হক, কারণ তিনি শিখদের মধ্যে গোলমাল শুরু করতে পারেন। কিন্তু শিখ নেতাকে গ্রেপ্তার করবার পরিবর্তে তাকে নিয়ে কী করা যায় কিংবা কি করা উচিৎ এই নিয়ে মাউন্টব্যাটেন পাঞ্জাবের দুই গভর্নর, পূর্ব ও পশ্চিম, স্যর ফ্রান্সিস মোদী এবং চন্দুলাল ত্রিবেদীর, সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারা শিখ নেতা, তারা সিংকে গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করলেন। অতএব তারা সিংএর বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা হল না। পরে পাঞ্জাবের গোলমাল দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল। অসংখ্য লোক প্রাণ হারাল, গৃহহীন হল। কয়েকদিনের মধ্যে দিল্লী এবং পাঞ্জাব হল এক নরককুণ্ড।

* * *

এদিকে বাংলা প্রদেশভাগের কথা পূর্ব বাংলার অধিকাংশ লোকেরাই বিশ্বাস করতে পারল না। শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলমানেরাও প্রথমে এই খবর শুনে বেশ অবাক হল। সবাই বলল বাংলা ভাগের পেছনে ছিল অবাঙালী মুসলমান হাত, যেমন ইস্পাহানী, সিদ্দিকী, এরা সবাই ছিল অবাঙালী মুসলমান। পাকিস্তান পরিকল্পনার আর একদল সমর্থক ছিল ঢাকার নবাববাড়ি।

১৫ই আগষ্ট রাত্রি বারোটার সময় নেহরু যখন সংবিধান সংসদে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন গান্ধীজি ছিলেন কলকাতায় বেলেঘাটার শিবিরে। তিনি প্রথমে নোয়াখালিতে যাবেন ঠিক করে ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সুরাবর্দীর অনুরোধে তিনি তার মত পরিবর্তন করলেন। তিনি বেলেঘাটায় এক হিন্দু-পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী তাকে বলেছিলেন যে এই এলাকায় অনেক মুসলিম বাসিন্দাদের হত্যা করা হয়েছে।

১৫ই আগষ্ট সমস্ত দেশবাসীরা যখন আনন্দ উৎসবে মেতে ছিল তখন তিনি শুধু বললেন : এ আমার স্বাধীনতা নয়…(লেখকের কাছে অধ্যাপক নির্মল বসুর মাধ্যমে) পরে তিনি কলকাতা শহরের এই হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে ক্ষণস্থায়ী বলে বর্ণনা করলেন। হলও তাই। আবার কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হল।

এর প্রতিবাদে গান্ধীজি অনশন শুরু করলেন। দাঙ্গা কমল⋯কিন্তু ওপার বাংলা থেকে জনস্রোতের আগমনের কোন ভাঁটা পড়ল না।

সেদিন শরণার্থীদের মধ্যে ছেলে, বুড়ো কিংবা গরীব, ধনীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন কিংবা যারা করেন নি, যারা দেশের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন কিংবা যারা কোন ত্যাগ স্বীকার করতে চাননি আজ সবাই এপার বাংলার জন্যে পদযাত্রা শুরু করলেন। এপার বাংলার মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী ওপার বাংলায় যাত্রা শুরু করলেন। ১৯০৫ সালে এই বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে সমস্ত দেশে আন্দোলন, সংগ্রাম করেছিল বাঙালী। সেই আন্দোলনের ভিত্তি করে রচনা করেছিল স্বাধীনতার গান, কবিতা⋯শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে, গিয়ে নেতারা বলেছিলেন আমরা প্রাণ দেব তবু বঙ্গভঙ্গ হতে দেব না।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে এর পরিবর্তন হল। বাংলা ভাগ হল। লর্ড কার্জন যা করতে পারেননি লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাই করলেন। কেউ প্রতিবাদ করল না, কোন আন্দোলন করা হল না। কারু মুখে শোনা গেল না 'বন্দেমাতরম কিংবা মুক্তির গান'। নিঃসম্বলে ভিখিরি হয়ে বাঙালীরা তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে এপার বাংলায় চলে এলেন। বাঙালী ভাবতে পারেনি যে এমনি করে একদিন দেশ ভাগ হয়ে যাবে। তারা আশা করেনি যে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। তারা বিশ্বাস করেনি যে আপোষ-মীমাংসা মধ্য দিয়ে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই দেশ যখন স্বাধীন হল তখন তাদের মনে কোন উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল না। অনিশ্চিত, অন্ধকার ভবিষ্যৎ'র সন্ধানে একদিন তারা পরাজয় স্বীকার করে বিনা প্রতিবাদে এপার বাংলায় চলে এলেন।

কিন্তু তবু অনেক আগেই বাঙ্গালী নেতারা বুঝেছিলেন দিল্লীর পথই হল 'স্বাধীনতার পথ'⋯তারা বুঝেছিলেন ঐ পথ দিয়ে যেতে হলে অনেক কঠোর সংগ্রাম, আন্দোলন, প্রয়োজন হলে, যুদ্ধ করতে হবে। মীমাংসা করে হয়তো প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। এমনি এক আদর্শের বিশ্বাসী এক নেতা সবাইকে বলেছিলেন মীমাংসা, আপোষ করে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। তিনি একদিন তার সংগ্রামী সৈনিকদের বলেছিলেন 'দূরে অনেক দূরে', নদীর একপাশে জঙ্গল ও গিরি পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে তোমার স্বদেশ জননী⋯যে মাটিতে তোমার জন্ম হয়েছে সেই মাটিতে আমরা আবার ফিরে যাব। শোন, তোমার দেশের মাটি তোমাকে ডাকছে, দিল্লী মহানগরী তোমাকে আহ্বান করছে, ভারতের আটত্রিশ কোটি লোক তোমাকে স্মরণ করছে। আজ রক্ত ডাক দিয়েছে রক্তকে। দাঁড়াও, সময় নেই, হাতিয়ার নাও⋯তোমার

সামনে রয়েছে পথ, যে পথ তোমার পূর্বপুরুষেরা তৈরি করেছিলেন। ঐ পথ দিয়ে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে, আমরা এগিয়ে যাব··· ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে শহীদের মৃত্যুকে বরণ করে নেব····কিন্তু শেষ নিদ্রার আগে আমরা ঐ পথকে চুম্বন করব····যে পথ আমাদের সেনাবাহিনীকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে····কারণ বন্ধুগণ, দিল্লীর পথ হল মুক্তির পথ··· স্বাধীনতার পথ······ চল দিল্লী··········

এই কণ্ঠস্বর কারু অজানা, অপরিচিত নয়····এ হল অতি পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠ, যিনি দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে গেলেন। শুধু রেখে গেলেন তার স্মৃতি····। সেদিনকার ঐ বীর সৈনিকের নাম ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস (নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।